পরিচয়

স্বদেশি আন্দোলন : বাংলা ও বাঙালি

পরিচয়

বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১২

মে-জুলাই ২০০৫

১০-১২ সংখ্যা ৭৪ বর্ষ

স্বদেশি আন্দোলন : বাংলা ও বাঙালি

প্রচ্ছদ
অনিল ঘোষ

সম্পাদক
অমিতাভ দাশগুপ্ত

যুগ্ম সম্পাদক
বাসব সরকাব বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

কর্মাধ্যক্ষ
পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

সম্পাদকমণ্ডলী
কার্ত্তিক লাহিড়ী
শুভ বসু অমিয ধব

সম্পাদনা সহাযতা
অজয় চট্টোপাধ্যায

দপ্তব সচিব
দুলাল ঘোষ

উপদেষ্টামণ্ডলী
বাম বসু সিদ্ধেশ্বব সেন শঙ্খ ঘোষ

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু কর্তৃক ঘোষ প্রিন্টিং ওযার্কস, ১৯/এইচ/এইচ, গোযাবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তব ৩০/৬, ঝাউতলা বোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

নিবেদন

'স্বদেশি আন্দোলন বাংলা ও বাঙালি' বিশেষ সংখ্যা প্রকাশেব মধ্য দিয়েই পূর্ণ হল 'পবিচয' পত্রিকাব ৭৪ বছব। শাবদীয 'পবিচয' ১৪১২ হবে পত্রিকাব ৭৫ বছবেব প্রথম সংখ্যা। ১৯০৫ সালেব 'স্বদেশি আন্দোলন' ২০০৫ সালে শততম জযন্তী বর্ষে প্রবেশ কবছে এই আগস্ট মাস থেকে। সেটা 'পবিচয' পত্রিকাবও পঁচাত্তব বছবেব সূচনা মাস। 'পবিচয'-এর এই বিশেষ সংখ্যা তাই বাঙালিব সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনেব দুটি বিশিষ্ট ঘটনাব যোগসূত্র হযে পড়েছে কালগতভাবে। একশ' বছব আগে বাঙালিব আত্মপবিচযেব যে সূচনা কবেছিল স্বদেশি আন্দোলন, তাতেই বুদ্ধিব মুক্তি ও যুক্তিবাদী মাত্রা যোগ কবেছিল 'পবিচয়'। সেটাই পবিচয়-এর ঐতিহ্য ও অহঙ্কার, যে সমকাল-লগ্ন হযে বাঙালি সমাজ ও জীবনেব শাশ্বত মূল্যবোধ, তাব মানবমুখিনতাকে কালান্তবে উপস্থাপনের দায বহন কবে চলেছে।

'স্বদেশি আন্দোলন · বাংলা বাঙালি' বিশেষ সংখ্যা কোনও 'মিথে জলবন্দি' সংখ্যা নয। স্বদেশি আন্দোলন নিছক একটা শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা নয। তাব অভিঘাতের কোনও কোনও দিক আজও বাঙালি জীবনে বহতা ধাবা হযে রযেছে। তাব বিষয নির্বাচনে যথাসাধ্য চেষ্টা কবা হযেছে স্বদেশি আন্দোলনেব একটা সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে। বহু চর্চিত ঘটনার কালানুক্রমিক বর্ণনা নয, একশ' বছর আগে বাঙালি সমাজ কেন এবং কীভাবে আলোড়িত হযেছিল, সেই আলোড়নে বাঙালি সমাজেব কোথায এবং কতোটা সাড়া জেগেছিল, কোনও বড়ো মাপেব পবিবর্তনেব সূচনা কোথাও হযেছিল কিনা, এসবের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা কবা এই সংকলনেব উদ্দেশ্য। বিচারেব ভাব পাঠকদেব।

স্বদেশি আন্দোলনে বৌদ্ধিক নেতৃত্ব ছিল ববীন্দ্রনাথেব। বাজনৈতিক নেতৃত্ব যাঁবা দিযেছিলেন, তাঁবা নবম কিংবা চবম যে পন্থীক মানুষ হযে থাকুন না কেন, বাঙালি সমাজ স্বদেশি আন্দোলনকে মনে বেখেছে রবীন্দ্রনাথেব জন্যে। অধিকাংশ আলোচনায তাই ববীন্দ্র-প্রসঙ্গ এসেছে স্বাভাবিকভাবেই। কাবণ ববীন্দ্রনাথকে বাদ দিযে বাঙালি চিন্তা-চেতনাব প্রাসঙ্গিকতা বোঝা, ভাবা যায না। ববীন্দ্র-পূজা নয, বিষয়-লগ্ন ভাবে ববীন্দ্র-প্রসঙ্গেব আলোচনা, বিচাব ও বিশ্লেষণ কবেছেন বিশিষ্ট প্রবন্ধকাববা।

স্বদেশি আন্দোলন বিশ শতকে বাংলা ও বাঙালিব জাতীয যুগে প্রবেশের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আবাব এই স্বদেশি আন্দোলন দেশে বিশ শতকের জাতীয মুক্তি আন্দোলনেব প্রথম ধাপ। এব আগে পবশাসনে দেশে এতো বড়ো মাপেব কোনও আন্দোলন হযনি। তাই স্বদেশি আন্দোলনের আলোচনা একটা বিশেষ গুরুত্বের দাবি কবে।

সমকালেব বাংলায় যাঁবা বিশিষ্ট প্রবন্ধকাব তাঁদেব অনেকেবই অকুণ্ঠ সহযোগিতায এই বিশেষ সংখ্যার প্রকাশনা সম্ভব হযেছে। তাঁদেব সকলেব কাছেই আমবা কৃতজ্ঞ। অনিবার্য

অপাবগতা ছাড়া সহযোগিতায কেউ কুণ্ঠিত হন নি। পবিচয পত্রিকাব প্রতিটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশনায আমাদেব যে অভিজ্ঞতা এবাবেও তাব কোনও ব্যতিক্রম হয নি।

বিশেষ সংখ্যাব প্রস্তুতিপর্বে যাঁবা পবামর্শ দিযে আমাদেব সাহায্য কবেছেন তাঁদেব মধ্যে শঙ্খ ঘোষ, পবমেশ আচার্য, শুভঙ্কব ঘোষ, হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায, অভ্র ঘোষকে ধন্যবাদ। আরো অনেকে প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষভাবে যে সাহায্য কবেছেন, তাঁদেব সকলকেও ধন্যবাদ।

পবিচয সম্পাদকমণ্ডলী এই বিশেষ সংখ্যা সম্পাদনাব ভাব আমায দিযেছেন বলে আমি আন্তবিকভাবে কৃতজ্ঞ। তবে গোড়াতেই সম্পাদকেব দাযিত্ব পালনে আমাব ত্রুটিব উল্লেখ করা দবকাব। এই সংখ্যাব পবিকল্পনা পর্ব চলাকালে দু'টি বিষয অন্তর্ভুক্ত কবা হয নি। সে দু'টি হল 'স্বদেশি আন্দোলন ও বাংলাব নিম্নবর্গ', আব 'স্বদেশি আন্দোলনেব আর্থ-সামাজিক চালচিত্র'। যখন এই ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হই, তখন আব সুযোগ্য কোনও প্রবন্ধকাবেব সাহায্য পাই নি। আশা কবব সহৃদয় পাঠকবা আমায মার্জনা কববেন। আরেকটি কথা 'আত্মচবিতে স্বদেশি আন্দোলন' নিবন্ধটি যাঁব লেখাব কথা ছিল, অসুস্থতাব জন্যে তিনি সেটা করে উঠতে পাবেন নি। আব 'স্বদেশি আন্দোলন ও বাংলা নাটক ও যাত্রা' বিষযে যাঁব লেখার কথা, তিনি আকস্মিকভাবে বিপত্নীক হযে পড়ায় সেই প্রবন্ধ পাওযা যায নি। এইসব অসম্পূর্ণতার জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

বাসব সবকার
পবিচয়-এব পক্ষে
২২ জুলাই, ২০০৫

স্বদেশি আন্দোলনের স্বরূপ

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

১৯০৫ সালেব স্বদেশি আন্দোলনেব পূর্ণ কাহিনি আমবা প্রথম পাইলাম হবিদাস মুখোপাধ্যায এবং উমা মুখোপাধ্যায বচিত একখানি গ্রন্থে। এই গ্রন্থখানি ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয। ইহাব নামেব মধ্যেই আমাদেব স্বদেশি আন্দোলনেব স্বৰূপ নির্দিষ্ট। বইখানিব নাম *'India's fight for freedom or the Swadeshi movement'*। গ্রন্থেব লেখকদ্বয বলিতে চান যে, স্বদেশি আন্দোলন ভাবতেব স্বাধীনতা সংগ্রামেব অগ্রদূত। এই কথাটি বলিযাই এই প্রবন্ধ কেন আবম্ভ করিলাম তাহা বলি। আজ প্রায সকলেই মনে কবেন যে, ভাবতেব স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয ১৯২১ সালেব অসহযোগ আন্দোলনে। এই আন্দোলন, ১৯৩০ সালেব আইন অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৪২ সালেব ভারত ছাড়ো আন্দোলন—এই তিনটি আন্দোলনই আমাদেব স্বাধীনতা সংগ্রামেব ইতিহাস বলিযাই সকলেব ধাবণা। কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে। বমেশচন্দ্র মজুমদাব আমাদেব এক শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক তাঁহাব তিন খণ্ডে বচিত *Freedom movement in India* গ্রন্থেব ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয খণ্ডে লিখিলেন :

> "The Swadeshi movement, which commenced in 1905 as a protest against the partition of Bengal, was at first a purely local movement directed against a specific administrative measure concerning only the province of Bengal. But within an incredibly short time it led to, and merged itself in, a national struggle of All India character against the British, which never ceased till India won her independence."

বঙ্গভঙ্গেব সূচনা

১৯০৩ সালের প্রথমদিকে অবিভক্ত বাংলাব লাটসাহেব Sir Andrew Fraser প্রস্তাব কবিলেন ঢাকা এবং মৈমনসিংহ—এই দুইটি জেলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগ আসামেব সঙ্গে যুক্ত হইবে। ইহাব পব ১৯০৩ সালেব ৩বা ডিসেম্বব ভাবত সবকাবেব সেক্রেটাবি H. H. Risley এই প্রস্তাবটি পত্রাকাবে বাংলার চিফ সেক্রেটাবিকে জানাইলেন এবং ১৯০৩ সালেব ১২ই ডিসেম্বব ইহা ভাবত সবকাবেব গেজেটে প্রকাশিত হইল। এই প্রস্তাবেব বিরুদ্ধে এক মাসেব মধ্যে পাঁচশত প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয এবং পঞ্চাশ হাজার পুস্তিকা প্রচাবিত হয। ভাবতেব ভাইসবয লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গেব সমর্থনে অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু প্রস্তাবটি যে কত অসংগত তাহা সেকালেব এক বিশিষ্ট ইংবাজ Sir Henry Cotton ১৯০৪ সালেব ৫ই এপ্রিল Manchester Gaurdian পত্রিকায প্রকাশিত একটি পত্রে স্পষ্ট কবিলেন। তিনি লিখিলেন

> "The idea of the severance of the oldest and most populous and wealthy portion of Bengal and the division of its people into two arbitrary sections has given such a shock to the Bengalee race, and has roused such a feeling amongst them as was never known before. The idea of being severed from their own brethren, friends, and relations and thrown in with a backward province like Assam, which in administrative, linguistic, social and ethnological features widely differs from Bengal, is so intolerable to the people of the affected tracts that public meetings have been held in almost every town and market place in East Bengal, and the separation scheme has been universally and unanimously condemned."

১৯০৫ সালের ৭ই জুলাই ভারত সরকার বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবটি প্রকাশ করেন। তাহার পরের দিন ৭০ হাজার বাঙালি একটি প্রতিবাদপত্র সহি করিয়া বিলাতে ইংরাজ সরকারের কাছে পাঠাইলেন। ৮ই জুলাই Bengal Legislative Council-এর সভায় অম্বিকাচরণ মজুমদার বাংলার লাট Sir Andrew Fraser-কে বলিলেন

> "Sir, even the worst criminal has a right to be furnished with a copy of his indictment before he is condemned, but the Government have decided the fate of over 30 millions of his Mahjesty's innocent subjects even without a hearing."

কৃষ্ণকুমার মিত্রের "সঞ্জীবনী" সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিদেশি দ্রব্য বর্জনের ডাক দেওয়া হইল। কৃষ্ণকুমার মিত্র ১৯০৫ সালের ১৩ই জুলাই তাঁহার পত্রিকায় লিখিলেন, ইংরাজ বঙ্গদেশে একটি দ্বিতীয় আয়ারল্যান্ড সৃষ্টি করিতেছে। ১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব গেজেটে প্রকাশিত হইল। ২০শে জুলাই বাঙালির প্রতিবাদপত্র প্রকাশিত হইল। এই প্রতিবাদপত্রে বলা হইল

> "আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা অতঃপর দেশজাত দ্রব্য পাইতে কোনও বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিব না। এই কার্য্য করিতে যদি আর্থিক বা অন্য কোনও প্রকারের ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত হইব। আমরা এরূপ কার্য্য কেবল নিজেরা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব না, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য লোকদিগকে এইরূপ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের এই শুভ সঙ্কল্পের সহায় হউন।"

ইহাই আমাদের স্বদেশি আন্দোলনের শুভারম্ভ। ১৯০৫-এর ৭ই আগস্ট টাউন হলে এক মহতী সভার সভাপতি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বলিলেন, আজ বঙ্গদেশে স্বদেশি আন্দোলনের আরম্ভ। কলেজ স্কোয়ারে কলেজের ছাত্রগণ বন্দে মাতরম্ ধ্বনি তুলিল। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বলিলেন, বাঙালির আজ ভীষণ দুর্দিন। বিদেশি দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হইল। এ আন্দোলনের নায়কদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আব্দুল রসুল, সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, নিউ ইন্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদক বিপিনচন্দ্র

পাল, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রাসবিহারী ঘোষ, Dawn পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বঙ্গবিভাগের পর নূতন বঙ্গের নাম হইল পূর্ববঙ্গ এবং আসাম। ইহার আয়তন ১০৬,৫৪০ বর্গ মাইল। এবং ইহার লোকসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ, ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান এবং ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু। Bampfylde Fuller হইলেন এই নূতন বঙ্গের লাটসাহেব। ইহার পর যত সভা, মিছিল কলিকাতায় এবং জিলায় জিলায় সংগঠিত হইল, তাহার গভীরতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখিয়া ইংরাজও বিস্মিত হইলেন। ইংলিশম্যান পত্রিকা লিখিল

> there was the unusual sign in the streets of Calcutta of processions of students marching, two by two, with blue pennons inscribed in Bengali with the words 'United Bengal'

৭ই অগাস্টের মহতী সভার যে বিবরণ Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত হইল তাহা স্মরণীয়

> "Those who were responsible for the Boycott Resolution have doubtless been fired by the example of the Chinese, and they are optimistic enough to assume that a boycott of European goods could be made as effective and as damaging as the Chinese boycott of American goods has to all appearance been The assumption will cause a smile on the European side for more reasons than one But all the same it would be unwise for the Government to assume that the whole movement is mere froth and insincerity"

ভারত সরকারের বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে Proclamation গেজেটে প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। ২রা সেপ্টেম্বর এই Proclamation-এর প্রতিবাদে কলেজ স্কোয়ারে এক বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পর একটি সভায় একজন মুসলমান তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, সমস্ত মুসলমান সমাজ এই বঙ্গভঙ্গের বিরোধী। বিদেশি দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে বিচলিত হইয়া Marwari Chamber of Commerce ১লা সেপ্টেম্বর Manchester Chamber of Commerce-এ একটি তারবার্তায় বলিলেন

> "We appeal to you to intervene and persuade the Secretary of State for India to prevent the partition of Bengal which has created a great tension of feeling here The Bengalees have resolved in numerous public meetings to boycott British goods The sale of Manchester goods has been practically stopped We shall be ruined and shall not be able to make future contracts unless the Secretary of State withdraws the partition and the boycott ceases The matter is very urgent"

অর্থাৎ, বিদেশি দ্রব্য আন্দোলনে ইংরাজের আর্থিক ক্ষতি হইতে আরম্ভ করিল।

এখন স্বদেশি আন্দোলনের দুইটি বিশেষ ঘটনার কথা বলি। ইহার প্রথমটি রাখিবন্ধন অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করিলেন যে, ১৯০৫-এর ১৬ই অক্টোবর এই রাখিবন্ধন অনুষ্ঠিত হইবে। হিন্দু মুসলমান সকল বাঙালি ওইদিন সকলেই সকলকে রাখি পরাইয়া দিল। ওইদিন

অসংখ্য বাঙালি কলিকাতাব গঙ্গাব পাবে এই বাখিবন্ধনেব ব্রত পালন কবিল। একটি বাজনৈতিক আন্দোলন এক হৃদযবস্তু হইযা উঠিল। এই বাখিবন্ধন অনুষ্ঠানই ববীন্দ্রনাথ রচিত একটি গান সহস্র সহস্র কণ্ঠে গীত হইল

"বাংলাব মাটি বাংলাব জল
বাংলার বাযু বাংলাব ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হঁউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।"

দ্বিতীয অনুষ্ঠানটি অবন্ধন নামে পবিচিত। বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী প্রস্তাব কবিলেন যে, বঙ্গভঙ্গেব দিন বাঙালি মহিলারা বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত পালন কবিবেন এবং সেইদিন অবন্ধনেব দিন বলিযা পালিত হইবে। সেইদিন কেহ এই বঙ্গলক্ষ্মীব ব্রতকথাকে হিন্দুব সৃষ্টি বলিযা তুচ্ছ কবে নাই। হিন্দুব কোনো পুরাণে বঙ্গলক্ষ্মী নামে কোনো দেবীব উল্লেখ নাই। ওইদিন অপবাহ্নে বঙ্গ-ভবন স্থাপনেব উদ্দেশ্যে কলিকাতায পাবশি বাগানেব মাঠে ফেডাবেশন হল বা মিলন-মন্দিব-এব ভিত্তি স্থাপিত হইল। বোগ শয্যাগত আনন্দমোহন বসু সভাপতিত্ব কবিলেন। প্রায় ৫০ হাজাব কণ্ঠে উচ্চাবিত 'বন্দে মাতবম্' ধ্বনিব মধ্যে সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিব অভিভাষণটি পাঠ করিলেন। ইহাব পব আনন্দমোহন বসু স্বাক্ষবিত একটি ঘোষণাপত্র পঠিত হইল। ইংবাজিতে আশুতোষ চৌধুবী এবং বাংলায ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব এই ঘোষণাপত্রটি পাঠ কবিলেন। ঘোষণাপত্রটি এই .

"যেহেতু বাঙ্গালী জাতিব সর্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য কবিযা পার্লামেন্ট বঙ্গেব অঙ্গচ্ছেদ করিযাছেন, সেহেতু আমরা এই প্রতিজ্ঞা কবিতেছি যে, বঙ্গেব অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ কবিতে এবং বাঙ্গালী জাতিব একতা সংবক্ষণ কবিতে আমবা সমস্ত বাঙালী জাতি আমাদেব শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহাব সকলই প্রযোগ কবিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।"

সভা শেষ হইলে ওই বিপুল জনতা পশুপতি বসুব বাটীব দিকে যাত্রা কবিলেন। ববীন্দ্রনাথও তাহাদেব মধ্যে ছিলেন এবং সহস্রকণ্ঠে তাঁহাব এই গানটি গাওযা হইল .

"ওদেব বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদেব ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদেব আঁখি ফুটবে,
ততই মোদেব আঁখি ফুটবে।"

এই গানটি শেষ হইলে জনতা ববীন্দ্রনাথেব আবেকটি গান গাহিল। এই গানটি ববীন্দ্রনাথেব স্বদেশি গানেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ গান বলিয আজ চিহ্নিত

"বিধিব বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমনি শক্তিমান।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমাব হাতে এমন অভিমান—
তোমাদেব এমনি অভিমান॥

চিবদিন টানবে পিছে, চিরদিন বাখবে নীচে—
এত বল নাই বে তোমার, সবে না সেই টান॥
শাসনে যতই ঘেবো আছে বল দুর্বলেবও,
হও-না যতই বড়ো আছেন ভগবান।
আমাদেব শক্তি মেবে তোবাও বাঁচবি নে বে,
বোঝা তোব ভাবী হলেই ডুববে তবীখান॥"

এই গান আজকাল আব শুনি না। ইহাব শেষ চবণটি বাজদ্রোহ। কিন্তু কলিকাতার পুলিশ সেদিন ইহা লক্ষ কবে নাই।

স্বদেশি আন্দোলনের ভাবটি ববীন্দ্রনাথ তাঁহাব গানে এবং প্রবন্ধে এক মহৎ বস্তুরূপে উপস্থিত কবিযাছেন। সেই বস্তু এখন ইতিহাস এমন কথা বলিতে পাবি না। ইহা এখনও বাঙালি জীবনেব এক অতি মূল্যবান আদর্শ বলিয়া ধবিতে পারি। ববীন্দ্রনাথ সেইদিন আমাদেব স্বদেশিসমাজ সম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহা আজও বাঙালি জীবনেব এক অমূল্য সামগ্রী। এই কথাটি বুঝিতে হইলে আমাদেব ওই সময় বচিত তাঁহাব প্রবন্ধগুলি যত্ন কবিযা পডিতে হইবে।

স্বদেশি আন্দোলনেব সময়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধ কবির সমাজচেতনাব স্বরূপটি স্পষ্ট কবিযাছে। কবিব যে প্রবন্ধটি আজ অবশ্য পাঠ্য বলিযা মনে কবি সেটিব নাম স্বদেশিসমাজ। প্রবন্ধটি ১৩১১ সালেব ভাদ্র মাসে রচিত। তবে একালেব বাঙালি বোধহয় এই প্রবন্ধের মূল কথাটি বুঝিতে পাবিবে না। কথাটি এই

> "আমাদের দেশে সবকারবাহাদুব সমাজেব কেহই নন, সবকাব সমাজেব বাহিরে। অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহাব কাছ হইতে প্রত্যাশা কবিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিযা লাভ কবিতে হইবে। যে-কর্ম সমাজ সবকাবেব দ্বাবা কবাইযা লইবে, সেই কর্ম সম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিযা তুলিবে। অথচ এই অকর্মণ্যতা আমাদের দেশেব স্বভাবসিদ্ধ ছিল না,। আমরা নানা জাতির, নানা বাজাব অধীনতাপাশ গ্রহণ কবিযা আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনাব সমস্ত কাজ আপনি নির্বাহ করিযা আসিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিযযেই বাহিবেব অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ কবিতে দেয় নাই। সেই জন্য রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায গ্রহণ কবেন নাই।"

এই তত্ত্ব সামাজিক ঐক্যের তত্ত্ব। সমাজ ভাবে-চিন্তায ঐক্যবদ্ধ না হইলে একনিষ্ঠ হইযা কোনো কর্ম সম্পাদন অসম্ভব। ববীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনেব সময এই সামাজিক ঐক্যে তাঁহাব দেশবাসীকে ডাকিযা বলিলেন

> 'পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদযকে এক কবা।'

বাঙালি এ কথা শুনিল। আমাদেব স্বদেশি আন্দোলন এই কাবণে সার্থক হইল, সফল হইল। দ্বিখণ্ডিত বঙ্গদেশ আবাব এক হইল। ববীন্দ্রনাথেব এই সমাজচেতনা আজ আমাদেব নূতন কবিযা বুঝিতে হইবে। তিনি বলিলেন "প্রত্যেক জাতি বিশ্বমানবেব অঙ্গ।" কবিব স্বদেশি গানেও তিনি আমাদেব এই কথা বুঝাইযাছেন ·

"ও আমাব দেশেব মাটি, তোমাব পবে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীব, তোমাতে বিশ্বমাযেব আঁচল পাতা॥"

আমাদেব বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে আমবা কেবল দুই বঙ্গকে এক কবিতে চাহি না। আমবা সাবা বিশ্বকে এক কবিতে চাহিযাছি।

স্বদেশি আন্দোলনেব পূর্ব কথা

আমাদেব স্বদেশি আন্দোলনেব এই গভীবতাব কাবণ কী? ১৯০৫ সালে এই আন্দোলনেব আবম্ভ, কিন্তু এই আন্দোলনেব মূল ভাবটিব স্ফুবণ হয ইহাব বহু পূর্বে। আমাদেব স্বদেশ-চিন্তাব প্রথম প্রকাশ সিপাহী বিদ্রোহেব প্রায ১০ বৎসব পূর্বে বচিত এবং সংবাদ প্রভাকব পত্রিকায প্রকাশিত ঈশ্বব গুপ্তেব জননী ভাবতভূমি কবিতাটিতে। যদিও হিন্দু মেলাব যুগে বা স্বদেশি আন্দোলনেব যুগে এই গানটি প্রচলিত ছিল না তবু বলিতে হয এই কবিতাটি দেশবাৎসল্যেব আদি বাংলা গান। ঈশ্বব গুপ্তেব কযেকটি পদ বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ প্রীতিব ইতিহাসে অবশ্য স্মবণীয

"কত ৰূপ স্নেহ কবি দেশেব কুকুব ধবি
বিদেশেব ঠাকুব ফেলিযা।"

অথবা

"থাকিযা মাযেব কোলে সন্তানে জননী ভোলে
কে কোথায এমন দেখেছে?"

স্বদেশি আন্দোলনে বিদেশি দ্রব্য বর্জনেব প্রস্তাবেব সূচনা দেখি ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত ভোলানাথ চন্দ্রেব চিন্তায। এই ভোলানাথ চন্দ্রই বিদেশি দ্রব্য বর্জনেব প্রস্তাব প্রথম কবেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *A Brief History of Bengal Commerce* গ্রন্থে কৃষ্ণমোহন মল্লিক লিখিলেন যে, ইংবাজ আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যেব প্রসাবে বাংলাব ধনবৃদ্ধি হইযাছে। ভোলানাথ চন্দ্র তিনখণ্ডেব এই বইখানিব একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা *Mookerjee's Magazine*-এ প্রকাশ কবেন। এই সমালোচনায তিনি লিখিলেন

> "Allow us a share in the administration, and to frame our own tariff—and, with, perhaps at starting, a bit of patriotism to refuse to buy foreign goods, the children of India will prove to the world whether providence has willed them to be mere agriculturists, or whether they cannot dethrone King Cotton of Manchester, and once more re-establish their sway in the Cotton world."

ইহাব ৩০ বৎসবেব পবে আমবা বিদেশি দ্রব্য বর্জন কবিবাব প্রস্তাব গ্রহণ কবিলাম।

১৮৭০ সালে বাজদ্রোহ সম্বন্ধে ভাবত সবকাবেব আইনটি বিধিবদ্ধ হয। চিবল সাহেব তাঁহাব *Indian Unrest* (১৯১০) গ্রন্থে লিখিলেন যে, ভাবতে বাজদ্রোহ আবম্ভ হইযাছে। ইহাব তিন বৎসব পবে লন্ডন প্রবাসী বাঙালি পণ্ডিত S. N. Mitra তাঁহাব *Anglo Indian* (১৯১৩) গ্রন্থে লিখিলেন

"There is ample material to prove from the literature of the day that, though bombs were not then explodd against individuals the feeling of certain classes against the Government and the English was not less intense than it is today"

স্বদেশি আন্দোলনেব পূর্ব কথায দুইটি আন্দোলনেব কথা বলিতে হয। প্রথমটি নীল আন্দোলন (১৮৬০-৬১) দীনবন্ধু মিত্রেব 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয ১৮৬০ সালে। ১৮৬১ সালে 'নীলদর্পণ'-এব ইংবেজি অনুবাদ প্রকাশিত হইলে দুই ইংবাজ সম্পাদক ইহাব বিরুদ্ধে Supreme Court-এ মামলা কবিলেন। ইংবাজি অনুবাদে নাট্যকাবেব বা অনুবাদকেব নাম ছিল না। জেমস লঙ-এব অনুবোধে মাইকেল মধুসূদন দত্ত নাটকটিব অনুবাদ কবেন। জেমস লঙ আদালতে স্বীকাব কবিলেন যে তিনি এই অনুবাদেব জন্য দাযী। সুপ্রিম কোর্ট জেমস লঙ-কে একমাসেব কাবাদণ্ড দিলেন এবং হাজাব টাকা জবিমানা কবিলেন। আদালতে কালীপ্রসন্ন সিংহ উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি জবিমানাব টাকা সবকাবকে দিযা দিলেন। তবে এই নীল আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনেব বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল না। আন্দোলনকাবীদেব অভিযোগ ছিল নীলকব সাহেবদেব বিরুদ্ধে। দ্বিতীয আন্দোলন ইলবার্ট আন্দোলন। এই আন্দোলন ইংবাজ বিদ্বেষেব প্রথম প্রকাশ। ১৮৭২ সালেব ১০ নম্বব আইনের ৭ম অধ্যায অনুসাবে মফস্‌সলে কোনো ভাবতীয ম্যাজিস্ট্রেট বা জজেব কোনো ইংবাজেব বিচাব কবিবাব অধিকাব ছিল না। এই অন্যায বর্ণবৈষম্যেব বিরুদ্ধে কিছুকাল ধবিযাই আন্দোলন চলিতেছিল। ১৮৮২ সালেব ২০শে মার্চ বাংলাব সবকাব এই এক নূতন আইন কবিযা এই বৈষম্যেব অবসান কবিবাব জন্য ভাবত সবকাবকে পত্র লেখেন। এই পত্রেব সঙ্গে বিহাবীলাল গুপ্তেব যে দীর্ঘ মন্তব্য ছিল তাহাই এই বিলেব ভিত্তি। বিলটি যখন উপস্থিত কবা হয তখন সি পি ইলবার্ট আইন সদস্য ছিলেন এবং বিলেব স্টেটমেন্ট অব অবজেক্ট অ্যান্ড বীজনস্ তাঁহাব বচনা বলিযা এই বিল ইলবার্ট বিল নামে পবিচিত। প্রকৃতপক্ষে এই বিল বিহাবীলাল গুপ্তেব পবিকল্পনা।

১৮৮৩ সালের ৯ই ফেব্রুযাবি বিলটি কাউন্সিলে উপস্থিত কবা হয। ইহাব দশদিনেব মধ্যে ১৭ই মার্চ কলিকাতা টাউন হলে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদাযেব এক সভায এই বিলেব প্রতিবাদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয। সবকাব বিলটি প্রত্যাহাব কবেন। দেশে ইংবাজ বিদ্বেষ বাডিতে থাকে। তবে স্বদেশি আন্দোলন যে স্বাদেশিকতাব ভাবেব সৃষ্টি কবে তাহাব পূর্বাভাস হিন্দু মেলায দেখা গিযেছিল—একথা আগেই বলিযাছি। এখন এই হিন্দু মেলাব কাহিনি সংক্ষেপে উপস্থিত কবিতে পাবি। এই কাহিনি যোগেশচন্দ্র বাগল ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত তাঁহাব হিন্দু মেলাব ইতিবৃত্ত গ্রন্থে বিবৃত কবিযাছেন। এই মেলাব প্রথম অধিবেশন হইযাছিল ১৮৬৭ সালে। এই হিন্দু মেলাব নবম অধিবেশন ১৮৭৫ সালে অনুষ্ঠিত হয। এই অধিবেশনে ববীন্দ্রনাথ তাঁহাব হিন্দু মেলায উপহাব কবিতাটি পাঠ কবেন। এই কবিতাটি স্বদেশভাবের কবিতা।

স্বদেশি আন্দোলনকে স্বাধীনতা আন্দোলন বলিতে পাবি না। ইহা বঙ্গভঙ্গেব বিরুদ্ধে আন্দোলন। ইহাব আবম্ভ ৭ই অগাস্ট ১৯০৫। ১৯১১ সালেব ১২ই ডিসেম্বব যখন দিল্লি

দরবাবে পঞ্চম জর্জ কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ বহিত কবা হয, সেই দিন এই আন্দোলন শেয হয়। তবে যদিও স্বদেশি আন্দোলন স্বাধীনতাব জন্য আন্দোলন ছিল না তবু বলিতে পাবি এই আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামেব অগ্রদূত। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসেব জাতীয সভায পূর্ণ স্ববাজেব প্রস্তাব গৃহীত হয। এই প্রস্তাব জহবলাল নেহেরু উপস্থিত কবেন। কিন্তু স্বদেশি আন্দোলনকেই আমরা আমাদেব স্বাধীনতা সংগ্রামেব সূত্রপাত বলিযা ধবিযা লইতে পাবি। ১৯০৮ সালে স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধিব একটি উক্তি এখানে স্মবণ কবিতে পাবি

> "The real awakning [of India] took place after the partition of Bengal That day may be considered to be the day of the partition of British Empire .After the partition the people saw that they must be capable of suffering This new spirit must be considered to be the chief result of the partition"

এই প্রসঙ্গে আব একটি কথা স্মবণ কবিতে পাবি। ১৯০৬ সালে জাতীয কংগ্রেসেব বার্ষিক সভা কলিকাতায অনুষ্ঠিত হয। এই সভাব সভাপতি ছিলেন দাদাভাই নৌরজী। তিনি তাঁহাব সভাপতি ভাযণে স্ববাজ কথাটি উচ্চাবণ কবেন। এই স্ববাজের আদর্শই ১৯০৫-এর স্বদেশি আন্দোলনেব মর্মকথা। স্বদেশি আন্দোলনেব সমস্ত গান আজ আমবা একটি বৃহৎ সংকলনে পড়িতে পারি। এই গ্রন্থখানি হইল ডাঃ গীতা চট্টোপাধ্যাযের *বাংলা স্বদেশি গান* (১৯৮৩)। অনেক স্বদেশি গান স্বদেশি আন্দোলনেব পবেও সভা-সমিতিতে গীত হইত। আমাব মনে আছে যখন ইস্কুলেব ছাত্র ছিলাম তখন একটি গান আমবা গাহিতাম যেটি বাজদ্রোহমূলক :

> "মুক্ত সমুন্নত-পতাকা তলে,
> মিলাও ভাবত-সন্তান সকল,
> নব আশে হিন্দুস্থান, ধরুক নূতন তান,
> এস অবি-শোণিতে মেদিনী বঞ্জিতে
> এস নব বেশে ভীষণ অসিধাবী।"

গীতা চট্টোপাধ্যাযেব বইখানিতে জানিলাম যে, এই গানটিব বচয়িতা কামিনীকুমাব ভট্টাচার্য।

স্বদেশি আন্দোলন বঙ্গদেশে যে স্বদেশ চেতনাব সৃষ্টি কবিযাছিল সেই স্বদেশ চেতনা মনে হয আজ আমবা হাবাইযাছি। এই স্বদেশ চেতনাব স্বরূপ আমাদেব ববীন্দ্রনাথ বুঝাইযাছিলেন। এই সম্পর্কে ববীন্দ্রনাথেব সকল চিন্তা সকল ভাব তাঁহাব স্বদেশি সমাজ প্রবন্ধে বড় সুন্দব বুঝাইযাছেন

> "আমবা নানা জাতিব, নানা বাজাব অধীনতা পাশ গ্রহণ কবিযা আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিবদিন আপনাব সমস্ত কাজ আপনি নির্বাহ কবিযা আসিযাছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষযেই বাহিবেব অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ কবিতে দেয নাই। সেইজন্য বাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্বাসিত সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায গ্রহণ করেন নাই।"

কিন্তু আজ বাঙ্গালির সেই বঙ্গবোধ কই? এক নিবিড় বঙ্গবোধ হইতে ভাবতবোধেব সৃষ্টি। আবাব এই ভারতবোধই এক নিবিড বিশ্ববোধেব উৎস। কিন্তু আমাদের ভাবনাব এই তিনটি

স্তবের কোনো আভাস আমি কোথাও পাই না। এই বিষযে কোনো মহৎ উচ্চারণ শুনি না। আমরা ইংবাজকে তাডাইযাছি কিন্তু আমাদের দেশাত্মবোধ যেন কোথাও দেখি না। আমাদেব বাজনীতি এখন আব কোনো বৃহৎ নীতিতে পবিণত হয না। আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। কিন্তু আমাদেব চিত্তেব স্বাধীনতা এখনও পাই নাই। আমরা এখনও কোনো মহৎ আদর্শে নিমগ্ন হই না। মাইকেল তাঁহাব একটি সনেটে বলিযাছিলেন .

'জ্যোতির্ময কব বঙ্গ ভাবত বতনে।'

আমবা কি জ্যোতির্ময হইয়াছি? আজ সাবা ভাবত যেন খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। বঙ্গদেশও যেন ভাবনাব দিক হইতে খণ্ড খণ্ড হইযা যাইতেছে আমবা যেন কোনোভাবেই পূর্ণতালাভ কবিতে পারিতেছি না। ববীন্দ্রনাথ তাঁহাব একটি গানে লিখিযাছিলেন

"বাঙালির প্রাণ, বাঙালিব মন, বাঙালির ঘবে যত ভাই বোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।"

এই ঐক্য কি আমবা লাভ কবিয়াছি? বাজনীতিব স্পন্দনেব অভাব নাই। কিন্তু বাঙালিব প্রাণেব স্পন্দন কোথায?

বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশি আন্দোলন

বমাকান্ত চক্রবর্তী

এক

১৮৭৪-এ গোযালপাডা, কাছাড, এবং শ্রীহট্ট সহ, 'চিফ্ কমিশনাব'শাসিত আসাম প্রদেশ গঠিত হয। তাব আগে আসাম বঙ্গ-'প্রেসিডেন্সি'-ব অংশ ছিল। ১৮৭৪-এব পবে বঙ্গ -'প্রেসিডেন্সি'-ব অংশ ছিল বঙ্গ, বিহাব, উডিয্যা, এবং ছোটনাগপুব। আযতন ছিল ১,৯০,০০০ বর্গমাইল, এবং লোকসংখ্যা ছিল সাত কোটি আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজাব। আদায কবা হত ১১ কোটি টাকাবও বেশি বাজস্ব।

১৮৯১-তে কযেকজন উচ্চপদস্থ আমলা এই প্রস্তাব কবলেন যে, লুশাই পাহাড়-অঞ্চল, এবং চট্টগ্রাম বিভাগ আসামেব সঙ্গে মিশে যাওযা উচিত। ১৮৯২-তে এই সংযোগ সবকাব-'বাহাদুব' মেনে নিলেন, কিন্তু আমাদের তৎকালীন 'চিফ্ কমিশনাব' সাব্ উইলিযাম ওযার্ড্ ১৮৯৬-তে ঢাকা বিভাগকেও আসাম-প্রদেশেব অংশ কবতে চাইলেন। চাইলেন মৈমনসিংহকেও। এই প্রস্তাবেব কঠোব সমালোচনা কবেছিল 'ইন্‌ডিযান্ এসোসিযেশন্'। সাহেবদেব মধ্যে, আসামেব অস্থাযী কমিশনাব হেন্‌বি কটন্ এই প্রস্তাবেব বিবোধী ছিলেন। প্রধানত তাঁব বিবোধিতাব জন্যই তখন ঢাকা ও মৈমনসিংহ বঙ্গেব অংশ হযে বইল।

১৯০১ সালে উড়িয্যাকে বঙ্গীয 'প্রেসিডেন্সি' থেকে সবিযে 'সেন্ট্রাল প্রভিন্‌সেস্'-এব সঙ্গে যুক্ত কবাব প্রস্তাব দিলেন স'ব্ এন্ড্রু ফ্রেজাব, তিনি ছিলেন সেন্ট্রাল প্রভিনসেস্-এব 'গর্ভনব'। ১৯০৩-এ এই ব্যক্তি বঙ্গেব গভর্নব হলেন। ১৯০৩-এ ফ্রেজাব সাহেব পূর্বোক্ত উইলিযম ওযার্ড-এব পবিকল্পনা নিজেব ভাষায পেশ কবলেন, অর্থাৎ চট্টগ্রাম, ঢাকা, মৈমনসিংহকে বঙ্গ-'প্রেসিডেন্সি' থেকে বিচ্ছিন্ন কবে আসামেব সঙ্গে সংযুক্ত কবতে চাইলেন। ১৯০৩-এব মধ্যভাগে বডলাট লর্ড কার্জন এন্ড্রু ফ্রেজাব-এব প্রস্তাব সমর্থন কবেছিলেন।

১৯০৩-এ ৩ ডিসেম্বব ভাবতে সবকাবেব গৃহ-সচিব এইচ এইচ বিজ্‌লে বঙ্গীয সবকাবকে একটি পত্র লিখে জানালেন যে, বঙ্গ 'প্রেসিডেন্সিব'-ব আযতন বিশাল, লোকসংখ্যা ৭৮, ৪৯৩, ০০০, এবং বাজস্বেব পবিমাণ ১১৩৭ লক্ষ। এই ভাব যেহেতু দুর্বহ, তাই আযতনেব হ্রাস দুর্নিবাব। কিন্তু, বঙ্গভঙ্গেব কথা উঠলেই সমালোচনা হবেই, তবে সুশাসনেব প্রযোজনে সমালোচনা গ্রাহ্য না কবাই বিধেয। বিজ্‌লে-সাহেবেব প্রস্তাব প্রকাশিত হয, এবং সমালোচনাব ঝড ওঠে, কিন্তু লর্ড কার্জন যেন ঝডেব হাওযাতেও নিষ্কম্প দীপশিখা, ১৯০৪-এ তিনি দলবল নিযে চট্টগ্রামে, মৈমনসিংহে, ঢাকায গেলেন, বক্তৃতা কবে বঙ্গভঙ্গেব প্রযোজনীযতা ব্যাখ্যা কবলেন। কিন্তু তিনি এটাও উপলব্ধি কবলেন যে, জনমত গ্রাহ্য কবলে বঙ্গভঙ্গ হবে না। অতএব, জনমত অগ্রাহ্য কবাই বিধেয।

গোপনে বঙ্গভঙ্গেব কাজ চলল। লুকিযে চুবিযে কাজ হল। ১৯০৫-এ মে মাসে লন্ডনেব The Standard পত্রিকায খবব বেব হল যে ভাবত-সচিব বঙ্গভঙ্গেব প্রস্তাব মেনে নিযেছেন। প্রায যাটহাজাব লোকেব স্বাক্ষব-যুক্ত একটি প্রতিবাদপত্র বচিত হলেও বঙ্গভঙ্গ হযে গেল, কেননা প্রতিবাদপত্রটি হস্তগত হওযাব আগেই ভাবতসচিব বঙ্গভঙ্গেব প্রস্তাব গ্রহণ কবেছেন।

বঙ্গভঙ্গ হল এইব্দপ, যথা

চট্টগ্রাম, ঢাকা, এবং বাজশাহি 'বিভাগ', মালদহ, এবং দার্জিলিং বাদে জলপাইগুডি জেলা, তৎসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম, এবং আসাম সহ গঠিত হল পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ।

এই প্রদেশেব প্রশাসক হলেন একজন ''লেফ্‌টেনেন্ট-গর্ভনব''।

এই প্রদেশেব বাজধানী হল ঢাকা নগব।

জনসংখ্যা · ১৮ ''মিলিযন'' মুসলমান, এবং ১২ ''মিলিযন্‌'' হিন্দু।

এই নূতন প্রদেশেও কলকাতাব উচ্চ আদালতেব ''বিচাবকবণাধিকাব'' অক্ষুণ্ণ থাকল।

বঙ্গ থেকে বিযুক্ত হল ছোটনাগপুবেব পাঁচটি ''হিন্দু'' বাজ্য, বঙ্গ পেল সম্বলপুব এবং পাঁচটি ''উডিযা''-বাজ্য। ভাঙা বাংলাব আযতন হল ১,৪১,৫৮০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৫৪ ''মিলিযন'', তাদেব মধ্যে ৪২ ''মিলিযন্‌''-ই হিন্দু। বঙ্গেব পনেবোটি জেলা আসামেব সঙ্গে যুক্ত হল। এই জেলাগুলো হল ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফবিদপুব, বাখরগঞ্জ, টিপেরা, নোযাখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাজশাহি, দিনাজপুব, জলপাইগুড়ি, বংপুব, বগুড়া, পাবনা, মালদহ।

এইব্দপ বঙ্গভঙ্গেব ফলে উদ্‌বাস্তু-সমস্যা দেখা গেল না। কেউ ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র পালিযে যাননি। কিন্তু, জনমতকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য কবে, লুকিযে চুবিযে এমন ভাবে বাংলা ভাগ বাংলাব অধিকাংশ মানুষ নীববে মেনে নিতে পাবলেন না।

দুই

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গকালে 'ব্যনেসাঁস্‌' ছিল গতিশীল এবং সুস্পষ্ট। তখন সমগ্র ভাবতে বঙ্গ অতি বিখ্যাত প্রদেশ, কলকাতা ভাবতেব বাজধানী, ''প্রাসাদনগবী''। তখন সক্রিয ছিলেন বহু বিশিষ্ট ভাবতবিখ্যাত বাঙালি বাজনীতিবিদ্‌, জননেতা, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্‌, 'ভদ্রলোক', 'বাবু',—এঁদেব নিযে ম্যাক্স্‌ বেবব্‌ প্রবর্তিত সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা হযেছে, আলোচিত হযেছে এঁদেব নানাবিধ দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা, স্বার্থ-সংঘাত, এবং প্রবণতা।[১] কিন্তু, এতো সমালোচনাব পবেও, চুলচেবা বিশ্লেষণেব পবেও, এখন ভাবি কোথায উধাও হযে গেলেন আনন্দমোহন বসু, বমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব, বিপিনচন্দ্র পাল, সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায, অশ্বিনীকুমাব দত্ত, অববিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায, প্রফুল্লচন্দ্র বায, জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায? ১৯০৫-এও 'ব্যনেসাঁস' যথেষ্ট গভীব, অশেষ সম্ভাবনাময। আমবা ১৯৪৭-এব বঙ্গ বিভাজন মেনে নিযে উদ্বাস্তু-উপনিবেশে, বেলস্টেশন্‌-এ থেকেছি, কাবণ যাঁদেব

নাম করলাম, তাঁবা আমাদেব মধ্যে ছিলেন না। বিখ্যাত লোকজ্যেষ্ঠগণ আছেন, আছে ভাষাব গর্ব, সাহিত্যের গর্ব, সংস্কৃতিব গৌবব। বাঙালি কেন মানবেন উদ্ধত লর্ড কার্জন-কৃত বঙ্গভঙ্গ? কেন মানবেন পূর্ববঙ্গের, উত্তব বঙ্গেব পনেবোটি জেলাব আসামেব সঙ্গে সংযুক্তি?

প্রশ্ন উঠবে,—পূর্ববঙ্গেব মুসলমানবা ও নমশূদ্রবা বঙ্গভঙ্গ মেনেছিলেন। তাঁবাই ছিলেন সংযুক্ত জেলাসমূহে সংখ্যায় গবিষ্ঠ। তবে কি বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনকে প্রধানত "বাবু" জাতীয হিন্দুদের আন্দোলন বলা যায না? এব উত্তবে এই বলা যায যে, ১৯০৫-এ এমন কোনও পবিব্যাপ্ত দুর্বুদ্ধি তো ছিল না, যাতে বঙ্গবিভাজন প্রতিষ্ঠিত সত্য রূপে সর্বগ্রাহ্য হতে পাবত।

তবুও প্রসঙ্গত কিছু কথা মনে হয। বঙ্গভঙ্গেব বিরুদ্ধে, এইচ এইচ বিজ্‌লেব মতে, এই আপত্তি তোলা যেত .[৩]

> Bengal united is a power Bengal divided will pull in several different ways

কিন্তু, বিজ্‌লেব মতো সাহেবরা তো তাই চেয়েছিলেন।

১৯০৫-এব বঙ্গভঙ্গ ছিল বঙ্গীয 'ব্যনেসাঁস'-এব দুর্নিবাব পবিণাম। ১৯০০-তেও শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু সর্বক্ষেত্রে অগ্রবর্তী, বিশেষ প্রভাবশালী, দারুণ বুদ্ধিমান, অসম্ভব দাপুটে। আব বাঙালি মুসলমান সর্বক্ষেত্রেই পিছিযে ছিলেন, তাঁদের ভুবন অনালোকিত। কার্জন এই বিষযটি জানতেন। মুগল-আমলে ঢাকাব গৌবব ফিবিযে আনাব কথা ঢাকায গিযে তিনি বলেছিলেন, ঢাকাব নবাব সলিমুল্লাকে সহজ সর্তে চৌদ্দ লক্ষ টাকা সবকাবি ঋণ দেওযাব ব্যবস্থা করে হাতে এনেছিলেন। এইরূপ সাম্প্রদাযিক ভেদবুদ্ধিব একটা স্বাভাবিক ক্ষেত্র ছিল।

জাতীয কংগ্রেসেব দুর্বলতাও কার্জন লক্ষ কবেছিলেন, ১৯০০-তে লিখেছিলেন . "Congress is to tottering to its fall" ।[৪] সাহেববা এটাও কি জানতেন যে, 'বাঙ্গাল'দেব সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গে, ঠিক বিদ্বেষভাব না থাকলেও, নাসিকাকুঞ্চনেব অভাব ছিল না? সুশীলকুমাব দে-সংকলিত 'বাংলাপ্রবাদ' গ্রন্থে 'বাঙাল'দেব সম্বন্ধে যে পাঁচটি প্রবাদ আছে, সেগুলো জঘন্য বিদূষণমূলক।[৫] 'বাঙ্গাল'-দেব নিযে তামাশা কবাব আবও বহু বিববণ আছে। খ্যাতনামা পণ্ডিত জর্জ আব্রাহাম গ্রিযাবসন্ তাঁব এক বিখ্যাত নিবন্ধে "Calcutta Civilisation"-এব উল্লেখ কবেছেন। প্রশংসনীয এই "কলিকাতা-সভ্যতা'-য 'বাঙাল'-দেব ও উডিযাদেব, বিশেষভাবে মুসলমানদের অবদান অদ্যাবধি অবহেলিত।[৬]

ব্রাহ্ম মতাবলম্বী ভদ্রজন এইরূপ সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা দূব কবার জন্য চেষ্টা কবেছিলেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গেব ও উত্তববঙ্গেব উন্নযনেব বিষযটি পশ্চিমবঙ্গেব ভদ্র সংস্কৃতিতে অবহেলিত হযেছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন [৭]

> দেশীয লোকের অর্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল?
> কেন স্বধর্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল?

কোন জাতীযেবা মুসলমান হইযাছে? বাঙ্গালার
ইতিহাসে ইহাব অপেক্ষা গুরুতব তত্ত্ব আব নাই।

এসব পড়ে মনে হয যে, "দেশীয লোকের অর্ধেক অংশ" মুসলমান হওয়া অপবাধ হযেছিল। একে তো গঙ্গা-ভাগীবথী নেই, তায "যবনাধ্যুষিত"। এমন যে পূর্ববঙ্গ,—তাব দিকে, এক ব্রাহ্ম ছাড়া, আব কাব দৃষ্টি নেই। পূর্ববঙ্গে উত্তববঙ্গে যে সব পশ্চিমবঙ্গীয় জমিদাবেব জমিদাবি ছিল, তাঁবা তাঁদেব পূর্ববঙ্গীয উত্তববঙ্গীয প্রজাদেব আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নযনেব জন্য সচেতনভাবে কোনও কর্ম কবেননি।[৮] পূর্ববঙ্গেব ও উত্তববঙ্গেব যে সব খ্যাতনামা ব্যক্তি কলকাতায কুলীন সমাজে কল্কে পেতেন, তাবাও কি তাদের জন্মভূমিব উন্নযনের জন্য কিছু কবেছেন? তবে এঁদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিলেন মহাত্মা অশ্বিনীকুমাব দত্ত এবং মৈমনসিংহেব কোনও কোনও বাবেন্দ্র জমিদার।

এটাও সত্য যে আসামে বহু বাঙালি ছিলেন, অদ্যাবধি আছেন। আসামেব প্রথম"সিভিলিযান" (অর্থাৎ আই সি এস-আমলা), সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত, আনন্দবাম বড়ুয়াব পূর্বপুরুষ ছিলেন বাঙালি কুলীন কাযস্থ দুর্গাচবণ বসু।[৯] শিলং-এব উন্নযনে, আসামে চা-শিল্পেব ও কাষ্ঠ ব্যবসাযের বিবর্ধনে, জমিদাবি বিস্তাবে বাঙালিদের অবদান অনস্বীকার্য।

পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত শিষ্টবর্গের বাংলা ভাযা, পূর্ববঙ্গেব আঞ্চলিক ভাযার দ্বাবা, বা 'অহম'-ভাষার দ্বাবা স্পর্শদুষ্ট হওযাবও সম্ভাবনা ছিল না। বঙ্গভঙ্গে প্রচলিত জমিদাবি-ব্যবস্থায় কোনও বিরাট পবিবর্তন হওয়াবও আশঙ্কা ছিল না। পূর্বেই উল্লিখিত হযেছে, কলকাতাব উচ্চ আদালতেব বিচার ব্যবস্থা বঙ্গে সর্বত্রই প্রচলিত ছিল।

তবুও কেন বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন ক্রমশ সুতীব্র হল, পবিব্যাপ্ত হল? এ প্রশ্ন সাহেব-কর্তাদেব মনেও জেগেছিল। আন্দোলন কবাব কোনও সঙ্গত কাবণ ছিল না,—এই ছিল কর্তাদের ধাবণা :[১০]

> On the side of the Indian opponents of our scheme sentiment alone remains, a sentiment which no argument can eradicate and no assurances appease, but which rest on a mistaken conception of the true foundations of national unity

তিন

বঙ্গভঙ্গই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনেব একমাত্র কারণ ছিল না। বিভিন্ন ঐতিহাসিক (তাঁদের মধ্যে নীবদচন্দ্র চৌধুরীও আছেন) বাঙালি হিন্দু-ভদ্রলোকদেব বহুবকমেব দুর্বলতা, অনুপপত্তি, নেতিবাচক প্রবণতা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কবেছেন। কিন্তু তবুও বলে বাখা ভালো যে, এইরূপ অশেয নেতিবাচক মূল্যাযনেও বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকদেব মূল্যহীনতা কখনও প্রতিষ্ঠিত হযনি। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব প্রেক্ষিত যদিও বা ছিল, কবিব ভাষায়, এত 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ", তবুও , বঙ্গভঙ্গে দুঃখজনক মুহূর্তে, বাঙালি এক হয়েছিল। "হিতকাম-স্বৈবাচারী" (Benvolent Despot) রূপে প্রসিদ্ধ লর্ড কার্জন-

এব দম্ভলাঞ্ছিত সাম্রাজ্যবাদী বিচাবধাবা কেউ পছন্দ কবেননি। লর্ড কার্জন জাতিবৈববিবোধী ছিলেন; ভাবতেব প্রত্নবস্তু সংবক্ষণে উদ্যোগী ছিলেন, বাজকীয় গ্রন্থাগাব (এখনকাব জাতীয গ্রন্থাগাব) প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন, এসিযাটিক সোসাইটিব পৃষ্ঠপোষকতা কবেছিলেন, ভিক্টোবিযা মেমোবিযাল সৌধ নির্মাণ কবিযেছিলেন, ছ'হাজাব মাইল পর্যন্ত বেলপথ সম্প্রসাবিত কবেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালযে স্নাতকোত্তব পর্যাযে অধ্যযনেব ব্যবস্থা কবেছিলেন, নূতন বেলওযে-বোর্ড গঠন কবেছিলেন, এবং সর্বোপবি সবকাবি কর্মপ্রবাহে গতিব সঞ্চাব কবেছিলেন। কার্জন-এব ভালো কাজেব তালিকা ছোটো নয। কিন্তু তিনি ছিলেন মাত্রাতিবিক্ত কেন্দ্রীকবণেব জন্য সর্বদা ব্যস্ত, এবং স্বাযত্তশাসনেব ঘোব বিবোধী। Percival Spear কার্জন সম্বন্ধেই লিখেছেন [১১]

> His faults were superficially those of pride and self confidence, but fundmentally that of lack of imagintion He could not see a new nation arising around him the very product of British rule, yearning for political liberty as an ideal. and demanding autonomy as a right His political obtusity created a breach between government and people which was never wholly closed in the remaining forty-two years of British rule

তাহলে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব প্রথম কাবণ লর্ড কার্জন, তাঁব দম্ভ, তাঁব ঔদ্ধত্য, এবং তাঁব স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব ও আচবণ, তখন খ্যাতনামা বাঙালিদেব সঙ্গে একবাবও কথা না বলে তিনি সঙ্গোপনে বঙ্গভঙ্গ কবলেন। এমন অভাবনীয ঔদ্ধত্য বাঙালিবা মানবেন কেন? একে তো কার্জন বিশ্ববিদ্যালযেব স্বাযত্তশাসনে হস্তক্ষেপ কবলেন, কলকাতা পৌবসভায শ্বেতাঙ্গদেব উপস্থিতি দর্শনীয কবে তুললেন, তাব উপবে বাংলাব পনেবোটি জেলা আসামেব সঙ্গে যুক্ত কবলেন। এসব কুকর্ম এটাই প্রমাণ কবল যে, কার্জন ভযঙ্কবভাবে বাঙালি বিবোধী। তাঁব চালাকিও কম নয, তিনি ঢাকায গিযে বড বড কথা বলে বাঙালি মুসলমানদেব মন ভোলাতে চেষ্টা কবলেন।

হিন্দু-মুসলমানেব, বাঙাল-ঘটিব বিভিন্নতা থাকলেও, ১৯০৫-এ বঙ্গেব ও বাঙালিব মৌল একতাব ধাবণা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। বাঙালিব এই মৌলিক অখণ্ডতাকেই ববীন্দ্রনাথ তাঁব অবিস্মবণীয গানে বলেছিলেন "বিধিব বাঁধন"। কলকাতাব প্রতিস্পর্ধী প্রাচীন ঢাকা শহব, হিন্দুব প্রতিস্পর্ধী মুসলমান, এ ধবনেব চিন্তা বা কথা বাঙালি জাতীযতাবাদী চিন্তায স্থান পাযনি। বাংলাব একতাব মৌল মাত্রা ছিল বাংলা ভাষা, তাই ছিল সমস্ত বাঙালিব গর্ব, সমস্ত বাঙালিব আশা। শুধু তাই নয, বঙ্গ জননীব অসামান্য রূপবাশি, অসাধাবণ শক্তি। অসাধাবণ, অপার্থিব, বঙ্গমাতাব ব্যক্তিত্ব। তাব বর্ণনা কবেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতবম্' গানে। বিশুদ্ধ সহজবোধ্য তৎসম শব্দ ব্যবহাব কবে, বর্ণনা কবেছিলেন ববীন্দ্রনাথ—বঙ্গেব শ্রেষ্ঠ কবি—গানে গানে। এই বাংলা-মাযেব বুকে ছুবি বসালে, হাজাব দুর্বলতা এবং অনুপপত্তি থাকলেও, বাঙালিবা চুপ কবে বসে থাকতে পাবেন? এমন প্রশ্ন কার্জন্-এব মনে জাগেনি, সবটাই তিনি "Sentiment" বলে উড়িযে দিযেছেন।

সমগ্র বিশ্বে তখন ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা যে ভালো ছিল না—তাও জানা ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধে (Boer war, 1899–1902) ইংরেজরা কোনওরকমে রক্ষা পায়। ১৯০৪-১৯০৫-এ জাপান যুদ্ধে রাশিয়াকে পরাজিত করে। রাশিয়ার অভ্যন্তরে বিপ্লবের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। ওদিকে জার্মানির বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স হাত মিলিয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দামতায় অশান্ত। ভারতে সেনাপতি লর্ড কিচেনার্-এর সঙ্গে বড়লাট লর্ড কার্জন্-এর ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছে। এ সব ঘটনা অজানা ছিল না।

প্রবাদ আছে, "ভাত না কাপড় ঠাস করে চাপড়"।[১২] ১৮৯৬-৯৭-তে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। শস্য-উৎপাদনে বিরাট ঘাটতি ছিল। বণ্টনব্যবস্থায় বহু রকমের ত্রুটি ছিল।[১৩] মানুষ দুর্ভিক্ষে, এবং তার পরেই প্লেগ্-এ মরেছে। কার্জন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে হস্তার্পণ করলেন, তাতে জমিদারদেরই সুবিধা হয়, গ্রামে গ্রামে জোতদার মহাজনদের অত্যাচার নিরঙ্কুশ হয়। দেশের মৌল সম্পদ ব্রিটেনে পাচার হয়ে যায়, আর সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস বিদেশ থেকে আসে। কুটীর শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকার 'বাহাদুর'-এর কোনও চেষ্টা নেই। ওদিকে সুশিক্ষিত বাঙালি মুনসেফ্-এর মাসিক বেতন দু'শ টাকা। আর অর্ধশিক্ষিত ব্রিটিশ বিচারকের মাসিক বেতন দু'হাজার টাকা।[১৪] 'ডেপুটি'-আমলাতন্ত্রের সপ্তম স্থান থেকে প্রথম স্থানে উঠে আসতে কবি নবীনচন্দ্র সেনের মতো সুদক্ষ 'ডেপুটি-র ছত্রিশ বৎসর লেগেছিল। আদালতে কর্মহীন উকিলদের ভিড়, স্কুল-কলেজে ছাত্রদের ভিড়, কিন্তু ডিগ্রি পেলেও তাঁরা চাকরি পান না। এমতাবস্থায় "ঠাস করে চাপড়", অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল।

চার

বঙ্গভঙ্গের মতো অপকর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার উপযোগী মতাদর্শ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কাছ থেকে পাবার আশা ছিল না। কংগ্রেস আবেদন নিবেদন করাকেই রাজনীতি মনে করত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তা শুনত, এবং শুনে বলত, "হবে না"। এই অবস্থায়, বঙ্গে "বয়কট" শব্দটি বেশ জোরেই উচ্চারিত হল। "বয়কট", অথবা বিদেশি পণ্যবর্জন, আগেও প্রস্তাবিত হয়েছে, কিন্তু কার্যকর হয়নি। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রে চিনাদের প্রবেশাধিকার খর্বিত হওয়ার পরে চিনে মার্কিন পণ্য 'বয়কট্' করা হয়। বহুল-প্রচলিত এই ঘটনার প্রভাব বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনেও পড়ে।

১৯০৫-এ ১৩ জুলাই কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'বয়কট্'-এর প্রয়োজন ব্যাখ্যাত হল। ১৬ জুলাই বাগেরহাট শহরে এক জনসভায় 'বয়কট্'-এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। ৭ অগস্ট কলকাতার টাউনহল-এ বিশাল জনসমাবেশে 'বয়কট্' সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হল। কিন্তু কেউ কেউ ভাবলেন, এতে ইংরেজ-বন্ধুরা অসন্তুষ্ট হবেন। কলকাতার বহু ইংরেজ বঙ্গভঙ্গের সমালোচনা করেছিলেন। তাঁদের বিরাগভাজন হওয়া হয়তো বাঞ্ছনীয় ছিল না। তাই কলকাতার টাউন্হলে অনুষ্ঠিত সভায় এই সিদ্ধান্ত হল, যথা [১৫]

> That this meeting fully sympathizes with the resolution to abstain from the purchase of British manufactures so long as the Partition Resolution is not withdrawn

'বযকট্' এইৰূপ সিদ্ধান্ত অনুসাবে ছিল একটি অস্থাযী কার্যক্রম। কিন্তু, বঙ্গে সর্বত্র 'বযকট' আন্দোলন ক্রমশ তীব্র হযে ওঠে। ববিশালে কার্জন্-এব মূর্তিতে আগুন দেওযা হয। বিদেশি চিনি ও লবণ কিনে নষ্ট কবে ফেলা হয। কলকাতায ছাত্রবা বহু দোকানেব সামনে দাঁডিযে ক্রেতাদেব বিদেশি জিনিসপত্র কিনতে বাধা দিলেন। কোথাও কোথাও পুলিশ এসে ছাত্রদেব উপবে লাঠি চালায। মৈমনসিংহেব মুচিবা বিদেশি জুতা সেলাই কবতে বাজি হল না। কালীঘাটেব ধোপাবা বিদেশি কাপড ধুতে বাজি হল না। ইংবেজবা খুব অসন্তুষ্ট হযে বাঙালি কেবানিদেব ববখাস্ত কবতে লাগলেন। ঢাকাব নবাব সলিমুল্লা বঙ্গভঙ্গ সমর্থন কবলেও বহু প্রসিদ্ধ মুসলমান বঙ্গভঙ্গেব বিবোধী ছিলেন, ১৯০৫-এব ২৩ সেপ্টেম্বব কলকাতায অনুষ্ঠিত এক জনসমাবেশে মুসমানগণ 'বযকট'-আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। সবচেযে বেশি অসুবিধা হল মাবোযাবি এবং বাঙালি 'সাহা' ব্যবসাযীদেব। তাঁদেব বিদেশি বস্ত্র বিক্রয কবা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। বহু পবিমাণে বিদেশি কাপড় ভস্মীভূত হয।

'বযকট্'-আন্দোলনেব প্রত্যক্ষ ফল এই ছিল যে, বিদেশ থেকে কাপডেব আমদানি ৪৪ শতাংশ, তুলাব কাপড়ের আমদানি ১১ শতাংশ, লবণের আমদানি ১১ শতাংশ, সিগারেটেব আমদানি ৫৫ শতাংশ এবং জুতাব আমদানি ৬৮ শতাংশ কমে গেল।[১৬] এই অবস্থায চাহিদা মেটানোব জন্য মুম্বাই প্রেসিডেন্সিব কাপডেব কলগুলো সক্রিয হযে ওঠে, এবং প্রচুব পবিমাণে লাভ কবে। দেশি কাপডেব কলের মালিকরা দাম বাডাতে দ্বিধাবোধ করেননি।

পাঁচ

বিদেশি জিনিস 'বয়কট্' না কবলে "স্বদেশি" শিল্প ও অর্থনীতি বিকশিত হবে না। এই ছিল সাধাবণ ধাবণা। 'বযকট্'-এ ব্রিটিশদেব ক্ষতি হবে, বঙ্গেব লাভ হবে, এই ছিল বিশ্বাস। 'বযকট্' ও 'স্বদেশি'-ভাবধাবা প্রচাবেব জন্য আন্দোলন প্রযোজনীয ছিল।

আন্দোলন শুরু হযেছিল, ক্রমশ তা ব্যাপক হযে উঠল। এ তথ্য জানা ছিল যে, ১৯০৫-এব ১৬ অক্টোবব বঙ্গভঙ্গ বাস্তবে ৰূপাযিত হবে। ২৭ সেপ্টেম্বব কলকাতাব অক্রূব দত্ত লেন্-এ সাবিত্রি লাইব্রেবির "স্বধর্মসাধন সমিতি"-ব দ্বাবা সংগঠিত এক সভায সভাপতি ববীন্দ্রনাথ 'বাখী বন্ধন্'-এব প্রস্তাব কবেন।[১৭] এই প্রস্তাব অনুসাবে ১৬ অক্টোবর বঙ্গে সর্বত্র 'বাখীবন্ধন' এবং 'অবন্ধন' পালিত হয। এই উপলক্ষ্যে ববীন্দ্রনাথ গান বচনা কবেন "বাংলাব মাটি বাংলাব জল"। মুর্শিদাবাদেব জেমো-কান্দিগ্রামে ১৬ অক্টোবব বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী-বচিত "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা" বিষ্ণুমন্দিরেব উঠানে "অর্ধ সহস্রাধিক পুবনাবী"-ব উপস্থিতিতে পঠিত হয। স্বদেশি আন্দোলনে ধর্ম চলে এল।[১৭ক]

১৬ অক্টোবব পঞ্চাশ হাজাব মানুষেব উপস্থিতিতে অসুস্থ ব্রাহ্মনেতা আনন্দমোহন বসুব সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায 'ফেডাবেশন হল্'-এব ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হযেছিল, এবং স্বদেশি আন্দোলন চালিযে যাওযাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবা হযেছিল। এইবকম ব্যাপক গণ-আন্দোলন পূর্বে কখনও আমাদেব দেশে হযনি। তরুণ ছাত্রবা এই আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নিযেছিলেন।

১৯০৬-তে এপ্রিল মাসে প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায ববিশালে গিযেছিলেন। সেখানে পুলিশ লাঠি চালিযে প্রাদেশিক সম্মেলন বন্ধ কবে দিল, সুবেন্দ্রনাথকে গ্রেফতাব ও জবিমানা কবল। এমনকী অশ্বিনীকুমাব দত্তেব মতো শ্রদ্ধেয জনসেবকও নিগ্রহেব শিকাব হলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন তীব্র হযে উঠল বাখবগঞ্জে, মাদাবিপুবে, বিক্রমপুব পবগনায, মৈমনসিংহেব কিশোবগঞ্জে। এইসব জাযগা ছিল শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক অধ্যুষিত, কিন্তু বেশ কিছুটা অনুন্নত।

'স্বদেশি'র অর্থ ছিল সংবক্ষণাত্মক নীতি অনুসাবে দেশীয উৎপাদন বৃদ্ধি, এবং দেশীয শিল্পেব বিকাশ। ১৯০৬-তে অগস্ট মাসে শ্রীবামপুবে বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিল স্থাপিত হয। এজন্য বিভিন্ন উৎস থেকে আঠাবো লক্ষ টাকা সংগ্রহ কবা হযেছিল। ভাবতীয পবিচালনায স্থাপিত হযেছিল বেঙ্গল নেশনাল ব্যাঙ্ক, নেশনাল ইনসিউবেন্স্ কম্পানি। ১৯০৬-তে প্রতিষ্ঠিত হযেছিল ক্যাল্কাটা পটাবি ওযার্কস, এবং সাবান, দেশলাই ও সিগাবেট তৈবিব কাবখানা। কবি বজনীকান্ত সেন লিখেছিলেন [১৮]

মাযেব দেওযা মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে বে ভাই
দীন দুখিনী মা যে তোদেব তাব বেশি আব সাধ্য নাই॥

স্বদেশি আন্দোলনেব ফলে বাংলাব তাঁত-শিল্পেব, ঠিক পুনরুত্থান না হলেও, কিছুটা উন্নতি হয। কিন্তু, দুঃখেব কথা, স্বদেশি প্রচেষ্টায বঙ্গেব প্রচলিত অর্থনীতিতে ব্রিটিশ মূলধনেব প্রভাব একটুও কমেনি। শিল্পে শ্বেতাঙ্গদেব অধিকাব ছিল প্রশ্নাতীত, আব কৃষিতে জমিদাব-জোতদাবদেব প্রভুত্ব ছিল সার্বভৌম। স্বদেশি আন্দোলনে ভূমি-সংস্কাবের বিষযটিকে অবহেলা কবা হযেছে বোধ হয এই জন্য যে, সেই আন্দোলনে অনেক জমিদাব জোতদাব যোগ দিযেছিলেন। "স্বদেশি"-ব অর্থনীতি খুব একটা স্পষ্ট ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুম্বাই প্রেসিডেন্সিতে স্থানীয বা দেশি শিল্পোদ্যোগীদেব উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয। ১৯১৪-এব আগে পার্শিবা ৩৪-টি, হিন্দুবা ২৭-টি, মুসলমানবা ১০-টি, ইহুদিবা ৫-টি এবং ইওবোপীযান্বা ১৫-টি কাবখানাব মালিক ছিলেন।[১৯] বঙ্গ-প্রেসিডেন্সিতে দেশি শিল্পপতিদেব উপস্থিতি ছিল নগণ্য। স্বদেশি আন্দোলনেব অন্যতম নাযক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায ফ্রেডাবিক্ এঙ্গেলস্-এব কথা উদ্ধৃত কবে লিখেছিলেন যে শিল্প-বিপ্লব কবাব প্রযোজন নেই, কেন না তাতে শ্রমজীবীদেব দুঃখ দুর্দশা বেড়ে যায। ইংল্যান্ডে এই অবস্থাই দেখা গিযেছিল।[২০]

"স্বদেশী শিল্প" সম্বন্ধে শুধু যে সাহেবদেব আপত্তি ছিল, তাই নয, দেশেব মধ্যেই কঠোব সমলোচনা শুরু হযেছিল। ১৯০৯-তে খ্যাতনামা শিল্প-বসিক আনন্দ কুমাবস্বামী মন্তব্য কবেছিলেন [২১]

> Go ınto a Swadeshı shop You wıll not find the evıdence of Indıan ınventıon but will find every kınd of ımıtatıon of the productıons of European commerce, dıfferıng only from theır unlovely prototypes ın theır slıghtly hıgher prıce and slıghtly ınferıor qualıty The loss of beauty ın our lıves ıs a proof that we do not love Indıa, we love suburban England. We love the comfortable bourgeoıs prosperıty It ıs not thus natıons are made

এই ধবনেব সমালোচনা সম্বন্ধে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন[২২]

যে খুসী টিটকাবী দিক
অন্তবে বুঝেছি ঠিক
এ কেবল নহেক হুজুক
সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে
এলো নবযুগ॥

কিন্তু আনন্দ কুমাবস্বামীব সমালোচনা অহেতুক ছিল না। অথচ, এটাও বলতে হয যে, ব্রিটিশ স্যাম্রাজ্যবাদেব দুঃসহ বৈবিতাব জন্যই বঙ্গেব সৌন্দর্যমণ্ডিত কুটীব শিল্প ধ্বংস হযে গিযেছিল। "জাতীয জীবনে সৌন্দর্য" আনাব জন্য বিশেষভাবে প্রযোজনীয ছিল আর্থিক পুঁজি। তা তো ছিল না। তাই, "মাযেব দেওযা মোটা কাপড' তৎকালীন বঙ্গীয জাতীযতাবাদে প্রাধান্য পায।

ছয

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেব বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনেব কোনও সুনির্দিষ্ট সুবিবেচিত বাজনৈতিক মতাদর্শ প্রযোজনীয কি না,—এ প্রশ্ন ছিল। জাতীয কংগ্রেসেব আবেদন-নিবেদন, বা "শাসনতান্ত্রিক আলোডন" (constıtutıonal agıtatıon) সকলেব পছন্দ হযনি। কংগ্রেসেব আবেদন-নিবেদনেব কঠোব সমালোচনা কবে ববীন্দ্রনাথ গান লিখেছিলেন[২৩]

ছি ছি চোখেব জলে ভেজাস নে আব মাটি
দেখলে ও তোব জলেব ধাবা, ঘবে পবে হাসবে যাবা
তাবা চাবিদিকে—
তাদেব দ্বাবেই গিযে কান্না জুডিস, যায না কি বুক ফাটি॥

কংগ্রেসেব এমন অশ্রুসিক্ত বাজনীতি দর্শনে, বঙ্গভঙ্গ কালে ববীন্দ্রনাথ, বাজনৈতিক তত্ত্বকে বর্জন কবে, "বাষ্ট্রবতি'-কে অবহেলা কবে, বলা যায বাষ্ট্রকে দূবে সবিযে বেখে, "স্বদেশি সমাজ' শীর্ষক কবিত্বময প্রবন্ধে প্রচলিত হিন্দু-সমাজকে ইওবোপীয বাষ্ট্রেব ঊর্ধ্বে তুলে আনলেন।[২৪] তিনি ১৯০৫-এ ২২ জুলাই কলকাতায বিখ্যাত (অধুনা অবহেলায মৃতপ্রায) 'চৈতন্য লাইব্রেবি'-তে বিদ্বৎজন সমাবেশে এই প্রবন্ধ পড়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন

বাজায বাজায লড়াইযেব অন্ত নাই, কিন্তু আমাদেব মর্মবাযমান বেণুকুঞ্জে-

আমাদের আম্র কাঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভঙ্করী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণ পাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই, এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভষ্ট হয় নাই।

এখানে কোনও রাজনৈতিক ভাবাদর্শ প্রতিফলিত হয়নি, এখানে অস্পষ্ট, এবং রহস্যজনক "আত্মশক্তি" গুরুত্ব পেয়েছে। ১৯০৪-এ "স্বদেশী সমাজ"-এর আটটি মৌলিক নীতি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা 'বঙ্গদর্শন'-এ (আশ্বিন ১৩১১) প্রকাশিত হয়। "স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ" স্যার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ "সমাজ রাজতন্ত্র"-এর "নিয়ামক" করার প্রস্তাব করেছিলেন।

"স্বদেশী সমাজ" পড়লে ভালো লাগে, কিন্তু এর কঠোর সমালোচনা দেখা যায়। "সঞ্জীবনী" সাপ্তাহিক পত্রিকায় এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল (২৭ শ্রাবণ, ১৩১১)। তাতে এই দেখানো হয় যে, "স্টেট" (State) ও সমাজ সম্বন্ধে "রবীন্দ্রবাবুর" সুস্পষ্ট ধারণা নেই ।[২৬]

> রবীন্দ্রবাবু "সমাজ" শব্দটি তাঁহার প্রবন্ধে কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা ভালরূপে বুঝা গেল না। কখনও "পল্লী সমাজ", কখনও "হিন্দু সমাজ" কখনও জাতিনির্বিশেষে সমগ্র বঙ্গ সমাজকে নির্দেশ করিয়াছেন। শেষোক্তরূপ সমাজ আমাদের দেশে কোন দিন গঠিত হয় নাই। কেবলমাত্র এক পল্লীসমাজ ছিল বটে এবং এখনও কিয়ৎ পরিমাণে আছে। কিন্তু ইহাকে আদর্শ করিয়া একটি বঙ্গীয় "স্বদেশী সমাজ" গঠিত হইতে পারে না। পল্লীর বাহিরের লোককে আত্মীয় বলিয়া আমরা কোনদিন উপলব্ধি করিতে পারি নাই পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা পূর্ববঙ্গের লোকদিগকে "বাঙ্গাল", বঙ্গদেশের লোকেরা বিহারী ও উত্তরপশ্চিমবাসীদিগকে "খোট্টা ও ছাতুখোর", উড়িয়্যাবাসী দিগকে "উড়ে মেড়া", এবং স্বদেশবাসী মুসলমানদিগকে "নেড়ে" সম্বোধন করিয়া আসিতেছে।

'সঞ্জীবনী'-র এইরকম সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি স্বদেশি আন্দোলন থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে আসেন। তিনি গান লিখলেন [২৭]

মরিস মিথ্যে ব'কে ঝ'কে
দেখে কেবল হাসে লোকে
না হয় নিয়ে আপন মনের আগুন মনে মনেই জ্বললি॥
ওরে কে যে তোরে কী বলেছে নেই বা তাতে টললি॥

কোথাও কোথাও স্বদেশি সমাজ সংগঠিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো ছিল অচিরস্থায়ী। কোথাও কোথাও স্থানীয় জমিদার স্বদেশি নেতা সেজে অবাধ্য প্রজার ধোপানাপিত বন্ধ করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন।

সাত

"স্বদেশী" ভাবভাবিত কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় বাঙালির এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে, ব্রিটিশদের দ্বারা উদ্ভাবিত ও প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা কেরানি তৈরি করার ব্যবস্থা মাত্র। ব্রিটিশদের দ্বারা উদ্ভাবিত শিক্ষায় মনুষ্যত্বের এবং দেশাভিমানের বিকাশ হয় না। প্রকৃত "মানুষ" তৈরি করার ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯০৬-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে জাতীয় শিক্ষার নীতি এবং কর্মপন্থা গৃহীত হল। অথচ, তার আগেই কলকাতায় ১৯০৫-এর ১০ নভেম্বর গঠিত হয়েছিল একটি National Council of Education। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য কলকাতার ধনাঢ্য নাগরিক সুবোধচন্দ্র মল্লিক দিলেন এক লক্ষ টাকা, মৈমনসিংহের খ্যাতনামা জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী দিলেন পাঁচ লক্ষ টাকা, অজ্ঞাতনামা দাতা দিলেন দু'লক্ষ টাকা এবং একটি বাড়ি, অন্য এক অজ্ঞাতনামা দাতা দিলেন বাৎসরিক ত্রিশ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন "বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঋণাত্মক উচ্ছ্বাস থেকে রবীন্দ্রনাথ (শান্তিনিকেতনে) ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে সরিয়ে রাখলেও গঠনাত্মক কাজকর্মে সেই আবেগ আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে নিয়েছিল।[২৮]

National Council of Education-এর উদ্যোগে ১৯০৮-এর মধ্যেই স্থাপিত হয়েছিল পঁচিশটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং তিনশ' প্রাথমিক বিদ্যালয়। ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ড রাসবিহারী ঘোষ, জননায়ক বিপিনচন্দ্র পাল, কংগ্রেসের নেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসু, প্রখ্যাত চিকিৎসক নীলরতন সরকার এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৫-এ ১৭ নভেম্বর কলকাতায় "পান্তির মাঠ"-এ [বর্তমানকালে বিদ্যাসাগর কলেজ-এর হোস্টেল] এক সভায় ঘোষিত হয় যে, একটি "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯০৬-এর ১৪ অগস্ট উদ্বোধিত হল বটে, কিন্তু কোনও কলেজ তার অন্তর্ভুক্ত হল না। ব্রিটিশ সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বীকৃতি দিল না। রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখেছিলেন (১৯০৬, ১২ ডিসেম্বর) [২৮-ক]

> ইহা নিশ্চয় জানিবেন উচ্চতর লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে স্পর্ধা প্রকাশ করাকেই আত্মশক্তি-সাধনা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে করেন—যাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনাকে এই স্পর্ধা প্রকাশেরই একটা উপলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহাদের দ্বারা স্থিরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গল সাধন হইতে পারিবে না।

১৯০৪-এ নরেন্দ্রনাথ সেন, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোগেশচন্দ্র ঘোষের চেষ্টায় "শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা সমিতি" গঠিত হয়েছিল। এর "ট্রাষ্টি" হলেন কুচবিহারের ও ময়ূরভঞ্জের মহারাজাদ্বয়। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য মানুষের কাছ থেকে চার আনা চাঁদা আদায়ের কথা বলা হল।

পূর্বোক্ত National Council of Education-এর উদ্যোগে ১৯০৬-এর মার্চ মাসে স্থাপিত হয়েছিল Bengal National College And School অথবা, বঙ্গের জাতীয় বিদ্যালয়। এর অধ্যক্ষ ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, এবং "সুপারিনটেনডেন্ট" ছিলেন মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য বিশিষ্ট জ্ঞানী, "ডন্ সোসাইটি"-এর প্রাণপুরুষ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গে এবং বিহারে বহু জায়গায় জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব দর্শনে ব্রিটিশ সরকার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। জাতীয় বিদ্যালয়ে বহু মুসলমান ও নমশূদ্র পড়াশোনা করত। কিন্তু কলকাতায় স্থিত National Council of Education এই বিষয়টির উপরে গুরুত্ব আরোপ করেনি। কিন্তু সাক্ষরতার প্রসারের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়নি।

আট

স্বদেশি আন্দোলনের কালে অনেকগুলো "সমিতি" সংগঠিত হয়েছিল। ১৯০৮ পর্যন্ত এইসব সমিতি "গুপ্ত সমিতি" ছিল না। অধিকাংশ সমিতিতে ব্যায়ামাদির চর্চা হত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনা হত। সমিতিমাত্রই জনসেবার আদর্শ গ্রহণ করে। সমিতিসমূহের মাধ্যমে 'স্বদেশী' আদর্শ মফস্‌সল শহরে গ্রামে গঞ্জে সম্প্রসারিত হয়, সম্প্রসারিত হয় লোকশিক্ষা। কলকাতায় ছিল ১৯-টি সমিতি, সমিতির সংখ্যা বেশি ছিল পূর্ববঙ্গে। পূর্ববঙ্গের কয়েকটি বিখ্যাত সমিতি ছিল বাখরগঞ্জের স্বদেশবান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, ঢাকার অনুশীলন সমিতি, মৈমনসিংহের সুহৃদ্ সমিতি, সাধনা সমিতি। শ্রীহট্টে, রংপুরে, টিপেরাতে কতগুলো সক্রিয় সমিতি ছিল। কলকাতার "Anti-Circular Society" ("কার্লাইল-ফতোয়া" বিরোধী) ছিল সম্পূর্ণভাবে লোকায়ত (Secular), এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মৌলবী লিয়াকত্ হোসেন, আবুল হোসেন, দেদার বক্স, আবদুল গফুর। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের পরিচালনায় স্বদেশবান্ধব সমিতি বরিশালে একটি ব্যাপক গণসংগঠনে রূপান্তরিত হয়, গ্রামে গ্রামে এই সমিতির ১৭৫-টি শাখা ছিল। বিখ্যাত মুকুন্দ দাস স্বদেশবান্ধব সমিতির হয়ে বহু জায়গায় দেশপ্রেমমূলক যাত্রানুষ্ঠান করেন।

এইসব সমিতির বহুবিধ দুর্বলতার উল্লেখ করেও সুমিত সরকার লিখেছেন :-

> down to the summer of 1908, most *Samitis* were quite open bodies, engaged in a variety of activities Physical and moral training of members, Social work during famines, epidemics or religious festivals, preaching the *swadeshi* message through multifarious forms, organizing crafts, schools, arbitration courts and village societies, and implementing the techniques of passive resistance

এমন মনে হয় যে, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রভাবে উনিশ শতকের বঙ্গীয় "র‍্যানেসাঁস"-এর নিতান্তই নাগরিক, এবং সেই কারণেই সীমাবদ্ধ চরিত্রের নাগরিকতা

এবং সীমাবদ্ধতা চলে গেল। তাব প্রমাণ ববিশালেব স্বদেশবান্ধব সমিতি, মৈমনসিংহেব সুহৃদ্ সমিতি, সাধনা সমিতি, এবং বহু জাযগাব পল্লীমঙ্গল সমিতি। বাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চিন্তায সাধাবণ মানুষ, গ্রামেব মানুষ স্থাযী আসন পেলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব এটাই ছিল সবচেযে গুরুত্বপূর্ণ ফলিতার্থ।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব আবও একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত ছিল ব্যাপক ছাত্র-আন্দোলন, যা পূর্বে কখনও দৃষ্ট হযনি। ১৯০৫-এ ২২ অক্টোবব 'স্টেট্স্ম্যান্'-পত্রিকায প্রকাশিত হযেছিল 'Carlyle Circular । এই সবকাবি নির্দেশনায স্কুল ও কলেজেব ছাত্রদেব বাজনৈতিক আন্দোলন এবং কার্যকলাপ থেকে দূবে বাখার জন্য নানান্ বকমেব শাস্তিব বিধান ঘোষিত হয।-স্বদেশি-আন্দোলন এবং 'বযকট্' প্রধানত ছাত্রদেব তৎপবতায সমগ্র বঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। তাই ছাত্রদেব দমন কবাব জন্যই 'Carlyle Circular ঘোষিত হল। হুমকি দেওয়া হল যে, বাজনৈতিক আন্দোলন থেকে ছাত্রবা দূবে না থাকলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে সামান্য সবকাবি সাহায্যও দেওযা হবে না। এই স্বৈবচাবী বিধানেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলন কবাব জন্যই গঠিত হযেছিল উপব উক্ত Anti-Circular Society, যাব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অনেক দেশপ্রেমিক মুসলমান।

২৭ অক্টোবব (১৯০৫) ববীন্দ্রনাথেব সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায সিটি কলেজেব চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীব ছাত্র শচীন্দ্রনাথ বসু বলেন [৩০]

> আমবা কলিকাতাব ছাত্রবৃন্দ সম্মিলিত হইযা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা কবিতেছি যে, যদি গবর্নমেন্টেব বিশ্ববিদ্যালয আমাদিগকে পবিত্যাগ কবিতে হয তাহাও স্বীকাব , তথাপি স্বদেশ সেবারূপ যে মহাব্রত আমবা গ্রহণ কবিযাছি তাহা কখনও পবিত্যাগ কবিব না।

ছাত্রদেব আন্দোলন সম্বন্ধে সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায লিখেছেন [৩১]

> Their zeal had fired the entire Community Some of these young men threw themselves at the feet of a fashionable Bengalee lady. as she was coming out of Whiteway Laidlaw's shop, and begged of her to promise not to purchase foreign goods when similar home-made articles were available

ওদিকে পূর্ববঙ্গ ও আসামেব অত্যাচাবী প্রশাসক Joseph Bampfylde Fuller "বন্দে মাতবম্"-বলা নিষিদ্ধ কবেন। প্রকাশ্যভাবে 'বন্দে মাতবম্' বলা শাস্তিযোগ্য অপবাধ, তাই 'বন্দে মাতবম্' বলে বহু ছাত্র বিদ্যালয থেকে বহিষ্কৃত হলেন, বেত্রাঘাতেব লাঞ্ছনা সহ্য করলেন। ববিশালে Fuller গুর্খা সৈন্যদেব লেলিযে দিলেন। গুর্খা সৈন্য এক বিশেষ 'পদার্থ বা Category যাব প্রভুভক্তি ছাড়া আবও কোনও মানবিক তাৎপর্য ছিল বলে মনে হয না। গুর্খা সৈন্য ছিল ভাবতীয স্বাধীনতা সংগ্রামীদেব নিপীড়ক। গুর্খা সৈন্যবা ববিশালেব বিভিন্ন গ্রামে গিযে ভীষণ অত্যাচাব কবে। ববিশালে 'বন্দে মাতবম্' বলাব জন্য এক জঘন্য শ্বেতাঙ্গ-ম্যাজিস্ট্রেট বৃদ্ধদেবও সেই উচ্চাবণেব মুহূর্তে "স্পেশাল কন্স্টেবল্" রূপে

নিযুক্ত কবে কুচকাওয়াজ কবতে বাধ্য কবে। পুলিশ সিবাজগঞ্জে 'বন্দেমাতবম্' বলাব জন্য মানুষদের "বেল্ট্" দিযে পেটায। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেই দেখা গেল যে, সাহেবদেব বিবোধী বাঙালি "ভদ্রলোক"দেব মাথায লাঠি মাবতে পুলিশেব হাত কাঁপে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভাবতেব অন্যান্য প্রদেশে জাতীযতাবাদী বুদ্ধিজীবী এবং বাজনীতিবিদ্ ব্যক্তিগণ বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনকে তাঁদেব সমর্থন জানিযেছিলেন। খ্যাতনামা কংগ্রেস-নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে ভেবেছিলেন [৩২]

> The tremendous upheaval of popular feeling which has taken place in Bengal in consequence of the partition will constitute a landmark in the history of our national progress A wave of true national consciousness has swept over the Province

লালা লাজপৎ বাযেব মতে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন ছিল স্বাধীনতা অর্জনেব জন্য আন্দোলন। মানুষ আব পুলিশকে বা সাহেবকে ভয কবেনি। এই অভয মোহনদাস কবমচাঁদ গান্ধির সশ্রদ্ধ প্রশংসা অর্জন কবে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Will Durant লিখেছিলেন · "It was in 1905, then, that the Indian Revolution began"।[৩৩] ১৯০৫-এ বাবাণসীতে অনুষ্ঠিত জাতীয কংগ্রেসেব অবিবেশনে বঙ্গভঙ্গকে "a cruel wrong" বলা হয। ১৯০৭-এ এপ্রিল মাসে বিপিনচন্দ্র পাল আন্ধ্র প্রদেশে গিয়েছিলেন। তাব আগেই, ১৯০৬-তে, সেখানে "বন্দেমাতবম্" আন্দোলন তীব্র হযে উঠেছিল। "স্বদেশী" ভাবাপন্ন তেলেগুদেশে তেলেগু সাহিত্যচর্চা এবং ইতিহাসচর্চা ঘনীভূত হয।[৩৩-ক] আধুনিক তামিলনাড়ুব তিরুনেলভেলি জেলায, তুতিকোবিন বন্দবকে কেন্দ্র কবে স্বদেশি এবং চবমপন্থী আন্দোলনেব সূত্রপাত হয। মুম্বাই নগবে বিদেশি কাপড় পোড়ানো হয়। এবং "স্বদেশী বস্তু প্রচাবিণী সভা" গঠিত হয। ১৯০৭-এ অগস্ট মাসে স্বদেশি মূলধনসহ গঠিত হয টাটা লৌহ এবং স্টিল উৎপাদনেব কাবখানা।

নয

একে তো কংগ্রেসের নবম বাজনীতি অতিশয আভিজাত্যদুষ্ট, তায, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তব সংগ্রামেব কোনও সুনির্দিষ্ট পবিকল্পনা নেই। তার উপবে Bampfylde Fuller-জাতীয কুৎসিত শ্বেতাঙ্গ আমলাদেব দুঃসহ অত্যাচাব। বঙ্গীয 'ব্যনেসাঁস'-এব সমকালীন নাযকগণও বঙ্গভঙ্গ বোধ কবতে পাবলেন না। এই অবস্থায হিন্দুধর্মভাবভাবিত চরমপন্থী বাজনীতির ও বিপ্লববাদেব অভ্যুত্থান, তরুণদেব মধ্যে তাব প্রচাব, এবং জনপ্রিযতা দুষ্প্রতিবোধ্য ছিল। বিপিনচন্দ্র পালেব পত্রিকা *New India*, অরবিন্দ ঘোযেব পত্রিকা 'বন্দে মাতবম্', ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যাযের পত্রিকা 'সন্ধ্যা', বাবীন্দ্রকুমাব ঘোযেব পত্রিকা 'যুগান্তব' "স্ববাজ" লাভেব জন্য নিবন্তব সংগ্রামেব বাণী প্রচাব কবে। অববিন্দ ঘোষ সংগ্রামেব যে তত্ত্ব প্রচাব কবেছিলেন, তা তাঁব *Doctrine of Passive Resistance*-

এ সংকলিত হযেছে। এখানে নির্বিকল্প অসহযোগ পবিকল্পিত হযেছে। কিন্তু ব্যাপক গণ-আন্দোলনেব মূল্য অনুভূত হযনি, বোমা-পিস্তলেব ব্যবহাবমূলক বাজনৈতিক কার্যক্রম ক্রমশ তরুণদেব আলোড়িত কবে। মৃত্যু যেখানে একটি স্বাভাবিক পবিণাম, অথবা অত্যাচাব ও নিগ্রহ সহ্য কবা যেখানে সম্ভাব্য, সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মচিন্তা ও দেবদেবীব আবাধনা এসে পড়ে। হিন্দুধর্মেব জাগৃতিব বা পুনরুভ্যুত্থানেব প্রচলিত তত্ত্ব বিপ্লববাদকে আচ্ছন্ন কবে।

কৃষ্ণকুমাব্ মিত্রেব মতো কট্টব ব্রাহ্মগণ এই ধবনেব বাজনীতিমিশ্রিত ধর্মচিন্তাব বিবোধী ছিলেন, তাঁব Anti-Circular Society "শিবাজী-উৎসব"কে বর্জন কবে। তাঁব এই যুক্তি ছিল যে, বাজনৈতিক আন্দোলনে হিন্দুধর্মকে গুরুত্ব দিলে মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট হতেই পাবেন। ববীন্দ্রনাথও ক্রমশ এই ধর্মীয় বাজনীতিব প্রবাহ থেকে দূবে সবে আসেন। 'গোবা' (১৯০৭-১৯০৯) এবং 'ঘবে বাইবে' (১৯১৪) উপন্যাস দুইটিতে তিনি সমকালীন আততিসমূহেব এবং অস্পষ্টতাব বিশদ বিববণ দিযেছিলেন।

হিন্দুধর্মভাবভাবিত বাজনৈতিক নেতারা এটা যেন দেখেও দেখলেন না যে, বঙ্গভঙ্গেব বিরুদ্ধে ১৯০৫-এ ২৩ সেপ্টেম্বব কলকাতায দশ হাজাব ছাত্র নগব পবিক্রমা কবে সাম্প্রদাযিক একতাব ভিত্তি সুদৃঢ় কবেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ কবেছিলেন বহু স্বদেশপ্রেমিক মুসলমান, তাঁদেব নেতা ছিলেন হালিম গজনভি, আবদুল্লা বসুল, দীন মহম্মদ, দীদাব বক্স, মনিরুজ্জমান, ইসমাইল হোসেন সিবাজী, আবুল হোসেন, আবদুল গফুব, এবং মৌলবী লিযাকত্ হোসেন।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনকালে কংগ্রেসেব মধ্যে নবমপন্থী ও চরমপন্থী বাজনীতিব দুই ধাবা ক্রমশ স্পষ্ট হযে উঠল। বিপিচন্দ্র পালেব মতো অল্পাকাঙ্ক্ষী বাজনীতিবিদ্ বঙ্গভঙ্গেব ফলে সবকাবেব বিরুদ্ধে অত্যন্ত কোপন হযে উঠলেন। তিনি হলেন চবমপন্থাব এক প্রধান প্রচাবক। ১৯০৭-এ বিপিনচন্দ্র পাল মন্তব্য কবেন "It was Curzon and his Partition plan involving as they did total disregard of the propular will. that had destroyed our old illusion about British India" [১৪] ক্রমশ নবম ও চবম নেতাদেব মতবিবোধ এমনই তীব্র হয যে, সুবাটে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসেব অধিবেশনে চবমপন্থী বাজনীতি আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জিত হল। ফলত চবমপন্থা সংগ্রামময জাতীযতাবাদী বাজনীতিতে রূপান্তবিত হয, এবং বঙ্গে বিপ্লবী তরুণগণ বোমা ও পিস্তলেব ব্যবহাব শুরু কবেন, শুরু হয সাহেব ও পুলিশ নিধনের, ও বাজনৈতিক ডাকাতিব বাজনীতি। এ সবই প্রধানত লর্ড কার্জনেব হঠকাবিতাব ফলিতার্থরূপে বিবেচ্য।

১৯০৩ থেকে ১৯০৮-এব মধ্যে শিল্পেব ক্ষেত্রে শ্রমিকদেব অসন্তোষ ঘনীভূত হযেছিল। এ সমযে শ্রমিকদেব চাব নেতা, ব্যারিস্টাব অশ্বিনীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায, ব্যাবিস্টাব প্রভাতকুসুম রাযচৌধুবী, ব্যাবিস্টাব আথানাসিযাস অপূর্বকুমাব ঘোষ এবং উত্তব কলকাতায ছাপাখানাব মালিক প্রেমতোয বসু বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকদেব সংগঠিত কবেছিলে। ১৯০৫-এ (সেপ্টেম্বব মাসে) বার্ন কোম্পানিব কেবানিগণ হবতাল কবেন, অক্টোববে কলকাতাব

ট্রাম্-শ্রমিকগণ কর্মে বিবতি পালন কবেন, সবকাবি মুদ্রণালযেব শ্রমিকগণ, এবং ইস্ট ইন্ডিয়া বেলওযেব শ্রমিক (জুলাই, ১৯০৬) হবতাল কবেন। পাট-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণ বাববাব কর্মবিবতি পালন কবেন। এই বিষযটিব উপবে সুমিত সবকাব যথেষ্ট গুরুত্ব আবোপ কবেছেন।[৩৫]

দশ

বঙ্গভঙ্গেব বিরুদ্ধে সম্ভাব্য প্রতিবাদ "mistaken conception of the truc foundations of national unity" থেকেই উৎসাবিত হবে, এই ছিল লর্ড কার্জন সহ ভাবতেব অন্যান্য প্রশাসকগণেব ধাবণা।[৩৬] জাতীয ঐক্যেব প্রকৃত ধাবণা ১৯০৫-এ যে কেমন ছিল, তা জানাব জন্য তৎকালীন বাংলা গান পড়া উচিত।[৩৭] বঙ্কিমচন্দ্রেব 'বন্দে মাতবম্' তো ছিলই, আবও বহু কবি দেশাত্মবোধক গান এবং কবিতা বচনা কবেছিলেন। অজ্ঞাতনামা কবি 'ভারতী' পত্রিকায লিখেছিলেন [৩৮]

আজ বাঙ্গালাব
সাত কোটি হৃদযেব স্নেহপ্রেম শতাব্দীসঞ্চিত
এক ধ্রুব কেন্দ্রমুখে ছুটিতেছে ক্ষুব্ধ তরঙ্গিত
প্রতি বঙ্গ গৃহে বসি অপ্রমত্ত নরনাবীগণ
হইতেছে আত্মদীপ, আত্মাশ্রযী অনন্যশবণ..

সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায লিখেছিলেন [৩৯]

উঠ্‌বে উঠ্‌বে উঠ্‌বে তোরা
হিন্দু-মুসলমান সকলে ভাই।

বঙ্গ-মাতাব রূপ বর্ণনামূলক ববীন্দ্রনাথেব অবিস্মবণীয গান [৪০]

ডান হাতে তোব খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত কবে শঙ্কাহবণ
দুই নযনে স্নেহেব হাসি, ললাটনেত্র আগুনববণ
তোমাব মুক্তকেশেব পুঞ্জমেঘে লুকায অশনি
তোমাব আঁচল ঝলে আকাশ তলে বৌদ্রবসনী"।

এই মাতৃরূপ শুধু একটা প্রতিমা নয, এতে পবিস্ফুট হযেছে একটা অন্তর্ভব প্রতিরূপ, যা থেকে আসে সাহস, ঔদ্ধত্য, এবং স্বৈবাচাবেব বিরুদ্ধে সংগ্রামেব প্রেবণা। এই অন্তর্ভব, বা অন্তবস্থ প্রতিরূপই হল "বাংলার মাটি বাংলাব জল"।

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী লিখেছিলেন [৪১]

ওবে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস
এই বেলা তুই দিযে নে।

প্রশ্ন, বহু ব্যবহাবে ম্লান Extremism ' শব্দটি কি সেই অসাধাবণ মানুষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, যাঁব ডাক শুনে কেউ না এলেও, যিনি আপন বুকেব পাঁজব জ্বালিযে নিযে একলা চলেন?

স্বদেশি-আন্দোলনেব ফলিতার্থসমূহ খুব সংক্ষেপে উল্লেখ কবে এই প্রবন্ধ শেষ কবব। সুমিত সবকাব বাবোটি পবিণামেব উল্লেখ কবেছেন, যথা [৪২]

১ এই জায়মান বিশ্বাস যে, ব্রিটিশদেব স্বার্থ ও ভাবতীযদেব স্বার্থ বিভিন্ন, এবং এই বিভিন্ন স্বার্থেব মৌলিক বিভিন্নতা ক্রমশ বেড়ে যাবে।

২ সমগ্র বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদবিবোধী সংগ্রাম সম্বন্ধে নবচেতনাব উন্মেষ। সমাজবাদে ও সাম্যবাদী আন্দোলনে ক্রমবর্ধমান রুচি।

৩ ভাবত অশেষ সম্ভাবনাময় বিশাল দেশ। স্ববাজ লাভেব সম্ভাবনাসমূহ বাস্তবরূপ পবিগ্রহ কবতে পাবে, এই দৃঢ় ধাবণাব সঞ্চাব।

৪ স্বদেশি শিল্পের বিকাশেব মধ্য দিযে জাতীয জীবনেব স্বনিযন্ত্রিত বিকাশেব জন্য প্রচেষ্টার শুভারম্ভ।

৫ 'বযকট্'-আন্দোলনে শান্তিপূর্ণ প্রতিবোধ ছিল পববর্তী অসহযোগ আন্দোলনেব দিকে প্রথম পদক্ষেপ।

৬ স্বযংক্রিয দেশসেবক সংগঠনসমূহের উদ্ভব।

৭ শ্রমজীবীদেব আন্দোলনেব বিকাশ।

৮ জনসংযোগেব নূতন উপাযেব ও পদ্ধতিব বিকাশ।

৯ বাংলা কবিতায, গানে, লোকবঞ্জন শিল্পে দেশাভিমানেব প্রকাশ।

১০ অখিল ভাবতীয গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত।

১১ নূতন চারুশিল্প চেতনা।

১২. বিজ্ঞান বিযযক অধ্যযনে নূতন উৎসাহ।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন একটি গভীব অর্থবহ সাংস্কৃতিক আন্দোলনরূপেও বিচার্য। সবচেযে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ কবেছিল। ১৯১১-তে ডিসেম্বব মাসে অনুষ্ঠিত দিল্লি-দববাবে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গ বিভাজন লোপ কবলেন, কিন্তু ভাবতেব বাজধানী কলকাতা থেকে সবিযে এনে দিল্লিতে স্থাপন কবা হল।

তথ্যসূত্র

১ Monmohan Chakrabatti — *A Summary of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal 1757-1916* Revised and updated by Kumud Ranjan Biswas Department of Higher Education Government of West Bengal 1999 [অতঃপব *A Summary*] p 148

২ Joya Chatterji, — *Bengal Divided Hindu Communalism And Partition 1932-1947* Cambridge University Press Reprint 2002 pp 1-18 150-190

৩ *A Summary* পূর্বোক্ত, P 132

৪ Vincent A. Smith — *The Oxford History of India,* Revised Oxford Clarendon Press 1967 Part III P 759

৫ সুশীলকুমাব দে, — 'বাংলা প্রবাদ' কলকাতা, এ, মুখার্জি অ্যান্ড কোং, বঙ্গাব্দ ১৪০১,

পৃ ১৪৭, প্রবাদ সংখ্যা ৫৫৫৭-৫৫৬১

৬ G A. Grierson, *The Modern Vernacular Literature of Hindustan Calcutta, 1889. P' XXII*

দ্রষ্টব্য, বমাকান্ত চক্রবর্তী, 'বাঙালিব বর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি', কলকাতা, সুবর্ণবেখা, ২০০২, পৃ ১৫৯-১৬৯, "উনিশ শতকেব 'কলিকাতা-সভ্যতা' এবং বাঙাল"।

৭ যোগেশচন্দ্র বাগল-সম্পাদিত 'বঙ্কিম গ্রন্থাবলী', কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, বঙ্গাব্দ ১৩৬১, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৪০

৮ দ্রষ্টব্য, বমাকান্ত চক্রবর্তী, "শ্রীযুত' -এব জমিদাবি" বণবীব চক্রবর্তী, কৃণাল চক্রবর্তী, অমিত বন্দ্যোপাধ্যায সম্পাদিত, 'সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস, অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত স্মাবক গ্রন্থ', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ ২৪১-২৫৬

৯ সূর্য্যকুমাব ভূঞা, [আসামেব ভাষায বচিত] 'আনন্দবাম বরুয়া", গুবাহাটী, লযার্চ বুক স্টল, ৩য সং, ১৯৫৫, পৃ ১৭

১০ *A Summary* পূর্বোক্ত, P 138

১১ *The Oxford History of India,* পূর্বোক্ত, P 760-61

১২ 'বাংলা প্রবাদ' পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৩, প্রবাদ সংখ্যা ৬১৯৪

১৩ Malavika Chakravarti, *The Famine of 1896-97 in Bengal Availability or Entitlement Crisis?* New Delhi, Orient Longman, 2005

১৪ Sumit Sarkar, *Modern India 1885-1947,* Delhi, 1983 Macmillan India Ltd P 109

১৫ Sir Surendranath Banerjea, *A Nation In Making,* Calcutta Paschim Banga Bangla Akademi, 1998. PP 185-195

১৬ Sumit Sarkar পূর্বোক্ত, pp 115-116 সুবেন্দ্রনাথ বানার্জি লিখেছেন The Bombay Cotton Mills had a highly prospersous time during the height of the Swadeshi Movement *A Nation in Making* P 205

১৭ প্রশান্তকুমাব পাল, 'ববিজীবনী', পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০, পৃ ২৬১

১৭ ক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, 'বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী' সাহিত্য সাধক চবিতমালা-৭০ কলকাতা, বঙ্গীয সাহিত্য পবিষৎ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪, পৃ, ৭১-৮১

১৮ যোগীন্দ্রনাথ সবকাব সংকলিত, 'বন্দেমাতবম্'। কলকাতা, সিটি বুক সোসাইটি, পঞ্চম সংস্কবণ, ১৯০৬, পৃ ১৩৪-১৩৫

১৯ Dharma Kumar ed *The Cambridge Economic History of India Vol-2 C 1757-c 1970 Orient Longman edition p 580*

২০ Sumit Sarkar পূর্বোক্ত, P 116

২১ *The Statesman* September 22 1909

২২ 'বন্দেমাতবম' প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৫-১৫০

২৩ ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব, 'গীতবিতান', কলিকাতা, বিশ্বভাবতী গ্রন্থালয, বঙ্গাব্দ ১৩৫৭, পৃ. ২৫৯

২৪ দ্রষ্টব্য, সত্যেন্দ্রনাথ বায-সম্পাদিত, 'ববীন্দ্রনাথেব চিন্তাজগৎ সমাজচিন্তা ববীন্দ্র বচনা সংকলন', কলিকাতা, গ্রন্থালয প্রাইভেট লিমিটেড, বঙ্গাব্দ ১৩৯২, পৃ ৯৮-১২৩, প্রশান্তকুমাব পাল,

'রবিজীবনী'-৫, পূর্বোক্ত, পৃ ১৯০

২৫ 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ', উপরে উক্ত, পৃ ১১৯-১২২ "স্বদেশী সমাজ, সংবিধান"।

২৬ কানাইলাল চট্টোপাধ্যায সংকলিত, সম্পাদিত 'সাময়িক পত্রে সমাজচিত্র সঞ্জীবনী'। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং ১৯৮৯, "রবীন্দ্রনাথ ও স্বদেশী সমাজ", পৃ ১৭৭-৮৫

২৭ 'গীতবিতান', পূর্বোক্ত, "স্বদেশ", গীতসংখ্যা-২৭, পৃ ২৫৮, 'রবিজীবনী'-৫, পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৯

২৮ 'রবিজীবনী'-৫, পৃ ৪২১

২৮ক তদেব, পৃ ২৭৯

২৯ Sumit Sarkar পূর্বোক্ত, P 120

৩০ 'রবিজীবনী-৫', পৃ ২৭১-৭২

৩১ *A Nation in Making,* পূর্বোক্ত pp 192, 200-201

৩২ R C Majumdar, A K Majumcar ed *Struggle For Freedom* Bombay Bharatiya Vidya Bhavan 2nd ed 1988 pp 63-64

৩৩ তদেব উদ্‌ধৃতি, p 62

৩৩ক ভারতীয সাহিত্যে ১৮৮৫ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের প্রভাব সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা, দ্রষ্টব্য Sisir Kumar Das, *A History of Indian Literature 1800-1910 Western Impact Indian Response,* New Delhi, Sahitya Akademi, Reprint 2000 Chapter II p 219-254

৩৪ *Struggle For Freedom,* পূর্বোক্ত, উদ্‌ধৃতি, p 67

৩৫ Sumit Sarkar, *Modern India, 1885-1947,* পূর্বোক্ত, p 118

৩৬ *A Summary,* পূর্বোক্ত, P 138

৩৭ দ্রষ্টব্য, যোগীন্দ্রনাথ সরকার-সংকলিত এবং সম্পাদিত, 'বন্দেমাতরম্' (সখারাম গণেশ দেউস্কর-এর ভূমিকা সহ), পূর্বোক্ত।

৩৮ তদেব, পৃ ১৮-২১ "হে মোর স্বদেশ"।

৩৯ তদেব, পৃ ১৬১

৪০ 'গীতবিতান', পৃ ২৫৫

৪১ 'বন্দেমাতরম্', পৃ ১৩৯

৪২ Sumit Sarkar *The Swadeshi Movement in Bengal,* New Delhi People s Publishing House 1973, Chapter Ten

বাঙালির মননচর্চার ধারা

অলোক রায়

বঙ্কিমচন্দ্রেব *কৃষ্ণচবিত্র* (১৮৯২) ববীন্দ্রনাথেব ভালো লাগবাব কথা নয। *কৃষ্ণচবিত্র* পড়বাব সময়ে তাঁব মনে নানাধবনেব আপত্তিবোধ দেখা দিয়েছে। তবে উনিশ শতকেব শেষপাদে সেই 'উল্টাবথেব দিনে' নিশ্চেষ্টতাব পথে প্রত্যাবর্তনেব দিকে সকলেব ঝোঁক, "যখন আমাদেব দেশেব শিক্ষিত লোকেবাও আত্মবিস্মৃত হইযা অন্ধভাবে শাস্ত্রেব জয ঘোষণা কবিতেছিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বীবদর্পসহকাবে কৃষ্ণচবিত্র-গ্রন্থে স্বাধীন মনুয্যবুদ্ধিব জযপতাকা উড্ডীন কবিযাছেন।" শুধু তাই নয, ববীন্দ্রনাথেব মতে "কৃষ্ণচবিত্র গ্রন্থেব নাযক কৃষ্ণ নহেন, তাহাব প্রধান অধিনাযক স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি।"

১৮৯৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *স্বাধীন বুদ্ধি সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি* যখন আজকেব দিনেও সুলভ নয, উনিশ শতকে সেই উজান স্রোতের কালে তাব অসামান্যতা আমবা সহজেই বুঝতে পাবি। *বঙ্গদর্শন* (১৮৭২) পত্রিকাকে আশ্রয কবে বঙ্কিমচন্দ্র যে-মননচর্চাব উন্মেষ ঘটান, তা ববীন্দ্রনাথ সম্পাদিত *বঙ্গদর্শনে* (১৯০১) অব্যাহত ধাবায বক্ষিত হযেছে। অবশ্য ১৮৭২-এব মননচর্চাব সঙ্গে ১৮৮২ বা ১৮৯২-এব মননচর্চাব প্রভেদ অনস্বীকার্য। 'জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত' (ফাল্গুন ১২৮১) প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন "প্রত্যক্ষই জ্ঞানেব একমাত্র মূল—সকল প্রমাণেব মূল।" তখন তিনি জন স্টুযার্ট মিলেব শিয্য, কখনও কোমৎবাদী। পবে *বিবিধ প্রবন্ধ* (১৮৮৭) গ্রন্থে 'জ্ঞান' প্রবন্ধেব পাদটীকায তিনি লেখেন, "এই সকল মত আমি এক্ষণে পবিত্যাগ কবিযাছি।" ১৮৯২ সালে *কৃষ্ণচবিত্র* গ্রন্থেব ভূমিকায বঙ্কিমচন্দ্রেব মন্তব্য মনে পড়বে, "বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্রে লিখিযাছিলাম, আব এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকাবে যতদূব প্রভেদ, এতদুভযে ততদূব প্রভেদ।" এই মত-পবিবর্তনেব কাবণ শুধু 'বযোবৃদ্ধি, অনুসন্ধানেব বিস্তাব এবং ভাবনাব ফল' নয, এব জন্য দাযী অনেক পবিমাণে দেশকালেব পবিবর্তন। বঙ্কিমচন্দ্র *সাম্য* (১৮৭৯) বইযেব পুনর্মুদ্রনে আপত্তিবোধ কবলেও 'বঙ্গদেশেব কৃযক' প্রবন্ধেব প্রচার কাম্য বিবেচনা কবেছেন। *বিবিধ প্রবন্ধ*-এব অধিকাংশ প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন-এর যুগে লেখা হলেও তাব প্রচাবে বঙ্কিমচন্দ্রেব আপত্তি ছিল না। আব *ধর্মতত্ত্ব-কৃষ্ণচবিত্র* ভিন্ন মানসিকতাব নিদর্শন হলেও, সেখানে বঙ্কিম-মনীযাব পবিচয মেলে—সেই ক্ষুবধাব বুদ্ধি, অধ্যযন ও প্রজ্ঞাব সম্মিলন, একান্ত নিজস্ব স্বাধীন ভাব-ভাবনা, বাঙালিব মননচর্চাব ধাবাকে উনিশ শতকেব শেয দশকেও পুষ্ট কবেছে।

তবে উনিশ শতকেব শেযেব দিকে আমাদেব সমাজে যে-পিছুটান দেখা দেয, বঙ্কিমচন্দ্রও যাব হাত থেকে মুক্তি পাননি, তার মধ্যে প্রাপ্তি যেটুকু হযেছে তা একধবনেব নবজাগ্রত স্বাজাত্যবোধ। 'হিন্দু কলেজ' থেকে 'হিন্দু মেলা—হিন্দু প্যাট্রিযট' নামেব মধ্যে

যে হিন্দুয়ানির ঘোষণা, তা থেকে নবপর্যায়-*বঙ্গদর্শনের* হিন্দুয়ানি কিছুটা স্বতন্ত্র। তবে রাজনারায়ণ বসুর *হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা* (১৮৭২) প্রতিপাদনের প্রয়াস আর রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দুত্ব'(*বঙ্গদর্শন*, শ্রাবণ ১৩০৮) ব্যাখ্যার মধ্যে কোথাও যেন একটা যোগ লক্ষ করা যায়। ইংরেজের অনুকরণ নয়, নিজের নিজত্ব উপলব্ধির মধ্যেই জাতির প্রতিষ্ঠা—"পূর্বপুরুষদের সেই চিত্তকে আমাদের জড় সমাজের উপর জাগাইয়া তুলিলে, তবেই আমরা বড় হইব। আমাদের সমস্ত সমাজ যদি প্রাচীন মহৎ-স্মৃতি ও বৃহৎ ভাবের দ্বারা আদ্যোপান্ত সজীব সচেষ্ট হইয়া উঠে—নিজের সমস্ত অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বহুশতাব্দীর জীবনপ্রবাহ অনুভব করিয়া আপনাকে সবল ও সচল করিয়া তোলে, তবে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও অন্য সকল দুর্গতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে।" এইভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শের সঙ্গে বর্তমান ভারতবর্ষের দুর্গতির কারণ অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে বিশ শতকের মননচর্চার ধারা রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে নতুন পথে অগ্রসর হয়েছে। নবপর্যায়-*বঙ্গদর্শন* (বৈশাখ ১৩০৮-বৈশাখ ১৩১৩) পত্রিকা হিন্দুধর্ম-প্রচারে বাহন না হলেও, বিশ শতকের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ ও সমসাময়িক ধর্মান্দোলনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ দেখা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূর্য যখন রক্তমেঘ-মাঝে অস্ত গেল, তখন 'পতিত ভারতে' জাগরণের স্বপ্ন দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীরা। *নৈবেদ্যর* (১৯০১) একাধিক কবিতায় প্রাচীন ভারতবর্ষের উদাত্ত বাণী, ব্রাহ্মণ্য আদর্শ ধ্বনিত হয়েছে—"হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন,/বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,/দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার/তাহার ঐশ্বর্য যত।" এই সময়ে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় কবি 'ব্রাহ্মণ' (আষাঢ় ১৩০৯) প্রবন্ধে লিখছেন "যথার্থ ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, ধর্মনিষ্ঠ হইবেন। সর্বপ্রকার আশ্রমধর্মের আদর্শ ও আশ্রয়স্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন।" মনে পড়বে, এই সময়ে শান্তিনিকেতনে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিকল্পিত ব্রহ্মবিদ্যালয় ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথের তখন মনে হয়েছিল, "শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহ-বাসের মতো সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নামগন্ধ থাকিবে না—ধনী দরিদ্র সকলেই কঠিন ব্রহ্মচর্য না শিখিলে আমরা *প্রকৃত হিন্দু* হইতে পারিব না।" (*চিঠিপত্র* ৬) অন্য একটি চিঠিতে লেখেন, "আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।" (দ্র. *প্রবাসী*, আশ্বিন ১৩৪৮)। রবীন্দ্রজীবনীকার জানিয়েছেন, "নববর্ষের দিনে (১৩০৯) আশ্রমবিদ্যালয়ের প্রথম নববর্ষে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে যে ভাষণ দান করেন তাহা পাঠ করিলে আমরা দেখিব যে, কবির মন কী পরিমাণ প্রাচীনভারতঘেঁষা ও হিন্দুভাবাপন্ন।" (রবীন্দ্রজীবনী ২, পৃ ৪৪)। মাত্র সাড়ে এগারো বছর বয়সে মেজমেয়ে বেণুকার বিবাহ, বারো বছর বয়সে তার ফুলসজ্জার সঙ্গে ধর্মীয় নির্দেশের কোনো যোগ ছিল না, কিন্তু শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট লিখিত নির্দেশ ছিল—"যাহা হিন্দুসমাজবিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না, সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক

প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কাব কবিবে এই নিযম প্রচলিত কবাই বিধেয।'' *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায বর্ণাশ্রমধর্মেব সপক্ষে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যাযেব প্রবন্ধ অকাবণ ছিল না— ব্রহ্মচার্যশ্রমেব ভোজনশালায পঙ্ক্তিবিচাব কবে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদ মেনে সকলে আহাবে বসতেন। আশ্রমবিদ্যালযেব সূচনায ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায ও তাঁব অনুগামী বেবাচাঁদ অল্পদিনেব জন্য হলেও যাবতীয নীতিনিযম বচনাব দাযিত্ব পান। এই পর্যাযে ব্রহ্মবান্ধবেব আদর্শেব সঙ্গে ববীন্দ্রনাথেব আদর্শেব কোনো বিবোধ ছিল বলে মনে হয না। (''উপাধ্যায আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিযেছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদেব কাছে সেই উপাধি বহন কবতে হচ্ছে।''—*আশ্রমেব রূপ ও বিকাশ*)।

নবপর্যায *বঙ্গদর্শন*-এর প্রথম সংখ্যায় প্রথমে *নৈবেদ্য* কাব্যেব বাবোটি কবিতা 'প্রার্থনা' শিবোনামে মুদ্রিত হযেছে (যাব মধ্যে আছে 'পতিত ভাবতে তুমি কোন্ জাগবণে/ জাগাইবে, হে মহেশ, কোন্ মহাক্ষণে/সে মোব কল্পনাতীত।') তাব পব ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যাযেব প্রবন্ধ 'হিন্দুজাতিব একনিষ্ঠতা'। লক্ষণীয, হিন্দুধর্মেব পুনরুত্থানেব কালে 'আমবা আর্য', 'আমবা হিন্দু', 'আমবা শ্রেষ্ঠ'—এই ধবনেব আস্ফালনেব সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবেব 'হিন্দুব হিন্দুত্ব' বক্ষাব উপাযনির্দেশেব মধ্যে পার্থক্য আছে। ব্রহ্মবান্ধবেব প্রতিপাদ্য ''হিন্দুত্বেব ভিত্তি, হিন্দত্বেব সাব, বর্ণাশ্রমধর্ম এবং তৎপ্রণোদিনী একনিষ্ঠতা।''এই সংখ্যাব অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথেব 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধটি আপাতদৃষ্টিতে বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদীব এই নামে লেখা একটি প্রবন্ধেব প্রতিবাদ। বামেন্দ্রসুন্দব দেখিযেছেন, ইংবেজিশিক্ষাকে আমবা প্রকৃতিগত কবতে পাবিনি বলে তাব মূল মহত্ত্বকে আযত্ত কবতে পাবিনি। ববীন্দ্রনাথেব মতে, শুধু ইংবেজি-সভ্যতা নয, আমাদেব দেশীয সভ্যতা সম্বন্ধেও আমবা অস্বাভাবিক—'' 'নিত্যানিত্য কালাকাল বিবেক ইহাই আমাদেব হয নাই।'' প্রাচীন ভাবতবর্ষেব একটা অংশকে তিনি বলেন 'সামযিক', উনিশ শতকেব শেষে, এমনকি বিশ শতকেব সূচনাতেও যা নিযে মাতামাতিব অন্ত ছিল না।— ''কিন্তু ভাবতবর্ষেব চিবন্তন আদর্শটিকে যদি আমবা ববণ কবিযা লই তবে আমবা ভাবতবর্ষীয থাকিযাও নিজেদেব নানা কাল নানা অবস্থাব উপযোগীতা কবিতে পাবিব।'' সম্ভবত এই সিদ্ধান্তবাক্য শুধু ব্রহ্মবান্ধব নয, বামেন্দ্রসুন্দবও মেনে নিতে বাজি ছিলেন।

বোঝা যায এই সমযে বাঙালিব মননচর্চায হিন্দুত্ব অথবা প্রাচীন ভাবতবর্ষেব আদর্শ প্রসঙ্গটি বাববাব ঘুবে ফিবে এসেছে। ব্রহ্মবান্ধবেব 'হিন্দুজাতিব একনিষ্ঠতা' প্রবন্ধেব সূত্র ধবে ববীন্দ্রনাথ *বঙ্গদর্শন*-এব পববর্তী সংখ্যায (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮) 'প্রাচ্য ও পাশ্চ্যাত্য সভ্যতাব আদর্শ' বিশ্লেষণ কবেছেন। ব্রহ্মবান্ধব ইউবোপীয সভ্যতায দেখেছেন 'বহুনিষ্ঠতা', ববীন্দ্রনাথ দেখছেন 'বাষ্ট্রনীতি'। ইউবোপীয ছাঁদে 'নেশন' গডে তোলাব কথা সে সমযে অনেকে বলছেন বটে, কিন্তু ববীন্দ্রনাথ তা কাম্য বিবেচনা কবেননি। তিনি জাতীয আদর্শ বলতে হিন্দুসমাজও হিন্দুধর্ম বোঝেন। ব্রহ্মবান্ধবেব 'তিন শত্রু' (শ্রাবণ ১৩০৮) প্রবন্ধে বৃথাভিমানী হিন্দু-হিন্দু-বব নির্ঘোযকাবী গোঁডাব দল, ইংবেজিনবিশ হিন্দুনামধাবী বামপক্ষিভক্ষীব দল, আব সমন্বযবাদীব দল—সকলকেই তীব্র সমালোচনা কবা হযেছে।

আসলে বর্ণাশ্রমধর্ম নিয়ে সে সময়ে যে-বিতর্ক শুরু হয়েছে, তাতে 'একনিষ্ঠ উদারতা'র সমর্থনে প্রবন্ধকারকে অনেক বাক্যব্যয় করতে হয়েছে। 'ভারতের অধঃপতন' (মাঘ ১৩০৮) এবং 'বর্ণাশ্রমধর্ম' (ফাল্গুন ১৩০৮) প্রবন্ধে পিছুটান বোধহয় আরও প্রবল-''বর্ণধর্ম-ভঙ্গেই জাতীয় হীনতা আসিয়াছে।'' 'একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-প্রধান আশ্রমধর্ম হিন্দুত্বের ভিত্তি। এই আশ্রমধর্ম হিন্দুজাতিকে ঘোর বিপ্লবসমূহ হইতে রক্ষা করিয়াছে, আর্যত্বকে স্থায়ী করিয়াছে।'' এর পরিণাম কয়েক বছর পরে স্বদেশি আন্দোলন, যা অনেক পরিমানে হিন্দু-আন্দোলনও বটে।

'বর্ণাশ্রমধর্ম' (*বঙ্গদর্শন*, চৈত্র ১৩০৮) নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু তিনি ব্রহ্মবান্ধবের বর্ণাশ্রমধর্ম-ভ'বনাকে সমর্থন করতে পারেননি। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রায় সব প্রবন্ধেই নৈয়ায়িক যুক্তিক্রম বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি যুগের হাওয়া অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন তা নয়, তবে রবীন্দ্রনাথ যেমন ক্রমশ হিন্দুধর্ম থেকে হিন্দুসমাজ, হিন্দুসমাজ থেকে মানুষের ধর্মে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দরও তেমনি অনেক পরিমাণে সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তাকে গণ্ডিমুক্ত মানবচিন্তার দিকে অগ্রসর হয়েছেন। তবে বিশ শতকের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধবের মতো তিনি মনুসংহিতার নির্দেশ নিয়ে ততটা চিন্তিত নন, যতটা তাঁর চিন্তার বিষয় মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে। বর্ণাশ্রমধর্ম ভালো কি মন্দ, আমরা প্রব্রজ্যাগ্রহণ করব কি না—এ সব বিতর্ক মনে হয় তাঁর কাছে অপ্রাসঙ্গিক। তিনি জানেন, সমাজ যখন পরিবর্তনশীল তখন সমাজস্থিতির ব্যবস্থাও পরিবর্তনশীল হতে বাধ্য। অদ্ব্যর্থভাষায় রামেন্দ্রসুন্দর বলেন, ''এ কালে যে মনুর সময়ের বর্ণাশ্রমধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা কেহ আশা করেন না। বোধ করি ইচ্ছাও করেন না। সে দিন নাই, হইবেও না।'' পরিবর্তন কাম্য, ''কিন্তু বিপ্লব কোন কালেই বাঞ্ছনীয় নহে। পুরাতন আদর্শ পুরাতন ভিত্তির উপর বজায় থাকুক, ইহাই প্রার্থনীয়, সেই আদর্শ কালানুযায়ী মূর্তি গ্রহণ করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই।''

২

বিশ শতকে বাঙালির মননচর্চার ধারা অনুসরণ করার পক্ষে নবপর্যায়-*বঙ্গদর্শন* পত্রিকাটি আমাদের সহায় হতে পারে। উনিশ শতকের ধারাবাহিকতা একদিকে যেমন রক্ষিত হয়েছে, তেমনি বিশ শতকের নতুন চিন্তাভাবনার উন্মেষ দেখা গেছে সেখানে। বিশেষভাবে হিন্দুয়ানি-প্রসঙ্গ অবতারণার কারণ, অল্প কয়েকবছর পরে স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে, বাঙালির স্বাজাত্যবোধের প্রকাশ যতটা আকস্মিক মনে হয় আসলে তা ছিল না।

অবশ্য *বঙ্গদর্শন* মানেই 'হিন্দুত্ব' ব' 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা' নয়। *বঙ্গদর্শনের* প্রথম দুবছরে প্রবন্ধকারের সংখ্যা অনেক (কবিতা, গল্প, উপন্যাস থাকত বটে, কিন্তু 'চোখের বালি' ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাড়া 'বর্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত' হতে দেখা যায় না। তুলনায় প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই অসামান্য

কিছু প্রবন্ধ মুদ্রিত হযেছে. যাব বচযিতা ববীন্দ্রনাথ নন)। প্রবন্ধেব মান সাধাবণভাবে অত্যন্ত সমুন্নত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক হিসেবে বঙ্কিমযুগেব লেখক, গণিত এবং দর্শন উভয শাস্ত্রে এমন অনাযাস দক্ষতা কদাচিৎ দেখা যায। তিনি একদিকে লিখছেন 'নিউটনেব দুইটি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে একটি নূতন সিদ্ধান্তেব ব্যবকলন' (শ্রাবণ ১৩০৮) অন্যদিকে দীর্ঘ ধাবাবাহিক প্রবন্ধ 'সাব সত্যেব আলোচনা' (ভাদ্র ১৩০৮ থেকে)। নিউটনেব প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত থেকে নতুন সিদ্ধান্ত অবশ্যই বিতর্কমূলক বচনা। অধ্যাপক সাবদাবঞ্জন বায পত্রিকাব পববর্তী সংখ্যায প্রতিবাদ কবেছেন, যদিও 'মূল-প্রবন্ধ-লেখকেব' বক্তব্য তাতে খণ্ডিত হযনি। আমাদেব মনে পডবে দ্বিজেন্দ্রনাথকে তর্কযুদ্ধে হাবানো সে কালে সহজ ছিল না। অবশ্য তাঁব যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, যাব সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেই লেখেন, 'কৃষ্ণকমল is not যে সে লোক—he is a terrible fellow He knows how to write and how to fight and how to slight. all things divine' তবে কষ্ণকমল এই সমযে বঙ্গদর্শনে লেখেননি, লিখলে হযতো সাবসত্যেব আলোচনাব প্রতিবাদী বক্তব্যেব সূচনা হতে পাবত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ গভীব তত্ত্বালোচনায যে সহজ সবল ভাষা ব্যবহাব কবতেন, অভিজ্ঞতা জগৎ থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ কবতেন, তেমনটা খুব কম প্রবন্ধকাবেব পক্ষেই সম্ভব ছিল। দার্শনিক বিষয নিযে লেখা হীবেন্দ্রনাথ দত্তেব 'অমূর্ত ও মূর্ত' (অগ্রহাযণ ১৩০৯) প্রবন্ধে গভীবতা আছে, কিন্তু প্রকাশে স্বচ্ছতা নেই। তুলনায তরুণ লেখক সতীশচন্দ্র বাযেব সাহিত্যালোচনা একই সঙ্গে গভীব ও অন্তবস্পর্শী। সতীশচন্দ্র কবি বলে 'আবো একটি কথা' (বৈশাখ ১৩০৯), 'প্যাবাসেলসাস' (কার্তিক ১৩০৯) বা 'স্বপ্নপ্রযাণ' (পৌষ ১৩০৯) প্রবন্ধগুলি কাব্যোচ্ছ্বাসে পবিপূর্ণ নয, সেখানে যুক্তিক্রম অনুসবণে তাঁব বিশেষ প্রবণতা দেখা গেছে। 'প্যাবাসেলসাস' কাব্যেব পঞ্চম অঙ্ক বিশ্লেষণে সতীশচন্দ্রেব কবিপ্রাণেব ব্যাকুলতা শুধু প্রকাশ পাযনি সেই সঙ্গে কাব্যতত্ত্বে তাঁব অভিনিবেশ ধবা পডেছে—

> সমস্ত খণ্ডেই ব্রাউনিং মানুষটিব গভীব হৃদযগুহায নামিযাছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু চতুর্থ খণ্ড পর্যন্ত প্যাবাসেলসাসেব যে জীবন, তাহা তাঁহাব প্রাপ্ত ইতিহাস হইতে সহজেই নিষ্কাশিত কবিযা লওযা যাইতে পাবে, কিন্তু পঞ্চম খণ্ড অর্থাৎ 'প্যাবাসেলসাসেব অভযলাভ' ইতিহাসে আছে কি? এটুকু ব্রাউনিং জুড়িয়া দিযাছেন। এইখানেই ব্রাউনিং-এব ক্ষমতা।—খণ্ড ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত সম্পূর্ণতায দৃষ্টিপ্রসাবণেই কবিব মাহাত্ম্য। মানবজীবন ক্ষণিক অন্ধকাব সত্ত্বেও যে যুক্তি-শৃঙ্খলা-সৌন্দর্যে পূর্ণ, বিশৃঙ্খল বাহ্যঘটনা বিদীর্ণ কবিযা কবি তাহাই দেখাইযা দিতে পাবেন। প্যাবাসেলসাসেব সেই দুর্লক্ষ্য অথচ নিতান্তই সত্য, জীবনেব শেয অঙ্কখানি, মানবহৃদযেব মর্মচাবী ব্রাউনিং স্বভাবতই জাগাইযা তুলিযাছেন।

বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী ও যোগেশচন্দ্র বাযেব মতো প্রবন্ধকার যে-কোনো যুগেই বিবল। বিশেযত বিজ্ঞানেব জটিল তত্ত্ব এবং আমাদেব অপবিচিত পবিভাযাবহুল তথ্যেব উপস্থাপনায সে সমযে সহজ কাজ ছিল না। যোগেশচন্দ্র যত বডো পণ্ডিত ছিলেন, তাঁব

প্রবন্ধে হযতো তাব পবিচয মেলে না। তবে বোঝা যায, বাজেন্দ্রলাল মিত্র বা হবপ্রসাদ শাস্ত্রীব মতো বহুবিচিত্রবিদ্যায তাঁব অধিকাব ছিল। তিনি লিখেছেন কম, কিন্তু যেটুকু লিখেছেন তা মহামূল্যবান। বাংলাসাহিত্যে একমাত্র যথার্থ প্রবন্ধকাব, সম্ভবত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকাব বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী। বিজ্ঞানেব ছাত্র ও অধ্যাপক, সে বিষযে তাঁব অধিকাব নিযে প্রশ্নই ওঠে না (জীবিতকালে আধুনিকতম গবেষণাব খবব বাখতেন তিনি)। বিস্মযকব মনে হয দর্শনশাস্ত্রে তাঁব অধিকাব দেখে—তাঁব 'জিজ্ঞাসা'ব যেন কোনো শেষ নেই। বিজ্ঞান ও দর্শনকে তিনি মেলাতে পেবেছেন কি না, তা নিযে হযতো তর্ক আছে। কিন্তু বামেন্দ্রসুন্দবের যে-কোনো প্রবন্ধ পডলে তাঁব মননশক্তিব অসামান্যতাব পবিচয মেলে। বিষযেব উপব অধিকাব, সমস্যাব গভীবে প্রবেশ, সমাধানেব ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিব প্রযোগ, সহজ সর্বজনবোধ্য ভাষায বক্তব্যেব উপস্থাপন—বঙ্কিমচন্দ্রেব পবে আব কাবও মধ্যে দেখা যায নি। বিজ্ঞান নিয়ে সহজ ভাষায *বঙ্গদর্শনে* প্রবন্ধ আবও অনেকে লিখেছেন, যেমন জগদানন্দ বায, কিন্তু সেখানে মৌলিক চিন্তাভাবনাব পবিচয মেলে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায ইতিহাস ও পুবাতত্ত্ব নিযে আলোচনাব সূত্রপাত হযেছে, তবে 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকাব'-এব মতো দু-একটি প্রবন্ধ বাদ দিলে অন্যগুলি 'কুলি-মজুবেব কাজ'। নবপর্যায-বঙ্গদর্শন পত্রিকায অক্ষযকুমাব মৈত্র বীতিমতো ঐতিহাসিক গবেষণা-কর্মে নিয়োজিত হযেছেন—'বাঙ্গালাব ইতিহাস' (অগ্রহাযণ ১৩০৮), 'মদন-মহোৎসব' (পৌষ ১৩০৮), গৌড়েব পূর্বকাহিনী (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯)। ১৮৯৯ সালে *ঐতিহাসিক চিত্র*-এব সূচনায় ববীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"*ঐতিহাসিক চিত্র* ভাবতবর্ষেব ইতিহাসের একটি স্বদেশি কাবখানাস্বরূপ খোলা হইল। এখনো ইহাব মূলধন বেশি জোগাড় হয নাই, ইহাব কল-বলও স্বল্প হইতে পাবে, ইহাব উৎপন্ন দ্রব্যও প্রথম প্রথম কিছু মোটা হওযা অসম্ভব নহে, কিন্তু ইহাব দ্বাবা দেশেব যে গভীব দৈন্য—যে মহৎ অভাব-মোচনেব আশা কবা যায় তাহা বিলাতেব বস্তা বস্তা সূক্ষ্ম ও সুনির্মিত পণ্যেব দ্বাবা সম্ভবপব নহে।" বলাবাহুল্য বাঙালিব ইতিহাসচর্চায প্রথমাবধি 'স্বদেশি' ভাব প্রাধান্য পাওযায, অক্ষযকুমাব মৈত্রেব পক্ষেও সর্বদা 'ইতিহাস-নীতি' বক্ষা করা সম্ভব হযনি, শুধু 'সিবাজদ্দৌলা'-প্রসঙ্গ নয, অন্যত্র কখনও দেখা যাবে" শান্তভাবে কেবল ইতিহাসেব সাক্ষ্য-দ্বারা সকল কথা ব্যক্ত না কবিযা সঙ্গে সঙ্গে নিজেব মত কিঞ্চিৎ অধৈর্য ও আবেগেব সহিত প্রকাশ কবিয়াছেন। সুদৃঢ প্রতিকূল সংস্কাবেব সহিত যুদ্ধ কবিতে গিযা এবং প্রচলিত বিশ্বাসেব অন্ধ অন্যাযপবতাব দ্বাবা পদে পদে ক্ষুব্ধ হইযা তিনি স্বভাবতই এইরূপ বিচলিত ভাব প্রকাশ কবিযাছেন।" এব কযেকবছব পবে আমাদেব স্বদেশি আন্দোলনের কালে বাঙালিব মননচর্চায এই অধৈর্য ও আবেগ প্রাযই দেখা যাবে। সখাবাম গণেশ দেউস্কবকে ঠিক ঐতিহাসিক বলা যাবে না, তবে স্বদেশেব ইতিহাস-অন্বেষণে তিনি প্রভূত সময ব্যয কবেছেন, *বঙ্গদর্শনেব* দ্বিতীয বছবে তিনি লিখেছেন 'ভাবতে আব্দালী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯)। কলকাতাব জাতীয বিদ্যালযে তিনি অল্পদিন 'ইতিহাসাধ্যাপক' ছিলেন, এব অনেক আগে থেকে তিনি মহাবাষ্ট্র-ইতিহাসেব চর্চা কবছেন। তবে যথাবাম গণেশ দেউস্কবেব সবচেযে বিখ্যাত বই *দেশেব কথা* (১৯০৪,

১৯০৭) "জাতীয মহাসমিতিব আবব্ধ কার্যে সহাযতা কবিবার উদ্দেশ্যে 'দেশেব কথা' প্রচারিত" হয। সবকাবি অধ্যাদেশেব ফলে বইটি অবশ্য অনতিপবে বাজেযাপ্ত ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায· হিন্দুযুগেব ইতিহাস বচনায নিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসাব পবিচয দিযেছিলেন। বিজযচন্দ্র মজুমদাব মুখ্যত পুবাণ-কাহিনী নিযে গবেষণামূলক কিছু প্রবন্ধ বচনা কবেন। ভাযাতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব-নৃতত্ত্ব-পুবাতত্ত্ব প্রায সর্বক্ষেত্রে তাঁব অধিকাবেব পবিচয মেলে এইসব প্রবন্ধে। *বঙ্গদর্শন*-এব শেষ পর্যাযেব সংযোজন নিখিলনাথ বায।

৩

১৯০৩ সালেব ডিসেম্বর মাসে সবকাবিভাবে বঙ্গবিচ্ছেদেব প্রস্তাব বাঙালি প্রথম জানতে পাবে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায ও জনসভায প্রতিবাদ শুরু হয। ববীন্দ্রনাথ *বঙ্গদর্শন* (জ্যৈষ্ঠ ১৩১১) পত্রিকায 'সাময়িক প্রসঙ্গে' 'বঙ্গবিভাগ' নিযে প্রথম যে-আলোচনা কবেন, তাব মধ্যে আবেগ ও উত্তেজনাব প্রকাশ ঘটেনি—"বাহিবেব কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, এ কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকাব কবিব না। বিচ্ছেদেব চেষ্টাতে আমাদেব ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ কবিযা তুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে আমবা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমবা এক হইব। বাহিবেব শক্তি যদি প্রতিকূল হয, তবেই প্রেমেব শক্তি জাগ্রত হইযা উঠিযা প্রতিকাবচেষ্টায প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টায আমাদেব যথার্থ লাভ।" এর কয়েকমাস পবে তিনি লিখলেন 'স্বদেশী সমাজ' (*বঙ্গদর্শন*, ভাদ্র ১৩১১), প্রবন্ধ যেখানে প্রেমেব শক্তিতে শোনা গেল—"একবাব তোবা মা বলিযা ডাক্।" কিন্তু হিন্দু-মুসলমান-বিবোধেব উল্লেখ সত্ত্বেও 'সমাজপতি' হিসেবে তাঁব নির্বাচন 'তপোনিষ্ঠ ভগবৎপরাযণ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায', যিনি 'আচাব ও নিষ্ঠাদ্বাবা হিন্দুসমাজেব অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবিযাছেন।' ফলে এই বিখ্যাত ভাযণেব শেযে এমন কথাও তাঁব কণ্ঠে শোনা গেল, "হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিষ্টান ভাবতবর্ষেব ক্ষেত্রে পবস্পব লড়াই কবিযা মবিবে না—এইখানে তাহাবা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিযা পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না—তাহা বিশেযভাবে হিন্দু।"একে যদি কেউ স্বদেশি-সমাজেব স্ববিবোধ বলতে চান বলতে পাবেন। তবে এব সূচনা বিশ শতকেব প্রাবম্ভে ববীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায, এমন কথা বললে হযতো একটু অন্যায বলা হবে। দেশকালেব মধ্যেই ছিল তিক্ত দ্বিধা, যা ববীন্দ্রনাথেব পক্ষেও অতিক্রম কবা সম্ভব হযনি।

তবে লক্ষনীয, বঙ্গভঙ্গ তথা স্বদেশি আন্দোলনেব সমযে যাঁবা মননচর্চায নিযোজিত, তাঁবা সকলেই 'ববীন্দ্রানুসারী' ছিলেন না। 'স্বদেশী সমাজ', প্রকাশেব কাল থেকে 'ব্যাধি ও প্রতিকাব', 'যজ্ঞভঙ্গ', 'পথ ও পাথেয', 'সমস্যা', 'সদুপায', 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য', 'দেশহিত'—প্রত্যেকটি প্রবন্ধ বচনাব পব বঙ্গীয সাহিত্যসমাজে তীব্র বাদানুবাদ সৃষ্টি হযেছে। কৃষ্ণকুমাব মিত্র, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায, সুবেশচন্দ্র সমাজপতি, পৃথ্বীশচন্দ্র বাযেব প্রতিবাদেব বিযয সাহিত্য নয। তাঁদেব বক্তব্য ছিল,

"রবীন্দ্রবাবুর ন্যায় একজন শিক্ষিত লোকও রাজশক্তি, সমাজশক্তি ও আমাদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারেন। এবং আকাশকুসুম রচনা করিয়া তাহারই পশ্চাতে ধাবিত হইবার জন্য আহ্বান করিতে পারেন, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়।" (দ্র *রবিজীবনী* ৫, পৃ ১৯৮)। আসলে, রবীন্দ্রনাথ কবি, তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা কম, তাই সমাজ-রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কাল্পনিকতা-দোষে দুষ্ট। স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে যাঁরা এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের পাশে ছিলেন, তাঁরাও পরে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণাও অপরিবর্তিত থাকেনি। তিনি একদা সম্মোহিত অবস্থায় যে-হিন্দু আদর্শের জয়গান করেছেন পরে সেই সম্মোহন কেটে যায়। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে তিনি সমাজপতি হিসেবে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করেন। পরে বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেন, "ভুল করেছিলুম, অন্যায় করেছিলুম, কিন্তু তখন ভেবেছিলুম যে গুরুদাসবাবু হলেও চলে।" (*রবীন্দ্র-সঙ্গ-প্রসঙ্গ*, পৃ. ২৩)। 'দেশনায়ক'প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেশনায়কের মঙ্গল-মহাসনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্থাপন করতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি জানতেন সুরেন্দ্রনাথ এই সময়ের আগে ও পরে বারবার বলেছেন," A section of our people have lost all confidence in the utility of constitutional agitation, they say that they decline to approach the government with memorials and petitions They say, what is the good of them all Here, in the matter of Partition we have begged and prayed and protested, and entreated. the arts of sycophancy have been put into the fullest requisition But all in vain They say. that self respect demands that they should have nothing whatever to do with the goverment I may say. gentlemen, that I am not in sympathy with that view at all I think that the political agitation must be continued and I further think that petitions should be submited You may say 'no' to the end of your life and you will not convince me that in this matter I am in the wrong " (The partition of Bengal' December 1906. *Speaches of Rashtraguru Surendra Nath Banerjee* Vol 1 1970) সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তবে তিনি ছিলেন পেশাদার রাজনীতিক। প্রয়োজনে মত বদল করতে অভ্যস্ত, এবং আবেগে ভেসে যেতে সক্ষম।

মননচর্চার ক্ষেত্রে যুক্তিক্রম ও বাস্তবতাবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ শতকের প্রথম পাদে এদিক থেকে একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী চিন্তার মৌলিকতায়, সংযত সংহত বাক্যনির্মাণে, স্বচ্ছ স্পষ্ট বক্তব্যে, নৈয়ায়িক যুক্তিক্রম অনুসরণে যথার্থ প্রবন্ধকারের গৌরব দাবি করতে পারেন। স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা-মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের তো কথাই নেই, এমনকি রামেন্দ্রসুন্দরও কিছু পরিমাণে ভাবাপ্লুত অবস্থায় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'র (*বঙ্গদর্শন*, পৌষ ১৩১২) মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের রচনাকর্মে অগ্রসর হন। এই সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (*প্রবাসী*, শ্রাবণ ১৩১৪) প্রবন্ধের ঠিক প্রতিবাদ-উদ্দেশ্যে না হলেও স্বতন্ত্র ভাবনার প্রয়োজনে একই নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন (*প্রবাসী*, আশ্বিন

১৩১৪)। রামেন্দ্রসুন্দবের প্রবন্ধেব সূচনা ও সমাপ্তি অংশ স্মরণ করলে মননচর্চার বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে ধবা পড়বে—

"প্রতিবাদ আমাব উদ্দেশ্য নহে। দু-বৎসব ধরিয়া মাতামাতিব পব কতকটা স্নাযবিক অবসাদে, কতকটা ইংবেজেব ভ্রূকুটিদর্শনে আমবা এখন ঠাণ্ডা হইয়া পড়িতেছি। ববিবাবুও সময বুঝিযা আমাদিগকে বলিতেছেন, মাতামাতিতে বিশেয কিছু হইবে না, এখন কাজ কব।

'আজ যিনি আমাদিগকে আস্ফালনে ক্ষান্ত হইবাব জন্য উপদেশ দিতেছেন, বাংলাব ইতিহাসে এই নূতন অধ্যাযেব আবম্ভে আমি তাঁহাবই কৃতিত্ব দেখিতে পাইতেছি। ইংবেজেব নিকট 'আবেদন নিবেদন' কবিযা তাহার প্রসাদ গ্রহণ কবিলে কিছুই স্থাযী লাভ হইবে না, ইংবেজেব মুখাপেক্ষা না কবিযা আপনাব বলে ও আপনাব চেষ্টায যেটুকু পাওযা যায, তাহাই স্থাযী লাভ, বঙ্গবিভাগেব কিছু পূর্ব হইতেই ববিবাবু এই কথাটা ঘোষণা করিতেছিলেন; এবং বঙ্গবিভাগেব বহু পূর্ব হইতে তাঁহাব কণ্ঠস্বব অত্যন্ত উচ্চ ও অত্যন্ত তীব্র হইয়া মুহুর্মুহুঃ ঐ কথা আমাদেব কানে প্রবেশ কবাইতেছিল। অকস্মাৎ বঙ্গবিভাগেব ধাক্কা পাইযা বাংলাব শিক্ষিতসমাজ প্রায একবাক্যে কোলাহল কবিযা বলিযা উঠিল— না, আমবা আর ইংবেজেব কাছে ঘেঁযিব না, উহাদের ছায়া স্পর্শ কবিব না, উহাদের ভিক্ষা গ্রহণ কবিব না.

"স্বদেশীব আগুন যখন জ্বলিযা উঠিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথেব লেখনী তাহাতে বাতাস দিতে ত্রুটি করে নাই। বেশ মনে আছে, ৩০শে আশ্বিনের পূর্ব হইতে হপ্তায হপ্তায তাঁহার এক একটা নূতন গান বা কবিতা বাহিব হইত, আব আমাদের স্নাযুতন্ত্র কাঁপিযা আব নাচিযা উচিত। নিষ্ফল ও অনাবশ্যক আস্ফালনে তিনি কখনই উপদেশ দেন নাই, কিন্তু সে সমযটায যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা ঘটিযাছিল, তাহাব জন্য ববীন্দ্রনাথেব কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না।"

অতঃপব ববীন্দ্রনাথ' কাজ কবা'র আহ্বান জানালেন 'ব্যাধি ও প্রতিকাব' প্রবন্ধে। তবে কাজ সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথেব ধাবণাব সঙ্গে বামেন্দ্রসুন্দরেব ধাবণার পার্থক্য আছে। প্রবন্ধেব শেযে জাতীযজীবনে পক্ষাঘাত দূব করাব জন্য ববীন্দ্রনাথ কীভাবে 'ভাবেব বৈদ্যুতী প্রযোগে' সক্ষম, সে কথা জানিযেছেন। হযতো এখানে একটু শ্লেয লুকিযে থাকতে পাবে, তবে রামেন্দ্রসুন্দর যে স্বতন্ত্র পথে ব্যাধিব প্রতিকাব সন্ধান কবেছেন, তা স্পষ্ট বোঝা যায—

"এই দুই বৎসরেব আন্দোলনকে আমি নিষ্ফল আন্দোলন বলিতে প্রস্তুত নহি। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রবাবুও প্রস্তুত নহেন—কেন না, এই ভাবের তবঙ্গ প্রবাহিত কবিতে যে কয জন লোকে চেষ্টা কবিযাছেন, তিনি তন্মধ্যে অন্যতম অগ্রণী। জনসঙ্ঘমধ্যে ভাবেব প্রবাহ পবিচালনাব প্রধান অধিকার—সাহিত্যিকেব। ববীন্দ্রনাথ স্বদেশী ভাযাব সাহায্যে যে সাহিত্য সৃষ্টি কবিযাছেন ও কবিতেছেন, তাহাতে সেই স্রোতে নতূন নতূন তবঙ্গ উৎপন্ন হইযাছে, সময সময তুফানেব সৃষ্টি হইযাছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তুফানে তবণী ছাড়িযা

দিযা আজ যদি তিনি সামাল সামাল কবিতে থাকেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ দোষ নিবপবাধ আবোহীদিগেব উপব যোল আনা না চাপাইযা স্বযং কতকটা গ্রহণ কবিবেন।"

আমাদেব মনে পডবে অল্পদিন আগে (২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১২) রবীন্দ্রনাথ পত্রে বামেন্দ্রসুন্দবকে লিখছেন, "উন্মাদনায় যোগ দিলে কিযৎপবিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয এবং তাহাব পবিণামে অবসাদ ভোগ কবিতেই হয। আমি তাই ঠিক কবিযাছি যে, অগ্নিকাণ্ডেব আযোজনে উন্মত্ত না হইযা যতদিন আযু আছে, আমাব এই প্রদীপটিকে জ্বালিযা পথেব ধাবে বসিযা থাকিব।" এই প্রসঙ্গে *খেযাব* 'বিদায' (১৪ চৈত্র ১৩১২) কবিতাব কথা সকলে উল্লেখ কবে থাকেন, "বিদায দেহো, ক্ষম আমায ভাই/কাজেব পথে আমি তো আর নাই।" মুশকিল হল. কাকে বলে 'কাজ' তা নিযে সে সমযে যেমন, আজও তেমনি বিতর্কেব অন্ত নেই। ববীন্দ্রনাথ তো 'কাজ' কবাব আমন্ত্রণই জানিযেছিলেন বিভিন্ন প্রবন্ধে।

যাঁবা একসমযে নবপর্যায-*বঙ্গদর্শন* পত্রিকা প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথেব পাশে ছিলেন। তাঁবা কযেক বছবেব মধ্যে দূবে সবে গেছেন। বাঙালিব মননচর্চাব ধাবায যে দ্বিধাব কথা আমবা বলেছি, তাবই মধ্যে এই বিবোধেব বীজ লুকিযে ছিল। ববীন্দ্রনাথ 'শিবাজী-উৎসবে'ব (*ভাবতী*, আশ্বিন ১৩১১) মতো কবিতা কীভাবে-লিখলেন, তা নিযে অনেকে বিস্ময প্রকাশ কবেছেন। ববীন্দ্রনাথ জানিযেছেন, "দেউস্কর মহাশযেব বৈদ্যুত তাড়নায শিবাজি উৎসব সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিযা পাঠাইলাম।" *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা প্রকাশে অনেকদিন পর্যন্ত বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন ববীন্দ্রনাথেব প্রধান সহায়। 'বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা' (কার্তিক, অগ্রহাযণ ১৩১২) কিংবা 'স্বদেশী বা পেট্রিযটিজম্' (চৈত্র ১৩১২, আষাঢ় ১৩১৩) প্রবন্ধেব মধ্যে বিপিনচন্দ্রেব স্বাধীন চিন্তাব পবিচয পাওযা যায। তিনি বিশ্বাস কবতেন 'আমবা যে নেশন হইব, এ বিযযে কোনো সন্দেহ নাই।' ববীন্দ্রনাথেব 'নেশন' সম্বন্ধে ধাবণা ভিন্ন, তাই স্বদেশিব সঙ্গে তিনি নেশনেব ধাবণাকে মেলাতে চাননি। তবে বঙ্গদর্শন পত্রিকাব চবিত্র-বদল স্পষ্ট হযেছে বিপিনচন্দ্র পালেব 'শিবাজী-উৎসব' (ভাদ্র ১৩১৩) এবং 'শিবাজী-উৎসব ও ভবানীমূর্ত্তি' (আশ্বিন ১৩১৩) প্রবন্ধে। ববীন্দ্রনাথ যখন 'শিবাজী-উৎসব' কবিতা লেখেন, তখন নিশ্চয তিনি ভাবতে পাবেননি, ভবানীকে বাদ দিযে শিবাজী-চবিত্রেব নিগূঢ় তত্ত্ব ও জীবনেব লক্ষ্য বোঝা যায না। বিপিনচন্দ্র পাল তথ্য ও যুক্তি দিযে প্রমাণ কবাব চেষ্টা কবেছেন—"প্রাকৃত জনে মূর্তি দেখিযাছে,—দেবতাজ্ঞানে সে মুর্তিকে হযত শ্রদ্ধাবশত অন্তরে প্রণাম কবিযাছে, কিন্তু এই মূর্তিত্রযেব (ভবানী-বামদাম-শিবাজি) মধ্যে শিবাজী চবিত্রেব মূলচিত্র—শিবাজীব জীবনেব নিগূঢ় শক্তি ও শিক্ষাব প্রতিকৃতি দেখিযাছেন কেবল জ্ঞানী ও ভাবুকে। তাঁহাদেব চক্ষে এ কেবল মৃন্ময়ী মূর্তিতে প্রতিভাত হয নাই। তাঁহাবা ভাবতেব চিন্ময়ী জাতীযশক্তি ও ভাবত-ইতিহাসেব নিত্য অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে এই মূর্তিত্রযেব সমাবেশে প্রত্যক্ষ কবিযাছেন। নিম্ন অধিকাবীব জন্য নহে, প্রকৃতপক্ষে উচ্চ অধিকাবীব জন্যই এই সকল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইযা থাকে। বেদান্তেব পবে পুরাণ একথা ভুলিযা গেলে চলিবে না।"

বিপিনচন্দ্র পাল *নাবাযণ* (১৯১৪) পর্বে যে-ভূমিকা গ্রহণ কবেছিলেন তাব জন্য অনেক নিন্দামন্দ লাভ কবেছেন। আসলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীব মননচর্চাব সঙ্কট বিপিনচন্দ্র পাল বা পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যাযেব মধ্যে প্রকটভাবে লক্ষ কবা যায। ললিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যাযও নবপর্যায *বঙ্গদর্শনে* লিখতেন। তাঁব পড়াশোনাব ক্ষেত্র ছিল বিস্তীর্ণ, ববীন্দ্রনাথ তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা কবতেন। পববর্তীকালে অচলাযতন (১৯১১) নাটক নিযে ললিতকুমাবেব আপত্তিব উত্তব দিযেছেন চিঠিতে ববীন্দ্রনাথ। তবে *বঙ্গদর্শন* পর্বেই ললিতকুমাব মতানৈক্যেব কথা জেনেই *সাহিত্য* (কার্তিক ১৩১২) পত্রিকায লিখেছেন 'স্বদেশী আন্দোলন ও পলিটিক্স'।

অবশ্য মননচর্চাব ক্ষেত্রে মতান্তব বড়ো কথা নয। তাছাড়া কালেব ব্যবধানে মতেব পবিবর্তনও ঘটে। সবচেযে দবকাবি কথা হল—স্বাধীনচিন্তা। বিনযেন্দ্রনাথ সেন *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায অল্পই লিখেছেন, সম্ভবত বাংলাতে তিনি খুব বেশি লেখেননি। (তাঁব *Intellectual Ideal* বইটি পড়ে ববীন্দ্রনাথ মুগ্ধবিস্ময প্রকাশ কবেছেন)। বিনযেন্দ্রনাথ *বঙ্গদর্শন* (আষাঢ় ১৩১৩) পত্রিকায' বর্তমানযুগেব স্বাধীনচিন্তা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তাঁব মূল প্রতিপাদ্য বিষয—"এই স্বাধীনচিন্তা কোন দেশ বা ভূভাগ, বা সম্প্রদাযবিশেষেব সম্পত্তি নয।" "এই স্বাধীনতার স্রোত দুইটি বিপবীত গতিতে চলিযা আসিযাছে,—একটি ভাঙিবাব পথ, আব একটি গড়িবাব পথ। অথচ দুইটিকে লইযা একই পথ,—একটিব ভিতব দিযা না আসিলে আব একটি আসিবাব উপায ছিল না।" "আত্মজ্ঞান, আত্মসম্মান, আত্মনির্ভবেব গভীব সুদৃঢ় ভিত্তিব উপর এই স্বাধীনচিন্তা প্রতিষ্ঠিত, জগৎসংসাব কেবল সেই এক, অখণ্ড অচিন্ত্য জ্ঞানেবই বিকাশ, এই সত্যকে অবলম্বন কবিযা ইহাব দিগন্তব্যাপী, অপ্রতিহত প্রসাব। ইহা যথেচ্ছাবী বা অসংযত বুদ্ধি নয, সহজ মানবপ্রকৃতিতে ইহাব মূল থাকিলেও, ইহা কঠোব সাধন, শিক্ষা ও অনুশীলন সাপেক্ষ। নির্ভীকতা ইহাব প্রকৃতি, বিশ্বব্রূপদর্শন ইহাব আকাঙ্খা, বিভূতিযোগ ইহাব সাধনেব সামগ্রী।" এই কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র, ববীন্দ্রনাথ, বামেন্দ্রসুন্দব বলতে পারতেন। পববর্ত্তীকালে বাঙালি মনীষী যাঁবা সত্যসন্ধানী, এগুলি তাঁদেব সকলেবই মর্মকথা। তবে বাঙালিব মননচর্চাব ধাবা অব্যাহতগতিতে অগ্রসব হযনি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব কালে সেই মননচর্চার দৃষ্টান্ত অল্পপবিমাণে এখানে উপস্থিত কবা হল।

'জাতি প্রতিষ্ঠা' এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্

সত্যজিৎ চৌধুবী

'নেশন' ধাবণাটি বিদেশেব আমদানি। ইংবেজি বিদ্যাব কল্যাণে চেতনা এল, এক ভূখণ্ডেব অধিবাসী তাবত মানুষ বিত্তেব এবং মর্যাদাব নানান্ ভাগ-বিভাগ সত্ত্বেও একই জাতিসত্তায বা নেশনে বেঁধে উঠতে পাবে। যেমন ইংবেজ ফবাসি জর্মান। এ চেতনাব সূচনা থেকেই আমাদেব ভাবুক মনস্বীবা বুঝেছিলেন ভাবত একটা নেশন নয, কখনও যুবোপীয অর্থে নেশন ছিল না। বামমোহন তাঁব সমকালীন (হিন্দু) সমাজেব ঐকসূত্রহীন ভাগবিভাগেব বাস্তবকে জাতীয চেতনা বা স্বাদেশিকতাব অন্তবায ভেবে লিখেছিলেন, "The distinction of castes introducing innumerable divisions and subdivisions among them has entirely deprived them from patriotic feeling " (১৮২৮)। নেশন অর্থে 'জাতি' কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র সুস্পষ্টভাবে ব্যবহাব কবে আক্ষেপ কবেন "জাতিপ্রতিষ্ঠা নানা কাবণে ভাবতবর্ষে অনেক দিন হইতে লোপ হইযাছে।" (ভারত কলঙ্ক/ভাবতবর্ষ পরাধীন কেন, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ)। বঙ্কিম ভাবতেন আর্য-প্রসাবে ভাবতবর্ষময এক জাতিসত্তা যেন জমাট বেঁধে এসেছিল যা ভেঙে গেল বৌদ্ধ অভিঘাতে। আর্য ভাবত মানে কী, কতটা তাব প্রসার— বঙ্কিমেব লেখায তা স্পষ্ট হয না। উল্লেখই নেই আর্য প্রভাবের বাইবে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় আদিবাসী বা বাংলাব মানুযের মতো প্রান্তিক অধিবাসীদেব। কল্পিত আর্য-মহিমায় তন্মय বঙ্কিম বৌদ্ধভাবতেব বৈযযিক সাংস্কৃতিক উজ্জ্বল পর্বগুলি সরাসরি উপেক্ষাই কবেন। বেদ-বিরোধী বৌদ্ধধর্মও তো ভাবতেব বিপুল অধিবাসীদেব এক সংস্কৃতিব কোলে টেনে নিযেছিল। তাতেও অবশ্য আধুনিক অর্থে নেশন বাঁধেনি। বৌদ্ধ-সংহতি ভেঙে গেল। হিন্দু জাগবণের পর্ব এল। বর্ণব্যবস্থাব থাকবন্দি সে হিন্দু-সমাজে স্থিতিস্থাপকতা ছিল—যাব ফলে হাজাব-রকম "বফানিষ্পত্তি" কবেও পবস্পব-বিবোধী জনগোষ্ঠীকে একই বিধিব্যবস্থায দীর্ঘদিন একত্রিত ধবে বেখেছিল। হিন্দুসমাজেব গড়নে বর্ণব্যবস্থাটাই শক্ত ভিত। যেভাবেই হোক, সমাজেব কোনো-না-কোনো থাকে নির্দিষ্ট আশ্রয় চাই, সমাজ ছাড়া মানুয বাঁচে না। বৌদ্ধ-উত্তব হিন্দু-সমাজ যেভাবে বাঁধা হল তাব মধ্যে ছত্রভঙ্গ হযে যাওযা বৌদ্ধবাও জাযগা পেযেছে। একই বৃত্তিগত জাতিব মধ্যে প্রাযই দুটি উপ-থাক, জল-চল জল-অচল। জল-চল তাঁতি জল-অচল তাঁতি। জল-চল তেলি জল-অচল তেলি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখিযেছিলেন ভেঙে যাওযা বৌদ্ধ-সমাজেব মানুষবাই হীনতা স্বীকাব কবে জল-অচল উপ-থাকে জাযগা পেয়েছিল। এই হিন্দু-সমাজেব বাইবেও তো পডেছিল আদিবাসী জনজাতিব বিপুল সংখ্যা। নির্মলকুমাব বসুব হিন্দু অ্যাবজর্পসন অফ ট্রাইবালস তত্ত্বেব সাববত্তা সত্ত্বেও আজও তাবত জনজাতি হিন্দু-সমাজে সামিল হযনি। তাব মধ্যে ধাকা দিল ইসলাম। ৮০০ বছব পাশাপাশি বাস কবেও মুসলমান সমাজ হিন্দুসমাজে মেশেনি কোনো অর্থেই। আঙিনা ভাগ বযেই গেছে—যে বিচ্ছেদ মর্মান্তিক

হয়ে ওঠে মাঝেমাঝে রক্তাক্ত হানাহানিতে। স্বাধীন ভারতের বড়ো রাজনীতিতে আজও হিন্দুত্বের প্রতিপত্তি আক্রোশে অন্ধ হয়ে আঘাত করে বিরাট মুসলমান সমাজকে।

উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীরা অনেকেই ভারত বলতে বুঝতেন হিন্দু ভারত। সে এক-দেশ-দর্শিতা এই একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সত্যিই বিমূঢ় করে। ধর্মের ভাগাভাগি বাদ দিলেও ভারতের অঞ্চলে অঞ্চলে সাংস্কৃতিক একতাও দৃশ্যত বহুধাবিভক্ত। ভাষা-বিভেদ অনেকান্ত। এমন একটি দেশে আদিকাল থেকে নেশন বেঁধে ওঠার কোনো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সূত্রপাতই হয়নি। কাজেই নেশন-এর তত্ত্ব আমাদের মাটিতে গজায়নি। ইংরেজের সংস্রবেই আমাদের চৈতন্যে 'এক জাতি এক প্রাণ একতা'-র বীজ উড়ে এসে মাটি খুঁজতে শুরু করে। মাটি পাওয়া সহজ ছিল না, কারণ, শত ভিন্নতা সত্ত্বেও নেশন বাঁধার একটি অমোঘ গ্রন্থিসূত্র 'রাষ্ট্র' বস্তুটি আমাদের দখলে ছিল না। প্রভু ইংরেজ রাষ্ট্র চালায়। ইংরেজ এক নেশন। ইংরেজ নেশন প্রভুত্ব করে নেশন-এ গ্রন্থিত হবার সম্ভাবনাহীন ভারতীয় জনসমষ্টির উপরে। ইংরেজ নেশনের স্বার্থে ভারতীয় জনসমষ্টির ভাগবিভাগ বজায় থাকা জরুরি। আবার ইংরেজ শাসিত ভারতের সচেতন মানুষ—সংখ্যা তার অবশ্যই নগণ্য—জ্ঞানে বোঝে নেশন-বাঁধা ভিন্ন বিদেশির মুঠি-গত রাষ্ট্র বস্তুটির উপরে অধিকার প্রতিষ্ঠার ভিন্ন কোনো উপায় নেই। পরিস্থিতির জটিলতা বোঝার জন্য ইতিহাসের বাস্তবে নামতে হয়—যা আমাদের পক্ষে এখানে জরুরি নয়। তথ্যস্তূপ এড়িয়েও বোধের সত্যাসত্য সরলভাবে বুঝতে পারা যায়। আধুনিক বুদ্ধিমার্গে বর্ণহিন্দুরাই এগিয়ে থেকেছে। তাদের বোধে হিন্দুত্বকে নেশন-এর ঐক্যসূত্র ভাবার ভ্রান্তি অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এইখানেই সমূহ বিপদের ফাটল তৈরি হল। যত হিন্দু-নেশন বাঁধার চেষ্টা হবে, বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান ও জনজাতি সমাজ সমান মাপে দূরে সরে যাবে। এই ঘটনাটা আমরা ঘটিয়ে এসেছি সজ্ঞানে, একরোখা ভাবে। বোধোদয়ের প্রক্রিয়া কত দ্বন্দ্বময়, কত দুর্গম—সে গোরা বুঝেছিল—দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে। গোড়ায় অনেকটা রবীন্দ্রনাথ নিজে আছেন, কারণ, হিঁদুয়ানির ঘোরের মধ্যে দিয়ে তাঁকেও একসময় আসতে হয়েছে। স্বদেশ জিজ্ঞাসার সৎ উদ্যমে দেশের কাজে নেমে তাঁকেও পদে পদে ঠেকতে হয়েছে, গোরার মতোই। বুঝতে হয়েছে হিন্দুত্বের ছকের মধ্যে গোটা ভারতবর্ষকে কিছুতেই ধরানো যায় না। হিন্দু জাতীয়তা এক ভ্রান্ত রাষ্ট্রতত্ত্ব।

ইংরেজ রাজত্বের প্রশাসনিক বাঁধনে ভৌগোলিক সত্তায় এক অখণ্ড ভারতবর্ষ দাঁড়ালো যা মহামতি আকবরও দাঁড় করাতে পারেননি। অশোকও কি পেরেছিলেন? কিন্তু ভৌগোলিক অখণ্ড সত্তার আধারের অধিবাসী বিপুল এক জনসমাজ সম্পূর্ণই খণ্ড-বিখণ্ড। উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় যেটুকু আধুনিক চিন্তাচেতনা দানা বেঁধেছিল সেই সীমিত জ্ঞানে স্পষ্ট ধরা যাচ্ছিল সমকালীন ভারতীয় বাস্তবে য়ুরোপের ধাঁচে জাতিপ্রতিষ্ঠা বা 'নেশন বাঁধা' সম্ভব নয়। য়ুরোপে আধুনিক নেশন বেঁধে উঠেছে রাষ্ট্রের প্রবল চাপে। নেশন মানে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্রীয়-নেশন। ভারতে রাষ্ট্রের 'ক্ষমতা' বিদেশি শাসকের কব্জায়। ভারতীয়ের ন্যাশনাল-ইজম শাসকের স্বার্থ-বিরোধী। সংঘর্ষের পথে নেশন পত্তনের ভাবনা চাকরিজীবী ভদ্র শিক্ষিত সমাজের চৈতন্যে ঠাঁই পায় না। 'আনন্দমঠে'ও (১৮৮২) অনেক 'রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের' পরে

এই বাণীটি দেগে দেওয়া হয, "ইংবেজ মিত্র বাজা। আব ইংবেজেব সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জযী হয, এমন শক্তিও কাহাবও নাই।" প্রথম সংস্কবণেব ভূমিকায় লেখা হয, "সমাজ-বিপ্লব অনেক সমযেই আত্মপীডন মাত্র। বিদ্রোহীবা আত্মঘাতী। ইংবেজবা বাঙ্গলা দেশ অবাজকতা হইতে উদ্ধাব কবিযাছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।" দ্বিতীয় সংস্কবণেব বিজ্ঞাপনে উদ্ধৃত হয 'দি লিবাবল' পত্রিকায ৮ এপ্রিল ১৮৮২ তাবিখে প্রকাশিত মন্তব্য, যাব শেষ অংশে ছিল The British Government shall remain indestructible so long as the Hindus do not once more become great in knowledge, virtue and power This passage embodied the most enlightened views of the educated Hindus, and happening at it does in a novel powerfully conceived and wisely executed, it will influence the whole race for good" 'দি লিবাবল' কেশবচন্দ্র সেনেব ভাই কৃষ্ণবিহারী সেনের পত্রিকা, আনন্দমঠ সম্পর্কে প্রকাশিত টিপ্পনীটি কেশবচন্দ্র ডিকটেশন দিযেছিলেন বঙ্কিমেব অনুবোধে। সমকালীন বাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে ভদ্রজনেব উপলব্ধি মন্তব্যটিতে চমৎকাব ফুটেছে বলতেই হবে। ইংবেজ দুর্ধর্ষ শক্তি, সিপাহি বিদ্রোহ আব ধাবাবাহিক কৃষকবিদ্রোহ দমনে এই ঔপনিবেশিক বাষ্ট্রের ভযাবহ, নৃশংস শক্তি চোখেব সামনে থাকায এ বাস্তবকে মানাই তখন 'কাণ্ডজ্ঞান'। ইংবেজকে মিত্র বললে জাতিসত্তাব প্রতিষ্ঠা খারিজ কবে দিতে হয—এই চেতনা উপস্থিত দাযে-পড়া 'কাণ্ডজ্ঞানে' চাপা পডে যায।

উপবে তোলা বাক্যগুলি এভাবে পড়ায তো আজ কোনো দ্বিধা বা কুণ্ঠাব কাবণ নেই। তাহলে ভাবতে হয সমকালীন মনস্বীদেব সামনে নেশন বাঁধাব আব কী উপায ছিল।

ববীন্দ্রনাথ ফবাসি ঐতিহাসিক Ernest Josef Renan (১৮২৩-৯২) বেঁনাব তত্ত্ব ধবে একটি ভাবাশ্রয দাঁড় করালেন। বেঁনা দেখিযেছিলেন "জাতি, ভাষা, বৈষযিক স্বার্থ, ধর্মেব ঐক্য ও ভৌগোলিক সংস্থান, নেশন-নামক মানস পদার্থ সৃজনেব মূল উপাদান নহে।" ("নেশন কী")। নেশনের মূল উপাদান খুব স্পষ্ট কবে নির্দেশ কবা হল, "নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থেব অন্তঃপ্রকৃতি গঠন কবিযাছে। একটি হইতেছে সর্বসাধাবণেব প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ, আব একটি পবস্পব সম্মতি।" "নেশন কী"। বেঁনাকে অনুসবণ কবে ভাবনাব সূত্রপাত হলেও ববীন্দ্রনাথ বেনাঁব তত্ত্ব থেকে বেশ সবে আসেন এবং ক্রমেই তাঁব স্থিব সিদ্ধান্ত দাঁডায আমাদেব বাস্তবে 'নেশন' হযে ওঠা-না-ওঠা বডো কথা নয। যুবোপীয 'নেশনেব' জাযগায আমাদেব ছিল 'সমাজ'—যাব স্থিতিস্থাপকতাব শক্তি অপবিসীম, যা বহু বিচিত্র 'সংস্কৃতি'কে কোনোভাবে ক্ষুণ্ণ, আহত বা ধ্বংস না কবে সহাবস্থানেব পবিসব তৈবি কবে দিযেছে।

এই তত্ত্ব আমাদেব আধুনিক ইতিহাসেব অভিজ্ঞতায টেকে-কি-টেকেনা সে বিচাব এখানে না তুলে মেনে নেওযা যায, ববীন্দ্রনাথ-বামেন্দ্রসুন্দব-হবপ্রসাদ শাস্ত্রীবা যখন দেশেব কাজেব জাযগা হিসেবে বঙ্গীয-সাহিত্য-পবিষদেব মতো সংগঠন গডায তন্ময তখন এই ভাবাদর্শ আশ্রয-তত্ত্বেব ভিতেব কাজ কবেছে। নেশনালিজম, জাতীযতা, স্বাদেশিকতা যে নামই দেওযা হোক, উপস্থিত সমযেব দাবি, আত্মপবিচযেব জমি শক্ত কবে তোলা। তাব জন্য 'সর্বসাধাবণেব

স্মৃতিসম্পদ' উদ্ধাব করা দবকাব। কোন্ ঐক্যসূত্র বিভিন্ন উপাদানে গঠিত আমাদের সাংস্কৃতিক প্রবাহকে একমুখি বেখেছে বোঝা চাই। শাসকেব সংস্কৃতিব প্রবল অভিঘাতে সেই দেশীয় সাংস্কৃতিক ভিত সম্পূর্ণ ধ্বস্ত হযে যে যাযনি—তা প্রতিপন্ন কবা ভিন্ন আত্মবক্ষা সম্ভব নয। ঔপনিবেশিক ভাবতেব বাস্তবতায আধুনিক সচেতন মন সন্নিহিত বাস্তবেব ছিন্নভিন্ন পবিস্থিতিতে ঐতিহ্যস্মৃতিব জমি খুঁজতে একক উদ্যমে ভবসা বাখতে পাবেনি। "পবস্পব সম্মতি"-ব তত্ত্ব আশ্রয কবতে চেযেছে। "পরস্পব সম্মতি"-ব তত্ত্ব প্রযোগে আনলে সংগঠনেব প্রযোজন অনিবার্য। 'দশে মিলি কবি কাজ'। ঊনবিংশ শতাব্দীব উপান্তে শুধু বাংলায নয, সাবা ভাবতেই এই গবজ দেখা দিল। এই গবজেই ভাবতীয জাতীয কংগ্রেসেব (১৮৮৫) পত্তন হয। এই গবজেই বঙ্গীয-সাহিত্য-পবিষদেবও পত্তন।

একটি আযবনি উল্লেখ না কবে পাবা যায না। কংগ্রেস আব পবিষৎ দুযেবই পত্তন সাহেবেব হাতে। কংগ্রেস-এব আধাবশিলা পোতেন বিটাযার্ড সিভিলিযান অ্যালান অক্‌টেভিযান হিউম Allan Octavian Hume, গোখলে তাঁকেই কংগ্রেস-এব "পিতা ও প্রতিষ্ঠাতা" বলেছিলেন। পরিষৎ-এব আধাবশিলা পোতেন ইংবেজ বাজকর্মচাবী এল লিওটার্ড L Liotard

বিজিতেব অভিজ্ঞতায এমন-সব অনুকম্পাব তাপউত্তাপ জোটে অনেক সময়ে, কাজেও লাগে। কিন্তু কাবও অনুকম্পায ভব কবে বেশি দূব এগোনো যায না। নিজেদেব দায বহনেব উপযুক্ত হয়ে উঠতে হয। এই দায-চেতনা বিবর্তনের নজিব কংগ্রেসেও আছে, পরিষদেও আছে।

দুই

সাহিত্য পবিষদেব আদি ৰূপ দি বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটাবেচাব-এব সূচনা ইংবেজি কেতায, এল লিওটার্ড-এর উদ্যোগে। তাঁব এবং তাঁব সহযোগীবা মডেল হিসেবে মাথায বেখেছিলেন বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমি অফ লিটাবেচাব। সেই মডেলেই নতুন প্রতিষ্ঠানেব নাম দিলেন দি বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটাবেচাব। প্রতিষ্ঠা ২৩ জুলাই ১৮৯৩, ৮ শ্রাবণ ১৩০০। দপ্তব ২/২, নবকৃষ্ণ স্ট্রিট, শোভাবাজাব বাজবাড়ি।

লিওটার্ড নিশ্চয মানতেন তাঁব এই উদ্যোগেব অনেক আগে জন বীমস John Beams (১৮৩৭-১৯০২), যাঁকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায বলেছেন 'দি ফাউন্ডাব অফ মডার্ন ইন্ডো-এবিয্যান লিঙ্গুইস্টিক্‌স", তিনি বাংলা ভাষা চর্চায সংহতি আনাব জন্য এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়াব প্রস্তাব প্রচাব কবেছিলেন। বীমস্-এব মূল ইংবেজি পুস্তিকা (১৮৭২) হাবিযে গেলেও এব বাংলা বযান পাওযা যায 'বঙ্গীয সাহিত্য সমাজ' নামে ছাপা বঙ্গদর্শন পত্রিকাব প্রথম বর্ষ তৃতীয সংখ্যায, (আযাঢ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ)। সম্পাদকেব পাদটীকায বঙ্কিমচন্দ্রেব মন্তব্য, "যে অনুষ্ঠানপত্র উপবে প্রকটিত হইল, তাহা পণ্ডিতপ্রবব শ্রীযুক্ত জে বীমস্ সাহেব কর্তৃক বঙ্গসমাজ মধ্যে প্রচাবিত হইবে। ইহা প্রচাবিত হইবাব পূর্ব্বেই আমবা তাঁহাব অনুগ্রহে বাঙ্গালায প্রাপ্ত হইযা সাদবে প্রকাশ কবিলাম। বীম সাহেব দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত, এবং

বঙ্গদেশেব বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁহাব কৃত এই প্রস্তাবের উপব অনুমোদন বাক্য আবশ্যক নাই, এবং বলিবার কথাও তিনি কিছু বাকি রাখেন নাই। আমবা ভবসা কবি যে সকল বঙ্গপণ্ডিতেবা দেশেব চূড়া, তাঁহাবা ইহাব প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। তাঁহাদিগেব অভিপ্রায় বুঝিতে পাবিলে, আমবা এই প্রস্তাবেব পুনরুত্থাপন কবিব। ইতি।—বঙ্গদর্শন সম্পাদক।"

যে কাবণেই হোক বীমসেব প্রস্তাবে তখন কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে আর প্রসঙ্গটি তোলেননি। 'বঙ্গপণ্ডিত'দের অনাগ্রহই তাব কাবণ। বীমস যুবোপেব প্রধান ভাষাগুলিব বিকাশ ও আধুনিকতায় উত্তবণে বড়ো মাপেব সাহিত্যিকদেব প্রভাব ও একাডেমি-প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকার বিববণ দিযে প্রস্তাব কবেছিলেন, "অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যেব ভাষাব স্থিবতা বিধান জন্য সকল বাঙ্গালী মিলিত হইয়া সভা স্থাপন কবত তদ্দাবা ভাষার উন্নতিসাধন কবা আবশ্যক।" সভাব মূল কাজ হবে শুদ্ধ বাংলাব পূর্ণাঙ্গ অভিধান প্রণয়ন, যেমন করেছিল ফরাসি একাডেমি। এ ছাড়া লেখকবা প্রকাশেব আগে এখানে নিজেদের লেখা বই পড়বেন। তাব সমালোচনা শুনে "সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি করিবেন।" "এ মতে সাহিত্যেব ক্রমে নির্ম্মলতা এবং প্রতিভা বৃদ্ধি হইবেক।"

দুই দশক পেরিয়ে বীমসেব প্রস্তাবেব ইঙ্গিত ধবে কাজে নামলেন লিওটার্ড। দি বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটাবেচাবের কর্মকাণ্ড ভিন্ন এল. লিওটার্ড মানুষটিব ব্যক্তি পবিচয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। মদনমোহন কুমাব 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেব ইতিহাস/প্রথম পর্ব' (১৩৮১ বঙ্গাব্দ) বইয়ে একাডেমির কাগজপত্র থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়েছেন—যা খুব মূল্যবান নথি। কিন্তু মূল খাতাগুলি তাঁব কাছ থেকে আব সাহিত্য পবিষৎ দপ্তরে ফেবত আসেনি। ফলে অধ্যাপক কুমাবের দেওয়া তথ্যেই ভরসা, মূল বস্তু সব অবলুপ্ত। সাহিত্য পবিষদেব এই কাণ্ড তো ধাবাবাহিক। পত্রিকার পাতা কাটা, খাতাপত্র লোপ—এসব কীর্তিব জন্য কোনো কথা দাঁড় কবাতে গেলে অন্যেব ছেপে দেওয়া তথ্যেব উপবে নির্ভব কবা ছাড়া উপায় নেই।

জানা যাচ্ছে লিওটার্ড ইংবেজ বাজকর্মচাবী ছিলেন। তাঁকে কেউ কেউ চন্দননগরবাসী এক মঁসিযে লিওতাব বলে উল্লেখ কবেছেন—যা, অধ্যাপক কুমাবেব মতে, সম্পূর্ণ ভুল। বাংলা ভাষা-সাহিত্যে অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁব কাজেই প্রমাণিত হয়ে আছে। একাডেমি প্রতিষ্ঠায় সেকালেব নামী মানুষদেব মধ্যে লিওটার্ড সঙ্গে পেয়েছিলেন হীবেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, কালীপ্রসন্ন সেন, নীলবতন মুখোপাধ্যায়—এরকম মাত্র ১৭ জনকে। হীবেন্দ্রনাথ ভিন্ন এঁবা সকলে খুব খ্যাত ছিলেন না। পবে যাঁবা যোগ দেন তাঁদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য সূর্যকুমাব সর্বাধিকাবী, সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শবৎচন্দ্র দাস, নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু, বাজনাবাযণ বসু, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, ক্ষীবোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, বমেশচন্দ্র দত্ত, বজনীকান্ত গুপ্ত, চণ্ডীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানকুমাবী বসু। ১৮৯৩-এ বাংলা সাহিত্য বেশ জমজমাট। বঙ্কিম জীবিত। পত্রপত্রিকা অনেক। কিন্তু লিওটার্ড খুব বেশি সাহিত্যিকদেব জড়ো কবতে পাবেননি। একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হল শোভাবাজাব রাজবাড়িতে। সভাপতি মহাবাজকুমাব

বিনয়কৃষ্ণ দেব। সহসভাপতি এল লিওটার্ড ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সম্পাদক ও ধনাধ্যক্ষ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী। একাডেমির মর্যাদা বাড়াবার জন্য বিদেশের ভারত অনুরাগীদের বিশিষ্ট সদস্য করা হয়—যাঁদের মধ্যে ছিলেন ফ্রেডরিখ মাক্সম্যুলর, জর্জ বার্ডউড, মনিয়র উইলিয়মস, এডুইন আর্নল্ড, উইলিয়ম উইলসন হান্টার-এর মতো বিখ্যাত মনস্বী।

বীমস যেমন বলেছিলেন, নতুন একাডেমি মূল কাজ হিসেবে নির্ণয় করলেন শুদ্ধ পরিশীলিত বাংলা ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান প্রণয়ন। ভাবা হয়েছিল, বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের এই কালে ভাষার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করবে একাডেমির অভিধান। সম্ভবপর হলে প্রণীত হবে যথার্থ একখানি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ। বিশেষ করে মাক্স ম্যুলর আরও কয়েকটি কাজের সূচি নির্দেশ করেছিলেন, লোককথা সংগ্রহ, বাংলা লেখমালা সংগ্রহ, পুরানো স্থান-নাম, নদীর নাম সংগ্রহ। ম্যুলর লেখেন, "I call them patriotic, because all that helps to give a people a knowledge of and a pride in their history, strengthens their patriotism and places it on a true foundation" (কুমার/পৃ ৩১)।

এসব পরামর্শ সাদরে গৃহীত এবং কাজে পরিণত করার আন্তরিক চেষ্টা হয়েছে। অধ্যাপক কুমারের অনুপুঙ্খ বয়ান প্রথম বৎসরের কাজের ফিরিস্তিতে ঠাসা। নিয়মিত অধিবেশন বসছে। সদস্যরা প্রস্তুত হয়ে আসছেন। নিজেদের প্রবন্ধ পড়ছেন। সতীর্থদের লেখা বা বাইরে থেকে পাওয়া রচনার খুঁটিনাটি নিয়ে গভীর ও বিস্তৃত সমালোচনা করছেন এবং সমস্ত আলোচনা বিশদভাবে কার্যবিবরণীতে লিখে রাখা হচ্ছে। বেশি ঝোঁক পড়ছে অভিধান ও ব্যাকরণের উপাদান সংগ্রহে এবং তার সমস্যা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণে। জন বীমস তাঁর ব্যাকরণের নতুন সংস্করণ একাডেমিতে আলোচনার জন্য পাঠাচ্ছেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত একাডেমির ২৯তম অধিবেশনে (২৭ মে ১৮৯৪) 'গ্রামার অফ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গোয়েজ, লিটারারি অ্যান্ড কলোকিয়াল'-এর দীর্ঘ সমালোচনা নিবন্ধ পড়লেন, সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত। ইতিমধ্যে অভিধান নিয়েও কাজ শুরু হয়ে গেছে। অভিধানের কাজ একা কারও পক্ষে করে ওঠা সম্ভব নয়। নীতি স্থির হচ্ছে এক-একটি বর্ণের দায়িত্ব এক-একজনের উপরে দেওয়া হবে। সংকলিত শব্দ তালিকা হাতে এলে সদস্যদের মধ্যে বিচারবিবেচনা করে মন্তব্যের জন্য বিতরণ করা হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে একাডেমির বাইরের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞদের কাছেও পাঠানো হবে। ধাপে ধাপে সংশোধন সংযোজনের পদ্ধতিতে পৌঁছনো হবে আদর্শ পূর্ণাঙ্গ অভিধান নির্মাণের চূড়ান্ত পর্যায়ে।

লক্ষ করার বিষয়, কাজের পদ্ধতি-বিজ্ঞান, মেথডলজি সম্পর্কে সতর্কতা। কাজের পরিকল্পনায় বাঁধুনি। কোথাও চিন্তার অস্বচ্ছতা নেই। লক্ষ্য সুস্পষ্ট। কাজের ধাপগুলি সুনির্ণীত। গোটা প্রকল্পের আড়ালে সক্রিয় থাকছে খুব সচেতন আধুনিক মন—যা সব উদ্যমকে শৃঙ্খলায় গেঁথে সফলতায় উত্তীর্ণ করে দেবে। ব্যাকরণ-অভিধান ছাড়াও নানান কাজ হয়েছে প্রথম বর্ষটি জুড়ে। সংগঠনের মুখপত্র 'দি বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটারেচার' প্রকাশ শুরু হল আগস্ট ১৮৯৩ থেকে। পত্রিকায় একাডেমির যাবতীয় কাজকর্মের বিবরণ এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় অল্প সময়ে বেশ প্রচার পেল।

১৩০০ বঙ্গাব্দ ১৮৯৩ এক শতাব্দীব সেই ক্রান্তিক্ষণে বাংলায সাহিত্য সংস্কৃতিব পবিমণ্ডল কেমন চনমনে—সে আমবা বেশ কল্পনা কবতে পাবি। অমন সময়ে এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে, বাংলা নিয়ে কাজকর্মে প্রতিষ্ঠানেব নাম, মুখপত্রেব নাম লেখালেখি সব ইংবেজিতে কেন? এমন এক প্রতিষ্ঠান যাব ঘোষিত উদ্দেশ্যই হচ্ছে বাংলাব বাঙালিব আত্মপবিচয় সন্ধান। বাজনাবাযণ বসু লিওটার্ডকে চিঠি লিখলেন ক্ষোভ আব বিস্মব জানিযে। লিওটার্ড বলতে চাইলেন, প্রতিষ্ঠানটিব নাম তো 'বেঙ্গলি একাডেমি' নয, 'বেঙ্গল একাডেমি'। বিতর্কেব মেজাজ জমে ওঠে ক্রমে। 'বেঙ্গলি একাডেমি' নযই বা কেন। জবাব, হতেই পাবে—এমনকি আগামী কালই। তাহলে কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানেব 'এম্স অ্যান্ড অবজেক্টস' বদলাতে হবে। সে কী যুক্তিযুক্ত হবে আদৌ? একটা দেশ—যাব প্রগতি সভ্য দুনিযাব অভিমুখে, সে তো শুধু 'ভার্নাকুলাব লিটাবেচাব' নিযে পড়ে থাকতে পারে না। বাঙালি 'নেশন'-এব সর্বাত্মক প্রগতিব কথা ভাবলে সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাব ঊর্ধ্বে উঠতেই হবে। ইংবেজি অবলম্বন কবতে হবে।

একাদেমিব প্রথম বছবটিব শেষ কযেক মাস ইংবেজি থেকে বাংলায, একাডেমি থেকে 'পবিষদ'-এ সাজবদল নিযে নানান আলোচনাব নথিপত্র আছে। এ থেকে দুটি কথা খুব স্পষ্ট। এক একাডেমিব সমাদব, গুরুত্ব ও প্রযোজনবোধ এক বছবেই বেশ ব্যাপক হযেছে এবং সংগঠনটি বাংলাব সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাব মূলকেন্দ্র হযে উঠেছে। দুই. বাংলা, বাঙালিত্বেব দাবি ক্রমে প্রবল হযে উঠেছে। একাডেমিব বদলে পবিষদ/পবিষৎ অভিধা মানা হল। ১৩ ডিসেম্বব ১৮৯৩-এব এক চিঠিতে সভাপতিকে বাজনারায়ণ বসু একাডেমিব কাজকর্মে বাংলাভাষা ব্যবহাবেব পবামর্শ জানান। যে প্রস্তাব আধাআধি মানা হল। ঠিক হল বিষয ইংবেজি হলে ইংবেজি ভাষা, বিষয বাংলা হলে বাংলা ভাষা ব্যবহাব কবা হবে। ৯ ফেব্রুযাবি ১৮৯৪-এব চিঠিতে একাডেমিব সদস্য উমেশচন্দ্র বটব্যাল সবাসবি প্রতিষ্ঠানটিব নাম বদলেব প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাব ছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য সদ্‌গোষ্ঠী, বঙ্গীয় সাহিত্য সাধুগোষ্ঠী—এই তিনটিব মধ্যে একটি নাম বাছাই কবা হোক। প্রথম নামটিব পক্ষে যুক্তি বেশ জোবালো। প্রাচীনকালে শিষ্যবা গুরুব চাবপাশ ঘিরে বসে শাস্ত্র অনুশীলন কবত—চাবপাশ ঘিবে বসাব জন্য বলা হত পবিষদ। পবে শব্দটিব অর্থ দাঁড়ায "ধর্মোপদেশক পণ্ডিত মণ্ডলী"। উমেশচন্দ্র লেখেন, "গ্রীসদেশে Academy বলিলে যে অর্থ প্রকাশ পাইত অস্মদ্দেশে পবিষদ বলিলেও একদা অনেকটা তাদৃশ অর্থ অভিব্যক্ত হইত।" এই বাক্যে তিনি চিঠি শেষ কবেন "অপব ভাষায দেশেব লোকেব কাছে আত্মপবিচয দিযা বেড়াইতে লজ্জা বোধ হয।"

এবারে এই প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে সবাসবি 'দেশেব লোক' আব 'আত্মপবিচয' কথা দুটি উঠে এল। একাডেমিব ২৩তম অধিবেশনে ১৮ ফেব্রুয়াবি ১৮৯৪ নাম বদলেব সিদ্ধান্ত নেওযা হল। হাতেব লেখায কার্যবিববণীতে ছিল 'বঙ্গ সাহিত্য পবিষদ' কিন্তু পত্রিকায ছাপা হয 'বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ'। অকাবান্ত 'পবিষদ'কে হসন্ত পবিষদ্ লেখাব সিদ্ধান্ত হল ১৭ মে ১৮৯৬-এব মাসিক অধিবেশনে। 'একাডেমি' থেকে 'পবিষদ্/পবিষৎ' প্রতিষ্ঠানটিব আদ্যন্ত বঙ্গাযনেব প্রক্রিযা। এই প্রক্রিযায কলকাতার বাইবে থেকে নিযমিত ধাক্কা দিচ্ছিলেন আদ্যন্ত

স্বদেশি মানুষ বাজনাবাযণ বসু—চিঠিব পবে চিঠি, যেসব পবামর্শেব বেশিব ভাগই পবিষদ্ পবিচালকেবা মেনে নিচ্ছিলেন, কাজে পবিণত কবছিলেন। বাজনাবাযণেব একটি মাবাত্মক প্রস্তাব শুধু মানা গেল না, "বাঙ্গালা পডিযা যাইতেছি—মধ্যে মধ্যে একটি একটি ইংবাজী শব্দ ইংবাজী অক্ষবে—ইহা ভযানক। 'বক্তৃতা দান' ইত্যাদি বাঙ্গালা অক্ষবে লুক্কাযিত ইংবাজী প্রযোগেব উপবেও পবিষদ খড়্গাহস্ত হইবেন। 'বক্তৃতা দান কি বে বাপু'?

" কিন্তু যিনি বাঙ্গালা কহিতে কহিতে, বাঙ্গালা ভাষায যাহাব অর্থ হইতে পাবে তাহাব স্থলে, ইংবাজী শব্দ ব্যবহাব কবিবেন, তাঁহাব এক পযসা জবিমানা হইবে।" "জবিমানাব কাগজেব ফাবম"-ও তৈরি কবে পাঠান বাজনাবাযণ। (১৭ ভাদ্র ১৩০১ সালেব চিঠি)। এ আইন বলবৎ হলে 'শিক্ষিত' বাঙালিব বক্তৃতা আব সাহিত্যসৃষ্টি দুই-ই স্তব্ধ হযে যেত নিশ্চয।

'একাডেমি' বা কোনো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেব ধাবণাটাই বিদেশি, তাকে স্বদেশি কবে তোলাব প্রক্রিযায অতিবেক কিছু ঘটতেই পাবে। কিন্তু একাডেমিব একবছবেব কাজকর্মেই প্রমাণ হল, উপস্থিত কালেব প্রযোজনে এমন একটি 'প্রাতিষ্ঠানিক' উদ্যোগ একান্ত কাম্য। তাই প্রতিষ্ঠানটিব বযস একবছব না পেবোতেই অগ্রগণ্য লেখক চিন্তাবিদ্ সব একে একে যুক্ত হচ্ছেন দেখা গেল। ১৩০২ সালেব, দ্বিতীয বর্ষের 'কর্মাধ্যক্ষ'দেব মধ্যে এলেন সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত, সহসভাপতি তিনজন—চন্দ্রনাথ বসু নবীনচন্দ্র সেন ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব।, সম্পাদক—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায, পত্রিকা সম্পাদক—বজনীকান্ত গুপ্ত। কার্যনির্বাহক-সমিতিতে রইলেন যতীন্দ্রনাথ চৌধুবী হীবেন্দ্রনাথ দত্ত বিনযকৃষ্ণ দেব মনোমোহন বসু সূর্যকুমাব সর্বাধিকাবী চণ্ডীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায বাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী আব রামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী।

২৪, ২৫ চৈত্র ১৩০১, ৫, ৬ এপ্রিল ১৮৯৫ তাবিখে শোভাবাজাব বাজবাড়িতে পবিষদেব প্রথম বাৎসবিক অধিবেশন ও সম্মিলনী অনুষ্ঠানেব জাঁকজমকেব বিববণ খুব নজব টানে। বিনযকৃষ্ণ দেবেব বাড়িব বিবাট উঠোন জোড়া সভার জাযগা "ধ্বজা পতাকা, পুষ্প ও পুষ্পমালায পবিশোভিত সুন্দব কার্পেট, সুন্দব চেয়াব, সুবঞ্জিত চন্দ্রাতপ প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হইযা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ কবিল।" সমবেত হযেছেন ৪০০ জন "সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ।" উপস্থিতিব সংখ্যাটি বিস্মযকব। সভাপতি বমেশচন্দ্র দত্ত। কর্মকর্তাবা সবাই আছেন, সহ-সভাপতি ববীন্দ্রনাথ সমেত। সমবেত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেব নাম ধবে খোঁজখবব নিলেই বোঝা যাবে বাইবে অনেকেই পবস্পব বিবোধী মতপথেব মানুষ, কিন্তু এখানে পাশাপাশি বসে একই উদ্দেশে নিজেদেব যেন নিবেদন কবতেই এসেছেন। উদ্‌বোধন সংগীতটিতে সকলকে আহ্বান কবে গাওযা হল 'আজি উৎসবে, এস হে সবে।" সভার সুব একতানে বাঁধা। এক শুভ উদ্‌বোধ, শুভ সূচনা। বার্ষিক বিববণ পাঠ সাঙ্গ হলে বিতর্ক নয, আবাব একটি গীত, মা মাতৃভাযাকে সম্বোধন করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতেব ছবিতে ভবা "সর্ব্ব বিদ্যা-বিভূষণা, হবে মা অল্পদিবসে।/দেখ মা সুষমা আজি, বঙ্গ-বুধ-বত্ন-বাজি,/নানা জ্ঞান-বত্নে সাজি, মিলিত সেই শুভোদ্দেশে।" (মনোমোহন বসুব লেখা)। সমাবেশেব সে সংহত আবেগ তুবীয স্তব স্পর্শ কবল ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব "বাঙ্গালা জাতীয সাহিত্য নামক সুললিত প্রবন্ধ পাঠে।" খুবই

সঙ্গত, এই আপ্লুত অধিবেশনেব প্রথম পর্বেব সমাপন হল বন্দেমাতবম গানে। পবেব পর্বটিও ওই মেজাজ ধবে রাখে, ইচ্ছেমতো মিষ্টান্ন ফলমূলে জলযোগ, টুকবো টুকবো জটলায সাহিত্য নিযে আলাপচাবি, হাবমোনিযাম টেনে নিযে গানে জমিযে দিচ্ছেন "ববীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সুকণ্ঠ গাযকগণ।"

এমন জমাট উৎসবে, পবিযদেব ভিত পাকা কবাব এমন দিনে একজনেব দেখা নেই, তিনি মি এল লিওটার্ড। ১৪ জুলাই ১৮৯৪-এ তিনি অসুস্থতাব কাবণে 'ধনবক্ষকেব' পদ ত্যাগ কবেন। ৪ নভেম্বব ১৮৯৪ ৬ষ্ঠ অধিবেশনেব খবব লিওটার্ডেব "পবিযদেব সঙ্গে সংস্রব ত্যাগপত্র পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে তাহা পবিগৃহীত হইল।" লিওটার্ডেব সবে যাবাব কাবণ অস্পষ্ট বযে গেছে। তিনি আদৌ বাংলা জানতেন না—পবিযদেব বঙ্গাযন প্রক্রিযায কখনও কখনও তিনি আপত্তিও তুলেছেন। সহকর্মীদেব সঙ্গে অল্পস্বল্প মতবিবোধেবও আভাস মেলে। একাডেমিব 'পবিষদে' উত্তবণ সম্পূর্ণ হযে ওঠাব মুখে বাংলা ভাষা-সাহিত্যেব এই বিদেশি সুহৃদ্ নিজেকে বোধহয অবান্তব মনে কবেছিলেন। মানুযটি একেবাবে হাবিযেই গেলেন।

মদনমোহন কুমাবেব সংকলিত তথ্য উপেক্ষা কবা যায না। ফলে মানতে হয বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদ দি বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটাবেচাব প্রতিষ্ঠানেবই ৰূপান্তব। এই ৰূপান্তর প্রক্রিযাব মধ্যে বাংলাব স্বাদেশিক চেতনাব উন্মেয বিকাশের ইতিহাস জড়িযে আছে।

আমবা নেশন বাঁধতে পাবিনি। জাতিপ্রতিষ্ঠা আমাদেব আযত্তে আসেনি। কিন্তু যুবোপেব দেশে দেশে নেশন বেঁধে ওঠাব ইতিহাস আমাদেব সামনে বযেছে। ইংবেজ ফবাসি বা জর্মান নেশনগুলি বাষ্ট্রবন্ধনে যেমন ঐকবদ্ধ তেমনি তাদেব ঐকবন্ধনেব অপব লক্ষণগুলি প্রকাশ পায নিজেদেব ভাষাব সাহিত্যের, নিজেদেব সাংস্কৃতিক ইতিহাসেব একতায। এই গৌববেব বস্তুগুলি নিযে বহুমুখি উদ্যোগে, অভিধান বচনায, কোযগ্রন্থ প্রণযনে, সাহিত্য-সংস্কৃতিব ইতিহাস সংকলনে জড়িযে থাকে তাদেব দেশাভিমান। ম্যাক্সমূলব এই কাজগুলিকে বললেন 'পেট্রিযটিক'। আমাদের কাছে এ নতুন চিন্তাব বীজ। বাষ্ট্রশক্তি আমাদেব আযত্তে নেই। বাষ্ট্রীয বন্ধনে নেশন হযে ওঠাব সম্ভাবনা আমাদেব পক্ষে দূব অস্ত। কিন্তু আমাদেব ভাযাব অনন্যতা, সাহিত্যেব সৌকর্য, উচ্চাঙ্গ এবং লৌকিক সংস্কৃতিব বিচিত্র প্রকাশৰূপ—এসব উত্তবাধিকাবেব শৃঙ্খলাময, সঙ্ঘবদ্ধ চর্চা তো আত্মসত্তাব পবিচয উজ্জ্বল কবে তুলতে পাবে। এই চর্চায বাধা নেই। দবকাব শৃঙ্খলা এবং সঙ্ঘবদ্ধতা। বিশেষ কবে ভাযাব, মাতৃভাষার ৰূপটিকে মার্জিত, আধুনিক মনেব প্রকাশমাধ্যম কবে তোলা দরকার। তাই অভিধান বচনায, শুদ্ধ ভাযাব ব্যাকবণ বচনায অভিনিবেশ চাই। এসব কাজেব জন্য প্রযোজন সংগঠন, কোনো পবিযদ্। এতেই নেশন বাঁধা হবে না, কিন্তু নেশনেব বনেদ, জাতীয ঐক্যচেতনাব ভিত্তি তৈবি হয অবশ্যই।

তিন

ঊনবিংশ শতাব্দীব উপান্তে স্বাদেশিকতা-জাতীযতাব চেতনা 'আপামব' জনসাধাবণেব মধ্যে কতটা চাবিযেছিল ঠিক ঠিক পবিমাপেব উপায নেই কোনো। কিন্তু এক নতুন হাওযা

বহেছিল—তার প্রমাণ পাওযা যাচ্ছিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানান আলোডনে। বিভিন্ন সংগঠন গডে ওঠায। বাংলাব ইতিহাসেব এই ক্রান্তিপর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্-এব প্রাসঙ্গিকতা, প্রত্যাশিত ভূমিকা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ববীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট কবে দেখিযেছিলেন প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীব অনুষ্ঠানে নিবেদিত তাঁব 'বাংলা জাতীয সাহিত্য' প্রবন্ধে। জাতিসত্তাব, নেশনেব আধাবশিলা স্থাযী কবা চাই। ববীন্দ্রনাথ যেন আগেই গডে তোলা তাঁব নেশন-তত্ত্বটি পবিষদেব কৃত্য প্রসঙ্গে প্রযোগ কবে একটি ধাবণাপ্রকল্প সুস্থিব কবে দিলেন। 'নেশন নামক মানস পদার্থ' সৃজনেব জন্য পবিষদ্ চাই। পবিষদ্ 'পবস্পব সম্মতি'তে তৈবি একটি সংগঠন, সাক্ষাৎ বর্তমানে স্থিত, অভিপ্রেত কর্মকাণ্ডেব ৰূপটি প্রত্যক্ষ কবা যাবে এই সংগঠনে। এব অভিমুখ বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে, সৃজনমযতাব পথে। আব এই সৃজনমযতাব প্রযোজনেই যেতে হবে ঐতিহ্যস্মৃতিতে, শিকড় মেলতে হবে 'সর্বসাধাবণেব প্রাচীন স্মৃতিসম্পদেব আবহমান মাটিতে'। বক্তৃতাটি শুরু কবলেন 'স্মৃতি-সম্পদেব' কথায, এক বেদনাব বোধে, কাবণ, 'এমন একটা নাড়ীর বিচ্ছেদ ঘটিযাছে যে, সেকাল হইতে মানসিক প্রাণবস অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হইযা একাল পর্যন্ত আসিযা পৌছিতেছে না।' শিল্পেব স্বদেশেব কথাই প্রথম তুললেন। ভুবনেশ্বব কণাবক মন্দিবেব ভাস্কর্যে প্রতিফলিত দেশেব সৃজন প্রতিভাব নজিব আমাদেব বিস্মিত কবে, কিন্তু বুঝতে পাবি না সমাজেব ভিতবেব কী গবজে, কেমন নৈপুণ্যে কাবা এ-সব 'অভ্রভেদী সৌন্দর্য' সৃজন কবেছিল। 'শিল্পী নাই কিন্তু তাহাদেব শিল্পনৈপুণ্যে দেশ আচ্ছন্ন হইযা আছে।' 'আমাদেব জাতীয-জীবন-ইতিহাসের মাঝখানেব কযেকখানি পাতা কে একেবাবে ছিঁড়িযা লইযা গেল .। জাতীয যোগবন্ধনেব অসদ্ভাবেব জন্যই সাহিত্যেব ধাবাবাহিকতা, 'পূর্বাপর সজীব যোগবন্ধন' বিচ্ছিন্ন হযে গেছে। সাহিত্যেব বন্ধন অনেক উদাব প্রসাবিত ক্ষেত্রে মানুষকে পবস্পর মেলাতে পাবে, ঐকবন্ধনে বাঁধতে পাবে। আমাদেব সমাজে তাব জাযগায স্থাযী হযে থেকেছে সংকীর্ণ ধর্মীয বাঁধন, তৈবি হযেছে শাক্ত বৈষ্ণব কাব্যেব সমষ্টি। মানুষকে মেলাতে হলে সাহিত্যে শুধু ধর্ম নয, সর্বত্রগামিতা চাই। একালে এ সত্য প্রথম উপলব্ধি কবেন বামমোহন বায। মিলনেব ভাষা সর্বত্রগামী হবে গদ্যে, বামমোহনেব উদ্যম তাই গদ্যসংগঠনে। জ্ঞানেব চূডা থেকে বামমোহন গদ্য অবলম্বন কবে "সর্বসাধাবণেব ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন ।" এই যুক্তি টেনে নিযে ববীন্দ্রনাথ দেখালেন, সাহিত্য একক মনেব সৃষ্টি হলেও তাব সজীবতাব জন্য, সার্থকতাব মূল্য অবধাবণেব জন্য বহু মানুষেব পবস্পব মানসিক সংস্পর্শ দবকাব। কেবল জন-কয়েক ক্ষমতাশালী লেখকেব উপব একালের সাহিত্য নির্ভব কবে থাকছে না। থাকছে না বলেই, বহু মানুষেব জীবনে প্রসারিত হবাব জন্যই দবকাব হচ্ছে নানা পত্রপত্রিকা, নানা সমিতি ও সংগঠন। আধুনিক শিক্ষাব, ধ্যান-কল্পনাব যা-কিছু ফসল সব বাংলা পত্রপত্রিকা, বাংলা আশ্রিত সভাসমিতিব মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব পাবে। পবিষদেব ডাকে যে বৃহৎ সমাবেশ, তাব তাৎপর্য সুগভীব। "আজ বঙ্গসাহিত্য আপন অন্তবেব মধ্যে এক নতুন প্রাণশক্তি, এক বৃহৎ বিশ্বাসেব পুলক অনুভব কবিযাছে,"। এই প্রাণশক্তি সৃষ্টিময সুফলনেব অমোঘ প্রতিশ্রুতিময। আজ হযতো নতুন শস্যেব পরিমাণ কম, কিন্তু এ সূচনা শাখা-প্রশাখায ভবন্ত হতেই থাকবে এবং ববীন্দ্রনাথেব আশা, শতবর্ষ পবেব

এমন কোনো সভায যিনি তাঁব জাযগায দাঁড়িযে কথা বলবেন তিনি "স্ফুটতব অরুণালোকে জাগ্রত বঙ্গকাননে বিবিধ কণ্ঠেব বিচিত্র কলগানেব অধিনেতা হইযা বর্তমানেব উৎসাহে আনন্দধ্বনি উচ্ছ্রিত কবিযা তুলিবেন"—এমন আবেগেব মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে এক ইঙ্গিত, সে 'বিবিধ কণ্ঠেব বিচিত্র কলগানেব', জাতীয সাহিত্যেব সেই পূর্ণতাব ধাত্রী ভূমিকায অধিষ্ঠিত থাকবে বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদ্।

সাহিত্য পবিষদেব মঞ্চ থেকেই সাহিত্যেব উদ্যমেব সঙ্গে 'জাতীয' অভিধা যুক্ত কবে দেওযা হল। দিলেন ববীন্দ্রনাথ—যিনি এব পবে দীর্ঘদিন পবিষদেব বহুমুখি কর্মধাবাব সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোত বেখেছিলেন। পবিষদেব কোনো প্রকল্পকেই আব গোষ্ঠীগত, সম্প্রদাযগত বলা চলবে না। বলতে হবে জাতীয উদ্যোগ। সার্বভৌম।

চাব

মাতৃভাযা মাযেব তুল্য। জাতীয চেতনাব আধাব। মাতৃভাযাব ব্যাপক চর্চাব আশ্রয পবিষদ্। আশ্রযটিকে বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী বললেন মাতৃমন্দিব (কাশিমবাজাব বঙ্গীয-সাহিত্য-সম্মেলন, ১৩১৪)। আদি ঠিকানা ১/২ নবকৃষ্ণ স্ট্রিট শোভাবাজাব-মহাবাজকুমাব বিনযকৃষ্ণ দেবেব বাড়ি। ১৩০৩ সালে উঠে এল বিনযকৃষ্ণ দেবেবই ১০৬/১ গ্রে স্ট্রিটেব বাড়িতে। সদস্য ক্রমেই বাড়ছে, জাযগা অকুলান, আবাব তাই জাযগা বদলে আসতে হল ১৩৭/১ কর্নওযালিস স্ট্রিটেব ভাড়াবাড়িতে। আন্তবিক চেষ্টায মহাবাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীব দান হালসিবাগানে ২৪৩/১ আপাব সার্কুলাব বোডে (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বোড) প্রথম দফায পাঁচ কাঠা, পবে আব দুবাবেব দানে মোট ১৪ কাঠা জমি পাওযা গেল। স্থাযী ঠিকানায ধাপে ধাপে তৈবি হযেছে অভিপ্রেত মাতৃমন্দিব। সবটাই দানেব টাকায। মূলত অর্থবান্ ভূস্বামী, দু-একজন ব্যবসাযী দাতা। সবকাবি সাহায্য যৎকিঞ্চিৎ, কলকাতা কর্পোবেশন কিছুদিন একটি অনুদান দিযেছে। সবকাবের এককালীন দান ১৬০০০ টাকা আসে ১৩৩৮ সালে, মিউজিযামটি সাজানো গোছানোয। এখনকাব পবিষদ-ভবন ধাপে ধাপে তৈবি। প্রথম পর্যাযেব নির্মাণ শেষ হতে এই স্থাযী ঠিকানায পবিষদ্ উঠে এল ২১ অগ্রহাযণ ১৩১৫। উল্লেখ কবতেই হবে, হাজাব অসুবিধে সত্ত্বেও পবিষদ্ চিবদিনই বযে গেছে বেসবকাবি প্রতিষ্ঠান। পবিপোষক বিদ্বৎসমাজ, বিদ্যানুবাগী সাধাবণ মানুষ, ধনী জমিদাব। আজও বেশ বড়ো অঙ্কেব বার্ষিক সবকাবি অনুদান পাওযা সত্ত্বেও বেসবকাবি প্রতিষ্ঠানই বযে গেছে। স্বযংশাসিত বঙ্গীয এই প্রতিষ্ঠান অধীন-স্বাধীন দুই পর্বেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা অক্ষুণ্ণ বেখেছে। পবিষদেব উপবে কর্তৃত্ব বক্ষাব চেষ্টায ছোটো ছোটো গোষ্ঠীব দ্বন্দ্ববিবোধ ছিল এবং এখনও আছে, কিন্তু বাইবেব দলীয বাজনীতিব প্রভাব নেই। এই চবিত্র বেশ তাৎপর্যেব। চবিত্রে বেসবকাবি, শিকড় সমাজ জীবনেব গভীবে, আর্থিক জৌলুষ নেই, আছে আত্মমর্যাদাব গৌবব।

এই প্রসঙ্গেই এশিযাটিক সোসাইটিব কথা মনে আসে। পবিষদেব যেসব কাজ নিযে গৌবব, পুথি থেকে মুদ্রিত বই তৈবি, পুবাবৃত্ত ভাবততত্ত্বেব চর্চা, আধুনিক জ্ঞানেব নানান শাখা নিযে মৌলিক গবেষণাব কাজকর্ম, সমৃদ্ধ প্রকাশনা বিভাগ, বিশেষ কবে আবহমান

ভাবতীয জ্ঞানভাণ্ডাব—পুথিসংগ্রহ গডে তোলা—সোসাইটিব কাজেব সঙ্গে এসব কাজেব মিল আছে। কোনো কোনো প্রকল্প সোসাইটিব আদলে কল্পিত। তবুও দুটি প্রতিষ্ঠান ববাবব চবিত্রে আলাদা। পত্তনেব পব থেকে সোসাইটিব উপবে পুবো নিযন্ত্রণ ছিল শাসকপক্ষেব আমলাতন্ত্রেব। আজও সোসাইটি স্বযংশাসিত জাতীয প্রতিষ্ঠান হওযা সত্ত্বেও অন্তত আর্থিক দিক থেকে কেন্দ্রীয সবকাবেব নিযন্ত্রণে বযেছে। যে জাতীযতা চর্চাব গবজে বাংলাব অভিভাবক স্থানীয মানুযেবা পবিযদ গডেছিলেন সে কি সোসাইটিতে যোগ দিযে কবতে পাবতেন? সে তো অসম্ভব ছিল। বোঝাই তো মুশকিল ছিল। ইচ্ছে কবলেই সদস্য হওযা যেত না। দৃশ্যত বা অদৃশ্য ভাবে আমলাতন্ত্রেব নিযন্ত্রণ ছিলই। সাহেব পণ্ডিতদেব প্রতিপত্তি বেশি। পণ্ডিত বা মৌলবিবা আসেন সাহেবদেব প্রকল্পে সাহায্য কবতে—তাদেব স্বাধীনভাবে কাজ কবাব সুযোগ ছিল না। বাজেন্দ্রলাল মিত্রই একমাত্র ব্যতিক্রম। তুলনা কবে দেখলে মানতে হয পবিষদ চিবদিনই খোলামেলা জাযগা। পবিষদেব কর্মকর্তাদেব মধ্যেও, এক ঠাকুববাডিব সদস্যবা ভিন্ন, সবাই প্রায আমলা। মনে হয, ওই যে চাকবিব গ্লানিব জায়গা, যাকে বঙ্কিমচন্দ্র বলতেন, জীবনেব সবচেযে বড়ো অভিশাপ, পবিষদ যেন এই আমলা বিদ্বৎজনদেব মুক্তিব জাযগা, একবকমেব স্বাধীনতাব জাযগা। বিদ্যাচর্চাতেও বশ্যতা থাকে। সোসাইটিব বিদ্যাচর্চায পদ্ধতিগত একটা ছক তো মানা হত, সে ছক সাহেবদেব তৈবি। নিখুঁতভাবে সেই মেথডলজি, পদ্ধতি বিজ্ঞান মেনে কাজ কবাব বাধ্যতাতেই শাসকেব সংস্কৃতিব চৌহদ্দিব মধ্যে নিজেকে খাপ খাইযে নিতে হত। ভাষা-সাহিত্যেব ইতিহাস বা পুথি নিবদ্ধ কাজেব চর্চায পবিষদেও যে সেই আমদানি পদ্ধতিবিজ্ঞান অনুসবণ কবা হযনি তা নয। কিন্তু প্রকল্প প্রণযনে, রূপাযণেব স্তবে স্তবে কাজ যিনি কবছেন তাঁব উপবে পবিষদে কোনো নিযন্ত্রণ আবোপেব প্রশ্ন কখনও ছিল না। বিশেযত বাংলা নিযে কাজের সুযোগ সোসাইটিতে আদৌ ছিল না—যা স্বদেশকে নিবিডভাবে বোঝাব গবজ। ফলে সোসাইটিব মতো বিবাট প্রতিষ্ঠানেব সমান্তবালে গডে তুলতে হয, একান্ত দীন দশা থেকে তৈবি কবে তুলতে হয পবিষদ্। শাসকেব নিযন্ত্রণেব বাইবে, সবকাবি সাজ খুলে বেখে ইচ্ছাসুখে কিছু কবাব জাযগা। সে কাজে পযসাব প্রত্যাশা নেই, ত্যাগেব গৌবব আছে। মননেব স্বাধীনতাব এক পবিসব এই বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদ্।

পাঁচ

পবিষদেব স্থাযী আবাস হল। পুথি সংগ্রহ গডে উঠল। চিত্রশালা সুবিন্যস্ত হল। গ্রন্থাগাব দ্রুত বেডে উঠল। পত্রিকাটি সমৃদ্ধ প্রকাশনাব মর্যাদা পেল। দেশ পবিচয উদ্ধাবেব নানা প্রকল্প রূপায়ণেব আযোজন হল। এসব কাজেব বিববণ এখন সহজে পাওযা যায। কিন্তু ঘবে বসে কাজেব চেযেও জরুবি মনে হল পবিষদেব কর্মজালেব মধ্যে বিস্তীর্ণ স্বদেশকে তুলে আনা। পবিষদেব কাজকর্মেব আযোজনেব মধ্যে দাঁডিযে দেশের মধ্যে স্বাদেশিক আলোডনেব তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা কবা যায। সেজন্য পবিষদেব কর্মসূচি, কর্মপ্রকল্পগুলি ভিতব থেকে বুঝতে হবে।

বাংলা পুথি খোঁজা একটা বড়ো কাজ পবিষদেব। এই কাজটিব স্বাভাবিক অধিনায়ক হযে উঠলেন হবপ্রসাদ শাস্ত্রী। পুথি নিযে কাজেব শিক্ষা হবপ্রসাদ বাজেন্দ্রলাল মিত্রব কাছে পেযেছিলেন। সোসাইটিব কাজেব অভিজ্ঞতা নিযে তিনি পবিষদে আসেন। তাঁব সম্পর্কে ববীন্দ্রনাথ এক প্রশস্তি-বচনায লিখেছেন, "বাজেন্দ্রলালেব সহযোগিতায এসিয়াটিক সোসাইটিব বিদ্যাভাণ্ডাবে নিজেব বংশগত পাণ্ডিত্যেব অধিকাব নিযে তরুণ বযসে তিনি যে অক্লান্ত তপস্যা কবেছিলেন, সাহিত্য-পবিষদকে তাবই পবিণত ফল দিযে এতকাল সতেজ কবে বেখেছিলেন।' কথাটা স্পষ্ট কবা যায তথ্যের আলোয। সোসাইটিতে হবপ্রসাদ বাজেন্দ্রলালকে পুথিব কাজে সাহায্য কবতেন। ১৮৯১-এ বাজেন্দ্রলালেব মৃত্যু হয। তাঁব জাযগায পুথি সন্ধানেব ডিবেক্টব পদে নিযুক্ত হলেন হবপ্রসাদ। বাজেন্দ্রলালেব তৈবি 'নোটিসেস অফ স্যানসক্রিট ম্যানাসক্রিপ্টস' পার্ট-২ ভলুম ১৩ পর্যন্ত কোনো বাংলা পুথিব উল্লেখ নেই। হবপ্রসাদেব তৈবি নোটিসেব একাদশ খণ্ডেব (১৮৯৫) ভূমিকায প্রথম আলাদাভাবে বাংলা পুথিব উল্লেখ দেখা যায। সোসাইটিব কাজেব ছকেব মধ্যেই হবপ্রসাদ বাংলা নিযে কাজেব দিশা খুঁজছিলেন—১৮৯৭-এ তিনি এই আগ্রহ আব প্রস্তুতি নিযে পবিষদে যোগ দিলেন। বিশেষভাবেই উল্লেখ কবতে হবে, এই বছবই তিনি মে মাসে পুথিব খোঁজে নেপাল যান। আবিষ্কার কবেন 'বামচবিত'-এব পুথি—যা পাল বাজত্বেব ইতিহাস সংগঠনে অমূল্য নথি। চাববার নেপাল গেছেন পুথিব খোঁজে। সন্ধানের ফল পেযেছে সোসাইটি ও পবিষদ্ দুটি প্রতিষ্ঠান। ১৯০৭-এ নিযে আসেন চর্যাপদেব পুথিব কপি—যা পবিষদ থেকেই প্রকাশিত হয এবং বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাস হাজাব বছব পিছিযে শুরু কবাব উপাদান হাতে আসে। শুধু নেপালে নয, সাবা বাংলাযই হবপ্রসাদ পুথি সন্ধান জাল ফেলেন। তাঁকে সাহায্য কবতেন দীনেশচন্দ্র সেন, মুনশি আবদুল কবিম সাহিত্য বিশাবদ, বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ, তাবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। ক্রমে পবিষদই হযে ওঠে বাংলা পুথি নিযে কাজেব মূল জাযগা, হবপ্রসাদেব পবিচালনায। সোসাইটি থেকে পবিষদে উত্তবণ, দেশেব মাটিব কাছে ঘনিযে আসাব অভিজ্ঞতা। স্বদেশেব, মাতৃভাষাব সাহিত্যিক বিকৃথ সন্ধান—এই উদ্যোগে তো স্বাদেশিকতা চর্চাবই আব এক মুখ জেগে থাকে। সভাসমিতি মিটিং মিছিল নয, অখণ্ড মনোযোগে, নিবিষ্টতায লিপিব আকাব-আকৃতি বুঝবাব চেষ্টা, পাঠোদ্ধাবেব সুদীর্ঘ আযাস, তিতিক্ষাময এক সাধনাই যেন-বা। এ সাধনায ক্রমে উন্মোচিত হয স্বদেশেব কোনো-না-কোনো গৌববেব কথা, লুপ্ত হযে যাওয়া কোনো বিদ্যাব পবিচয, বিস্মৃত হযে যাওয়া কোনো প্রাচীন কবি-মনীষীব পবিচয। হবপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭-এ চর্যাপদেব পুথি পেযেছিলেন, সম্পাদনায লেগে গেল ৯/১০ বৎসব। নিশ্চিত হযে ১৯১৬ বই প্রকাশ কবলেন। বইয়েব নামকবণেই প্রকাশ পেল অপবিমিত প্রত্যয, 'হাজাব বছবেব পুবাণ বাঙ্গালা ভাষায বৌদ্ধগান ও দোঁহা।' 'হাজাব বছবেব পুবানো বাংলায'—বড়ো নিশ্চিত বড়ো সাহসী ঘোষণা। সম্পাদিত কোনা প্রাচীন বইযেব নামকবণে এ বকম নিশ্চিত ঘোষণা বেশ ব্যতিক্রম। জাতিব আত্মপবিচয এক দৃঢ ভিতেব উপবে দাঁড কবিযে দেওযা। বলতেই পাবা যায, এ হল জাতি প্রতিষ্ঠাব আধারশিলাগুলি জুগিযে দেওযা। একই কাজ কবছিলেন বসন্তবঞ্জন বায, নগেন্দ্রনাথ বসু,

হীবেন্দ্রনাথ দত্ত, আবদুল কবিম, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। পাশাপাশি সাহিত্য-পবিষৎ পত্রিকায প্রকাশিত হযে চলেছিল মধ্যযুগেব বাংলাব ভাষা-সাহিত্য নিয়ে নতুন গবেষণাব ফসল। আজও সে সব বচনা সংকলিত হযে গ্রন্থবদ্ধ হযনি।

একই দেশ জিজ্ঞাসাব তাগিদ থেকে নানা জনেব দানে ক্রমে গড়ে ওঠে একটি সমৃদ্ধ চিত্রশালা। সবকাবি প্রতিষ্ঠান ইন্ডিযান মিউজিযম ছিল, বিশাল তাব সর্বভাবতীয সংগ্রহ। স্বদেশিব মেজাজেই ভাবা খুব স্বাভাবিক, স্বদেশি প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয-সাহিত্য-পবিষদেও থাকতে পাবে দেশ-পবিচযেব প্রত্নসামগ্রী-সংগ্রহ। কিনবাব সামর্থ্য কোনোদিনই ছিল না পবিষদেব, বিভিন্ন সূত্রেব দানে ক্রমে সম্পন্ন হযে ওঠে এই সংগ্রহ। প্রাচীন মুদ্রা, পাথব ও ধাতুব মূর্তি, বিচিত্র টেবাকোটাব কাজ, পুবানো বাংলাব চিত্রকলা, খ্যাতিমান বাঙালিদেব ব্যক্তিগত ব্যবহাবেব সামগ্রী, চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ। এ সংগ্রহে ভাবতেব বিভিন্ন অঞ্চলেব মুদ্রা আছে, গ্রীক মুদ্রা আছে, গান্ধাব মথুবাব মূর্তি ইত্যাদি আছে, কিন্তু সব ছাপিযে ওঠে বাংলাব প্রত্নসামগ্রী, বাংলাব পোড়ামাটিব কাজ, বাংলার মনীষীদেব পোশাক-পবিচ্ছদ, চিঠিপত্র, বাংলাব বাজন্যদেব তাম্রশাসন। এব মধ্যে অষ্টম-নবম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীব মাঝেব প্রত্নসামগ্রীব সংখ্যা অনেক। পবিষদেব একাদশ বাৎসবিক কার্যবিববণীতে উদ্ধৃত আছে ববীন্দ্রনাথেব অভিপ্রায, 'ববীন্দ্রবাবুব অভিপ্রায যে, অতঃপব বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে তাহাই পবিষদেব আলোচ্য হউক, যেন পবিষদেব কার্যালযে আসিলে বাংলাদেশের সম্বন্ধে যে-কোনো জ্ঞাতব্য বিষযের সন্ধান পাওযা যায।' এই নীতি রূপাযণে চিত্রশালাটি গড়ে তোলা হল বিশেষ লক্ষ্য নিযে। মূলত এই চিত্রশালা সংগঠন কবেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী আব বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায। লক্ষ্য নির্দিষ্ট, এখানে এলে যেন বাংলাব স্বাদগন্ধ পাওযা যায। একবাবও যাঁবা এ সংগ্রহ দেখেছেন তাঁদেব চোখে ভেসে উঠবে মুর্শিদাবাদ থেকে পাওযা তিনটি বিষ্ণুমূর্তি, ব্রোঞ্জেব—অসাধাবণ কাজ, কিংবা কালো পাথবেব সূর্যমূর্তি, ব্রোঞ্জেব ছোট্ট একটি পার্বতী, অনুমান নবম শতাব্দীব কাজ, পালযুগেব পাথরেব বোধিসত্ত্ব ও তাবা মূর্তি কিংবা বিচিত্র টেবাকোটা সংগ্রহ—যাব মধ্যে আছে চন্দ্রকেতু-গড়েব যক্ষ-যক্ষী—বিশেষজ্ঞদের হিসাব, পঞ্চম শতাব্দীরও আগেব নিদর্শন অথবা গৌড়-পাণ্ডুয়ার সূক্ষ্ম অলংকরণেব কাজগুলি। বাংলাব ঋদ্ধ অতীত, কাল পবম্পবা ধবা আছে এই ছোটো কিন্তু তাৎপর্যময সংগ্রহে। এতো স্বদেশকেই বুঝতে চাওযা গবজে গড়ে তোলা। ঊনবিংশ শতাব্দীর স্মবণীয মনীষীদেব, বামমোহনেব বিদ্যাসাগব মশাযেব, বঙ্কিমচন্দ্রেব স্মৃতিজড়িত সামগ্রীগুলিব ভিতব দিযে হেঁটে যাওযায স্বদেশকেই ছুঁযে যেতে হয।

একটা মন কাজ কবেছিল এইসব উদ্যোগেব মধ্যে। নিজেব ইতিহাসকে গড়ে তোলাব তৃষ্ণায ব্যাকুল মন। 'নেশন' বেঁধে তুলতে হবে। সেই কল্পিত নেশন দাঁড়াবে যে আধাবশিলাব উপবে তাবই নাম ইতিহাস। তাকে ববীন্দ্রনাথ বলবেন, সর্বসাধাবণেব স্মৃতিসম্পদ। ইতিহাস সম্পর্কে এই চেতনা, বোধ—এ বস্তু একেবাবেই নতুন। এ চেতনা বিকাশেবও ইতিহাস আছে। 'জাতি প্রতিষ্ঠা'ব গবজ যাঁবা বোধ কবেছিলেন তাঁবাই, বঙ্কিমচন্দ্র, বাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায—এঁবা অনুভব কবলেন সাহেবদেব হাতে তৈবি ব্রিটিশ ইন্ডিযাব ইতিহাসে কোনো স্বদেশ নেই।

কাবণ সেই ইতিহাসেব ছক সাম্রাজ্যিক শাসন চিবস্থাযী কবাব তত্ত্বেব উপবে প্রতিষ্ঠিত। সে ইতিহাসে আমাদেব সৃষ্টিশীলতাব, বীর্যবত্তাব, ত্যাগেব সত্য নেই। ফলে যে চাবিত্রিক ধাবাবাহিকতাব উপবে একটা জনগোষ্ঠী জাতি হিসাবে ভব কবতে পাবে তাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন কবা হয, বিকৃত ব্যাখ্যায। তাই বিকল্প ইতিহাসতত্ত্বেব অবস্থান খুঁজতে হয।

পবিষদেব কর্মকাণ্ডেব অন্তর্গত একটি প্রধান অভিপ্রায দেখতে পাই এই বিকল্প ইতিহাসতত্ত্ব প্রতিপন্ন কবা। এ জন্য উপাদান সংগ্রহেব উদ্যম নানা উদ্যোগে, প্রকল্পে সক্রিয হযে ওঠে। কর্মকর্তাবা উপলব্ধি কবছেন, কলকাতায তাত্ত্বিক তর্কবিতর্কে যতই বুদ্ধিব ঝলক দেখা যাক, কলকাতায স্বদেশ নেই। দেশময ছড়িযে আছে আমাদেব পূর্ব-পুরুষেব বিচিত্র কর্ম ও কীর্তিব পবিচয। একেবাবেই অনন্য সৃজনপ্রতিভা বা জনসাধাবণেব সৃষ্টিক্ষমতা বৈষযিক সংস্কৃতিব একটি বিশিষ্ট ধাবা তৈবি কবেছিল। চাষেব পদ্ধতি, সেচেব পদ্ধতি, কৃষি সবঞ্জাম, তৈজস উৎপাদনেব পদ্ধতি, জাল বোনা, তাঁতেব কাজ, পবিবহনেব নানা পদ্ধতি উদ্ভাবন, নৌকো গড়া—এমন হাজাবটা সৃষ্টিব কাজ যা আমাদেব বেঁচে থাকাব বাস্তবেব সঙ্গে জড়িত, সেই বাস্তবেব উপবে সমাজটাকে আমবা যে বিন্যাসে সাজিযেছিলাম—তাব সমগ্র পবিচয উদ্ধাব কবে না আনতে পাবলে তো স্মৃতি সম্পদেব উপকবণ জ্ঞানেব বাইবে থেকে যাবে। তেমনি ওই জীবন, যতই চমক বর্জিত হোক, দুস্থ হোক—তাব আবহমান মূল্যবোধগুলি, তার শ্রেয উপলব্ধিগুলি—সেই জনমানসেব অভিব্যক্তিগুলি ছড়ায গানে কাব্যে লোকনাট্যে পূজাব বা উৎসবেব উপকবণে পাল-পার্বণেব অনুষ্ঠানে আচবণ-বিধিতে কী ভাষায কেমন শৈলীতে প্রকাশ পেত—সেই মানস সংস্কৃতিব উপাদানগুলিও তো উদ্ধাব কবে আনা চাই। সেই তো আমাদেব আত্মতাব পবিচয। সে-ই আমাদেব ধাবাবাহিক বাস্তব ও মানস সংস্কৃতিব ইতিহাসেব উপাদান। স্বদেশেব মুখ চাবিযে আছে ওই উপাদানে। এই দেশপবিচয নিখুঁতভাবে, সমগ্রভাবে জানতে হবে। এ তো বক্তৃতা কবে হয না। এ বস্তু উদ্ধাব কবে আনবাব জন্যে জীবনেব মধ্যে নেমে যেতে হয। বক্তৃতামঞ্চ থেকে নেমে আসতে হয এ কাজে। পবিষদেব কর্মপ্রকল্পে এই কাজেব আহ্বান ছিল। একে বলাও যায স্বদেশকে জানা এবং জানাব ভিতব দিযে স্বদেশকে গড়াব প্রক্রিযা। এই স্বাদেশিকতাকেই বলা যায জাতিপ্রতিষ্ঠাব উদ্যম। 'নেশন' চিন্ময, কিন্তু চিন্ময পদার্থেবও বস্তুভিত্তি লাগে। বস্তুভিত্তি থেকেই কি চিন্ময কোনো সত্য জেগে ওঠে না? না হলে চিন্ময উপলব্ধি হযে যায কল্পনাবিলাস, কাল্পনিকতা।

পবিষদ স্থিব কবলেন, পবিষদকে দেশময ছড়িযে যেতে হবে। এই উদ্যমে নেতৃভূমিকায দেখতে পাই হবপ্রসাদ শাস্ত্রীকে, বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদীকে, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুবকে। ১৯০৫-এ বঙ্গবিভাগেব আঘাত অন্যমাত্রাব এ স্বদেশ জিজ্ঞাসা সংহত এবং প্রকল্পভিত্তিক কার্যকব রূপ দিযেছিল।

পবিষৎকে সর্বত্র নিযে যেতে হবে। সেজন্য শাখা পবিষৎ গড়াব নীতি মেনে নেওযা হল। প্রস্তাবটি এসেছিল মফস্‌সলবাসী কোনো সুবেন্দ্রচন্দ্র বাযচৌধুবীব কাছ থেকে, ১৯০৪-এ, 'বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব প্রসাববৃদ্ধি এবং বঙ্গেব ঐতিহাসিক উপকবণ ও প্রাচীন কাব্যাদি সংগ্রহেব জন্য প্রতি জেলায উহাব একটি কবিযা শাখা-সভা স্থাপিত হউক'।

বঙ্গবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে, দেশের মধ্যে ঐকবন্ধন দৃঢ় করার জন্য 'মহা-আহ্বান' সার্থক করে তোলার কর্মকাণ্ডে রবীন্দ্রনাথ পরিষদকে দেশব্যাপী আলোড়নের সঙ্গে যুক্ত করে নিতে চাইলেন, 'আমরা এই সময়ে এই উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে বাংলার ঐক্যসাধন যজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা পরের দিকে না তাকাইয়া, নিজেকে পরের কাছে প্রচার না করিয়া, নিজের সাধ্যমত স্বদেশের পরিচয় লাভ ও তাহার জ্ঞানভাণ্ডার পূরণ করিতেছেন। এই পরিষৎকে জেলায় জেলায় আপনার শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে এবং পর্যায়ক্রমে এক-একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার, এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে—এখন সমস্ত দেশকে নিজের আনুকূল্যে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে'। ("অবস্থা ও ব্যবস্থা")।

পরিষদের কর্মধারা সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ অবলোকন আছে এই বাক্য কয়েকটিতে। পরিষদ নিজেকে জাহির না করে 'স্বদেশের পরিচয়' উদ্ধার করে আনছেন। রচিত হয়ে উঠছে 'চিন্তার, ভাবের, ভাষার, সাহিত্যের' ঐক্য। এ হল 'স্বাধীন কর্তব্য পালন'। বাইরের আঘাতের মুখে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ জরুরি। সে প্রতিরোধ ব্যাপক হওয়া দরকার। কর্তব্যটি রাজনৈতিক। সে রাজনীতির অন্যতম সক্রিয় নেতা রবীন্দ্রনাথ, যিনি আবার পরিষদেরও একজন প্রধান পরিচালক, তিনি ভাবছেন দেশের উপরে নেমে আসা বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের দুর্যোগে 'স্বাধীন কর্তব্য' পালনে অভ্যস্ত পরিষদ জোরালো প্রতিরোধ গড়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। পরিষদ সক্রিয় রাজনীতিতে নেই কিন্তু তার ভূমিকা হয়ে উঠছে রাজনৈতিক। ঐক্যের দৃঢ় বনিয়াদ পরিষদ গড়ে তুলতে পারে। সে ঐক্য ব্যাপক করে তোলা পরিষদের পক্ষেই সম্ভব। সেই ঐক্যই উপস্থিত রাজনীতির প্রধান হাতিয়ার। আবার এই ঐক্যের বাঁধনই জাতিসত্তার একতা সম্ভব করবে। 'নেশন বেঁধে তোলায়', 'জাতি প্রতিষ্ঠায়' হয়ে উঠবে প্রধান শক্তি। পরিষদের ভূমিকা হয়ে উঠছে ঐতিহাসিক তাৎপর্যময়।

রবীন্দ্রনাথের আহ্বান বৃথা যায়নি। প্রথমে রংপুরে তারপর একে একে সত্যিই জেলায় জেলায়, জেলা শহরের বাইরেও অনেক জায়গায় শাখা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্য দিকে প্রাথমিক অসুবিধে কাটিয়ে বাৎসরিক সাহিত্য সম্মিলন অনুষ্ঠানও সম্ভব হল। প্রথম অনুষ্ঠান হয় মুর্শিদাবাদে কাশিমবাজারে ১৩১৪ সালের কার্তিক মাসে। এই বাৎসরিক সম্মিলনের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ে এবং ১৩৩৮ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন একটি রেজিস্ট্রি করা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

সম্মিলনগুলির বিস্তারিত কার্যবিবরণ পাওয়া যায়। মূল অধিবেশন ছাড়াও সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান---বিভিন্ন শাখার স্বতন্ত্র অধিবেশন হত---যেখানে পড়া হত বিভিন্ন বিষয়ে নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রবন্ধের বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক চলত। কার্যবিবরণে দেখা যায়, যেখানে অধিবেশন হচ্ছে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও মূল সভাপতির দীর্ঘ ভাষণগুলিতে সেই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে বিবৃত হত। এইসব অনুপুঙ্খ বিবরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক

দেশ পবিচযেব নথিব মর্যাদা পেত। এই উপাদান সে সমযেব বিদ্যাচর্চাব পদ্ধতিব পবিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ কবে পড়লে একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই নজবে আসবে। বিংশ শতাব্দীব প্রথম তিন চাব দশকে আমাদেব অ্যাকাডেমিক জ্ঞানচর্চায অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজেব মডেল অনুসবণ কবা হত। সাহিত্য বিচাবে, দর্শনেব আলোচনায, ইতিহাসেব চর্চায দেশেব সঙ্গে, স্বদেশেব জনমানসেব প্রবণতাব সঙ্গে তাব সামান্যই যোগ থাকত। পবিষদ্ আযোজিত চর্চায এমন-সব মানুষ যোগ দিতেন, যাঁবা একেবাবেই ভিন্ন অবস্থান থেকে জ্ঞানেব বিষযগুলিতে প্রবেশেব চেষ্টা কবতেন। যেমন ইতিহাসেব চর্চায দেখছি অগ্রগণ্য মনস্বী অক্ষযকুমাব মৈত্রেয, নগেন্দ্রনাথ বসু, হবপ্রসাদ শাস্ত্রী, অমূল্যচবণ বিদ্যাভূষণ, নবেন্দ্রনাথ লাহা, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, বামপ্রাণ গুপ্ত। ইতিহাসেব দৃষ্টি নিয়ে অ্যাকাডেমিক পণ্ডিতদেব সঙ্গে এঁদেব বিতর্কগুলি আমাদেব ইতিহাসতত্ত্বেব বিবর্তনেব দিক থেকে আজও চর্চাব যোগ্য। আমাদেব ইতিহাস সাহেববা লিখে দেবে বা আমাদেব ইতিহাস বচনায সাহেবদেব 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাসেব' ছকেব বাইবে যাব না—এই অবস্থানেব বিরুদ্ধতাব একটা ধাবা বঙ্কিমেব বঙ্গদর্শনের যুগ থেকে চলে এসেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালযেব সিলেবাস নিযন্ত্রিত ইতিহাস চর্চাব প্রতাপে সেই বিকল্প দৃষ্টি যেন তেমন দাঁড়াবাব জমিই পাযনি। ববীন্দ্রনাথ ১৩০৫ সালে অক্ষযকুমাব মৈত্রেযেব 'সিবাজদ্দৌলা' বইটিব সমালোচনা প্রসঙ্গে দেখিযেছিলেন, এই ঐতিহাসিক সাহেবদেব ইতিহাসেব ছকেব বাইবে এসে যে সিবাজচবিত্র এঁকেছেন সেই চরিত্রচিত্র অন্ধ অনুবৃত্তি থেকে মুক্তিলাভেব দৃষ্টান্ত। ববীন্দ্রনাথেব উজ্জ্বল উক্তি, "বাংলা ইতিহাসে তিনি যে স্বাধীনতাব যুগ প্রবর্তন কবিযাছেন সেজন্য তিনি বঙ্গ সাহিত্যে ধন্য হইযা থাকিবেন।" (পশ্চিমবঙ্গ সবকাব প্রকাশিত ববীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড ১৯৯৪, পৃ ৫১৪)। 'বাংলা ইতিহাস' আব 'স্বাধীনতাব যুগ' কথা দুটি আমাদেব স্বাদেশিক জ্ঞানচর্চায অভিপ্রেত অমোঘ সংজ্ঞার্থেব মতো।

বঙ্গীয-সাহিত্য-সম্মিলনেব মঞ্চে এই দৃষ্টি প্রতিষ্ঠাব চেষ্টা হত, সে চেষ্টা প্রতিহত কবাব চেষ্টাও হত। যেমন হল বর্ধমানে অষ্টম বঙ্গীয সাহিত্য-সম্মিলনে ইতিহাস শাখাব অধিবেশনে। হবপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রবন্ধ পড়ছেন 'হিন্দুব মুখে আবঙ্গেবেব কথা'। সভাপতি যদুনাথ সবকাব প্রবন্ধেব কিছু কিছু অংশ পডতেই দিলেন না। শাস্ত্রী মশায বলতে চাইছিলেন, কেন আমবা ইতিহাস রচনায শুধু সবকাবি দলিল দস্তাবেজেব উপবেই একান্তভাবে নির্ভব কবব। বাজপুতানাব মাবাঠাব পঞ্জাবেব আঞ্চলিক ভাষাব সাহিত্যে ইতিহাসেব অনেক উপাদান ছড়িযে আছে। সেসব উপাদান ব্যবহাবে আমাদেব ইতিহাসে ভিন্ন মাত্রা আসতে পাবে। রাজপুতানাব ভাট-চাবণদেব মতো মহাবাষ্ট্রে ছিল গন্ধালী—যাবা যুদ্ধেব বর্ণনা পোবাডা (পযাব) বচনা কবে গেযে শোনাতো। "মাবাঠা-ইতিহাসেব প্রত্যেক ঘটনার এইরূপ পোবাডা আছে। তাহা হইতেও ইতিহাসেব অনেক উৎকৃষ্ট মসলা সবববাহ হইতে পাবে।" এইসব হাটেব মাঠেব লোকেব মুখেব ছডা গান নিযে ইতিহাস হবে—যদুনাথ ভাবতেই পাবতেন না। সভাপতিব আসন থেকে মন্তব্য কবেছিলেন, 'আমাদেব দেশেব অনেক ঐতিহাসিকেব নিকট মুডিমুডকি এবং সীতাভোগেব একই দব।' জাযগাটা বর্ধমান! ইতিহাস চর্চায অ্যাকাডেমিক আভিজাত্য হবপ্রসাদ শাস্ত্রী অক্ষযকুমাব মৈত্রেযবা ভাঙতে চাইছিলেন। বঙ্গীয সাহিত্য পাবিষদ বা সাহিত্য

সম্মিলনই হয়ে উঠেছিল মননে স্বাধীনতাব প্রধান মঞ্চ।

সমকালীন দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য 'মননেব ক্ষেত্রে স্বরাজেব' কথা বলেছিলেন (Swaraj in Ideas, Visva-Bharati Quarterly, Autumn 1954)। বুঝিয়েছিলেন, সাংস্কৃতিক পবাধীনতাই হল চেতনাব দাসত্ব 'যা ঝেড়ে ফেলে দিযে মুক্ত হতে পাবলে মনে হয চোখেব উপব থেকে একটা আববণ যেন সবে গেল। তখন এক নবজন্মেব অভিজ্ঞতা জাগে। তাকেই বলি মননেব স্ববাজ।' ঠিক এই কাজটিই বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদে কবা চলছিল। জাঁকজমক কবে নয়, নীববে, বহু পবিশ্রমী মনস্বীব তিতিক্ষায। বাজনৈতিক সংঘর্ষেব বাস্তব থেকে দূবে তাঁবা প্রতিদিনেব নিবিষ্ট সাধনায 'সর্বসাধারণেব স্মৃতিসম্পদ' উদ্ধাব কবে সাজিযে দিচ্ছিলেন। বর্তমান আধুনিক মনেব প্রকাশেব ভাষা নির্মাণ করে তুলছিলেন। এই সাধনায যাঁবা নিজেদের পবিপূর্ণ উৎসর্গ কবেছিলেন তাঁদেব মর্মেব কথা উচ্চাবণ কবেছিলেন হবপ্রসাদ শাস্ত্রী, "আমাব বিশ্বাস, বাঙালি ইংবাজি শিখিযা যত কাজ কবিযাছে, সে সকলই ভালো-মন্দ-জড়িত। কিন্তু বঙ্গীয-সাহিত্য-পবিষৎ সম্বন্ধে দুই রকম ব্যাখ্যা নাই এবং হইতেও পাবে না। ইহা যদিও ইংবাজিওযালাবাই স্থাপন কবিযাছেন, তথাপি ইহাতে দুই বকম ব্যাখ্যা নাই। ইহা খাঁটি বাংলাব খাঁটি মঙ্গলেব জন্য জন্মিযাছে এবং খাঁটি বাংলাব খাঁটি মঙ্গল কবিতেছে। সকল বাঙালিবই ইহাতে যোগ দেওযা উচিত এবং দিতেছেনও অনেকে—ইংবাজিওযালাবাও দিতেছেন, সংস্কৃতওযালাবাও দিতেছেন, আববি-পাবসিওযালাবাও দিতেছেন। এখানে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নাই, আচবণীয অনাচাবণীয ভেদ নাই, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ভেদ নাই। ইহাব উদ্দেশ্য বাংলাব সীমাব মধ্যে মানুষ যাহা কিছু কবিযাছে, সেইগুলি বাহিব কবা এবং তাহাব একটা উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দেওযা—ইহাতে মঙ্গল বৈ অমঙ্গল হইবে না—এরূপ খাঁটি মঙ্গলময ব্যাপাবে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য কবিতে পাবিলেও সেটা আমি ধর্ম বলিযা মনে কবি। আপনাবা যদি ধর্ম অর্ধম না মানেন, আমি সেটা পুণ্য বলিযা মনে কবি, আপনাবা যদি পাপপুণ্য না মানেন, আমি সেটা ভাগ্য বলিযা মনে করি—আপনাবা মানুন আব নাই মানুন, আমি ইহাকে ধর্ম, পুণ্য ও ভাগ্য, এই তিন বলিযাই মানি এবং আমাব পবম সৌভাগ্য যে, আমি এরূপ পুণ্যময অনুষ্ঠানেব সহিত এত দীর্ঘকাল জড়িত ছিলাম।' ("সভাপতিব অভিভাষণ" ১৩৩৭, হবপ্রসাদ শাস্ত্রী বচনা-সংগ্রহ-২, পৃ ৪৫৬)।

বঙ্গীয-সাহিত্য-পবিষদেব মর্মস্থল আব কীভাবে প্রকাশ কবা যাবে। এই উচ্চাবণ নীববে মর্মেব মধ্যে তুলে নিতে হয।

জাতীয় যুগ নেশনতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথের 'বিকল্প-সমাজ' ধারণা

বাসব সবকাব

১৩০৮ সালে নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাব শ্রাবণ সংখ্যায় (১৯০১ সালেব জুলাই-আগস্ট মাস) সম্পাদক ববীন্দ্রনাথ 'হিন্দুত্ব' শিবোনামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ কবেন সেখানেই সমকালীন চিন্তাভাবনা অনুসাবে নেশন' প্রসঙ্গ উত্থাপন কবেছিলেন। প্রবন্ধেব পাদটীকায বলা হয সেই মাসেব সাহিত্য সমালোচনা বিভাগে বিখ্যাত ফবাসি তত্ত্ববিদ বেনাঁব নেশন সংক্রান্ত বক্তব্যেব যে অনুবাদ দেওযা হযেছে, তাব সঙ্গে মিলিযে 'হিন্দুত্ব' প্রবন্ধটি পাঠ কবা হলে প্রবন্ধকাবেব বক্তব্য পাঠকদেব কাছে আবো স্পষ্ট হবে। এখানে দুটি প্রশ্ন গোডাতেই তোলা যেতে পাবে। প্রথমত ১৯০১ সালেব সেই মাঝামাঝি সমযে নেশন সংক্রান্ত আলোচনা উত্থাপনেব কি এমন বিশেষ তাগিদ ববীন্দ্রনাথকে এই আলোচনায উদ্বুদ্ধ কবেছিল? আব দ্বিতীয প্রশ্ন হলো নেশনেব মতো বাজনৈতিক একটা বিযযেব আলোচনায প্রবন্ধেব শিবোনাম তিনি 'হিন্দুত্ব' দিযেছিলেন কেন? এই সূত্রে তৃতীয একটা প্রশ্ন মূলত নিবর্থক হলেও তোলা যেতে পাবে যে ববীন্দ্রনাথ কি জীবনেব কোনো পর্বেও 'বাজনৈতিক হিন্দুত্ববাদ', একালেব ভাবতে সংঘ পবিবাব যাকে 'কালচাবাল ন্যাশনালইজম' বলে, তাব প্রবক্তা হযে পডেছিলেন?

প্রথম প্রশ্নেব উত্তবে বলা যায বিশ শতকেব সূচনাপর্বেব কিছু আগে থেকেই বঙ্গ দেশ ও মহাবাষ্ট্রেব অনেক ঘটনাব অভিঘাত শিক্ষিত মানুষদেব একাংশেব মনে বাজনৈতিক সচেতনতাব দ্রুত প্রসাবেব কাবণ হযে পডেছিল। তাঁবা মোটেই পেশাদাব বাজনীতিক বা সাংবাদিক ছিলেন না, যাঁদেব পেশাগত কাবণেই বাজনৈতিক বিষযে মতামত প্রকাশেব তাগিদ থাকবে। বাংলায এমনই দুজন বিশিষ্ট মানুষেব নাম এই সূত্রেই বলা যেতে পাবে, যেমন ববীন্দ্রনাথ ও বামেন্দ্রসুন্দব। ববীন্দ্রনাথেব গ্রন্থভুক্ত প্রথম বাজনৈতিক প্রবন্ধ 'ইংবাজ ও ভাবতবাসী'ব (দ্র 'বাজা প্রজা', ববীন্দ্র বচনাবলী সুলভ সংস্কবণ ৫ম খণ্ড) বচনাকাল আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০০, 'সাধনা', ইংবাজি তাবিখে সেপ্টেম্বব-অক্টোবব, ১৮৯৩ যেখানে সমকালেব দেশ ও মানুষেব প্রসঙ্গ উঠেছে। বিস্তাবিত আলোচনায না গিযেও বলা যায দেশে তখন জাতীয যুগেব সূচনা হযেছে, যে প্রেক্ষিতে ববীন্দ্রনাথ নেশন প্রসঙ্গ আলোচনা কবেছিলেন। দ্বিতীয প্রশ্ন নেশনেব মতো একটা বাজনৈতিক বিযযেব আলোচনাব শিবোনাম তিনি হিন্দুত্ব দিযেছিলেন এই জন্যেই যে, আবহমান কালেব ভাবত অসংখ্য ভাঙা গডা, বিপর্যয অভ্যুত্থানেব মধ্য দিযে নিজেব যে পবিচযটুকু বাঁচিযে বাখতে পেবেছে সেটা তাব সমাজধর্মেব জোবে। ভাবতেব আত্মপবিচযেব অনন্যতা তাব সমাজজীবনেব গভীবে

নিহিত। ইংরাজ শাসনাধীন সমকালের ভারতীয় সমাজকে রবীন্দ্রনাথ এই ধারণার অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তৃতীয় প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের দেওয়া প্রথম শিরোনাম কি হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত, যার উত্তর রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সৃজনকর্মের প্রতিটি পর্বের মধ্যে রয়েছে। তিনি যে দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুত্ব শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, তার পিছনে মানুষের প্রচলিত ধর্মমতের, অর্থাৎ রিলিজিয়নের কোনো ভূমিকা নেই। তিনি হিন্দুত্ব বলতে বোঝাতে চেয়েছিলেন ভারতের সমাজধর্ম, যা এই বহু বর্ণ, বহু ভাষা, বহু ধর্মের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমাজকে ধারণ করতে পেরেছে।

মহাবিদ্রোহের সমকালের উত্তর ভারতের লোকসাহিত্যের আলোচনায় উদ্ধৃত একটা ঘটনা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। অবরুদ্ধ দিল্লির পতন যখন আসন্ন তখন ইংরাজ সেনাপতি শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফরকে ফার্সিতে একটা শের লিখে বলেছিলেন 'দমদমে মে দম্ নেহি অব্ খের মাগো জান্ কি। অয় জাফর বস্ হো চুকি সমশের হিন্দুস্তান কি।' কবি সম্রাট তার জবাবে বলেন 'বাগিয়ো বুঁ রহেগি যব্ অলখ্ ইমান কি। তখ্ত্ লন্ডন্ তক্ চলেগি তেগ হিন্দুস্তান কি।' বাহাদুর শাহ্ জাফরের হিন্দুস্তান বলা বাহুল্য হিন্দু ভারত নয়। শেষ মোগল সম্রাট ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার অনেক আগেই দেশের অধিকাংশ অঞ্চল তাঁর শাসন ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছিল। তবু প্রতীকী অর্থে তিনি ছিলেন সারা হিন্দুস্তানের সম্রাট। সেই রকম রবীন্দ্রনাথ, হিন্দুত্ব নামটি ব্যবহার করেছিলেন ভারতবর্ষীয় সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে। বিশ শতকের সূচনাপর্বে প্রথম দু'তিন বছর, অনেক রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞের মতে হিন্দুধর্মের একটা প্রভাব তাঁর কাজে লক্ষ করা যায়। সেই বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, নেশনতত্ত্ব আলোচনায় তিনি বেদবিহিত হিন্দু-ধর্মের প্রভাবে অভিভূত হন নি। তবু কয়েক বছর পর স্বদেশি আন্দোলনের সূচনাপর্বে যখন এই প্রবন্ধগুলি 'আত্মশক্তি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন প্রবন্ধের শিরোনাম বদলে রাখেন 'ভারতবর্ষীয় সমাজ', যেটা তার আসল পরিচয়। সম্ভবত হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী যে-সব প্রবণতা তখন মাথা চাড়া দিচ্ছিল, পাছে হিন্দুত্ব নামটি তারা নিজেদের সীমিত স্বার্থে ব্যবহার করে, সেই প্রচেষ্টা বন্ধ করতেই নামবদল।

এক

'ভারতবর্ষীয় সমাজ' আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন য়ুরোপ যেখানে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য তার সামাজিক ঐক্যের আধার বলে মনে করে, ভারত সেখানে সামাজিক ঐক্যকে তার সমস্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে স্থাপন করেছে। রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যকে তিনি উপেক্ষা করেন নি, কিন্তু যে পটভূমিতে এই আলোচনা সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য স্থাপনের জমিটাই তৈরি হয়নি। কন্‌গ্রেসের সমস্ত উদ্যোগ যদি ব্যর্থও হয় তবু তার মধ্যে ভারতীয়দের মিলনের যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে, সেটা ব্যর্থ হবে না। মিলনের আকাঙ্ক্ষা অন্য কোনো ভাবে নিজেকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। কিন্তু ততোদিন ভারতীয় সমাজ তার জীবনের অতি প্রয়োজনীয় দিকটি পূরণ

কবাব সব প্রচেষ্টা বন্ধ কবে নিশ্চল হযে থাকতে পাবে না। কাবণ এদেশের মানুষ যদি নির্জীব না হযে থাকে, যদি জীবন্মৃত না হয, তাহলে নিজেব মৌল প্রযোজন মেটাবাব উদ্যোগ তাবা গ্রহণ কবতে বাধ্য। যেহেতু 'জীবনেব পবিবর্তন বিকাশ, মৃত্যুব পবিবর্তনেব বিকাব', তাই মানুয নিজেব তাগিদেই সচেতনভাবে এমন কাজ কববে, যাতে তাব বিকাশমুখিনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। বলা বাহুল্য সেই উদ্যোগ কোনো পবানুকবণেব মধ্য দিযে সার্থক হতে পাবে না। কাবণ অনুকবণে মন নিঃশ্চেষ্ট থাকে, সেটা একটা অন্ধ অনুবৃত্তি চিত্তেব জডতাব মধ্যে তাব জন্ম, আব সেই জডত্বেব মধ্যে তাব পবিসমাপ্তি।

এই সূত্রেই বেঁনাব কথাব মর্মবস্তু উদ্ধৃত কবে ববীন্দ্রনাথ বলেন 'নেশন একটি সজীব সত্তা একটি মানস পদার্থ', তাব একটি অতীত আছে বটে যা 'সর্বসাধাবণেব স্মৃতিসম্পদ', কিন্তু তাব প্রত্যক্ষগম্য লক্ষণটি বর্তমানে পাওযা যায, যা হলো 'সাধাবণ সম্মতি, সকলে মিলিযা একত্রে জীবন বহন কবিবাব সুস্পষ্টপবিব্যক্ত ইচ্ছা'। বেঁনা বলেছেন যবোপে 'বাষ্ট্রতন্ত্র হইতে বাজাব অধিকাব ও ধর্মেব আধিপত্য নির্বাসিত' হযেছে। একালেব পবিভাযায সেটাই সেকুলাব তত্ত্ব। এগুলি বাদ যাওযাব পব যা থেকে যায তা হলো 'মানুয, মানুযেব ইচ্ছা, মানুযেব প্রযোজন সকল'।

ববীন্দ্রনাথ দেখিযেছেন যুবোপে নেশন গঠন প্রক্রিযাব মূলে যাবা, সেই মানুয আসলে সবর্ণ, ভাযা ও কাপড় এক হযে যাওযার পব তাদেব মধ্যে জেতা ও বিজিতের মধ্যে কোনো জোড়েব চিহ্ন নেই। তাদেব এক হওযাব ইচ্ছার মধ্যে নানা সমযে যে সব বাধা এসেছিল সেগুলি বিস্মৃত হযে মিলনেব স্মৃতিকেই তাবা আশ্রয় করেছে। 'নেশন গড়িতে যেমন স্মৃতিব দবকাব, তেমনি বিস্মৃতিব দবকাব'। কিন্তু ভাবত যাদেব এক কবে নিযেছে তাবা অসবর্ণ। এখানে 'হিন্দু সভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিযাছে তাহাব মধ্যে স্থান পায নাই এমন জাত নাই। . সকলে আপন ভাযা, বর্ণ, ধর্ম ও আচাবেব নানা প্রভেদ সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দু সমাজের মধ্যে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য বক্ষা কবিযা একত্রে বাস কবিতেছে।' তাই ববীন্দ্রনাথ বেঁনাব মত মেনে বলেছেন কোথায নেশন কীভাবে গঠিত হবে, তাব মূল লক্ষণ কী, তা সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা কঠিন।

অন্য দেশেব কথা যাই হোক, ভাবতে সুবিশাল হিন্দু সমাজেব মধ্যে যে ঐক্যেব শক্তি নিজেকে সমস্ত প্রতিকূলতাব মধ্যে বাঁচিযে বাখতে পেবেছে তাব শিকড় বযেছে সমাজ জীবনেব গভীবে। 'আমাদেব দেশে সমাজ সকলেব বড়ো। অন্যদেশে নেশন নানা বিপ্লবেব মধ্যে আত্মবক্ষা কবিযা জযী হইযাছে—আমাদেব দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকল প্রকাব সংকটেব মধ্য বক্ষা কবিযাছে।' এদেশে মানুযেব সর্বোচ্চ আশ্রয সমাজ। এই সমাজেব মধ্য দিযেই উত্তবপুরুয পূর্বপুরুযেব জ্ঞান কর্মেব উত্তবাধিকাব কেবল লাভ কবে তাই নয, অনাগত কালেব জন্য নিজেদেব অবদান তাব সঙ্গে যুক্ত কবে জীবনেব বহতা ধাবাকে অর্থবহ ও সমকালেব সঙ্গে সম্পৃক্ত কবে। যুবোপেব দৃষ্টান্ত দিযে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন নেশন যে সজীব সত্তা তাব প্রমাণ সেখানে অতীত ও বর্তমানেব মধ্যে নিবন্তব চিত্তেব সম্বন্ধ একটা অখণ্ড কর্মপ্রবাহ ব্যপে চলে আসে। আমাদেব অবস্থা ঠিক তাব

বিপবীত। আমবা আমাদেব পিতামহ প্রপিতামহেব সাধনা, তাঁদেব সচেষ্ট চিত্তবৃত্তিব সাফল্যেব উপব নিশ্চলভাবে শযন কবে, তাঁদেব মানসী শক্তিব অনুশীলন না কবে, তাঁদেব অবিকল অনুকবণকেই আমাদেব কাজেব উপজীব্য কবে তুলেছি। তাই আমাদেব পূর্বপুরুষ আব আমাদেব মধ্যে সজীব নেই। ববীন্দ্রনাথ তীব্র বিদ্রুপেব সুবে বলেছেন 'শণেব দাড়ি-পবা যাত্রাব নাবদ যেমন দেবর্ষি নাবদ, আমবাও তেমনি আর্য। আমবা একটা বড়োবকমেব যাত্রাব দল—গ্রাম্য ভাষায এবং কৃত্রিম সাজ-সবঞ্জামে পূর্বপুরুষ সাজিয়া অভিনয কবিতেছি।'

'ভাবতবর্ষীয সমাজ' প্রবন্ধেব উপসংহাবে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন পূর্বপুরুষেব মঙ্গল ভাবটি নিযত-জাগ্রত উপাদান হিসেবে অনুভব, সমাজেব সর্বত্র সেটি প্রযোগ কবাই যদি আমাদেব নিত্যকর্ম হয, কেবল তখনই অতীতেব সঙ্গে বর্তমানেব নিবন্তর চিত্ত সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পাবে। তাই 'সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধনসম্পদ দান, ইহা আমাদেব নিজেদেব কর্ম, ইহাতেই আমাদেব মঙ্গল—ইহাকে বাণিজ্য হিসাবে দেখা নহে, ইহাব বিনিময়ে পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আব কিছুই আশা না করা, ইহাই যজ্ঞ, ইহাই ব্রহ্মেব সহিত কর্মযোগ, এই কথা নিযত স্মবণ কবা, ইহাই হিন্দুত্ব।'

দুই

ববীন্দ্রনাথ সমাজেব চবিত্রে, মেজাজে বাজনৈতিক প্রক্রিয়া, প্রচেষ্টাব কোনো ভূমিকা নেই, 'ভাবতবর্ষীয সমাজ' প্রবন্ধে সে কথা একবাবও বলেন নি। সামাজিক ঐক্যসাধনে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা যতটা সাহায্য কবতে পাববে সেটাই তাব প্রধান গৌবব। তাই নেশনেব ধাবণা তিনি বাতিল কবেন নি, অগ্রাহ্য কবেন নি, ভাবতেব প্রেক্ষিতে তাব ভূমিকা চিহ্নিত কবতে চেযেছিলেন। যুবোপে নেশন গঠন প্রক্রিয়া সুরু হযেছে ষোড়শ শতকেব মাঝামাঝি থেকে। তাবও প্রায একশো বছর পবে ১৬৪৮ সালেব ওযেস্টফেলিযা শান্তিচুক্তি যখন যুবোপেব রাষ্ট্রগুলিকে ভূখণ্ডভিত্তিক কবে তোলে তাবপব থেকে এই প্রক্রিয়া আব কখনও থেমে থাকে নি। বাষ্ট্র ও নেশনেব অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আধুনিক যুবোপীয জীবনেব বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকে জন স্টুয়ার্ট মিল তাকে আবো সুনির্দিষ্ট কবে 'এক জাতি এক বাষ্ট্র' ধাবণা প্রচাব কবেন। যে কোনো ত্যাগ স্বীকাব কবে বাষ্ট্রকে বাঁচিযে বাখা যুবোপেব মানুষ তাদেব ন্যাশনালত্বেব অস্তিত্ব বক্ষাব লড়াই বলেই মনে কবে। ভাবতেব সুদীর্ঘকালেব ইতিহাসে তাব কোনো নজীব নেই। তাহলে ভাবতে নেশন গঠন কবা হবে কোন পথে, কোন পদ্ধতিতে।

১৩১১ সালেব শ্রাবণ মাসে, ৭ এবং ১৬ তাবিখে, ইংবাজি ২২ ও ৩০ জুলাই, ১৯০৪ মিনার্ভা ও কার্জন রঙ্গমঞ্চে ববীন্দ্রনাথ তাঁব সুবিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পাঠ কবে নিজেব সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ কবেন। এই প্রবন্ধ যেমন উপস্থিত বিপুল সংখ্যক শ্রোতাদেব উদ্দীপ্ত করেছিল, তেমনই বেশ কিছু বিশিষ্ট মানুষ রবীন্দ্রনাথেব বক্তব্যেব তীব্র সমালোচনা কবেছিলেন। 'আত্মশক্তি' গ্রন্থভুক্ত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ মিনার্ভা বঙ্গমঞ্চে পঠিত প্রবন্ধেব

পরিবর্ধিত অংশ। কার্জন রঙ্গমঞ্চে এটাই পাঠ করা হয়, যা ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' ছাপা হয়েছিল। এই প্রবন্ধের পরিশিষ্ট অংশ হিসেবে একটা সংযোজনী আছে, যা রবীন্দ্রনাথ কিছু সমালোচনার জবাবে লিখেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে তিনি যা বলেছিলেন দীর্ঘদিন পরেও তিনি সেই বক্তব্য নানা সূত্রে উল্লেখ করেছেন, বোঝা যায় সমালোচনায় তিনি মত বদল করেন নি। সেই সময়ে বড়লাট কার্জনের বঙ্গভঙ্গ করার প্রস্তাবে জনচিত্ত উদ্বেলিত উত্তেজিত হয়ে থাকায় 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ সেই সমূহ আলোড়নে একটা নতুন মাত্রা যোগ করে।

রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন সেই সময় দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা নামে যা কিছু চলে এসেছে সেটা অল্প সংখ্যক ইংরাজি শিক্ষিত মানুষের কর্মকাণ্ড। জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক কাজ তখনও কার্যত 'তিন দিনের তামাসা'। বাংলার প্রাদেশিক সম্মেলনগুলিতে প্রতি বছর যারা যেতেন তাঁরা আরাম, আয়েস, খানাপিনায় যতোটা ব্যস্ত থাকতেন বাংলার সমস্যা নিয়ে ততোটা নয়। তাও কংগ্রেসের ও সম্মেলনের কাজকর্ম চলত চোস্ত ইংরাজি ভাষায়। সাধারণ মানুষের এই ধরনের কাজের সঙ্গে প্রাণের, মনের, আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো যোগ ছিল না। এই রাজনীতি যা সাধারণ মানুষকে কখনও কাছে টানার চেষ্টা করে নি বরং নিজেকে সর্বপ্রযত্নে বিযুক্ত করে রাখতে চেয়েছে সেখানে দেশ ও মানুষের কোনো অস্তিত্ব নেই। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ (আত্মশক্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী সুলভ সংস্করণ ২য় খণ্ড) একটা বিকল্প পথের কথা বলেছেন যা সমাজ এবং তার আসল উপাদান সাধারণ মানুষকে একটা ভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে স্থাপন করতে চেয়েছে। সেটাকে রবীন্দ্রনাথের 'বিকল্প রাজনীতি' বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীয় হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।' আবার 'আমরা ইংরেজি-শিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া—আপামার সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, একথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না।' শিক্ষিতজন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই মানসিক দূরত্ব, একদিকে তাদের উপেক্ষা করা অন্যদিকে লোকসাধারণকে সম্পূর্ণ ভুলে থাকার সুযোগ শাসকদের দিয়েছে। 'রাজা প্রজা' গ্রন্থের 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে, এই প্রবন্ধের প্রায় দশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন লন্ডনের 'স্পেক্টেটর' পত্রিকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রসঙ্গে ব্যঙ্গোক্তি উল্লেখ করে আমাদের ইংরাজি জানা নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের শাসকদের কাছ থেকে সমাদর, সহানুভূতি লাভের প্রবল আগ্রহ হলো 'সিমপ্যাথি লালসা'। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন বিদেশির সমবেদনা পাওয়ার জন্য লালায়িত তখন দেশে নেশন গঠনের মতো সর্বজনিক উদ্যোগের জন্যে আপ্রাণ পরিশ্রমের কাজ কে করবে, সেটাই প্রশ্ন।

ইংরাজরা যেহেতু বহু আয়াসে সকলের সমবেত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই স্টেট ও নেশন

গঠন করেছে, তাই জনগণ সম্পর্কে তাদের ভয় ও শ্রদ্ধা দুইই আছে। রাজাপ্রজার এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ইংরাজ পীপল-নামক একটা পদার্থকে জুজুর মতো দেখে, আমরাও সেই জন্য কোনোমতে পাঁচজনকে জড়ো করিয়া পীপল সাজিয়া গলা গম্ভীর করিয়া ইংরাজকে ভয় দেখাই।' শাসকরা জানে এইসব ভয় দেখানেওয়ালাদের সঙ্গে মুষ্টিমেয় কিছু ভক্ত ও স্তাবক ছাড়া ভারতের কোটি কোটি মানুষের প্রাণের, মনের, আচারের, ব্যবহারের জীবনযাপন প্রক্রিয়ার কোনো যোগ নেই। সুতরাং শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের কাছে আবেদন নিবেদন কিংবা ভয় দেখানোর ভাবভঙ্গির বদলে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কর্মসূচিতে ব্রতী হওয়ার প্রয়োজন আছে। 'স্বদেশী সমাজ' গঠন হলো সেই বিকল্প পথ, যা ইংরাজদের সঙ্গে সম্পর্করক্ষা বা ছেদ করা নিরপেক্ষভাবে দেশের সকল মানুষের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করবে।

'আমাদের দিশি লোকের সঙ্গে দিশি ধারায়' মিলিবার সব উপলক্ষ্য কাজে লাগিয়ে এতোকাল আমরা 'মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপনই' সবচেয়ে বড়ো কাজ মনে করে এসেছি, তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই হবে অন্যতম পথ। সেখানে প্রতিটি মানুষের ভূমিকা স্বমহিমায় বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবে কারণ 'প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি—আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।' তিনি স্বীকার করেছেন যে ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধকে খুব বড়ো জায়গায় ব্যাপ্ত করা সম্ভব হবে না। যা ছোট পল্লীর মধ্যে তা সারা দেশ জুড়ে সম্ভব নয়। তাই দেশব্যাপী সেই উদ্যোগ সার্থক করতেই সংগঠন চাই, যাকে রবীন্দ্রনাথ 'কল' বলেছেন। এই 'কল' আমাদের ছিল না। সংগঠনের ধারণা, নিয়ম নীতি বিদেশের আমদানি। সুতরাং কলের পক্ষে যা কিছু স্বাভাবিক, তার সাজসরঞ্জাম—আইনকানুন, মেনে চলার দায়ও স্বীকার্য। কিন্তু 'শুধু কলে ভারতবর্ষ চলিবে না—যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব না করিব, সেখানে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না।'

এই পারস্পরিক আত্মীয়সম্বন্ধভিত্তিক সর্বজনীন কর্মযজ্ঞকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সমাজের শাসন—'সমাজতন্ত্র'। এই ব্যবস্থার সঙ্গে একালে বিশেষ মতাদর্শগত যেসব ভাব সম্পৃক্ত, তাঁর আলোচনায় সে-কথা নেই। তখন য়ুরোপের শ্রমজীবীদের সংগঠনেই কেবল সেই সমাজতন্ত্রের কথা শোনা যেত। এদেশে সেই ধারণা ছড়ায় নি, যদিও রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, যা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নানা লেখায় জানা যায়। তিনি সমাজতন্ত্র বলতে কেবল সমাজের শাসন বোঝাতে চান নি, তার মঙ্গলময় স্বরূপটি সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের চূড়ান্ত আধার হিসেবে 'সমাজ-রাজতন্ত্র' বলেছেন। তার সঙ্গে যোগ করেছেন 'সমাজপতির' ধারণা। সেই আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে করা যেতে পারে। এই সমাজপতির মধ্যেই সমাজের একতা সপ্রমাণিত হবে। তিনি ভালো অথবা মন্দ যাই হোন না কেন, সমাজ, সমাজের সদাজাগ্রত স্বরূপটি সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে আপনার স্থায়ী মঙ্গলের কর্মসূচি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে।

তিন

যুবোপে নেশনে সাধাবণ মানুষ যেভাবে সবকাবেব সমস্ত কাজেব উপব সতর্ক দৃষ্টি বাখে, ভাবতেব এই বিকল্প ব্যবস্থায় সাধাবণ মানুষ সামাজিক কর্মকাণ্ডেব শবিক হিসেবে সেই সতর্ক প্রহ্বা বজায় বাখবে। সমাজেব শাসন বলতে ববীন্দ্রনাথ সেটাই জোবেব সঙ্গে বোঝাতে চেয়েছিলেন। সদাজাগ্রত, সচেতন, আত্মকর্তৃত্বকেই ববীন্দ্রনাথ আত্মশক্তি বলেছেন, যে শক্তি নিজেকে জানে, চেনে, সামাজিক কর্মকাণ্ডেব সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত থেকেই নিজেকে সম্পূর্ণ কবে, সার্থক কবে এটাই ভাবতেব একান্ত নিজস্ব ব্যবস্থাবুদ্ধি, যা বিচিত্রকে এক কবে, পবকে আপন কবে, স্টীমবোলার চালিযে বিলাতেব মতো বৈচিত্র্যকে সমভূম, সমতল কবে দেয না। ববীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন 'আত্মসার্থকতা'। এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ, অম্লান বাখাই ভাবতীয সমাজেব স্বধর্ম।

চিবকাল ভাবত এই স্বধর্মেব বলেই সমস্ত সংঘাতেব মধ্য দিযেই আপন কর্তব্য কবে এসেছে। মুসলমান আগমনেব জন্য যে সংঘাত সৃষ্টি হয, তাব আগে পর্যন্ত এই সংঘাতেব পব সমাজ 'যাহা কিছু ঘবের এবং যাহা কিছু অভ্যাগত, সমস্তকে একত্র কবিযা লইযা পুনর্বাব ভাবতবর্ষ আপনাব সমাজ সুবিহিত কবিযা গড়িযা' তোলে। তাতে সমাজ আগেব চেযে আবো বিচিত্র হযে উঠেছিল। মুসলমান আক্রমণজনিত সংঘাত সেই প্রক্রিযাকে স্তব্ধ, বিলুপ্ত কবে দিতে পাবেনি। একটা সামঞ্জস্য-প্রক্রিযা সর্বত্রই আবাব সুরু হযেছিল, হিন্দু ও মুসলমান উভয সমাজেব মধ্যে একটা যে সংযোগস্থল সৃষ্টি হযেছিল, দুই সমাজেব সীমাবেখা যে মিলে আসছিল, নানকপন্থী, কবীরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীব বৈষ্ণবসমাজ তাব দৃষ্টান্তস্থল। আজও তো মুসলমান সমাজ আমাদেব এক পাড়াতেই আছে। আগেকাব দিনে প্রাচীন শাস্ত্রকাববা এইসব পবসমাজেব সঙ্গে সম্পর্ক পবস্পবেব অধিকাব নির্ণযেব সূত্রে নির্ধাবণ কবে দিতেন। মুসলমান আগমনকালে সমাজ অভ্যন্তবীণ কাবণে নির্জীব হযে পড়ায সেই প্রক্রিযা কিছুটা ব্যাহত হযেছিল মাত্র, কিন্তু একেবাবে থেমে যায নি। একালে যেসব দ্বন্দ্ব বাধে তাব কাবণ খুঁজে, উভযেব গ্রহণযোগ্য মীমাংসাব দায সমাজকেই গ্রহণ কবতে হবে। হিন্দু ও মুসলমানেব পক্ষে এক ঠাঁই হযে থাকা কোনো অস্বাভাবিক বিষয নয, অসম্ভব তো নযই। স্বদেশি যুগে এ কথাব মধ্য দিযে ববীন্দ্রনাথ কেবল সমাজভাবনা নয, বাজনৈতিক ভাবনাও প্রকাশ কবেছিলেন যা আন্দোলনচলাকালে নানাভাবে প্রকাশ পেযেছে।

এহেন সমাজে ব্যক্তি মানুষ যেহেতু সমাজেবই সক্রিয অংশ হযে থাকবে, তাই একান্ত ব্যক্তিগত বিষযও সমাজেব বৃহত্তব মানবিক প্রেক্ষিতেব পবিপূবক হযে উঠবে। মানুষেব আত্মসচেতনতা আব সমাজ সচেতনতাব মেলবন্ধন ঘটানোব কথা ভেবেছিলেন ববীন্দ্রনাথ। মানুষেব উপব গভীব বিশ্বাস থেকেই ববীন্দ্রনাথ এই ধাবণায উপনীত হতে পেবেছিলেন। বলা বাহুল্য হৃদযেব সহজ সম্পর্ক মানুষকে উজ্জীবিত কবে। দুনিযাব সব দেশ, সব সমাজ সম্পর্কেই একথা বলা যায। হৃদযেব সম্পর্ক স্থাপন একটা বিশেষ ধবনেব সামাজিকীকবণ প্রক্রিযা, 'স্বদেশী সমাজেব' বিকল্প ব্যবস্থাব মধ্যে সেটাই ফুটে উঠেছে। স্বদেশি আন্দোলনেব বিশেষ প্রেক্ষিতে সেটা একই সঙ্গে সামাজিক ও বাজনৈতিক, দ্বিমাত্রিক হযে উঠতে পাবে।

প্রশ্ন উঠতে পাবে এই ধবনের একটা বিকল্প ব্যবস্থার ধাবণা কি নিছক একটা ইউটোপিযা? ববীন্দ্রনাথ কি কোনো ইউটোপিযাব কথাই কেবল বলেছেন? ববীন্দ্রনাথ সমাজ মানসিকতা বদলাতে চেযেছিলেন, সেটা যতোটা না সমাজেব বিপুল সংখ্যক সাধাবণ মানুযেব মন থেকে, তা'ব থেকে অনেক বেশি যাবা দেশ সমাজ নিযে ভাবে বলে দাবি কবে, যাবা নিজেদেব জনগণেব স্বাভাবিক প্রতিনিধি, এমনকি ন্যাচাবাল লীডাব বলে শাসকদেব স্বীকৃতি পেতে চায, তাদেব মন থেকে। যেহেতু তিনি লিখেছিলেন বাংলায, পড়েছিলেন কলকাতা শহবেব শিক্ষিত শ্রোতাদেব সামনে, তাই তাঁব বক্তব্যেব অভিমুখ ছিল তাদেবই দিকে। এব মধ্যে বাজনৈতিক নেতা ও কর্মী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক আব সাহিত্যিকবা ছিলেন। এইসব মানুযদেব অভ্যস্ত কাজেব পথ থেকে সবিযে, কথাব বাজ্য থেকে কাজেব বাজ্যে আহ্বান জানাতেই তাঁব এই উদ্যোগ। তাই 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে যে দিকটা ভাবেব, আইডিযাব তাব মধ্যে ইউটোপিযাব কিছুটা ছোঁযা থাকতে পাবে। কিন্তু সমাজকে কেন্দ্র কবে কাজেব যে বৃত্ত তিনি বচনা কবতে চেযেছিলেন যেমন স্বাস্থ্যদান, শিক্ষাদান জলদান, সেখানে পবমুখাপেক্ষিতা অর্থাৎ সবকাব নির্ভবতা বাতিল কবে নিজেদেব কর্মোদ্যোগ, তাব মধ্যে আব যাই থাক ইউটোপিযাব নামগন্ধ নেই।

চাব

ববীন্দ্রনাথ বেঁনাব কথা থেকে বক্তব্য সুরু কবার সময বলেছিলেন ইংবাজি 'বেস' শব্দেব বাংলাব প্রতিশব্দ 'জাতি', কিন্তু বাংলায 'নেশন' শব্দেব কোনো প্রতিশব্দ নেই বলে তিনি সেটাই ব্যবহাব কবাব পক্ষপাতী। এটা ১৯০১ সালেব কথা। কিন্তু ১৮৯৩ সালেব শেষভাগে লেখা 'ইংবাজ ও ভারতবাসী' 'প্রবন্ধে তিনি যেখানে জাতি শব্দ ব্যবহাব কবেছেন, সেখানে মনে হয তিনি 'নেশন' কথাটাও বোঝাতে চেযেছেন, শুধু 'বেস' নয। এই প্রবন্ধটিব একটা অনালোচিত না হলেও স্বল্প আলোচিত দিক এই সূত্রে উল্লেখ কবা যেতে পাবে যাতে বোঝা যাবে তিনি কোনো ইউটোপিযাব কথা বলতে চান নি।

ইংবাজদেব নকলনবিশি কবতে অতি ব্যগ্র এদেশেব শিক্ষিত মানুযদেব বড়ো একটা অংশ ভাবতেই চান না যে ভাবত তাদেব 'হিসাবেব খাতায শ্রেণীবদ্ধ অঙ্কপাতে দ্বাবায নির্দিষ্ট। ভাবতবর্ষেব কেবল মন দবে, সেব দবে, টাকাব দবে, সিকাব দরে গৌবব। ইংরাজেব কাছে আদব পাইবাব ইচ্ছাটা আমাদেব কিছু অস্বাভাবিক পবিমাণে বাডিযা উঠিযাছে। পবিপূর্ণ ডিনাবেব মাঝে বসিযা কিছুতেই ভাবিযা পান না তাঁহাদেব বাতাযনেব বহিঃস্থিত পথপ্রান্তবর্তী ঐ বিদেশী বাঙালিটিব এমন বুভুক্ষু কাঙালেব মতো ভাবখানা কেন।' ববীন্দ্রনাথ তাবপবেই বলেছেন 'আমাদেব এই চিব-উপবাসী ক্ষুধিত স্বভাবেব মধ্যেও যেটুকু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট ছিল তাহা ক্রমে বিদ্রোহী হইযা উঠিতেছে।' এই মানসিক বিদ্রোহ সম্ভবত অনিবার্য, হযতো বা বিধাতাব অভিপ্রেত। কাবণ যাচিযা মান ও কাঁদিযা সোহাগেব জন্য লালাযিত হওযাব মানসিকতা হযতো শেষ হওযাব সময এসেছে।

আঘাতে, অপমানে এই মাটি ধবে পড়ে থাকাব দৈন্যতাব মধ্য দিযেই মানুযেব গভীব শিক্ষা ও স্থাযী উন্নতিব সন্ধান সুরু হয। তাছাড়া মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে এটাও বুঝতে সুরু কববে যে আমবা যতো বেশি ইংবাজ সাজাব চেষ্টা কবব, ততোই দেশেব মানুযদেব সঙ্গে আমাদেব দূবত্ব, অনৈক্য বাড়বে। কিন্তু কীভাবে এই মানসিক বিদ্রোহকে বাস্তবাযিত কবা যাবে, সেই পথটা অনুসবণ কবা সহজসাধ্য নয। তাঁব বক্তব্য হলো ''যতোদিন না সুযোগ্য হইব ততোদিন অজ্ঞাতবাস অবলম্বন কবিযা থাকিব। নির্মাণ হইবাব অবস্থায গোপনেব আবশ্যক। পাণ্ডবেবা পূর্ব গৌবব গ্রহণ কবিতে প্রবৃত্ত হইবাব পূর্বে অজ্ঞাতবাসে থাকিযা বল সঞ্চয কবিযাছেন। সংসাবে উদ্‌যোগ পর্বেব পূর্বে অজ্ঞাতবাসেব 'পর্ব।'

উনিশ শতকেব শেষ দশকে বাঙালি সমাজে ইংবাজিযানা এবং ইংবাজিপনাব যে বাড়বাড়ন্ত তিনি লক্ষ কবেছিলেন, সেখানে এই কথাগুলি তাঁব কাছে প্রত্যাশিত। কিন্তু তাব পবে লাইনে তিনি যা বলেছিলেন তা আশ্চর্যজনকভাবে কালসীমা, যুগসীমা অতিক্রম কবে, এই একুশ শতকেব বাংলা ও ভাবতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ববীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'আমাদেব এখন আত্মনির্মাণ-জাতিনির্মাণেব অবস্থা'। তিনি এখানে জাতি শব্দ ব্যবহাব কবেছেন নেশন অর্থে। তাব চেযে অনেক বড়ো কথা হলো জাতি-নির্মাণ, যাব উত্তব উপনিবেশ পর্বকালীন নাম 'নেশন বিল্ডিং', তিনি তাব অর্ধশতাব্দী আগে যদি সে-কথা বলে থাকেন, তাহলে এ কোন ববীন্দ্রনাথেব কথা? এই একুশ শতকেও যখন বাষ্ট্রনেতাবা স্বীকাব কবেন ভাবতেব মতো তৃতীয দুনিযাব দেশে জাতি-নির্মাণ প্রক্রিযা এখনও অসমাপ্ত কেবল নয, অপবিণতও বটে।

ক্ষমতা হস্তান্তবেব পব উনিশ শ' পঞ্চাশেব দশকেই আমাদেব বাষ্ট্রনেতাবা প্রথম বলেন এদেশে জাতি-নির্মাণ হয নি। তাব আগে পর্যন্ত প্রচলিত ধাবণা ছিল স্বাধীনতা যখন এসেছে, যখন জাতীয মুক্তি আন্দোলন জযযুক্ত হযেছে বলে সকলেই আত্মতৃপ্ত, তখনই দেশেব শাসন প্রক্রিযাকে ক্রমাগত নানা সংকটেব মোকাবিলা কবতে হযেছে দেখেই নেতাদেব একাংশ, মূলত প্রধানমন্ত্রী জহবলাল স্বীকাব কবেন ভাবতে জাতি-নির্মাণ হযনি। কাবণ জাতীয মুক্তি ঘটলেই জাতি-নির্মাণ হয না। আব এখন ঘবে বাইবে তত্ত্ববিদ থেকে বাজনীতিক, আমলা থেকে সচেতন সাধাবণ মানুষ সবাই বলেন, জাতি-নির্মাণ প্রক্রিয শেষ হতে আবো বাকি আছে। আব নিন্দুকবা বলেন যা সুরু হয নি তা শেষ হওযাব প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে ববীন্দ্রনাথ আজ থেকে একশ' বছবেব বেশি আগে জাতি-নির্মাণ বলতে কী বুঝিযেছিলেন, সেটা একটু ভেবে দেখা দবকাব।

ববীন্দ্রনাথ গড়পড়তা মানুযেব কাছে তেমন কিছু প্রত্যাশা কবেন নি যা মানবচবিত্রে সুবিধাব ঢালেব দিকে যাওযাব যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে তাব বিপবীত কিছু কব হয। এখানে দুটি কথা গোড়াতেই বলা দবকাব প্রথমত ববীন্দ্রনাথ আত্মনির্মাণ-জাতিনির্মাণকে একই বিকাশ প্রক্রিযাব পবম্পবা বলে উল্লেখ কবেছেন। একটি শেষ হলে অন্যটিব সূচন হতে পাবে বলে মনে কবেন নি। দ্বিতীযত ১৮৯৩ সালেব ভাবতে কোনো বাজনীতিব

বা বিদগ্ধ জনেব মনে এই ধবনেব শুধু নয, কোনো ধবনেব কোনো নির্মাণপর্বেব নীল নক্সা ছিল, এমন কথা এযাবৎ শোনা যাযনি। মহাদেও গোবিন্দ বানাডে প্রমুখ ব্যক্তিবা শিল্পাযনেব কর্মসূচিব কথা বলেছেন কিন্তু জাতি নির্মাণেব কোনো পবিকল্পনাব কথা বলেন নি। তবু ববীন্দ্রনাথ আত্মনির্মাণ-জাতিনির্মাণেব একটা কর্মসূচি ছকে দেওযাব চেষ্টা কবেছেন এই ভূমিকা কবে যে 'যদি অবণ্যে বোদনও হয তবু বলিতে হইবে'।

তাঁব কর্মসূচি হলো 'ইংবাজি ফলাইযা কোনো ফল নাই, স্বভাযায শিক্ষাব মূলভিত্তি স্থাপন কবিযাই দেশেব স্থাযী উন্নতি, ইংবাজেব কাছে আদব কুডাইযা কোন ফল নাই, আপনাদেব মনুয্যত্বকে সচেতন কবিযা তোলাতেই যথার্থ গৌবব, অন্যেব নিকট হইতে ফাঁকি দিযা আদায কবিযা কিছু পাওযা যায না, প্রাণপণ নিষ্ঠাব সহিত ত্যাগ স্বীকাবেই প্রকৃত কার্যসিদ্ধি।' একুশ শতকেব এই ভোগবাদী বিশ্বাযন ও ক্যাবিযাব সর্বস্বতাব যুগে কথাগুলি কি অনাধুনিক, অপ্রসাঙ্গিক?

পাঁচ

ববীন্দ্রনাথেব 'বাজা প্রজা' গ্রন্থকে তাব মূল বক্তব্যেব দিক থেকে বিচাব কবা হলে তাঁব কযেক বছব পবে স্বদেশি আন্দোলনপর্বে প্রকাশিত 'আত্মশক্তি' গ্রন্থেব প্রস্তাবনা বলা যায। এই যে আত্মনির্মাণ-জাতিনির্মাণ প্রসঙ্গ তাব প্রস্তাবিত কর্মসূচিব দিক থেকে বিশ্লেষণ কবা হলে স্বভাবতই এই সিদ্ধান্ত কবা যেতে পাবে যে বিদেশি শাসনেব পবিমণ্ডলে শাসকদেব সঙ্গে নির্ভবতাব সব সম্পর্ক এড়িযে এমনভাবে আত্মনির্মাণ কবা সম্ভব যা এদেশেব লোকসাধাবণকে শাসকদেব সমকক্ষ কবে তুলবে। সব কিছু জাহিব কবে শাসকদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে 'তপ্ত তপ্ত নাম চাওযাব' যে অভ্যাস আমাদেব নেতৃবৃন্দ চালু কবেছিলেন, যাকে ববীন্দ্রনাথ 'যাচিযা মান কাঁদিযা সোহাগ' আদাযেব হীনমন্যতা বলে ধিক্কাব দিযেছেন, লোকমান্য হযে ওঠাব এই অপকৌশলেব পবিবর্তে ইংবাজেব সমকক্ষ হযে ওঠাব নীবব সাধনাই হতে পাবে দেশেব একমাত্র লক্ষ্য। সেটাই আত্মশক্তিব বিকাশ।

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে তাই যখন তিনি সমাজেব শাসন, সমাজতন্ত্র, সমাজ-বাজতন্ত্রেব কথা বলেন তখনও অনুমান কবা যেতে পাবে তিনি ইংবাজ শাসনেব বাইবে একটা সমান্তবাল সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনেব কথা বোঝাতে চেযেছেন। ইংবাজবা ইংবাজদেব মতো থাকুক, কাবণ দেশ থেকে ইংবাজ শাসনেব অবসান ঘটানোব মতো শক্তি তখনও দেশেব মধ্যে কোথাও গড়ে ওঠে নি। কিন্তু সমাজেব কাজ যদি মানুষ সমবেত শক্তি নিযে নিজেবা কবে, যেখানে ইংবাজদেব অনুমোদন, সবকাবেব কাছে সাহায্যেব প্রত্যাশা কিছুই থাকবে না, তাহলেই এদেশে মানুয স্বাধিকাবেব নিজস্ব এলাকা গড়ে তুলতে পাববে সবকাবি নীতি ও ব্যবস্থাব চৌহদ্দিব বাইবে। সেটাই হবে একটা 'প্যাবালাল সিস্টেম' সমান্তবাল সামাজিক শাসনেব এলাকা। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ গান্ধীযুগে অসহযোগেব কর্মসূচিব মধ্যে এই ধবনেব একটা সমান্তবাল শাসনব্যবস্থাব ধাবণা লক্ষ কবেছিলেন।

রেঁনাব নেশনতত্ত্ব আলোচনাকালেই ববীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যুবোপেব মানুষ অনেক মূল্য দিযে যে নেশন গড়েছে, তার মূল কথা হলো তাদেব জীবনেব নেশন-কেন্দ্রিকতা। অদূব কিংবা দূব ভবিষ্যতে এদেশে কোনোদিন নেশন গড়ে উঠলে আমাদেব জীবনেব ভবকেন্দ্র কতোটা বদলে যাবে, ববীন্দ্রনাথ তা নিযে কোনো জল্পনা কল্পনা কবতে চাননি। জাতীয যুগেব সূচনাপর্বে দেশে লোক সাধাবণেব মধ্যে যে আলোড়ন দেখা দিযেছে বঙ্গভঙ্গেব প্রস্তাবেব বিরুদ্ধে, তাতে বাংলা বিভাজন হোক অথবা বিভাজন প্রস্তাব প্রত্যাহাব কবা হোক, কোনো অবস্থাতেই এই গণ আলোড়নকে ব্যর্থ হতে দেওযা অনুচিত হবে। তাই যে কাজ আমাদেব একান্ত নিজস্ব, যা হাতেব কাছেই বযেছে গণউদ্যোগেব প্রতীক্ষায তাতে সার্বিক আত্মনিযোগ জরুবি। তাতেই একযোগে চলবে আত্মনির্মাণ ও জাতিনির্মাণেব কাজ।

এই জাতিনির্মাণেব কর্মসূচিব মধ্যেই রয়েছে ববীন্দ্রনাথেব সমাজ-বাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাব ধাবণা। ভাবত যেহেতু চিবকাল সমাজকেই সবাব বড়ো বলে মনে কবে এসেছে তাই সমাজেব পূর্ণাঙ্গ বিকাশেব মধ্যেই ঘটবে জনগণেব সার্বিক কর্তৃত্বেব প্রতিষ্ঠা সমাজেব বাজতন্ত্র। এই বাজতন্ত্র কোনো ব্যক্তিব শাসন নয। এটা হবে সকলেব শাসনলোকতন্ত্র। রুশো যাকে জনগণেব সার্বভৌমত্ব বলেছিলেন, যাকে কেন্দ্র কবে ফবাসি প্রজাতন্ত্র গড়ে ওঠে, স্বদেশি যুগে ববীন্দ্রনাথেব প্রস্তাবিত সমাজ-বাজতন্ত্র হলো সেই বিপাবলিকান ব্যবস্থা। ববীন্দ্রনাথ যে বিকল্প সমাজেব কথা বলেছিলেন সেখানে প্রজাই হবে রাজা, অন্য কেউ নয। রবীন্দ্রনাথ বিপাবলিকেব কথা জানতেন না এমন মনে কবাব কোনো কারণ নেই। সমকালীন দুনিযা এবং যুবোপীয ইতিহাসেব নানা ঘটনা নিযে তাঁব প্রাসঙ্গিক নানা মন্তব্য বুঝিযে দেয ফবাসি প্রজাতন্ত্র, ইতালি ও জার্মানিব বাষ্ট্রিক ঐক্য গঠনেব ইতিহাস তাঁব বিলক্ষণ জানা ছিল। তিনি ইচ্ছা কবেই প্রজাতন্ত্র শব্দটি ব্যবহাব কবেন নি, যাতে তাঁব সমসামযিক বাজনৈতিক নেতাবা কনস্টিটিউশনাল বিতর্কে সমস্ত উদ্যোগকে তাদেব চেনাগলিতে টেনে নিযে যেতে না পাবেন।

ছয

জাতি-নির্মাণে বাঙালি, মাবাঠি প্রভৃতি দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলেব মানুষ তাদেব ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা বিচাব কবে প্রযোজনীয যা কিছু নিজেবাই ঠিক কববে, নিজেবাই রূপাযিত কববে। এইভাবে প্রতিটি ভাষাভাষী অঞ্চলে সমাজেব শাসন গড়ে উঠলে দেশব্যাপী 'স্বদেশী সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। এটাও একটা দেশব্যাপী ফেডাবাল ব্যবস্থা কাযেম কবাব সূচনা পর্বেব ইঙ্গিত তাঁব 'আত্মশক্তি' গ্রন্থে দেওযাব চেষ্টা কবেছিলেন ববীন্দ্রনাথ। বিশ শতকেব সেই গোড়াব দিকে দেশে ভবিষ্যতেব বাজনৈতিক কাঠামো ফেডাবাল ধবনেব হতে হবে, ববীন্দ্রনাথেব আগে কেউ ভেবেছেন বলে জানা নেই। সমসময়ে বচিত তাঁব কোনো কোনো প্রবন্ধ যা 'বাজা প্রজা' এবং 'সমূহ' গ্রন্থেব অন্তর্ভুক্ত হযেছে, সেখানে দেখা যায ভাবতব্যাপী এই ব্যবস্থাকে তিনি 'মহাজাতি' বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯৩৮ সালে কলকাতায সুভাষচন্দ্রেব প্রস্তাবিত সর্বভাবতীয মিলনক্ষেত্র হিসেবে

যে ভবনের ভিত্তিপ্রস্তরের রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করেছিলেন তার 'মহাজাতি সদন' নামকরণের সূচনাও এই স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে হয়েছিল। ভারতীয় নেশন বা ভারতীয় মহাজাতি নামকরণ তাই জাতীয় যুগের সূচনাকালীন চিন্তাভাবনারই পরিণত রূপ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন নেশনরা অমর নয়। তাদের যেমন জন্ম আছে তেমনই মৃত্যুও আছে। হেরোডোটাসের একটা বিখ্যাত উক্তি এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন 'নেশনের ইতিহাসের তিনটি স্তর আছে, সাফল্য, তারপর তার ফলশ্রুতিতে ঔদ্ধত্য ও অন্যায, এবং তারপর তার পরিণতিতে পতন'। কিন্তু সমাজ অবিনাশী। সমাজ হয়ে ওঠে। একই লক্ষ্যের দিকে একদল মানুষের মিলিত পদক্ষেপ থেকেই সমাজ উদ্ভূত হয়। সমাজের তাৎপর্য হলো একই লক্ষ্য অভিমুখী মানুষের মিলিত অভিযান। লক্ষ্য বদলে গেলে, যা অবশ্যই পরিবেশ ও পরিস্থিতিগত কারণে বদলায়, সমাজ নিজেকে কালোপযোগী করতে বদলে নেয়। এই প্রক্রিয়া সভ্যতার সূচনাপর্ব থেকে দুনিয়ার সব সমাজেই ঘটে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ এই সমাজধর্মের উপরেই আস্থা রাখার কথা বলেছেন।

আজকের এই একুশ শতকের ভারতে স্বদেশি আন্দোলনের শতবর্ষে প্রশ্ন উঠতেই পারে যখন মানুষ তাদের অভাব, অভিযোগ পূরণের জন্যে ক্রমাগত সরকারের কাছে দাবি করছে, তখন সমাজের ভূমিকা আর কোথায় থাকছে! তার উত্তরে বলা যায় এই যে দাবি মানুষ করছে তার পিছনে কাজ করেছে এনটাইটেলমেন্ট এবং এমপাওয়ারমেন্টের— স্বাধিকার আর ক্ষমতায়নের ধারণা। মানুষ সমাজে তার ভূমিকা ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে না উঠলে সরকার বা রাষ্ট্রের কাছে এই দাবি করতে পারত না। যেহেতু এই দাবি পূরণ করতে পারে রাষ্ট্র সরকারের মাধ্যমে তাই তার কাছে মানুষের দাবি। কোনো অসংগঠিত সমাজে মানুষের এই অধিকার চেতনাই জন্মাতে পারত না, তাদের দাবি করার প্রশ্নও উঠত না। রবীন্দ্রনাথ সেই সমাজ চেতনা গড়ে তোলার জন্যেই আত্মনির্মাণ জাতি নির্মাণের কথা বলেছিলেন, সেটা মোটেই কবিমানসের কল্পনা ছিল না।

সবশেষে আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে গণমাধ্যম, মুদ্রণ আর বৈদ্যুতিন, দুয়ে মিলে 'ঘর কৈনু বাহির আর বাহির কৈনু ঘর' করতে হয় না, ঘর আর বাহির একাকার হয়ে গেছে, তখন রবীন্দ্রনাথের 'নেশনতত্ত্ব' বা নেশন-বিকল্প সমাজ ধারণার কোনো প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা, সেই প্রশ্ন বারেবার উঠে পড়া অস্বাভাবিক কিংবা অসঙ্গত নয়। কিন্তু আমজনতার জীবনে বিশ্বায়নের প্রাসঙ্গিকতা কতোটুকু। আমদানি করা ভোগ্যপণ্যে বাজার ছেয়ে গেলেও, কেন্টাকি ফ্রায়েড চিকেনের বিপণন কেন্দ্র নানা শহরে ছেয়ে গেলেও, বেশিরভাগ মানুষের জীবনে বিশ্বায়ন অর্থহীন, অবাস্তব হয়ে থাকবে। তথ্যপ্রযুক্তির রমরমে বাজার যাদের নাগালের মধ্যে, তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের এইসব কথা অন্যগ্রহের, অন্যকালের কথা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু উড়িষ্যার সেইসব এলাকায় যেখানে দরিদ্র দম্পতি সন্তান বিক্রি করে, কিংবা রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ কিংবা মধ্যপ্রদেশের সেইসব এলাকা যেখানে এখনও সতী হয়, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া কিংবা বাঁকুড়া জেলার সেইসব অঞ্চল যেখানে পানীয় জলের জন্যে মেয়েদের রোজ কয়েক কিলোমিটার হাঁটতে হয়,

'হিন্দ স্বরাজ' আর 'স্বদেশী সমাজ'-এ স্বরাজের ধারণা

অভ্র ঘোষ

১

'হিন্দ স্বরাজ'-এর সূচনা অংশে সম্পাদকের বকলমে গান্ধি বলছেন, 'বঙ্গ-ভঙ্গ রদের দাবি স্বরাজের দাবির সামিল'। গান্ধি 'হিন্দ স্বরাজ'-এ এ-কথা লিখেছিলেন ১৯০৮-এ, ছাপা হয়েছিল ১৯০৯-এ। এই 'স্বরাজ' শব্দটি ১৯০৩-০৮-এর আন্দোলনে একটা বড় স্লোগান হয়ে উঠেছিল। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে মুখ্য চারটি স্লোগান ছিল—বয়কট, স্বদেশি, স্বরাজ আর জাতীয় শিক্ষা। এই চতুরঙ্গের সম্পর্ক ছিল প্রায় অর্গানিক—একটিকে ছেড়ে অপরটির তাৎপর্য বোঝা মুশকিল। কিন্তু একই সঙ্গে এই কথাটিও মনে রাখা জরুরি যে এই চার অঙ্গের প্রত্যেকটিকেই আন্দোলনরত নেতারা সমান চোখে দেখতেন না। সমান চোখে তো নয়ই বরং নেতৃত্বের এক বড় অংশ বয়কটকেও মানতে পারেননি, স্বরাজকেও নয়। এই আন্দোলনের সময়, ইতিহাস যাদের মডারেট বা নরমপন্থী এবং একসট্রিমিস্ট বা চরমপন্থী বলে চিহ্নিত করেছে, সেই মডারেটরা চরমপন্থীদের স্বরাজের ধারণা ও বয়কটের প্রোগ্রামকে সুনজরে দেখেননি। একথা সর্বজনবিদিত যে মডারেট নেতারা ইংরেজের সাম্রাজ্যশাসনের অধিকার পুরোদস্তুর ভাঙতে চাননি, বঙ্গবিভাগের কার্জনী পরিকল্পনাকে বাতিল করতে চেয়েছিলেন শুধু। অতএব চরমপন্থী নব্য নেতাদের তোলা স্লোগান 'স্বরাজ' তাঁদের মনঃপূত ছিল না। আর বয়কট তো ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে আদৌ সহায়ক আন্দোলন নয়, কেননা স্বদেশি উৎপাদনব্যবস্থার পরিকাঠামো তৈরিই হয়নি, এমন এক যুক্তি দেখানো হয়েছিল। উপরন্তু বয়কটের মতো শানিত অস্ত্রব্যবহার সমীচীন কিনা, সে প্রশ্নও ছিল। চরমপন্থী গোষ্ঠী এইসব কথাবার্তাকে ভীরুতা মনে করতেন, আপোসমূলক রাজনীতি বলে গাল দিতেন। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মতাদর্শগত দ্বন্দ্বটির চেহারা ছিল খানিকটা এইরকম।

'হিন্দ স্বরাজ'-এ গান্ধি যখন স্বরাজের প্রশ্নটি তোলেন এবং সম্পাদক-পাঠকের সংলাপের মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেন 'স্বরাজ কী', তার দার্শনিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য বঙ্গ -বিভাগ উপলক্ষে স্বরাজের এই সমূহ রাজনৈতিক দাবি ছাপিয়ে আকারে ও প্রকারে আরও অনেক বড় মাপের হয়ে ওঠে। গান্ধির স্বরাজ-এর ধারণা পশ্চিমি এনলাইটেনমেন্ট দর্শনের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে।

আপাতভাবে আমাদের মনে হতে পারে যে গান্ধির স্বরাজ-ব্যাখ্যা মডারেটদের রাজনৈতিক দর্শনের বিরুদ্ধ-পক্ষমাত্র। কারণ মডারেটগোষ্ঠীর নেতৃকুল ওই ইওরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের দর্শনেই মাখামাখি হয়ে আছেন, তাঁরা তো মনে করেন ব্রিটিশশাসন ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আলোকবর্তিকাস্বরূপ। অতএব গান্ধির স্বরাজভাবনা এর বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিক্রিয়াই শুধু, চরমপন্থীদের মতো। কিন্তু 'হিন্দ স্বরাজ'-এর সংলাপগুলি যত এগোতে থাকে, আমরা

বুঝতে পাবি, এ-কেবল মডাবেট-বিরুদ্ধতা নয। 'সম্পাদক'-এর কথা শুনতে শুনতে 'পাঠক'-এরও একসময়ে মনে হয়, 'আপনাব কথায বুঝিতেছি যে, আপনি তৃতীয় এক দল খাড়া কবিতে চাহেন। আপনি দেখিতেছি গবম দলেরও নহেন, নবম দলেবও নহেন।'[১]

ব্যাপাবটা সত্যিই তাই, গান্ধিব চিন্তা গবম দলেবও নয, নবম দলেবও নয। তবে এই কথাটা বুঝতে হলে গান্ধিব 'হিন্দ স্বরাজ' কোন্ পটভূমিতে লেখা হযেছিল আব এই লেখাব অব্যবহিত তাগিদটি কী ছিল, সেটাও একটু জেনে নেওযা দবকাব। একথা বিশদ কবাব আর দবকাব নেই যে, দক্ষিণ আফ্রিকায গান্ধি শ্বেতাঙ্গ প্রভুদেব বিরুদ্ধে নিপীড়িত ভাবতীযদেব লড়াইযে সামিল কবেছিলেন তাঁব সত্যাগ্রহ নামক অস্ত্রটি দিযে। অহিংসা ছিল তাব প্রাণ। এই অহিংস সত্যাগ্রহেব ধাবণা গান্ধিব চিন্তায এসেছিল দুদিক থেকে—এক, দক্ষিণ আফ্রিকায পৌঁছুবাব পবই তাঁকে মুখোমুখি হতে হযেছিল তীব্র জাতিবিদ্বেষেব ঘটনাবলিব সঙ্গে। বেলওযে কম্পার্টমেন্টে বা ঘোড়াব গাডিতে তাঁব ওপব নির্যাতনের বিষযটি বহুকথিত। এইসব ঘটনা মোকাবিলা কবতে গিযে গান্ধি পাশবিক বল ফিবিযে দেওযাব কথা ভাবেননি, আত্মিক বলেব সন্ধান কবছিলেন। এ-বিষযে তাঁব ধার্মিক স্বভাব ও প্রবল ধর্মবোধ (ঈশ্বব সত্য নন, সত্যই ঈশ্বর) তাঁকে সাহায্য কবেছিল। দুই, টলস্টয, বাস্কিন কিংবা থোবো প্রমুখ মনীষীদেব বচনাও তাঁকে উদ্‌বেজিত করেছিল, একথাও বহু আলোচিত। তাহলে সংক্ষেপে বলা যেতে পাবে, দক্ষিণ আফ্রিকার নিদারুণ অভিজ্ঞতা ও লডাইযেব কৌশল-নির্মাণ 'হিন্দ স্বরাজ' লেখাব কিছু বসদ জুগিযেছে। কিন্তু অব্যবহিত তাগিদটা কী? গান্ধিব সবচেযে প্রামাণ্য জীবনী-গ্রন্থে[২] আছে এই অব্যবহিত ঘটনা-সূত্রটিব কথা। ১৯০৮ সাল, দক্ষিণ আফ্রিকায জাতিবিদ্বেষেব বিরুদ্ধে ভাবতীয কুলিদেব লড়াইযের ভবিষ্যৎ তখনো নির্ধাবিত হযে যাযনি। লডাই তখনো চলছে। ইংবেজ সরকাবেব সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য গান্ধি গিযেছেন লন্ডনে। যে-মিশন নিযে তিনি গিযেছিলেন, তা ব্যর্থ হযেছে। এই সমযেই লন্ডনে তাঁব সঙ্গে দেখা হযে যায জনকযেক ভাবতীয অ্যানার্কিস্টদেব, সে-আমলে অ্যানার্কিজম বলতে সন্ত্রাসমূলক বাজনীতি বোঝাত। অ্যানার্কিস্টদেব কথাবার্তায ভাবতীয মডাবেটপন্থী বাজনীতিব বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পেযেছিল। গান্ধি ধৈর্য নিযে শুনেছিলেন সেসব কথাবার্তা। এবকম এক সমযেই অন্যদিকে ঘটে গিযেছিল বাজনৈতিক এক গুপ্তহত্যা। ভাবতীয বিপ্লবী মদনলাল ধিংবাব হাতে খুন হন স্যাব কার্জন উইলি। গান্ধি স্পষ্টতই টের পেলেন যে এক ভিন্ন ঘবানাব স্বাধীনতা সংগ্রাম গাঢ হযে উঠতে চাইছে ভাবতীয বাজনীতিব পবিবেশে। লন্ডনে বসেই তাঁব এক পুবনো বন্ধু ড প্রাণজীবন মেহতাব সঙ্গে গান্ধিব এক বিশদ আলাপচাবিতা চলেছিল এইসব বাজনীতি নিযে। আব এবপবেই দক্ষিণ আফ্রিকায ফিববাব পথে জাহাজে বসেই ক্ষিপ্রবেগে গান্ধি গুজবাটি ভাষায লিখেছিলেন তাঁব ঐতিহাসিক বই 'হিন্দ স্বরাজ'। 'হিন্দ স্বরাজ' কেন dialogic form-এ লেখা হল, তাব কাবণ দেখাতে গিযে সাহিত্যিক দেবেশ বায তাঁব একটি অপ্রকাশিত নিবন্ধে লিখেছেন[৩] যে, এ-বই আসলে ওই অ্যানার্কিস্টদেব আব প্রাণজীবন মেহতাব সঙ্গে কথপোকথনের ফল। গান্ধি নিজেও অবশ্য বলেছেন, 'হিন্দ স্বরাজ'-এব অধিকাংশটাই বন্ধু প্রাণজীবনেব সঙ্গে কথাবার্তাব লিখিত রূপ।

আমবা একটু আগে উত্থাপন কবেছিলাম এক প্রশ্ন যে, গান্ধি নবমপন্থী বা চবমপন্থী—কোনো পক্ষেবই নন, তাহলে গান্ধির অবস্থানটি কী? এই তাত্ত্বিক প্রশ্নটি বিশ্লেষণের জন্য আমাদেব একটি প্রাথমিক স্বীকার্য মেনে নিযে এগোতে হবে। স্বীকার্যটি হল এই যে গান্ধি 'যে পথ নির্দেশ কবেছেন সে পথ সাধাবণ, 'আধুনিক' মানুযেব পথ নয।'[৭] উদ্ধৃতি-চিহ্নেব মধ্যে এই কথাগুলি লিখেছিলেন ইতিহাসবিদ্ অশীন দাশগুপ্ত ভিন্ন এক প্রসঙ্গে। সাধাবণ বুদ্ধিব এই 'আধুনিক' মানুযদেব মধ্যেই পড়েন বঙ্গভঙ্গবিবোধী আন্দোলনেব চবমপন্থীবা। তাঁবা স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই স্ববাজ বলতে বুঝতেন দেশ থেকে ইংবেজ বিতাড়ন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেব বিনাশ। বাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন কবে স্বদেশি বাষ্ট্রব্যবস্থা তৈবি কবাব লক্ষ্যেই আমাদেব এগোতে হবে। সেটাই প্রাথমিক কর্তব্য। 'হিন্দ স্ববাজ'-এ এই কর্তব্যে অবিচল সাধাবণ কিন্তু আধুনিক মানুষজনেব দলভুক্ত 'পাঠক'-কে 'সম্পাদক' প্রশ্ন কবেন 'আচ্ছা ধবিযা নিন, ইংবেজ বাজকার্য ছাড়িযা দিল তাহা হইলে আপনাবা কী কবিবেন?' 'পাঠক' জবাব দেন, '...ইংরেজ চলিযা গেলে কী অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা প্রধানতঃ প্রস্থানেব প্রকৃতির উপর নির্ভব করে। আপনি যে-বকম ধবিযা লইতেছেন, সেইমত তাঁহাবা যদি প্রস্থানই করেন, আমাব মনে হয সেক্ষেত্রে আমবা তখনও তাঁহাদেব সংবিধানই বজায বাখিব ও সবকাব পবিচালনা করিতে থাকিব। আর যদি বলাব ফলে তাহাবা কেবলই চলিয়াই যায, আমাদেব হাতেব কাছে ত সেনাবাহিনী প্রভৃতি থাকিযাই যাইবে, সবকাব চালাইতে আমাদের কোন অসুবিধা হইবে না।' এই জবাবের পৃষ্ঠে সম্পাদক তখন সিদ্ধান্ত কবেন, 'কার্যতঃ ইহার মানে ত এই যে, আপনাব ইংরেজ শাসন চাই, ইংবেজ চাই না। বাঘেব স্বভাব চান, বাঘটি চান না। অর্থাৎ আপনি হিন্দুস্থানকে ইংবেজি তৈবি কবতে চান।..আমি যে স্ববাজ চাহি, এটি তাহা নয।'

হিন্দুস্থানেব ক্রমশ এই ইংবেজি হযে ওঠাব তাগিদেব বিরুদ্ধেই গান্ধি এবাব লড়াইযে ব্রতী হবেন। হিন্দ স্ববাজ-এ ব্যক্ত যুক্তিগুলি গান্ধি সেইভাবেই সাজান। সেটাই তাঁব স্ববাজ-চিন্তা। গান্ধি প্রথম তোপ দাগেন ব্রিটেনেব অত্যাধুনিক পার্লামেন্টাবি ব্যবস্থাব দিকে। পার্লামেন্টকে তুলনা কবেন বন্ধ্যা বমণীব সঙ্গে, দেহপসাবিণীব সঙ্গে। কাবণ পার্লামেন্টেব নিজস্ব এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে সে মানুযেব কল্যাণ কবতে পাববে, সে প্রধানমন্ত্রি ও মন্ত্রিপবিষদেব দলীয সিদ্ধান্তগুলি অনুমোদনেব যন্ত্রমাত্র। মন্ত্রিবা জনকল্যাণ চান না, বাষ্ট্রীয ক্ষমতা বজায় বাখতে চান আব ওই ক্ষমতাব কোন্দলে নানান দলেব হাতে ব্যবহৃত হয় পার্লামেন্ট। অতএব দেহপসাবিণীব অতিবিক্ত কোনো সম্মান সে পেতে পাবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯২১ সালে ইযং ইন্ডিয়া-তে গান্ধি জানিযেছিলেন যে, দেহপসারিণী বা বেশ্যাব মতো যে-কঠিন শব্দ তিনি ব্যবহার কবেছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সম্পর্কে, সেটি তিনি বদলে নিতে চান। বদলাতে চান একজন ইংবেজ মহিলাব অনুবোধে। তবে শব্দটি পালটানো মানে এই নয যে তিনি পার্লামেন্ট বিষযে তাঁব মত পালটাচ্ছেন, বস্তুত এই বইযে কেবলমাত্র ওই একটি শব্দ ছাড়া আব কিছুই তিনি বদলাতে চান না। একথা আমাদেব অবিদিত নেই যে পার্লামেন্ট, ক্যাবিনেট, আইনের অনুশাসন, বিচাব বিভাগেব স্বাতন্ত্র্য, ক্ষমতা বিভাজন

তত্ত্ব ইত্যাদি আবও বহুবিধ প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাব সহযোগেই আধুনিক বাষ্ট্রব্যবস্থাব জন্ম এবং ইংল্যান্ডে তাব সুবিন্যস্ত ৰূপ কযেকশ বছব ধবে তৈবি হযেছে। ভাবতবর্ষে ইংবেজ শাসন প্রতিষ্ঠাব পব ওই আধুনিকতা এ দেশেব মাটিতেও প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে অথচ গান্ধি তা আদপেই ববদাস্ত কবছেন না। আমাদেব আবও খেযাল বাখতে হবে যে, কেবল পার্লামেন্টাবি ব্যবস্থাব বিরুদ্ধেই গান্ধিব এই বীতবাগ নয, গান্ধিব বাজনৈতিক দর্শনে ক্রমশ আধুনিক বাষ্ট্র-ব্যবস্থাটিই প্রতিভাত হযে উঠবে 'অর্গানাইজ্ড ভাযোলেন্স' ৰূপে। সেটা অবশ্য গান্ধি তাঁব 'হিন্দ স্ববাজ'-এ ব্যক্ত কবেননি।

অব্যবহিত বাস্তব বাজনীতি ছাপিযে 'হিন্দ স্ববাজ'-এ গান্ধিব আক্রমণেব প্রধান প্রতিপাদ্য বিযয হযে উঠল আধুনিক পশ্চিমি সভ্যতাব চবিত্র। উনিশ শতকেব শেষ দুই দশক থেকে বিশ শতকেব প্রথম দিক পর্যন্ত ভাবতীয চিন্তকদেব এক বৃহদংশে অতীত হিন্দুত্বেব গবিমাব প্রতি যে ঝোঁক দেখা গিযেছিল, গান্ধিব এই সমালোচনা তাবই এক অংশ—এমন কথা বলা সমীচীন হবে না, কাবণ পুনরুত্থানবাদীব আধুনিকতাব ওই ক্রিটিক তৈবি কবেননি, গান্ধিব চিন্তায যে-ক্রিটিক আমবা দেখতে পাচ্ছি। সমালোচনাটা কীবকম তাব খানিক পবিচয গান্ধিব কথা উদ্ধৃত কবেই দেখানো যাক

'আধুনিক সভ্যতাব সব চেযে খাঁটি পবিচয এই যে, যাঁহাবা নিজেদেব সভ্য বলেন, তাঁহাবা নিজেদেব শবীবেব সুখ, আরাম সাধনাকেই সর্বাপেক্ষা বড পুরুষার্থ বলিযা মনে কবেন। একশ বছব আগে ইউবোপেব মানুষবা যেৰূপ বাড়ি ঘরে থাকিত এখন তাহা অপেক্ষা ভাল বাড়ি ঘবে থাকে। আগে লোকে গরুব গাডিতে যাতাযাত কবিত, আজ সেখানে ট্রেনে দিনে চাবশত বা তাহাবও বেশী মাইল পাডি দিতেছে। ইহাই সভ্যতাব চবম উৎকর্ষ বলিযা বিবেচনা কবা হয। এমন কথাও বলা হয যে, ক্রমে ক্রমে এৰূপ দিনও আসিবে যখন আকাশ পথে সওযাব হইযা স্বল্প কযেক ঘণ্টায যে কোনও দেশে পৌছান যাইবে। লোকেব হাত পা চালাইবাব দবকাব হইবে না। একটা বোতাম টিপিলেই কাপড় কাছে আসিযা উপস্থিত হইবে, আব একটা ঘণ্টা টিপিলেই নতুন খববেব কাগজ সামনে আসিযা হাজিব হইবে, আব একটা বোতাম টিপিলেই মোটব গাডি আসিযা দাঁডাইবে—সুস্বাদু নানা ধবনেব খাদ্য পবিবেশন কবা হইবে। এ সবই যন্ত্রে হইবে।

'এই সভ্যতা অধর্ম। কিন্তু ইহা ইউবোপেব মানুযেব মন এমনভাবে দখল কবিযাছে যে তাহাদেব অর্ধোন্মাদ দেখায। শবীবে সত্যিকাব বল নাই, হৃদযে সত্যিকাব সাহস নাই। নেশা কবিযা জোব বজায বাখে তাহাবা।

'এই সভ্যতা এমন যে, যদি নীববে ধৈর্যেব সঙ্গে আমবা ইহাকে দেখিতে থাকি তবে দেখিতে পাইব যে, এই সভ্যতাব আগুন যাহাবা জ্বালাইযা বাখিতেছে পবিণামে তাহাবাই পুডিযা মবিবে। মহম্মদ পযগম্ববেব শিক্ষা যদি মানিযা লওযা যায, তাহা হইলে এই সভ্যতাব বাজ্যকে শযতানী বাজ্য বলিতে হয। হিন্দু ধর্ম ইহাকেই ঘোব কলিকাল বলিযাছে। এই সভ্যতাব ঠিক চিত্র আমি আঁকিতে পাবিব না। এই সভ্যতাই ইংবেজ জাতিব যাহা মৌল গুণ, তাহাকে নষ্ট কবিতেছে। ইহাব নাগাল হইতে বাহিব হইতেই হইবে।

'সভ্যতারূপ ব্যাধি দুরারোগ্য নয়। তবে একথা কখনো ভুলিলে চলিবে না যে ইংরেজ জাতি বর্তমানে এই ব্যাধি-ক্লিষ্ট।'

ইওরোপের শিল্প-বিপ্লব ও এনলাইটেনমেন্টের দর্শনে সমৃদ্ধ আধুনিক সভ্যতা বিষয়ে গান্ধির এই উলটা পুরাণ এখানেই শেষ নয়। 'হিন্দ স্বরাজ'-এ গান্ধি প্রমাণ করেন যে, মনুষ্যসভ্যতার আধুনিক ব্যাধিগুলি তৈরি করে রেলপথ, ডাক্তার আর উকিল। এদের প্ররোচনাতেই মানুষের নৈতিকতার স্খলন আর পুরুষার্থের অসদ্ভাব। ভারতবর্ষে এই ইংরেজ শাসনের দৌলতেই আধুনিকতার প্রবেশ, আর গান্ধির মতে এই আধুনিকতাই আমাদের স্বরাজলাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। আধুনিকতায় দীক্ষিত 'পাঠক'কে তাই 'হিন্দ স্বরাজ'-এর সম্পাদক বলেন, 'আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, ইংরেজের গোড়ালির তলায় থাকিয়া নয়, বরং আধুনিক সভ্যতার কবলে পড়িয়া ভারত ডুবিযা যাইতেছে। দৈত্যের ভয়ঙ্কর চাপে সে আর্তনাদ করিতেছে।' দৈত্যের এই ভয়ঙ্কর চাপ থেকে মুক্ত হওয়াই আমাদের স্বরাজ।

স্বভাবতই বিকল্প সভ্যতার পথ দেখানোর দায়িত্ব বর্তে যায় গান্ধির ওপর। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তাহলে কোন্ পথে পরিচালিত হবে? এ-বিষয়ে গান্ধির সোজা-সাপ্টা জবাব ছিল যে, কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি ও কৃষি-সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিকাশসাধনই আমাদের প্রধান ধর্ম। কুটির শিল্পের বিকাশ, খাদি-চরকার ব্রত নিয়ে ভারতবর্ষের মানুষকে স্বয়ম্ভর হতে হবে। ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় আমাদের সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম। গান্ধি বলেন হারিয়ে যাওয়া সেই গ্রাম-স্বরাজকে পুনরুদ্ধার করাই আমাদের স্বরাজপ্রাপ্তির উপায়। অতএব অবাধ শিল্পায়ন ও নগরায়ন নয়, সেটা এদেশের ঐতিহ্য ও ধর্মবিরুদ্ধ প্রস্তাব। অতিশয় সরল ও স্পষ্ট ভাষাতেই গান্ধির ঘোষণা, 'যতদিন যন্ত্রে ছাড়া আলপিন না গড়িতে পারিতেছি, ততদিন আলপিন ছাড়াই কাজ চালাইব। কাঁচের জ্বলজ্বলে চমৎকারিত্বের আমাদের কোন দরকার নাই, আগেকার কালের মত আপন ক্ষেতে উৎপন্ন তূলায় পলিতা পাকাইব ও বাতি হিসাবে মাটির তৈয়ারী প্রদীপ ব্যবহার করিব। উহাতে চোখ ভাল থাকিবে, পয়সা বাঁচিবে, স্বদেশী সমর্থন করা হইবে এবং এইরূপে আমরা স্বরাজ লাভ করিব।' এই যুক্তি থেকেই গান্ধি স্বরাজের সঙ্গে স্বদেশি আন্দোলনের বয়কটকে সমর্থন করে 'হিন্দ স্বরাজ'-এ লেখেন, 'বাঙ্গলা যদি সব রকম যন্ত্রে তৈয়ারী দ্রব্যসম্ভার বয়কট ঘোষণা করিতে পারিত তাহা হইলে আরো ভাল হইত।'

'হিন্দ স্বরাজ' ছাপা হবার পর (১৯০৯) বেশ কয়েক মাস এর তেমন কোনো প্রভাব ভারতীয় বুদ্ধিজীবীসমাজে দেখা যায়নি। তবে এর ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হলে কিছু আলোড়ন দেখা গেল। ১৯১০-এ ইংরেজি সংস্করণ বেরোল, মুম্বাই সরকার বইটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। দক্ষিণ ভারতের স্যার শংকরণ নায়ার গান্ধির এই অনাধুনিক অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনাকে নস্যাৎ করে নিবন্ধ লিখলেন। পশ্চিম ভারতের মডারেট নেতারা, যাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রামরত গান্ধি সম্পর্কে খুবই উঁচু ধারণা পোষণ করতেন, তাঁরাও গান্ধির 'হিন্দ স্বরাজ'-এ ব্যক্ত চিন্তাভাবনাকে উনিশ শতকীয় প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু পুনরুত্থানবাদী দর্শনের প্রতিচ্ছায়া বলে সাব্যস্ত করলেন। বিশেষত গোখলে, যাঁকে আমরা জানি গান্ধির রাজনৈতিক

গুরু হিসেবে, তিনিও ১৯১২তে গান্ধিকে পবামর্শ দেন যে 'হিন্দ স্ববাজ'-এ প্রকাশিত মতামত তাঁব প্রত্যাহাব কবা উচিত। গান্ধিব জীবনীকার ডি জি. তেন্ডুলকাব লিখেছেন, Gopal Krishna Gokhle 'thought it so crude and hastily conceived that he prophesied that Gandhi himself would destroy the book after spending a year in India'[৫] গান্ধি কিন্তু গোখলেব পবামর্শ অগ্রাহ্যই কবেছিলেন। শুধু তাই নয়, ১৯২১-এ গান্ধি ইয়ং ইন্ডিয়া-তে লিখলেন, 'The booklet is a severe condemnation of 'modern civilisation' It was written in 1908 My conviction is deeper today than ever' কিন্তু ওই বচনায় পাশাপাশি গান্ধি একথাও জানালেন, 'But I would warn the reader against thingking that I am today aiming at the swaraj described therein I am individually woking for the self-rule pictured there in But today my corporate activity is undoubtedly devoted to the attainment of parliamentary swaraj in accordance with the wishes of the people of India' এই অকপট স্বীকাবোক্তিব পবেও ১৯৩৮ সালে 'হিন্দ স্বরাজ'-এব নতুন সংস্কবণ প্রকাশ উপলক্ষে গান্ধি আবাব জানালেন, ' after the stormy thirty years through which I have since passed, I have seen nothing to make me alter the views expounded in it'[৬]

একথা ঠিক যে, ১৯২১ সালে গান্ধি তাঁব 'হিন্দ স্ববাজ'-এব বক্তব্য প্রত্যাহাব না কবেও স্পষ্টতই স্বীকাব কবছেন যে ব্যক্তিগত বিশ্বাসেব সঙ্গে তাব বাহ্যিক বাজনীতিব সাযুজ্য নেই। স্বাধীনতা আন্দোলনেব নেতা হিসেবে তিনি পার্লামেন্টাবি স্ববাজকে সামনে বেখেই কাজকর্ম কবতে বাধ্য হচ্ছেন, পশ্চিমি মডেলকে পুবোপুরি অস্বীকার কবতে পাবছেন না। কিন্তু এই আপোস সত্ত্বেও আমবা কি লক্ষ কবি না যে গান্ধির পার্লামেন্টাবি স্ববাজ-এব ধাবণাব সঙ্গে পশ্চিম অনুপ্রাণিত নেহরু-সুভায-আম্বেদকাবদের রাষ্ট্র-ধাবণার ব্যাপক তফাৎ? বৃহদাযতন শিল্প-প্রযুক্তি-বিজ্ঞাননির্ভব অতিকায কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাসম্পন্ন নেশন-স্টেট গান্ধি অনুমোদন কবেননি। সুবিন্যস্ত হিংসাব প্রতিমূর্তি বাষ্ট্রকে শেষ পর্যন্ত স্বীকাব কবতে বাধ্য হযেছিলেন বটে, কিন্তু কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাব নেশন-স্টেটকে মেনে নিতে পাবেননি। পবিবর্তে স্বযংসম্পূর্ণ গ্রামকে কেন্দ্রে বেখে, ক্ষমতাব বিকেন্দ্রীকবণ কবে, স্বাধিকাব-সম্পন্ন গ্রাম-ব্লক-মহকুমা-জেলা-বাজ্য থেকে শুরু কবে জাতীয় সবকাবেব মধ্যে এক Oceanic circle তৈবি কবাই গান্ধিব লক্ষ্য ছিল। একে বলা যেতে পাবে কমিউনিটিভিত্তিক বাষ্ট্রব্যবস্থা।[৭] গণতান্ত্রিক সেই কমিউনিটিভিত্তিক বাষ্ট্রে হাজাব হাজাব গ্রামই হযে উঠবে শক্তিব প্রধান কেন্দ্র, সভ্যতাব প্রাণস্পন্দন। গান্ধিব বাজনীতিতে গ্রামীণ পুনর্গঠনেব ব্রতটিই তাই মুখ্য ছিল, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে কীভাবে গ্রাম হযে উঠতে পাবে স্বযংনির্ভব এক গতিশীল কেন্দ্র গান্ধিব নজব প্রধানত সেইদিকে। সৃষ্টিশীল গঠনাত্মক এই বাজনীতিতে ভবসা বেখেই গান্ধি তাই বলতেন 'স্ববাজ গঠন কবো'। বাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কবে স্ববাজ আনতে হবে—এমন কথা গান্ধিব মুখে তেমন শোনা যেত না।

'হিন্দ স্ববাজ'-এ যন্ত্রশিল্পেব সার্বিক বিরুদ্ধতা ছিল, বৃহদাযতন শিল্পের পবিবর্তে খাদি-

চবকা-কুটির শিল্পই আমাদেব মুক্তিব পথ, এমন এক চূডান্ত ঘোযণাও ছিল।' কিন্তু এক্ষেত্রেও 'হিন্দ স্ববাজ'-এর গান্ধিকে খানিকটা আপোস কবতে হযেছিল আধুনিকতাবাদীদেব সঙ্গে। অসহযোগেব যুগ থেকেই তাব শুরু। ইযং ইন্ডিযায প্রকাশিত মন্তব্যগুলি" একথা প্রমাণ কববে। যেমন, 'আমি সবচেযে জটিল যন্ত্রেব ব্যবহাবেবও পক্ষে থাকব, যদি তা দিযে ভাবতেব দাবিদ্র্য ও কর্মহীনতা দূব কবা যায' (৩ ১১ ১৯২১)। 'আদর্শ পবিস্থিতিতে আমি সব বকম যন্ত্রেব বিরুদ্ধে কিন্তু যন্ত্র থাকবেই' (২০ ১১ ১৯২৫) কিংবা 'যন্ত্রেব ব্যবহাব সঙ্গত, যখন এতে সবাব উপকাব হয' (১৫ ৪ ১৯২৬)। ১৯২৭ সালে ২৪ ফেব্রুযাবিব ইযং ইন্ডিযা-তে তিনি একথাও বলেছিলেন, 'আমি যদি যান্ত্রিক বস্ত্রশিল্প নিপাত কবতে চাইতাম, তাহলে তাদেব উপব বসানো আবগাবি শুল্কেব বিবোধিতা কবতাম না। আমি চাই মিলগুলি সমৃদ্ধ হোক, কিন্তু তাদের সমৃদ্ধি যেন দেশের স্বার্থেব পবিপন্থী না হয।'

১৯৩০ বা ৪০-এব যুগে গান্ধি কিছু কিছু ভাবি শিল্পেব প্রযোজনকেও গ্রাহ্য কবেছেন এবং সেসব সবকাবি মালিকানায থাকুক এমন মতও দিযেছেন। তথাপি এসব তথ্য প্রমাণ কববে না যে পবিণত গান্ধি তাঁব অর্থনৈতিক চিন্তাধাবা আমূল পবিবর্তন কবতে চেযেছেন। ববং ১৯২১ সালে ইযং ইন্ডিযাতে প্রকাশিত আব এক মন্তব্য থেকে আমবা বুঝতে পাবি তাঁব চিন্তাব গতি-প্রকৃতি। তিনি বলছেন, 'আমাদেব মিলগুলি আমাদেব প্রযোজনেব পক্ষে যথেষ্ট উৎপাদন করতে পাবে না।' মিল-কলকাবখানা-যন্ত্রচালিত শিল্প ভাবতবর্ষেব অগণিত গ্রামবাসীব কর্মসংস্থান কবতে পাববে না, ঘবে ঘবে চরকা সে-সংস্থানের বড উপায। বস্তুত বিকেন্দ্রিত উৎপাদন-ব্যবস্থাব গুরুত্বেব দিকে আমাদেব নজব ফেরানোব জন্যই তাঁব সমগ্র আন্দোলন। 'হিন্দ স্বরাজ'-এব দর্শন ওই দিক থেকেই বিচাবেব দাবি বাখে।

শুধু বাজনীতি আব অর্থনীতিব ক্ষেত্রে নয, 'হিন্দ স্ববাজ'-এব গান্ধি এক পবিপূর্ণ বিকল্প জীবন ও সমাজ-সভ্যতাব কথাই ভাবেন। সেই বিকল্প জীবনবোধ গডে উঠতে পাবে অহিংস সত্যাগ্রহেব পথে। এবং সে-সত্যাগ্রহেব পথ আদৌ নাস্তিক নয, জোরদাবভাবে আস্তিক। ঈশ্ববে বিশ্বাসী গান্ধি সত্যাগ্রহেব মাধ্যমে এক বিকল্প 'আত্মীয সমাজ' গডে তুলতে চান। কিন্তু সমস্যা হল, তিনি যে-সত্যাগ্রহেব পথ নির্দেশ কবেছেন সে-পথেব জন্য তো সকলে তৈবি নয, অল্প লোকই সেদিকে যেতে পাবে। নির্লোভ, নিষ্কাম, অনাসক্ত, অপবিগ্রহে আস্থাবান সহৃদয আস্তিক্যবুদ্ধি সাধাবণেব বাস্তা নয। তাছাডা বিশালাকাব ভাবতীয সমাজে সমস্যা যত জটিল হবে, এই প্রত্যক্ষ ধর্ম-জীবন তো ততই অসম্ভব হযে উঠবে। সববমতি আশ্রমে যে পবীক্ষা-নিবীক্ষা সম্ভব, বৃহত্তব ভাবতীয় জনসমাজে সে-পবীক্ষাব কি কোনো ফললাভ সম্ভব? তথাপি ঘটনা এই যে, গান্ধি-প্রবর্তিত সত্যাগ্রহেব এক্সপেবিমেন্ট আমাদেব জাতীয আন্দোলন ঘটেছে এবং এক ধবনেব আত্মিক বল যে তৈবি হযনি, এমন কথাও বলা যাবে না। তা যত সীমিত অর্থেই হোক না কেন।

এব পাশাপাশি আবও একটি ঘটনাব দিকে আমাদেব নজব দেওযা দবকাব। সাধারণ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ইংবেজি শিক্ষিত আধুনিক মানুষ গোডা থেকেই গান্ধিকে বর্জন কবে বসে আছেন, তাঁবা গান্ধিকে ব্যবহাব কবেছেন তাঁদেব বাজনৈতিক প্রযোজনে। একথা যে গান্ধি

বুঝতেন্ না, তাও নয। তাহলে কাব কাছে, কাদেব ভবসায, কাদেব জন্য গান্ধিব এই আত্মনির্ভবতাব আন্দোলন? গান্ধি-গবেষকমহলে এ-প্রশ্নেব নানাবকম উত্তব আছে। সেসব উত্তব থেকে যদি কোনও একটিকে বেছে নিতে হয, তাহলে কি বলতে পাবি যে গান্ধিব লক্ষ্য ছিল আসলে গ্রামীণ কৌমগুলিকে নতুন কবে নির্মাণ কবা, কৌমশক্তিব উপব স্থাযী ভবসা বাখা? কতোখানি সফল হযেছিলেন গান্ধি, সে ভিন্ন কথা, কিন্তু 'হিন্দ স্ববাজ'-এব মর্মার্থ যে এই গ্রাম-স্ববাজ, তাতে কোনো ভুল নেই।

২

'হিন্দ স্ববাজ' যেমন পশ্চিম ভাবতেব বাজনৈতিক নেতাদেব বিবক্তিব কাবণ হযেছিল, বছব পাঁচেক আগে লেখা ববীন্দ্রনাথেব এক বক্তৃতা 'স্বদেশী সমাজ' প্রায তেমনভাবেই বাঙালি নেতাদেব উত্তেজিত কবেছিল। ১৯০৪ সালেব ২২ জুলাই মিনার্ভা থিযেটাবে বর্যীযান নেতা বমেশচন্দ্র দত্তেব সভাপতিত্বে চৈতন্য লাইব্রেবিব এক বিশেষ অধিবেশনে ববীন্দ্রনাথ প্রথম এই প্রবন্ধটি পড়েন। প্রথম সভায স্থানাভাবে বহু লোক ঢুকতে পাবেননি, তাই জনতাব অনুবোধে ববীন্দ্রনাথকে দ্বিতীযবাব প্রবন্ধটি পড়তে হযেছিল। সে-সভা হযেছিল কার্জন থিযেটাবে এবং প্রথম সভাব প্রতিক্রিযা দেখে নিজেব মতটি আবও একটু পবিষ্কাব কবাব জন্য ববীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটিব ঈষৎ পবিবর্ধন কবেছিলেন। এই সভায সভাপতি ছিলেন হীবেন্দ্রনাথ দত্ত। দুটি সভাতেই সে-সমযকাব গুরুত্বপূর্ণ অনেক নেতাই উপস্থিত ছিলেন। এই দুই সভায ববীন্দ্রনাথেব বক্তব্য বিষযে যে-আলোচনা-প্রত্যালোচনা হয, তাব কিছু বিববণ ছাপা হযেছিল 'ভাবতী' পত্রিকাব প্রতিবেদনে।[১] এবপব 'স্বদেশী সমাজ'-এব পূর্ণাঙ্গ টেক্সট ('সংবিধান' অংশটুকু ছাড়া) আমবা পাচ্ছি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাব ১৩১১-এব ভাদ্র সংখ্যায। প্রবন্ধটি ছাপা হবাব পব বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায বিতর্কের ঝড ওঠে। পক্ষে-বিপক্ষে দুদিকেই মত ছিল। এই মতামতগুলিব মধ্য থেকে সে-যুগেব বাজনীতিটিও আমাদেব কাছে কিছুটা স্পষ্ট হযে ওঠে।

ববীন্দ্রনাথ এমন এক সমযে প্রবন্ধটি লিখছেন যাকে আমবা বলতে পাবি কার্জনেব বঙ্গবিভাগেব চূড়ান্ত প্রস্তুতিপর্ব। প্রশাসনিক সুবিধেব অজুহাতে ফ্রেজাবেব পবিকল্পনা তৈবি হযে গেছে, বিজলিব সার্কুলাব প্রকাশিত হযেছে এবং তাব বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গেব কিছু কিছু জেলায তীব্র প্রতিবাদ-সভাগুলিও অনুষ্ঠিত হযেছে। প্রতিবাদেব ক্ষিপ্রতা দেখে কার্জন স্বযং পূর্ববঙ্গেব কযেকটি জেলায সফব কবেন এবং পবিকল্পিত প্রস্তাবেব কিছু কিছু পবিবর্তনও কবেন। কিন্তু মোটেব ওপব পূর্ববঙ্গবাসীব মনোভাব তাঁকে নিবাশও কবে। ইতোমধ্যে আশুতোষ চৌধুবীব নেতৃত্বে বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিযেশন বঙ্গবিভাগেব আন্দোলনে তৎপব হয এবং ১৯০৪-এব ১৮ মার্চ সমগ্র বাংলাব প্রতিনিধিবা টাউন হলে এক বিবাট প্রতিবাদ-সভায মিলিত হন। এক অর্থে কার্জনেব বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরুই হযে গেছে বলতে হবে।

১৯০৪-এব জুলাইতে পডলেন ববীন্দ্রনাথ তাঁব 'স্বদেশী সমাজ'। প্রবন্ধেব বক্তব্য শুনে বমেশচন্দ্র দত্ত মন্তব্য কবলেন, 'কেবল বাজনীতি বা কেবল সামাজিক বিষয লইযা কোনো

জাতি উন্নত হয না। উন্নতি সমস্ত দিক হইতেই হইযা থাকে। কোনো গাছটি বৃদ্ধি পাইবাব পূর্বে যদি নিযম বাঁধিযা দেওযা হয, উহা এতদিন শুধু লম্বা হইতে থাকিবে কিংবা এতদিন শুধু চওড়া হইতে থাকিবে, তাহা যেরূপ অস্বাভাবিক—একসঙ্গে লম্বা ও চওড়া হইযা বৃদ্ধি পাওযাই নিযম—সেইরূপ জাতীয উন্নতি চতুর্দিক হইতে হইযা থাকে, শুধু সমাজনীতি বা বাজনীতি লইযা থাকা একদেশদর্শিতা। ’’[১৮]

এই অভিযোগেব কাবণ ববীন্দ্রনাথ তাঁব লেখায আমাদেব সভ্যতায বাষ্ট্রনীতিব চাইতে সমাজনীতিব গুরুত্ব যে অনেক বেশি এবং সেই হেতু বাজনৈতিক দববাবে আবেদন-নিবেদনেব চাইতে সমাজটিকে নানা দিক থেকে গড়েপিটে তোলাই যে আমাদেব মূল কাজ হযে ওঠা উচিত, সেকথা সবিস্তাবে বোঝাবাব চেষ্টা কবেছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, সমাজ-গঠনেব ব্রত বা বাংলাদেশেব গ্রামগুলিব দিকে নজব ফেবাবাব প্রযোজনেব কথা ববীন্দ্রনাথ ১৮৮০-এব যুগ থেকেই বলা শুরু কবেছিলেন। এই সূত্রেই আত্মশক্তিব দর্শন ও গঠনাত্মক স্বদেশিব ব্রত ববীন্দ্রসাহিত্যে বিশিষ্ট হযে উঠছিল। গ্রামসমাজেব সংস্কাব নিযে কথাবার্তা বলাব সমযে পাশ্চাত্য সভ্যতাব সঙ্গে ভাবতবর্ষেব ঐতিহ্যেব মূলগত প্রভেদটা কোথায তাও ববীন্দ্রনাথ বিশদ কবে দেশনেতাদেব বোঝাবাব চেষ্টা কবেছেন। কাবণ ববীন্দ্রনাথেব চোখে এই ছবিটি স্পষ্ট হযে উঠেছিল যে আধুনিক ইংবেজি শিক্ষায লালিত দেশেব সম্ভ্রান্ত নেতাবা পাশ্চাত্য বাজনীতিব বীতি-প্রকবণ ও মূল্যবোধ পুঁজি কবে স্বদেশসেবায নিযোজিত হযেছেন, তাতে দেশেব সাধাবণ মানুষেব সঙ্গে আলোকিত নেতাদেব দূবত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

পাশ্চাত্যেব বাষ্ট্রকেন্দ্রিক সভ্যতা এবং আমাদেব সমাজকেন্দ্রিক সভ্যতাব চেহাবাব মধ্যে মূল পার্থক্যটি কোথায, তা বুঝবাব জন্য ববীন্দ্রনাথেব লেখাই উদ্ধৃত কবা যাক। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধেব পবিশিষ্ট অংশে পাচ্ছি, 'যুবোপেব যেখানে বল আমাদেব সেখানে বল নহে। যুবোপ আত্মবক্ষাব জন্য যেখানে উদ্যম প্রযোগ কবে আমাদেব আত্মবক্ষাব জন্য সেখানে উদ্যম প্রযোগ বৃথা। যুবোপেব শক্তিব ভাণ্ডাব স্টেট অর্থাৎ সবকাব। সেই স্টেট দেশেব সমস্ত হিতকব কর্মেব ভাব গ্রহণ কবিযাছে—স্টেটই ভিক্ষা দান কবে, স্টেটই বিদ্যাদান কবে, ধর্মবক্ষাব ভাবও স্টেটেব উপব। অতএব এই স্টেটেব শাসনকে সর্বপ্রকাব সবল কর্মিষ্ঠ ও সচেতন কবিযা বাখা, ইহাকে আভ্যন্তবিক বিকলতা ও বাহিবেব আক্রমণ হইতে বাঁচানোই, যুবোপীয সভ্যতাব প্রাণবক্ষাব উপায। আমাদেব দেশে কল্যাণশক্তি সমাজেব সর্বত্র ব্যাপ্ত হইযা আছে। সেইজন্য এতকাল ধর্মকে সমাজকে বাঁচানোই ভাবতবর্ষেব একমাত্র আত্মবক্ষাব উপায বলিযা জানিযা আসিযাছে। বাজত্বেব দিকে তাকায নাই, সমাজেব দিকেই দৃষ্টি বাখিযাছে। এইজন্য সমাজেব স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভাবতবর্ষেব স্বাধীনতা। কাবণ, মঙ্গল কবিবাব স্বাধীনতা, ধর্মবক্ষার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।'[১১]

এই কাবণেই ববীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' লেখাব অব্যবহিত কাবণ-সূত্র বাংলাদেশেব কিছু গ্রামেব জলকষ্ট নিবাবণে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী সবকাবেব বিরুদ্ধে দেশীয নেতাদেব নালিশ বা দ্রোহকে সঠিক বাস্তা বলে মনে কবছেন না। আত্মোন্নযন-চেষ্টাব অভাব, সামাজিক সংস্কাবকর্মেব অভাব, দেশীয মানুষেব নিশ্চেষ্টতা ও ক্রমবর্ধমান সবকাব-মুখাপেক্ষিতা তাঁকে

ববং কষ্ট কবেছিল। তিনি বারেবাবেই বলে চলেছিলেন যে, স্বরাজেব আন্দোলন আসলে আত্মোদ্‌বোধনেব আন্দোলন, আত্মনির্ভরতা ও আত্মশক্তিচর্চাব আন্দোলন। দেশেব মর্মস্থল তাব সামাজিক প্রাণেব বিন্যাসে, সমাজেব কল্যাণকার্যে, গ্রামসমাজ গঠনে— সবকাব-দ্রোহিতাব বাজনৈতিক নাস্তিকতায নয।

একটু আগেই বলেছি যে, গঠনাত্মক স্বদেশিব ধাবণা যে ১৯০৪-এব 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধেই প্রথম প্রতিভাত হল, তা কিন্তু নয়। এই প্রবন্ধ বচনাব বহু আগে থেকেই ববীন্দ্রনাথেব সমাজ-বাজনীতি-ধর্ম বা শিক্ষা বিষযক বচনাগুলিব মধ্যে এই প্রতিজ্ঞাব কথা ব্যক্ত হযেছে। 'ভাবতী'-তে প্রকাশিত 'চেঁচিযে বলা' (১৮৮২), 'জিহ্বা আস্ফালন' (১৮৮২), 'ন্যাশনাল ফন্ড' (১৮৮৩) অথবা 'সাধনা' ও 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত 'ইংবাজ ও ভাবতবাসী' (১৮৯৩), 'প্রসঙ্গ কথা' (১৮৯৮), 'সমাজভেদ' (১৯০১), 'নেশন কী' (১৯০১) বা 'বঙ্গবিভাগ' (১৯০৪) ইত্যাদি আবও বেশকিছু লেখায এই বিষযটি নানা ভঙ্গিতে উত্থাপিত হযেছে। তবে সন্দেহেব কোনো অবকাশ নেই যে 'স্বদেশী সমাজ' এ-বিষযে সর্বাপেক্ষা সংহত, দৃঢ ও তত্ত্বগত বিস্তৃত ব্যাখ্যা। আবাব কেবল তত্ত্বকথাই নয, বঙ্গচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনেব ওই সূচনায প্রকৃত কাজে নেমে পড়াব জন্যও আহ্বান বযেছে কবিব এই ঐতিহাসিক বচনায। আবেকটি কথাও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে এই সূত্রে যে এই কালপর্বে 'স্বদেশী সমাজ'-এর মতো ববীন্দ্রনাথেব অন্য কোনো লেখা এতোটা বাদ-প্রতিবাদেব ঝড় তোলেনি।

কৃষ্ণকুমাব মিত্র তাঁব 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায (২৭ শ্রাবণ, ১৩১১) লিখেছিলেন, 'ববীন্দ্রবাবুব ন্যায একজন শিক্ষিত লোকও রাজশক্তি, সমাজশক্তি ও আমাদেব সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ কবিতে পাবেন, এবং আকাশকুসুম রচনা কবিযা তাহাবই পশ্চাতে ধাবিত হইবাব জন্য আহ্বান কবিতে পাবেন, ইহাই আশ্চর্যেব বিষয।' তীব্র আক্রমণ কবে সেকালেব আবও এক বিশিষ্ট মডাবেট নেতা পৃথ্বীশচন্দ্র রায 'প্রবাসী'-তে লিখলেন 'স্বদেশী সমাজ— ব্যাধি ও চিকিৎসা' (শ্রাবণ, ১৩১১)। প্রাচীন ভাবতীয গ্রামসমাজের বোমান্টিক চিত্র কবিকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত কবেছে, এই ছিল তাব মূল কথা। তাঁব মতে, 'ববিবাবু যে সমস্ত বাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক মতামত প্রকাশ কবিযাছেন তাহা আমাদেব দেশেব পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকব ও নানা দোষে দুষ্ট মনে কবি।' তাছাডা, বাজনৈতিক আন্দোলন ও পাশ্চাত্য ভাবধাবা থেকে দেশবাসীকে অন্যপথে চালিত করাও ববীন্দ্রনাথেব সঙ্গত কাজ হচ্ছে না। এই শেষোক্ত বাক্যটিব পুনকক্তি শোনা গেল প্রমথ চৌধুবীব লেখা নিবন্ধ 'কথা বনাম কাজ'-এ (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১২)। তিনি লিখেছেন, ববীন্দ্রনাথ কর্মেব ডাক দিযেছেন। ঠিকই কাজ ছাড়া গতি নেই, কিন্তু কথা নয কেন? সবকাব অপকর্ম কবলে তাব প্রতিবাদ হবে না কেন? স্বীকাব কবছি বাজে কথা হযেছে প্রচুব, কিন্তু সব কথাই কি নিষ্ফল ছিল? সবকাবেব চোখ বাঙানি আব গোপন অভিসন্ধিগুলিকে পাত্তা না দিযে কেবল নিজেদেব সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলিব উন্নতিব চিন্তা কি অবাস্তব চিন্তা হবে না? 'নব্যভাবত' (বৈশাখ, ১৩১২) পত্রিকায যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায লিখলেন, 'ববীন্দ্রনাথ তাঁহাব এই সামাজিক প্রবন্ধ যুক্তিব মৌক্তিক হাবে গ্রথিত কবিতে পাবেন নাই। ইহাব কাব্যাংশ এত অধিক যে ইহাকে একটি

সামাজিক কবিতা বলিলেও চলে।' এর সঙ্গে এই সমালোচনায ছিল ব্যক্তিগত আক্রমণ। বালক বয়স থেকেই এই প্রবন্ধের লেখক সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না। তাছাড়া অত্যুগ্র হিন্দুত্বেব আদর্শ দিযে সামাজিক ঐক্য স্থাপনের চিন্তা অবাস্তব ও ক্ষতিকাবক।

ঠিক এব বিপবীতে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায কোনো কোনো লেখক সন্দেহ প্রকাশ কবলেন যে, ববীন্দ্রনাথ 'ভাষাব ছটায মুগ্ধ কবে তলে তলে হিন্দুসমাজকে একাকাব কবে দেওযাব মতলব এঁটেছেন'।[১] হিন্দুসমাজনিষ্ঠ ব্যক্তির সংশয হতে পাবে এমন কর্তব্যবোধ থেকে এই পত্রিকাতেই বলাইচাঁদ গোস্বামী কযেকটি প্রশ্ন করেছিলেন। 'স্বদেশী সমাজ'-এব পবিশিষ্ট অংশে ববীন্দ্রনাথ তাব উত্তরও দিযেছিলেন। 'বঙ্গবাসী'র ফাইল এখন আব পাওয়া যায না। তাই প্রশ্নগুলি ঠিক কী ছিল বলা সম্ভব নয। তবে ববীন্দ্রনাথেব উত্তবগুলি থেকে কিছুটা অনুমান কবা যায়। ববীন্দ্রনাথেব উত্তরে পাচ্ছি, হিন্দু-সমাজের দোষত্রুটি সংস্কাব করার জন্য শাসকবা যেসব আইন তৈরি করে সেটা সমাজের শক্তি ও স্বাধীনতাব পক্ষে ক্ষতিকাবক। আব বোধহয় সমুদ্রযাত্রা নিয়ে কথা উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিযা পৃথিবীব পরিচয হইতে বিমুখ হওযাকে আমি ধর্ম বলি না'।

বলাইচাঁদ গোস্বামীর তোলা তৃতীয প্রশ্নটি ছিল আমাদেব বিচাবে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে ববীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'পোলিটিক্যাল সাধনাব চবম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদযকে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়ে, দেশেব প্রথা ছাড়িয়ে, কেবলমাত্র বিদেশীয় হৃদয আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আযোজনকেই মহোপকাবী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য কবা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।' আমাদেব নিশ্চযই মনে পড়বে এইসূত্রে যে বাংলাব প্রাদেশিক সম্মেলনে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা চালু করাব জন্য রবীন্দ্রনাথ কত চেষ্টাই না করেছিলেন এবং হাস্যাস্পদ হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ১৯০৮-এ পাবনা সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলায সভাপতিব ভাষণ দিযেছিলেন। কেবল ভাষা নয়, এখানে কবি তুলছেন আবও গুরুতব প্রশ্ন। বাজনৈতিক সম্মেলনেব তাৎপর্য কী—দেশেব কর্তব্যসমূহ স্থির করা এবং দেশের মানুষের সঙ্গে যোগসাধন কবা। এজন্য বিলেতি ধাঁচেব সভা না করে দেশি ধবণেব মেলাব গুরুত্ব অনেক বেশি। 'সেখানে যাত্রা-গান-আমোদ-আহ্লাদে দেশের লোক দূরদূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যেব প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভালো কথক, কীর্তন-গাযক ও যাত্রাব দলকে পুরস্কাব দেওযা হইত। সেখানে ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতিব সাহায্যে সাধাবণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বেব উপদেশ সুস্পষ্ট কবিয়া বুঝাইযা দেওযা হইত এবং আমাদেব যাহা কিছু বলিবাব কথা আছে, যাহা কিছু সুখদুঃখের পরামর্শ আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিযা সহজ বাংলা ভাষায় আলোচনা কবা যাইত।

'আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনাব নাড়ীর মধ্যে বাহিবের বৃহৎ জগতেব বক্তচলাচল অনুভব কবিবাব জন্য উৎসুক হইযা উঠে, তখন মেলাই তাহাব প্রধান উপায। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিবকে ঘবেব মধ্যে আহ্বান।'

আধুনিক রাজনীতি শাস্ত্রে পোলিটিক্যাল মোবিলাইজেশন, পোলিটিক্যাল কমিউনিকেশন নিযে অনেক রীতি-প্রকরণেব কথা আমবা বলি, একশ বছর আগে দেশীয় সংস্কৃতিব সঙ্গে

সাযুজ্য রেখে ঐতিহ্যাশ্রিত রীতি অনুযায়ী রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার এই আহ্বান আমরা বোধহয় আর তেমন শুনিনি। পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিই 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রাবীন্দ্রিক চিন্তার অন্যতম একটি কেন্দ্রীয় সুর ছিল এই দুটি বাক্য : 'মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধস্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল।' 'প্রয়োজনের সম্বন্ধকে আমরা হৃদয়ের সম্বন্ধ দ্বারা শোধন করিয়া লইয়া তবেই ব্যবহার করিতে পারি'। এই আত্মীয়-সম্বন্ধ স্থাপনের জন্যই কবি আহ্বান জানিয়েছিলেন মেলাগুলিকে 'নবভাবে' জাগ্রত করার জন্য। বলাইবাবুর প্রশ্ন ছিল এই 'নবভাবে' বস্তুটি কী? রবীন্দ্রনাথের উত্তর, 'আমাদের যাত্রা-কথকতায় অনেক শিক্ষা আছে, সে শিক্ষা আমরা ত্যাগ করিতে চাই না, কিন্তু তাহার উপরে নূতন করিয়া আরো-একটি কর্তব্য শিক্ষা দিতে হইবে। দেবতা সাধু পিতা গুরু ভাই ভৃত্যের প্রতি আমার কী কর্তব্য, তাঁহাদের জন্য কতদূর ত্যাগ করা যায়, তাহা শিখিব, সেই সঙ্গে সাধারণের প্রতি, দেশের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য তাহাও নূতন করিয়া আমাদিগকে গান করিতে হইবে—ইহাতে কি কোনো পক্ষের বিশেষ শঙ্কার কারণ কিছু আছে?'

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটিকে ঘিরে এই কোলাহলের ঠিক এক বছর পর কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রকল্প কার্যকর হল। কংগ্রেসের আন্দোলন আরও গাঢ় হয়ে উঠল এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁর আত্মশক্তি অর্জনের কর্মসূচি নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, একথা আমরা সকলেই জানি। নব্য 'ন্যাশনালিস্ট'গোষ্ঠী অর্থাৎ বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ নেতারা রবীন্দ্রনাথের গঠনাত্মক স্বদেশিকে তাঁদের কর্মসূচির অন্তর্গত করারই চেষ্টা করলেন। আন্দোলন স্বদেশি আন্দোলন হয়ে উঠল। পুরনো নেতারাও যে এলেন না, তাও নয়। কিন্তু কিছু প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে গিয়েছিল। প্রাচীন প্রগতিবাদীদের সন্দেহ ছিল যে নব্য দলের স্বদেশিব্রতে হিন্দুগন্ধ বড় বেশি, হিন্দু পুনরুত্থানবাদের কালো ছায়া সেখানে দৃশ্যমান। রবীন্দ্রনাথও ব্যতিক্রম নন। তাই নব্য স্বদেশিদের চিন্তায় ভারতবর্ষের যে-স্নিগ্ধ রূপ উন্মোচিত হয়েছিল আর বাগ্মিতাসর্বস্ব সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে ধিক্কার ছিল স্বদেশি নেতাদের কথাবার্তায়, তার বিরুদ্ধে সমালোচনা এল শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো মানুষের কাছ থেকেও। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হল তাঁর 'স্বদেশী ধুয়া' (আষাঢ়, ১৩১২), 'জাতীয় একতা' (ভাদ্র, ১৩১২), 'স্বদেশ প্রেমের ব্যাধি' (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩) নামে নিবন্ধগুলি। নব্যপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আধুনিকতা বা প্রগতির বিরোধী বলেই মনে হয়েছিল তাঁর। শাস্ত্রীমশাইয়ের বক্তব্য ছিল অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় কিন্তু অতীত-পূজা আদৌ শ্রদ্ধেয় নয়। তাঁর অভিযোগ, যে-স্বদেশপ্রীতি অতীতকে গৌরবান্বিত করে, ভবিষ্যৎ প্রগতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সে স্বদেশপ্রেম প্রেম নয়, ব্যাধি।[১৮] এই একই কথা শোনা গেল প্রমথ চৌধুরীর 'তেল, নুন, লকড়ি,' প্রবন্ধে (ভারতী, মাঘ-ফাল্গুন, ১৩১২)—' ভারতবর্ষের লুপ্ত সভ্যতা উদ্ধার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আজকের দিনে নিজের দেশে আপনার ভিতর যে নতুন সভ্যতার বীজের সন্ধান পেয়েছি, তাকেই পত্র-পুষ্প-ফল-মণ্ডিত মহাবৃক্ষে পরিণত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। স্বদেশের জ্ঞান লাভ করতে গিয়ে স্ব-কালের জ্ঞান যেন না হারাই।'[১৯] 'বঙ্গদর্শন'-এ (আষাঢ়, ১৩১৩)

বিনযেন্দ্রনাথ সেন লিখলেন, যা কিছু বিদেশি তাব প্রতি অনীহা স্বদেশপ্রেমেব শক্তি বা গৌবব হতে পাবে না। আব ওই অনীহা থেকে আমবা যদি স্বদেশেব ক্ষুদ্র গণ্ডিব মধ্যে ফিবে আসি সেটা আমাদেব আত্মমর্যাদাব পক্ষে কল্যাণকব হতে পাবে না।[১৫]

যাইহোক, ১৯০৪ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত কালপর্বে এই সমালোচনাগুলিতে দেখতে পাচ্ছি দুটি প্রধান সুব ভেসে উঠে ছিল—এক, ববীন্দ্রনাথেব চিন্তাভাবনায হিন্দু পুনরুত্থানবাদেব ঘন মেঘ দেখা ,যাচ্ছে, আব দুই, বাজনৈতিক কর্মপন্থা এডিযে সমাজগঠনেব কথা একপেশেভাবে আসছে। লক্ষণীয বিষয হল, প্রবীণ মডাবেট নেতাদেব কাছ থেকেই মূলত এই সমালোচনাব ধাবাটি তৈবি হযেছিল। নব্যপন্থীদেব গলায ববং ভিন্ন সুবই শোনা গেল। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধপাঠেব প্রথম সভায উপস্থিত ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। তাঁব মন্তব্যে ছিল অনুকূল সুব, ' গত ২৫ বছব যাবৎ দেশে যে সাধনা চলিতেছে ববীন্দ্রবাবুব প্রবন্ধ তাহাবই ফল।.এক সমযে পশ্চিম গগনপ্রান্ত সৌবকবচ্ছটায দীপ্ত হইযা আমাদিগকে আমন্ত্রিত কবিযাছিল। এখন যদি আমাদেব পক্ষে পশ্চিমে সূর্যাস্ত হইযা থাকে তবে তাহাব অভিমুখী হইযা থাকা পণ্ডশ্রম মাত্র। এখন নবসূর্য পূর্বদিক হইতে সমুদিত হওযাব লক্ষণ দেখাইতেছে। আর পশ্চিমেব দিকে তাকাইলে চলিবে না। এক সময আমবা ভাবিযাছিলাম ইংবেজও মানুষ আমবাও মানুষ। তাঁহাদেব যাহা সাধ্যাযত্ত আমাদেবও তাহাই। সে ভ্রম এখন ঘুচিযা গিযাছে। তখন ফবাসি বিপ্লবেব প্রচণ্ড আলোকে ইংবেজ আমাদিগেব বাজ্যে অভিনব মৈত্রীব মহাবাণী প্রচাব কবিযাছিলেন, আমবা তাহাতেই লুব্ধ হইযাছিলাম। বেড ইণ্ডিযানদেব মতো আমবা শ্বেতাঙ্গেব মোহিনীতে মুগ্ধ হই নাই। ইংবেজ এখন সেই মৈত্রীব প্রতিশ্রুতি ক্রমেই ভুলিযা যাইতেছে। কিন্তু বুদ্ধ যে দেশে জন্মগ্রহণ কবিযাছেন সে দেশেব লোক মনুষ্যত্বেব উচ্চতম আদর্শ কখনোই বিস্মৃত হইবে না। জাতীয উন্নতি এখন আব পবকীয দান-দ্বাবা ঘটিবে না, স্বকীয সাধনা-দ্বাবা অর্জন কবিতে হইবে। ববীন্দ্রবাবু জাতীয জীবনেব যে নূতন আদর্শ দেখাইযাছেন তাহাই আমাদেব পক্ষে একান্ত অবলম্বনীয।'[১৬] ইংবেজ-শাসনেব প্রতি বিপিনচন্দ্রেব এই বিরুদ্ধ প্রতিক্রিযা খানিকটা বিস্মযকবই বটে। কাবণ ১৯০৩ সাল পর্যন্ত ইংবেজ-শাসন সম্পর্কে তেমন কোনো কুণ্ঠা তাঁব ছিল না। ববং ইংবেজ-শাসনেব নৈতিক বৈধতায তাঁব সীমাহীন আস্থাই ছিল। হবিদাস মুখোপাধ্যায ও উমা মুখোপাধ্যায[১৭] অনুমান কবেন যে, ১৯০৩-এব ডিসেম্ববে বিজলি সার্কুলাব প্রকাশিত হবাব পব তাঁর চিন্তায তুমুল আলোড়ন ঘটল। ১৯০৪-এব জানুযাবিতে ব্রাহ্মসমাজেব এক উৎসবানুষ্ঠানে এক বক্তৃতায প্রথম তাঁব মুখে শোনা গেল এবকম কথা, ' the repressive tendencies of modern British imperialism have worked together to kill the old idealism of the British administrators in India, and the old faith of the people in their saving mission and power '[১৮] মানসিকতাব এই পবিবর্তন আবও স্পষ্টভাবে ধবা পডল 'স্বদেশী সমাজ' সম্পর্কে এই মন্তব্যে। বিপিনচন্দ্রেব মনে হযনি যে এই প্রবন্ধে ব্যক্ত বাবীন্দ্রিক প্রত্যয ও বিশ্বাসগুলি অতীত পূজাব নামান্তব, পুনরুত্থানবাদে কলুষিত, তাই তাঁব পক্ষে 'স্বদেশী সমাজ'-এব অন্তঃসাব গ্রহণ কবতে অসুবিধে হযনি। খোলা মনে বিচাব কবলে কি

আমাদেরও মনে হয না যে, অতীত-বিচাবের ক্ষেত্রে ববীন্দ্রনাথ আসলে সমাজ-জীবনের, সমাজ-মনের ইতিহাস খুঁজছেন। কথাটা অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত খুব চমৎকারভাবে বলেছিলেন, 'কবি বলছিলেন যে, এক একটা দেশেব প্রাণশক্তি এক একটা চেহাবা নেয। জাতিব প্রতিভা কোনও একটা বিশিষ্ট রূপে ফুটে ওঠে। দেশেব মানুয যেখানে থাকে, যেভাবে থাকে সেখানে এবং সেইভাবেই তাদেব ধবতে পাবলে দেশেব বিশেয চেহাবাটুকু ধরা পড়তে পারে।'[১৯] রবীন্দ্রনাথ সেই কাজটিই কবাব কথা ভেবেছেন, যা আব কেউ তেমন ভাবেনি।

হিন্দু পুনরুত্থানবাদেব অভিযোগ নিযে আবেকটি কথা। শ্রদ্ধেয হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায তাঁব একটি লেখায় খুব সঙ্গতভাবেই লিখেছিলেন যে, রিভাইভালিজম কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রগতিব বার্তাও বহন করে আনে। নেহরু তাঁব আত্মজীবনীতে স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য কবেছেন 'Socially speaking, the revival of Indian nationalism in 1907 was definitely reactionary' হীবেন্দ্রনাথ এই বক্তব্যেব প্রতিবাদে লিখেছেন, 'This kind of sweeping judgement ignores the progressive as well as the regressive aspects of revivalism.'[২০]

বস্তুত প্রতীচ্যবাদ আর প্রাচ্যাভিমানেব দ্বন্দ্বটিকে আমাদেব সাবেকি ইতিহাস যে বহুকাল ধরে খুব ফুলিয়ে-ফাঁপিযে দেখাবাব চেষ্টা করেছে, তার দুর্বলতা নিয়ে গত তিরিশ-বত্রিশ বছর অজস্র লেখা হযেছে। বিস্তাবের আব প্রযোজন নেই।

'স্বদেশী সমাজ'-এ বিধৃত বাবীন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে স্বাদেশিকদেব দ্বিতীয অভিযোগ ছিল, কবি রাজনীতি-বর্জিত সমাজগঠনেব একপেশে চিন্তায ভারাক্রান্ত। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংনির্ভর গ্রামসমাজ গঠন কবতে চান রাজনীতি এড়িযে। সরকাবকে উপেক্ষা করে। এটা কি আদৌ সম্ভব? মনে রাখা দবকাব, কেবল মডাবেটবাই আনেননি এই অভিযোগ, বঙ্গভঙ্গবিবোধী আন্দোলনেব বিস্তাবপর্বে এই বিযযটি নিযে চরমপন্থী বিপিনচন্দ্র-অববিন্দ-ব্রহ্মবান্ধবদেব সঙ্গেও বিচ্ছেদ ঘটেছে ববীন্দ্রনাথের। বিশদ বিস্তাবে না গিযে এই বিচ্ছেদের তিনটি মূলসূত্রসন্ধান সম্ভব—বযকট, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, জাতীয শিক্ষা নিযে অন্তর্কলহ।

আন্দোলনের শুরুব দিকে ববীন্দ্রনাথ বযকটে উৎসাহী, কিন্তু ক্রমে বোঝা গেল ববীন্দ্রনাথ যে-কারণে উৎসাহী, জাতীয নেতাবা অন্যরকম ভাবছেন। বাস্তবিকপক্ষে বযকট নিযে জাতীয় নেতাদেব মধ্যেও স্পষ্ট দুই দল। তার থেকেই নবমপন্থা-চরমপন্থাব উদ্ভব। সুরেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, 'বয়কট হলো একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা—একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবাব উপাযমাত্র। এব একমাত্র লক্ষ্য হলো বাংলাব অভিযোগেব প্রতি বৃটিশ জনসাধাবণেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবা। বঙ্গভঙ্গ বদ করে ঐ অভিযোগ দূব কবা হলে বযকটও প্রত্যাহৃত হবে।'[২১] অর্থাৎ মডাবেটদের কাছে বযকট ছিল সামযিক এক বণকৌশল। চবমপন্থীদেব প্যাসিভ বেসিস্ট্যান্সেব তত্ত্বে বযকট ছিল একটি শানিত অস্ত্র, পূর্ণ স্ববাজলাভেব উপায এবং সেই কাবণে সর্বাত্মক। ১৯০৬-০৭ সালে বযকটেব মর্মার্থ দাঁড়াল বিদেশি পণ্যবর্জন, বিদেশি বিচারালয বর্জন, বিদেশি স্কুল-কলেজ বর্জন, বিদেশি শাসন বর্জন। সর্বাত্মক বয়কটের এই চেহাবা দেখে মডারেটরা শঙ্কিত

হয়েছিলেন এবং ১৯০৭-এ সুরাট কংগ্রেসে যজ্ঞভঙ্গ তার পরিণাম। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় বয়কটের তাৎপর্য গোড়া থেকেই ভিন্ন। ওই দুটোর কোনোটিই নয়। '. ইংরেজের উপর রাগ বা জেদের বশবর্তী হয়ে নয়, দেশকে ভালোবেসে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার ও সেই কারণে কিছু ভোগ্যবস্তু থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখার মধ্যে যে ভাবাত্মক (Positive) দিকটি আছে, তাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর রচনাগুলিতে।' সঠিকভাবেই লিখেছেন এই কথাগুলি রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল। 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' কিংবা 'ব্রতধারণ' লেখাগুলিতে রাবীন্দ্রিক এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট।

বোঝাই যাচ্ছে নঙর্থক দৃষ্টি থেকে বাহ্য রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে বয়কটকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না রবীন্দ্রনাথ। তিনি একে জাতির আত্মবল বৃদ্ধির, জাতীয় ঐক্যরচনার উপায় হিসেবে দেখছেন। কিন্তু বয়কট যখন নেতাদের হুকুম আর জবরদস্তির বিষয় হয়ে ওঠে, স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা হারায়, রবীন্দ্রনাথ বয়কট-বিরোধী হয়ে ওঠেন। আর জবরদস্তিমূলক বয়কট আন্দোলনের সূত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের যে-প্রবল অবনতি ঘটে, তা রবীন্দ্রনাথকে কাতর করে তোলে। গঠনাত্মক কাজের যে বিকল্প কিছু নেই—এই প্রত্যয় আরও দৃঢ় হয়।

১৯০৩-০৮-এর আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের যোগ সবচেয়ে বেশি মাপে ঘটেছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে। কারণটাও অনুমান করা কঠিন নয়। ১৮৯০-এর যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তাঁর অসন্তোষ ব্যক্ত করছিলেন। 'শিক্ষার হেরফের' (১৮৯২) একটি গুরুত্বময় দৃষ্টান্ত, শিক্ষার ঔপনিবেশিক চরিত্রটি চমৎকার ধরা আছে তাতে। ১৯০১-এ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা, সে-শিক্ষাচিন্তার সঙ্গেও সরকারি শিক্ষা-ব্যবস্থার আকাশ-পাতাল তফাৎ। ফলে ১৯০৫-এর অক্টোবরের কার্লাইল সারকুলারের প্রতিক্রিয়ায় দেশের নেতারা যখন বিকল্প জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু করলেন তখন নেতৃত্বের সামনের সারিতে রবীন্দ্রনাথ থাকবেন, সে তো স্বাভাবিক কথা। ১৯০৬-এর মার্চে তৈরি হল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। কিন্তু গোড়া থেকে সেখানেও অন্তর্দ্বন্দ্ব। চরমপন্থীরা চাইছিলেন সরকার নিয়ন্ত্রিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে হবে জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে। আর তাছাড়া এই বিকল্প শিক্ষার ধারায় দুটি ধারণাকে প্রবল করে তুলতে হবে—এক, হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্যকে সম্পৃক্ত করতে হবে, দুই, শিক্ষাকে স্বাদেশিক রাজনীতি-অভিমুখী করে তুলতে হবে। অন্যদিকে মডারেটরা যুক্তি দিলেন সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি কাঠামোর বাইরে আসার প্রয়োজন নেই বরং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যা দিতে পারছে না, সেই টেকনিক্যাল বা কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হোক। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দুইয়েরই ব্যবস্থা হল। তৈরি হল বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুট (২৫ জুলাই, ১৯০৬) এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যান্ড স্কুল (১৫ অগস্ট, ১৯০৬)। কিন্তু দ্বন্দ্বটা থেকেই গেল। রবীন্দ্রনাথ অচিরেই এই দ্বন্দ্বে ক্লান্ত, উপরন্তু জাতীয় শিক্ষাচিন্তার এই অতিশয় রাজনীতি অভিমুখিনতায় বিরক্ত এবং শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। ১৯০৫-এর ১২ ডিসেম্বরে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা একটি চিঠির সামান্য এক অংশ উদ্ধৃত করলে কবির মনোভাব বুঝতে আমাদের সুবিধে হবে—'...ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন উচ্চতর লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে স্পর্ধা প্রকাশ

কবাকেই আত্মশক্তি-সাধনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে কবেন—যাঁহাবা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনাকে এই স্পর্ধা প্রকাশেবই একটা উপলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান কবেন তাঁহাদেব দ্বাবা স্থিবভাবে স্থাযী মঙ্গল সাধন হইতে পাবিবে না। দেশে যদি বর্তমান কালে এইৰূপ লোকেবই সংখ্যা এবং ইঁহাদেব প্রভাবই অধিক থাকে তবে আমাদেব মত লোকেব কর্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজেব কাজে মনোযোগ কবা। '...

ববীন্দ্রনাথেব এই বিবক্তি একতবফা ছিল না, অববিন্দ-বিপিনচন্দ্র-ব্রহ্মবান্ধব তাঁদেব 'বন্দেমাতবম' ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকায তীব্র সমালোচনা কবেই লিখেছেন যে, বাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতিবেকে আত্মোন্নযন, নৈতিক বা সামাজিক পুনর্গঠন আদপেই সম্ভব নয। অতএব কবিব বাজনীতিব আবেগবর্জিত গঠনাত্মক স্বদেশি কোনো কাজেব কথা নয।

বাবীন্দ্রিক গ্রামোন্নযনেব ব্রত বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষিত যুবকদেব কাছেও অতিশয অ-বাজনৈতিক হওয়াব দোযে পবিত্যক্ত হযেছিল। 'স্বদেশী সমাজ'-এব সংকল্পেব প্রতি আকৃষ্ট হযে বিপ্লবী বাবীন ঘোযেব নির্দেশে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ববীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানিযেছিলেন যে তাঁবা গঠনাত্মক স্বদেশিব্রত গ্রহণে ইচ্ছুক। অন্নদা কবিবাজেব সঙ্গে কবিব দীর্ঘ কথাবার্তাও হযেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁবাও অগ্রসব হননি এব নিতান্ত শুষ্ক উত্তেজনাহীন স্বভাবধর্মেব কাবণে।

চাবদিক থেকে 'স্বদেশী সমাজ'-এব আহ্বান প্রত্যাখ্যাত হওযায কবি আহত হযেছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাব মধ্যেও কিছু ভবসাব কথা ছিল। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হবার পবে বিতর্কেব উত্তাপ বাডতে থাকলে ববীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে চিঠি (১১ ভাদ্র, ১৩১১) লিখে জানাচ্ছেন, 'বাদ প্রতিবাদেব যে তবঙ্গ উঠিযাছে তাহাতে আপনি মনকে লেশমাত্র ক্ষুব্ধ কবিবেন না। আমাব বচনায শত্রুমিত্র সকলকেই যে জাগ্রত কবিযা তুলিযাছে ইহা ভাল লক্ষণ জানিবেন। আমাকে কে আক্রমণ কবিতেছে বা সমর্থন কবিতেছে তাহা চিন্তাব বিযয নহে—আমাব প্রবন্ধ যে দেশেব মধ্যে কাজ কবিতে আবম্ভ কবিযাছে ইহা আনন্দেব বিষয।—বিবোধ এবং প্রতিবাদও একটা সত্যকে ব্যাপ্ত ও সুদৃঢ় কবিযা দিবাব পক্ষে একান্ত প্রযোজনীয বলিযা জানিবেন।'[২১]

কথা শেষে

আমাদেব এই ভাবতীয সভ্যতায বাষ্ট্র সমাজকে—কৌম-জীবনকে—সম্পূর্ণ গ্রাস কবতে পাবে না, এই বিশ্বাস থেকেই গান্ধি-ববীন্দ্রনাথেব কাছে পল্লীসঞ্জীবন আব শিক্ষাব সংস্কাব জীবনেব প্রধান কাজ হযে উঠেছিল। দুজনেব মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য যথেষ্টই ছিল, কিন্তু গভীব মিল ছিল এক জাযগায যে, আত্মীয-প্রতিবেশী সমাজ গড়ে তুলতে হলে গ্রামকে প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বিচেনা কবতে হবে, স্ববাজসাধনা বা আত্মশক্তিচর্চাকে সংহত কবতে হবে ওইখানে। এব বিকল্প কোনো স্বপ্ন গ্রাহ্য হযনি এই দুজনেব কাছে। আমাদেব গত একশ বছবেব বাষ্ট্রীয কার্যকলাপ অবশ্য দুজনকেই প্রত্যাখ্যান কবেছে। কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানেব ক্ষেত্রে কিছু তাবতম্যও ঘটেছে। অনেকেবই মনে হয যে আজকের পৃথিবীতে গান্ধিব সত্যাগ্রহ হযতো বা ততোটা অগ্রহণীয নয, যতোটা অব্যবহার্য বাবীন্দ্রিক প্রকল্পটি। কাবণটা কী?

প্রত্যাখ্যান-অপ্রত্যাখ্যানের প্রশ্ন না তুলে গান্ধি-রবীন্দ্রনাথের চিন্তার পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে দেবেশ রায় তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন, 'Gandhi's Swaraj is both individual and collective The individual Swaraj turns into a collective Swaraj for the nation through the mediation of Passive Resistance Rabindranath also thinks that the emergence of the 'Atmasakti' is both individual and collective and even universal which may lead to the emancipation of human kind But he does not speak of any such mediation in the 'Swadeshi Samaj'[১৮] দেবেশ রায় অবশ্য জানান গোরা, ঘরে-বাইরে, শারদোৎসব, মুক্তধারা বা রক্তকরবী-তে এই mediation-এর শৈল্পিক চেহারার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু 'স্বদেশী সমাজ'-এ তার কিছুমাত্র উল্লেখ নেই। ইঙ্গিতটা বোধহয় এখানে স্পষ্ট যে, কবি কোনো রাজনৈতিক অস্ত্র সরবরাহ করতে পারেননি। স্বতঃই একটা প্রশ্ন উঠছে মনে। আমাদের রাজনীতি-নির্ভর সমাজে সত্যাগ্রহকে যে-অর্থে অস্ত্র হিসেবে গ্রাহ্য করি, রবীন্দ্রনাথের স্বাবলম্বন ও সম্মিলিত আত্মশক্তিচর্চাকেই বা রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারব না কেন? স্বীকার করছি গড়পড়তা বাঙালির কাছে আত্মশক্তিচর্চার কোনো রাজনৈতিক তকমা নেই, রাবীন্দ্রিক সমবায় তত্ত্বও পুঁথির বিষয় হয়ে আছে। তাহলে প্রাথমিক কর্তব্যটি বোধহয় আত্মশক্তিচর্চার রাজনীতিটিকে আরও পরিষ্কারভাবে শনাক্ত করা। আর সেক্ষেত্রে রাজনীতির ব্যবহারিক সংকীর্ণ অর্থ ছেড়ে তার ব্যাপকতর সংজ্ঞার্থ গ্রহণ করাই বোধহয় সমীচীন হবে।

সূত্রনির্দেশ

১ গান্ধী-রচনাসম্ভার। গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৭০। 'হিন্দ স্বরাজ' অনুবাদ করেছেন সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত। আমার নিবন্ধে এরপরে 'হিন্দ স্বরাজ' থেকে আরো যে উদ্ধৃতিগুলি ব্যবহৃত হবে, তা এই অনুবাদ থেকে নেওয়া।

২ ডি জি তেন্ডুলকর। মহাত্মা লাইফ অব মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি (প্রথম খণ্ড)। পাবলিকেশনস ডিভিশন, গভর্নমেন্ট অব্ ইন্ডিয়া। ১৯৬০।

৩ দেবেশ রায়। রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ড গান্ধি এ নোট অন দি টেক্সচুয়ালিটিস অব্ দি 'স্বদেশী সমাজ' অ্যান্ড দি 'হিন্দ স্বরাজ'। সাহিত্য আকাদেমি (দিল্লি) আয়োজিত এক জাতীয় সেমিনারে ১৯৯৬ সালে (ফেব্রুয়ারি ১-২) এই প্রবন্ধটি পড়েছিলেন লেখক। ছাপা অক্ষরে এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। অধ্যাপক অরুণ সেনের সৌজন্যে আমি এই লেখার একটি কপি পেয়েছি।

৪ অশীন দাশগুপ্ত। প্রবন্ধ সমগ্র। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১। প্রবন্ধটির নাম 'জড়ভরতের হরিণ গান্ধী এবং কংগ্রেস'। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে অশীন দাশগুপ্ত এই বাক্যটি লিখেছেন।

৫ ডি জি তেন্ডুলকর। প্রাগুক্ত গ্রন্থ

৬ ঐ

৭ এই বিষয়ে একটি অসামান্য প্রবন্ধ জয়প্রকাশ নারায়ণের 'গান্ধি অ্যান্ড দি পলিটিক্স অব্ ডিসেন্ট্রালাইজেশন'। শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত 'গান্ধি ইন্ডিয়া অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ড' গ্রন্থে সংকলিত।

৮. 'ইয়ং ইন্ডিযা'-তে প্রকাশিত মন্তব্যগুলিব বাংলা তর্জমা ব্যবহাব কবেছি অর্থশাস্ত্রী ভবতোষ দত্ত প্রণীত 'অর্থনীতিব পথে'। জিজ্ঞাসা। ১৯৭৭ গ্রন্থটি থেকে।
৯ ববীন্দ্র-বচনাবলী ষোডশ খণ্ড, গ্রন্থপবিচয। পশ্চিমবঙ্গ সবকাব, ২০০১।
১০ ঐ
১১ ববীন্দ্র-বচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ সবকাব, জন্ম-শতবার্ষিক সংস্কবণ।
১২ রবীন্দ্রনাথেব বিরুদ্ধে তাঁব সমকালেব এই সমালোচনাগুলিব বেশিবভাগ সূত্র পেযেছি 'ববিজীবনী' প্রশান্তকুমাব পাল, 'স্বদেশি মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল' সুমিত সবকাব এবং 'ববীন্দ্রনাথ বাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব' অববিন্দ পোদ্দাব ইত্যাদি গ্রন্থগুলি থেকে।
১৩ সুমিত সবকাব। স্বদেশি মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, ১৯০৩-০৮। পিপলস পাবলিশিং হাউস। দিল্লি, ১৯৭৩।
১৪ প্রমথ চৌধুবী। প্রবন্ধ সংগ্রহ। বিশ্বভাবতী, ১৯৭৪।
১৫ সুমিত সবকাব। প্রাগুক্ত গ্রন্থ
১৬ ববীন্দ্র-বচনাবলী। ষোডশ খণ্ড।
১৭ হবিদাস মুখোপাধ্যায ও উমা মুখোপাধ্যায। স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলাব নবযুগ। দে'জ সংস্কবণ, ২০০৪।
১৮ ঐ
১৯ অশীন দাশগুপ্ত। প্রাগুক্ত গ্রন্থ। প্রবন্ধটিব নাম 'ববীন্দ্রনাথেব হাবানো গ্রাম'।
২০ হবিদাস মুখোপাধ্যায ও উমা মুখোপাধ্যায়। প্রাগুক্ত গ্রন্থ
২১ ঐ
২২ ববীন্দ্র-বচনাবলী ষোডশ খণ্ড
২৩ ঐ
২৪ দেবেশ বায। প্রাগুক্ত প্রবন্ধ

পাশমোড়া দেবার সময়

শঙ্খ ঘোষ

প্রাদেশিক কংগ্রেসেব এক সভায (বরিশাল, মার্চ ১৯২১) একটি গল্প শুনিযেছিলেন অশ্বিনীকুমাব দত্ত। গল্পে আছে, জনাপাঁচেক মাতালেব মধ্যে একজন একেবাবে নডাচডা কবছে না দেখে অন্যেবা সাব্যস্ত করেছিল যে সে নিশ্চয় মাবা গেছে। সৎকাবেব জন্য তাকে কাঁধে তুলে নিমতলা ঘাটে যাবার পথে মৃতটি হঠাৎ একবার পাশ ফিরে শুল। দেখে একজন বলে উঠল . 'ওবে, ও তো মরেনি, পাশমোড়া দেয যে!' শুনে আবেকজন গম্ভীব স্বরে বলল . 'এই মডা এই অবধিই মবে। চল্।'

অশ্বিনীকুমারেব মনে হয়েছিল, আমাদেব বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন ছিল সেইবকম এক পাশমোড়া দেওযা, মৃতকল্প জাতির আকস্মিক এক পাশমোডা, তারপব আবাব ঘুম। আর এব অনেকদিন পর, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা দেখে তাকে তিনি ভাবছিলেন যেন 'দ্বিতীযবাবের পাশমোড়া'।

মধ্যবর্তী সময়টাতে দেশেব মধ্যে কোনো আলোড়ন যে ঘটছিল না, তা নিশ্চয নয। কংগ্রেসেব অধিবেশনগুলি চলছিল, রাজদববাবে আবেদন-নিবেদনেব পালা শেষ হযনি তখনও, আর অন্যদিকে যুগান্তব পার্টি বা অনুশীলন সমিতিব মতো বিপ্লবী সংগঠনগুলিতেও কাজেব নতুন নতুন বাঁক দেখা দিচ্ছে। বাংলার গুপ্ত সমিতিগুলিব সঙ্গে অনেক বেশি তখন যোগ তৈরি হচ্ছে ভাবতেব অন্যান্য অঞ্চলেব, সশস্ত্র বিপ্লবেব কল্পনায যুক্ত হচ্ছে বিদেশ থেকে অস্ত্রসংগ্রহেব ভাবনা। 'একদল যুবক রাষ্ট্রবিপ্লবেব দ্বাবা দেশে যুগান্তব আনবাব' যে উদ্‌যোগ কবছিলেন, সে কেবল ববীন্দ্রকথিত 'বঙ্গবিভাগেব উত্তেজনাব দিনেই', বঙ্গ-বিভাগ বদ হবাব পবেও চলছিল তাব প্রবহমানতা। সমিতিগুলিব কাজকর্ম কেন [illegible] দমিত কবা যাচ্ছে না কিছুতেই, পুলিশকে এই মর্মে ভর্ৎসনা জানাচ্ছেন সবকাবি কর্তারা, ১৯১৫ সালেও। সেসব চর্চা বা আযোজনেব কিছুই যে অশ্বিনীকুমাবেব জানা ছিল না তা নিশ্চয নয়, ১৯১৩ সালেব প্রাদেশিক সম্মেলনে সে-প্রসঙ্গেব উল্লেখও করেছিলেন তিনি। তবুও কেন বঙ্গভঙ্গ-বিবোধেব সঙ্গে অসহযোগেব এক নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক সম্পর্কেব কথা মনে হলো না তাঁব? কেন মনে হলো মধ্যপর্বে আবার বুঝি ঘুমিযে পডেছে দেশ? অসহযোগের সময়টাকে কেন মনে হলো দ্বিতীযবাবেব পাশমোড়া?

কেননা, ববীন্দ্রনাথেব মতোই, অশ্বিনীকুমারও দেশকে বুঝতে চেয়েছিলেন দেশের সর্বস্তরেব মানুষজনেব মধ্য দিযে। সমস্ত দেশেব মনকে জাগিযে তুলতে গেলে তাদেব সঙ্গে সংযোগ চাই, আব সে-সংযোগ ঘটতে পারে নিবন্তর সৃষ্টিমূলক কাজে, সমাজকে গডে তোলায়, ববীন্দ্রনাথেব মতো অশ্বিনীকুমারেরও ভাবনায ছিল এই প্রস্তুতিগত ঝোঁক। এ-প্রস্তুতিব জন্য একদিকে চাই ধৈর্য, অন্যদিকে চাই ব্যাপ্তি। সেইজন্যেই, প্রথম যুগ থেকেই

কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যোগ থাকলেও, কংগ্রেসের বহু সম্মেলনে হাজির থাকলেও, এর জাতীয় বা প্রাদেশিক অধিবেশনগুলিকে তাঁর মনে হচ্ছিল লক্ষ্যহারা। কংগ্রেসের দাবিগুলি বা প্রস্তাবগুলি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শুধু, সমগ্র জনমণ্ডলীর নয় তা, এই অভিযোগ নিয়ে অমরাবতী অধিবেশনে (১৮৯৭) দাঁড়িয়ে একে তিনি বলতে পেরেছিলেন 'তিন দিনের তামাসা মাত্র', মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন যে বছরের প্রতিটি দিন দেশের স্তরে স্তরে যদি কাজ না করা যায়, তবে এসব তামাসার কোনো মানে নেই। বিশেষ ওই সম্মেলনটির বছরেই আলমোড়ায় বিবেকানন্দের সঙ্গে কথা হয়েছিল তাঁর, যে-বিবেকানন্দ পরামর্শ দিয়েছিলেন অচ্ছুত মুচি মেথরদের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে, ডেকে বলতে যে তারা উঠে দাঁড়ালেই একটা বৈপ্লবিক কাণ্ড ঘটতে পারে দেশে। বস্তুত, এ-ধারণাটা অশ্বিনীকুমারের নিজের মনেও অনেকদিন ধরে ছিল বলে কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই তিনি কাজ করে চলেছিলেন তাঁর নিজের মতো, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক 'বরিশাল জনসাধারণ সভা'। এ-সভার সভ্যদের কাজ ছিল নিজেদের চারপাশ থেকে জীবনযাপনের সব তথ্য সংগ্রহ করা। জনসংখ্যা কত, পাঠশালা কটা, সেখানে ছাত্রসংখ্যা কত, জলাশয় বা রাস্তাঘাটের দশা কেমন, স্বাস্থ্যরক্ষারই বা ব্যবস্থা কী, এইসব হিসেব নেওয়ার সূত্রে একটা জনসংযোগ গড়ে তোলার আয়োজন ছিল তবে তাঁর প্রথম জীবনেই, আর সে-সংযোগ সমাজের নিচুতলার মধ্যেও, রবীন্দ্রনাথ এসব প্রসঙ্গে গোটা দেশকে উদ্‌বুদ্ধ করতে চাইবার অনেক আগে থেকেই। ১৮৯৮ সালের একটি লেখাতেই রবীন্দ্রনাথ যে তাঁকে 'দেশবন্ধু' অভিধায় উল্লেখ করেছিলেন,[১] তার যুক্তিটা হয়তো সেইখানেই। স্কুলকলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে, দেশের যুবশক্তিকে জাগিয়ে তুলবার মধ্য দিয়ে, 'লিট্‌ল্‌ ফ্রেণ্ডস্‌ অব্‌ দ্য পুওর' বা দরিদ্রবান্ধবসমিতি জাতীয় সংঘ গঠনের মধ্য দিয়ে তিনি পৌঁছতে পারছিলেন ওই দেশবান্ধবতার দিকে, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হবার অনেক আগে থেকেই। অনেক আগে থেকেই স্বদেশের আত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছিলেন তিনি তাঁর 'ভারতগীতি'র (১৮৮৪) গানগুলিরও কথাব্যবহারে, যার কোনো কোনো অংশে এমনও শুনতে পাই যে

এই দেশেতে তূলা হয়, এই তূলা বিলাতে যায়,
এই তূলাতে কাপড় তথায় বোনে ম্যাঞ্চেস্টারে,
ম্যাঞ্চেস্টার হতে এসে ঘরের টাকা নেয় রে শুষে,
এদিকে দেশের তাঁতি অনাহারে মরে।

গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'পরপণ্যে ভরা তনু আপন রে' কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'পরের ভূষণ পরের বসন/তেয়াগিব আজ পরের অশন'—এসবও বঙ্গভঙ্গ-ঘোষণার আগেকার লেখা, কিন্তু সেসব লেখাতেও এমন ভাষা এসে পৌঁছয়নি যে

এই কি দেশের ভালবাসা, তাঁতি ভাইদের এই দশা,
তাদের এই দুঃখ তোরা, দেখিস কেমন করে?

১ দ্র বিশ্বভারতী রবীন্দ্ররচনাবলী ১০, পৃ ৫৭২

আরবে চেষ্টা করি সবে, দেশী কাপড় বিক্রি হবে,
সাজাব দেশী তাঁতি সবে, ধন-রত্ন-হারে।
ইংরাজ শিল্পী দেখ গিয়ে, বাঙ্গালীর টাকা নিয়ে,
তেতলা চৌতলায় কেমন সুখে বিরাজ করে,
(আর) বাঙ্গালী শিল্পী যারা, অনাহারে মরে তারা,
দেখে তাদের এ দুর্দ্দশা প্রাণ যে কেমন করে।

নরমপন্থী আর চরমপন্থীদের লড়াইয়ে সুরাট কংগ্রেস (১৯০৭) ভেঙে যাবার পর 'যজ্ঞভঙ্গ' প্রবন্ধে আরো একবার রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিতে চাইছিলেন 'সমস্ত দেশের লোককে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিলে, তবেই সমস্ত দেশের যোগে ঐ কন্‌গ্রেস সত্য হইয়া উঠিবে।' যে-কোনো এক পন্থীর ও-রকমই একটা চেষ্টা হোক, এই আবেদন যখন তিনি জানাচ্ছিলেন, অশ্বিনীকুমার তখন তাঁর প্রায় পঁচিশ বছরের জনসেবার অভিজ্ঞতা নিয়ে গ্রামে গ্রামেই গড়ে তুলতে চাইছিলেন এক আত্মপ্রতিষ্ঠার আয়োজন, সেইখান থেকেই আশা করছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে দেশের একটা সত্যিকারের যোগ হবে কখনো, গতিময় হবে গোটা দেশ। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে তেমন একটা যোগের আভাস তৈরি হয়েছিল বলে মনে হয়েছিল তাঁর (যতটা কিন্তু মনে হয়নি রবীন্দ্রনাথের), তবে বাংলা আবার জুড়ে যাবার পর ভেঙে যাচ্ছিল সেই ধারণা। ১৯১৩ সালের প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে অশ্বিনীকুমার তাই বলেছিলেন পার্টিশন গেছে, বয়কটও গেছে, কিন্তু স্বদেশি তো যায়নি। সেটাকেই জোরালো ভাবে ফিরিয়ে আনতে হবে আবার, তৈরি করে তুলতে হবে জনমত, আর সেটা শুধু 'classes'-এর মধ্য থেকে নয়, 'masses'-এর মধ্য থেকে। অস্থায়ী পাশমোড়া থেকে স্থায়ী জেগে উঠবার পথটা আছে সেইখানেই। রবীন্দ্রনাথের মতো অশ্বিনীকুমারও ভাবছিলেন যে ভিতর থেকে সেই সমাজগঠনের মধ্যেই আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা।

২

'কংগ্রেসের কর্ত্তব্য কি' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন অশ্বিনীকুমার, 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় (চৈত্র ১৩১২)। আমাদের দেশ যে 'আত্মশক্তি-বিস্মৃত' হয়ে ধিক্‌কৃত হয়ে পড়েছে, একথা সেখানে তিনি মনে করিয়ে দিতে চাইছেন কংগ্রেসকে। 'কত প্রার্থনা, কত যাজ্ঞা, কত নিবেদনই' তো করা গেল, তার ফলে এতদিন ধরে আমরা যা পেয়েছি তা 'লাল চুষণী বই' কিছুই নয়, 'ইহাতে জাতীয় বল সঞ্চয়ের কোনো উপাদান দেখিতে পাই না।' সেই উপাদানের সন্ধানে কংগ্রেসকে 'জাতীয় শিক্ষাবিধান, সালিশী সমিতি গঠন, বিবিধ শিল্পকলা-শিক্ষাগার স্থাপন'-এর দিকে মন দিতে হবে বলে মনে হয়েছিল তাঁর। ১৮৯৭ সালের কংগ্রেসে লোকশিক্ষার জন্য প্রচারক নিয়োগের যে 'নির্দ্ধারণ' হয়েছিল, এতদিনের মধ্যেও সেইমতো কাজের কোনো চিহ্ন দেখা যায়নি কেন, এই অনুযোগ তিনি তুলছেন। আর এই প্রবন্ধেরই অল্প কদিন পরে প্রাদেশিক সম্মেলনের (বরিশাল, ১৯০৬) ভাষণে তিনি

মনে কবিযে দিচ্ছেন ওই একইবকমেব কথা যে আমাদেব এখন কাজের ভিত্তি হোক জাতীয শিক্ষাব প্রবর্তন, স্বদেশি শিল্পেব সৃষ্টি আর বিকাশ, সালিশি সমিতিব প্রতিষ্ঠা, আব সাধাবণ মানুযেব অবস্থা-উন্নযনেব জন্য স্বাবলম্বী আবো নানা প্রতিষ্ঠানেব পত্তন।

দেশেব মানুযেব সঙ্গে কংগ্রেসেব যে আত্মিক কোনো যোগ থাকে না, এ-অভিযোগ যাতে তাঁব শহর বরিশালেব পক্ষেও প্রযোজ্য না হয, সেই লক্ষ্যে অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি অশ্বিনীকুমাব প্রায একবছব ধরেই তৈরি হচ্ছিলেন। তাঁব অন্যতম জীবনীকাব শবৎকুমাব বায জানিযেছেন কীভাবে ১৯০৫ সালের মযমনসিংহ অধিবেশনেব পব থেকেই এ-বিষযে সক্রিয হযে উঠেছিলেন তিনি। শহবে পঁযত্রিশ জনেব এক কমিটি কবে তাব অন্তর্গত দুজনকে পাঠিযে দেন দূব দূর অঞ্চলে, আসন্ন কংগ্রেসের উদ্দেশ্য আব সূচি বুঝিযে বলবাব জন্য। 'বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ, স্বদেশী এবং প্রাদেশিক সমিতিব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অতি সরল ভাযায' বিবরণ লিখে কযেক হাজার পুস্তিকা ছড়িয়ে দেবাবও ব্যবস্থা করেন তিনি। নিজেও ঘুবে বেড়ান বেশ কযেকটা গ্রাম,[২] আব সম্মেলনেব আগে জেলাব নানা প্রত্যন্ত থেকে মানুষজন নিয়ে এসে ভিন্ন এক সমাবেশেরও আযোজন কবেন বরিশাল শহরে।

এসবে তাঁর অসুবিধেব কোনো কারণ ছিল না। দরিদ্রবান্ধবসমিতি থেকে এখন তৈবি হযে উঠেছে তাঁর স্বদেশবান্ধবসমিতি। ১৯০৫ সালের আগস্টে এর প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই গড়ে উঠেছে তাব একচল্লিশটি শাখা আর ১৯০৮ সালে সে-সংখ্যা পৌঁছয একশো উনষাটে। গাঁযেগঞ্জে এদের পরিচালনায় চলছে প্রায় দুশোটি প্রাথমিক বিদ্যালয, যেসব বিদ্যালযে অন্যদেব সঙ্গে পড়তে আসছে মুসলিম আর নমশূদ্র ছেলেরা। বযকটেব পাশাপাশি আত্মনির্ভরতার কর্মসূচিতে দুদিকেই তখন ফল মিলছে অনেক। বরিশালে এক বছবে বিদেশি কাপড়েব আমদানি কমে গেছে তিন কোটি টাকার, জেলায বাহান্নটি বিদেশি মদেব দোকানেব মধ্যে একান্নটাই গেছে বন্ধ হযে,[৩] স্বদেশবান্ধবসমিতিব সালিশিতে মিটে যাচ্ছে পাঁচশো তেইশটি মামলা। সমিতিব প্রধান জোগানদার ছিল অশ্বিনীকুমাবের ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন। স্বদেশপ্রেমের কবিতা লিখে, দেশেব নানা লাঞ্ছনাব কথা সংগ্রহ কবে আব প্রকাশ করে, বাজনীতি আব অর্থনীতিব আলোচনা করে, শবীরচর্চা আব লাঠিখেলায মজবুত হযে শিক্ষকেবা তৈরি করছিলেন নিজেদেব আর ছাত্রদেব। ইংবেজদেব পক্ষে এঁরা হযে উঠছিলেন বিপজ্জনক। ১৯০৭ সালের পুলিশ বিপোর্টে (সেপ্টেম্বর) বাখবগঞ্জেব ছাত্রদের ভূমিকাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি জানিযে বিস্ময প্রকাশ করেছেন একজন গবেযক।[৪] তবে সে-বছবেব ২০ জুন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেব হিসেবেব মধ্যে কিন্তু

২ ববীন্দ্রনাথেব পাঠানো বাখিসূত্র পেযে যে-চিঠি লিখেছিলেন (২২ অক্টোবব ১৯০৫) অশ্বিনীকুমাব, তাতে ছিল 'আমি এতদিন প্রাদেশিক সমিতিব কার্য্যোপলক্ষে দূব দূব পল্লীতে ভ্রমণ কবিতেছিলাম তাই প্রাপ্তিস্বীকাব কবিতে বিলম্ব হইল।'

৩ সংখ্যাটা জানিয়েছেন অশ্বিনীকুমাব নিজেই তাঁব 'আত্মপ্রতিষ্ঠা' পুস্তিকায। সমকালীন Bengalee (১৪ সেপ্টেম্বব ১৯০৬) পত্রিকাব সূত্রে ড সুমিত সবকাব লিখছেন, ছাপ্পান্নটিব মধ্যে পঞ্চান্ন।

৪ Hiren Chakrabarti, *Political Protest in Bengal, Boycott and Terrorism 1905-1918*, Papyrus, 1992, p 22

বেশ ভালোভাবেই ছিল তাদেব কথা, এও বলা ছিল যে 'The BM Institution has been the centre and hub of the agitation since the Partition'। ১৯০৮ সাল জুড়ে প্রায় দৈনন্দিন খবব বাখা হচ্ছিল ব্রজমোহন কলেজেব ছাত্রশিক্ষকদেব, কলেজেব অনুমোদন তুলে নেবাব জন্য চাপ দেওযা হচ্ছিল এ-কলেজেব ছাত্রদের সবকাবি কাজেব পথে, সরিয়ে দিতে বলা হচ্ছিল কোনো কোনো শিক্ষককেও।

১৯০৬ সালেই একবার যখন গোটা জেলা জুড়ে হঠাৎ দেখা দিল ভয়ংকব এক দুর্ভিক্ষ, বান্ধবসমিতিব অন্য কাজেব সঙ্গে অশ্বিনীকুমাবের তখন বাডতি দাযিত্ব হযে দাঁড়াল এব প্রতিকারব্যবস্থা, সবকাবেব মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকবাব সময নয তখন। লাখুটিযাব কাছে সার্শি গ্রামে ক্ষুধার্ত ছেলেমেযেদের হত্যা কবছে ইমাবদ্দি নামেব একজন, পবিজনদের আর্তনাদ সহ্য করতে না পেবে আত্মহত্যা কবছে আমবাজুড়িব কৈলাসচন্দ্র কর্মকাব, এ-রকমই আত্মহত্যা বা তার আযোজন ঘটছে সোহাগপুরে কড়াপুবে, বুভুক্ষু কযেকজন মিলে এক বৃদ্ধাকে খুন কবে লুটে নিয়েছে তাব চাল—এমন অনেক ভযাবহতাব খবব দিযে জনসমাজের কাছে সাহায্য চাইছেন অশ্বিনীকুমাব। গড়ে তুলেছেন তিনি একশো পঞ্চান্নটি সাহায্যকেন্দ্র। আগস্ট মাসের কুড়ি দিনের (১১-৩১) মধ্যে খবচ কবতে হচ্ছে প্রায কুডি হাজার টাকা। বালাম চালের দব উঠেছে আট থেকে দশ, বরিশালেব প্রধান অবলম্বন মুশুরির ডাল টাকায চাব সের, বসন হিসেবে অনেক মহিলাকে ব্যবহাব কবতে হচ্ছে কলাপাতা বা কচুপাতা। কিন্তু—অশ্বিনীকুমার বলছেন—'রাজকর্মচাবীগণ সুষুপ্তি সম্ভোগ করিতেছেন'। সাহায্য তুলে নিযেছে সরকার, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কবছে না কিছু, পথকবেব আযকেও ব্যবহার কবা যাচ্ছে না এই বিপৎকালে। তাঁদেব নিজস্ব সাহায্যকেন্দ্রগুলিকে তাই কিছুতেই বন্ধ করতে পাবছেন না অশ্বিনীকুমাব। প্রত্যেক কেন্দ্র ছয থেকে বারোটি গ্রামে ত্রাণ পাঠাচ্ছে, প্রতি গ্রামে থাকছে একটি ত্রাণসমিতি, দ্রুততা বিশ্বস্ততা সংহতি দক্ষতায কোনো তুলনাই নেই তাদের। দেখে নিবেদিতাব মনে হযেছিল 'The greatest thing ever done in Bengal'। আত্মনির্ভবশীলতার এ স্বতন্ত্র এক নজিব।

'কংগ্রেসেব কর্ত্তব্য কি' প্রবন্ধে সাধাবণ্যে পৌঁছে কাজ কববাব মতো স্পষ্ট একটা পরিকল্পনাই পেশ কবেছিলেন অশ্বিনীকুমার। প্রতিটি জেলার প্রতিটি গ্রামে একটি সভাব প্রতিষ্ঠা কবতে হবে, সেই গ্রামসভাগুলির উপবে থাকবে এক-একটি মহকুমাসভা, তার উপবে জেলাসভা, তারপব প্রাদেশিক এবং তাবও উপরে জাতীয মহাসমিতি। নির্বাচনেব মধ্য দিযে প্রতি অঞ্চলের সেবা মানুষটি আসবেন সভার সদস্য হিসেবে, আব এইভাবে দেশের সমস্ত প্রান্তেব সঙ্গে সজীব একটা সম্পর্ক তৈবি হবে জাতীয সংগঠনেব। আমাদেব মনে পড়বে সে স্বদেশি পর্বে পল্লীসমাজ গঠন বিষযে রবীন্দ্রনাথ-প্রচাবিত প্রস্তাবসূচিতেও ছিল প্রায় একইবকমের কথা যে পল্লীসমিতিগুলিব কাজ হবে 'জেলা সমিতি, প্রাদেশিক সমিতি ও জাতীয মহাসমিতিব উদ্দেশ্য ও কার্যের সহাযতা কবা'। সালিশেব দ্বাবা মীমাংসা, স্থানীয় শিল্প-উন্নতিব চেষ্টা, নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পল্লীর তথ্য সংগ্রহ, দুর্ভিক্ষকালেব জন্য ধর্মগোলা স্থাপন—রবীন্দ্রনাথেব প্রচাবপত্রে পবিকল্পিত এসব অনেক সূত্রই ছিল অশ্বিনীকুমাবেব সঙ্গে অভিন্ন, কাজেবই মধ্য দিযে অশ্বিনীকুমাব প্রতিপন্ন কবছিলেন সেটা।

সাধাবণভাবে তাই মনে হয, সমাজ-সংগঠনটাই ছিল তাঁব প্রধান বাজনৈতিক আন্দোলন। আগেব যুগেব 'ভক্তিযোগ':আব পবেব যুগেব 'কর্মযোগ' বইদুখানি লিখে অশ্বিনীকুমাব আদর্শ কিছু যুবক গড়ে তুলতে চাইছিলেন তা বোঝা যায, চবিত্রবান যে-যুবকেবা দেশেব হিতসাধন কববে, 'কর্মযোগ'-এব ভাষায 'ব্যক্তিগত, সম্প্রদাযগত, সমাজগত, জাতিগত, বাষ্ট্রগত উন্নতিব জন্য' কাজ কবতে পাববে। কংগ্রেসেব কর্মসূচিব মধ্যে এই গঠনেব দিকটা তেমন প্রশ্রয পাচ্ছে না বলে এব চবমপন্থী নবমপন্থী কোনো দলেই সম্পূর্ণ ধাতস্থ হতে পাবেননি তিনি, আবাব কলকাতায দলাদলিব মধ্যে গিযে—তাঁব নিজেবই শব্দপ্রযোগ অনুযাযী—বিবদমান 'সৌব' আব 'বৈপিন' দলেব মাঝখানে স্বতন্ত্র একটা 'আশ্বিন' দলও গড়ে তুলতে চাননি তিনি।

তবু অনেকে তাঁকে ভাবতে শুরু কবেছিলেন চবমপন্থীদেবই পক্ষে ঝুঁকে-পড়া। এমনকী, ১৯০৬ সালে, আবো একটু এগিযে বাবীন ঘোষ তাঁব কাছে সশস্ত্র বিপ্লবেব কথাও তুলেছিলেন। সে-প্রস্তাব অশ্বিনীকুমাব অবশ্য প্রত্যাখ্যান কবেন। সুবাট কংগ্রেসে (১৯০৭) চবমপন্থীদেব দিকে তাঁব প্রবণতা যদিও প্রচ্ছন্ন থাকেনি। সে-কংগ্রেস পণ্ড হয়ে যাবাব পব ১৯০৮ সালে পাবনাব প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতি হিসেবে ববীন্দ্রনাথেবও আগে যে উঠেছিল অশ্বিনীকুমাবেব নাম, সেকথা আমাদেব মনে বাখতে হবে। সবকটা জেলাসমিতিব মত ছিল সেইটে, পাবনাব লোকেবা ববীন্দ্রনাথেব মনোনযনে একেবাবেই খুশি নন জানিযে চিঠি ছাপা হচ্ছিল অমৃতবাজাব পত্রিকায (২৩ জানুয়াবি, ১৯০৮)। স্টেটসম্যান পত্রিকায (১২ ফেব্রুযাবি) এ-খববও ছিল যে চবমপন্থীবা এ নিযে আপত্তি তুলবেন সভায। ধবে নেওযা হযেছিল যে অশ্বিনীকুমাবকে তখন পছন্দ কবছেন না' নবমপন্থীবা, আব তা অনেকটা সত্যিও মনে হয কোনো কোনো কমিটি থেকে তাঁব নাম খাবিজ হযে যেতে দেখে। সম্মেলনেব দ্বিতীয দিনেব অধিবেশনে ববীন্দ্রনাথ সুবেন্দ্রনাথ হীবেন্দ্রনাথ মতিলাল আব অশ্বিনীকুমাবকে নিযে একটি কমিটি গড়াব প্রস্তাবে সুবেন্দ্রনাথ তাঁব অপাবগতাব কথা জানিযে দেন, কিন্তু অশ্বিনীকুমাবেব নামটা সবিযে দিতেই বাজি হযে যান তিনি। এসব কি এইজন্যেই যে তাঁকে চবমপন্থীদেব অনুগত বলে সন্দেহ কবা হচ্ছিল? সবকাবেবও কি মনে হচ্ছিল সেইবকম? অন্তত, ১৯০৭ সাল থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তাব কববাব পবামর্শ দিযে চলছিলেন কোনো কোনো ওপবওযালা, যদিও অনেকদিন পর্যন্ত গ্রাহ্য হচ্ছিল না সেটা। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ১৯০৮ সালেব ১৩ ডিসেম্বব বিনা বিচাবে বন্দী কবা হলো তাঁকে ১৮১৮ সালেব এক আইনে, সবাসবি নির্বাসন দেওযা হলো লখ্‌নৌতে।

৩

ব্রিটিশবিবোধী আন্দোলনেব চবিত্র বোঝাতে গিযে হাউস অব লর্ডসেব কাছে মর্লি জানিযেছিলেন যে তিন শ্রেণীব মানুষেব সঙ্গে বোঝাপড়া কবতে হচ্ছে তাঁদেব। প্রথম হলো চবমপন্থী দল, যাবা এই স্বপ্ন লালন কবছে যে কোনো-একদিন 'আমাদেব তাবা ভাবত থেকে হটিযে দেবে'। দ্বিতীয দলেব মনে এমন-কোনো মতলব নেই, তাবা কেবল

ঔপনিবেশিক আওতার মধ্যেই একটা স্বাযত্তশাসন চায। আব তৃতীয একটা দল আছে যাবা চল্‌তি শাসনব্যবস্থাব মধ্যে খানিকটা মর্যাদাময অধিকাব শুধু পেতে চায, আব কিছু নয। আপাতত সবকাবেব কবণীয হিসেবে মর্লিব পবিকল্পনা হলো এই দ্বিতীয শ্রেণীটিকে তৃতীযেব দিকে টেনে আনবাব চেষ্টা কবা, যাতে খানিকটা সহযোগিতা কবতে পাবাব আশ্বাস পেলেই তাবা খুশি হতে পাববে। সবাসবি সন্ত্রাসবাদী যাবা, তাদেব কথা তখনও তাঁব হিসেবেব মধ্যে আসেনি।

অশ্বিনীকুমাব কথাবার্তা যেভাবে বলছিলেন কংগ্রেসে, তাতে সবকাব তাঁকে এই দ্বিতীয শ্রেণীব অন্তর্গত কবতেই পাবত, অর্থাৎ বুঝিযেশুনিযে তাঁকে তৃতীয শ্রেণীব দিকে টান দিতেই পাবত। সে-চেষ্টা যে ছিল না একেবাবে, তাও নয। দেশ ছেড়ে যাবাব আগে ফুলাব সাহেব শিলং থেকে লেখা একটা চিঠিতে (১৪ আগস্ট ১৯০৬) তাঁকে জানিযেছিলেন 'আমি খুবই আশা কবছিলাম যে আপনাব অবস্থানটাব বিষযে পুনর্বিবেচনা কববেন আপনি। কেননা আমি নিশ্চিত যে আপনি তাঁদেব মতো মানুষ নন যাঁবা দেশেব জন্য শুধু মৌখিক দু-একটা কথা বলেই নিশ্চিন্ত থাকেন। আপনাকে এখনকাব পবিস্থিতিটিব বিষযে ভলো কবে ভাবতে অনুবোধ কবছি, এই আন্দোলন আপনাদেব দেশেব যুবশক্তিব যে-পবিমাণ ক্ষতি কবছে তা একবাব অনুধাবন কবতে বলছি।' তোযণসূচক এই আবেদনে ফল হযনি অবশ্য, এ-চিঠিবও পব দু-বছব ধবে অশ্বিনীকুমাব তাঁদেব আন্দোলনকে দৈনন্দিন নেতৃত্ব দিযে চলছিলেন।

সেইজন্য কি সবকারেব ভয হচ্ছিল যে এই এক নেতা, যিনি দ্বিতীয শ্রেণী থেকে ববং প্রথম শ্রেণীবই দিকে এগিযে যাচ্ছেন? সেপথ বন্ধ কববাব জন্যই কি দুবছব পব গ্রেপ্তাব কবতে হলো তাঁকে? তাঁব গ্রেপ্তাব আব নির্বাসনেব খববে চমকে গিযেছিলেন অনেকেই, খুঁজে পাচ্ছিলেন না এব সংগত কোনো কাবণ। সুবেন্দ্রনাথেবও মনে হযেছিল এব কাবণটা হযতো দীর্ঘকাল ধবে নিশ্চয 'state secret' হিসেবে আবৃত থাকবে নথিপত্রে, কিন্তু সবকাবেব দিক থেকে কাজটা হযেছে ভুল, কেননা আন্দোলনকাবীবা এতে ভয পাবাব বদলে বরং উশকে উঠেছে আবো বেশি। বুঝিযেশুনিযে নবম কববাব পক্ষে ছিলেন যে মর্লি, যে-মর্লিব সমর্থনও ছিল না এই নির্বাসনদণ্ডে, ১৮১৮ সালেব মবচে-ধবা ওই তলোযাবখানা বাব কবতে গেলে তো বেশকিছু অফিসাবকেও নির্বাসনে পাঠাতে হয বলে ঠাট্টা কবছিলেন যিনি, তাঁব সঙ্গে কথা বলেও কিন্তু সুবেন্দ্রনাথ বদ কবাতে পাবেননি অশ্বিনীকুমাবদেব এই অনৈতিক শাস্তি।

নথিপত্র থেকে অবশ্য বোঝা যায যে সবকাবপক্ষেও এ নিযে বেশ দীর্ঘস্থাযী দ্বিধাই ছিল। যাঁবা অশ্বিনীকুমাবেব নির্বাসন চাইছিলেন, তাঁবা তা চাইছিলেন অনেকদিন ধবেই, মূল নির্বাসনেব প্রায দেড বছব আগে থেকে। কিন্তু আবো-ওপবওযালাবা শেষ পর্যন্ত প্রাটকে দিচ্ছিলেন সে-প্রস্তাব। আব এঁদেব এই টালবাহানায, বাচন-প্রতিবাচনে, এই দেড় বছব ধবে অশ্বিনীকুমাবেব কাজকর্মেব ব্যাপকতা আব তীব্রতাব ভালোমতোই একটা আন্দাজ পেতে থাকি আমবা।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভাবছেন, বাখরগঞ্জের মতো ভযংকব জাযগায অশ্বিনীকুমারের প্রভাব খুবই বিপদেব হযে উঠেছে, সম্পূর্ণ অবনতি ঘটেছে স্বাভাবিক অবস্থাব। দু-বছরেব চেষ্টায ইওবোপীযদেব বিরুদ্ধে আব এই সবকাবের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ একটা শত্রুভাব তিনি জাগিযে তুলতে পেবেছেন জনমানসে। যে মুসলিম চাযিদেব মধ্যে স্বভাবতই আছে 'fanaticism and lawlessness', তাদেবও ভিতবে জাগিযে তোলা হচ্ছে সেই একই শত্রুতাব বোধ। 'খ্রিষ্টান শাসকদেব বিরুদ্ধে হিন্দু আব মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ কবে তোলাই এখন অশ্বিনীবাবুব প্রধান লক্ষ্য' বলে বুঝতে পাবছেন তাঁবা। সমস্যা হলো, মুসলিমরা যদি হিন্দুদেব থেকে দূবে থাকে তাহলে দেখা দেবে দাঙ্গাব সম্ভাবনা, যেমন ইতিমধ্যে ঘটেছেও কযেকটা। আব যদি এক হয এবা, তাহলে যে এ-আন্দোলন কোথায পৌঁছতে পাবে 'তা আমবা কেউ ভাবতেই পারছি না'। নেতাকে দ্রুত সবিযে নিতে না পাবলে কিছুদিনেব মধ্যেই কিন্তু এঁর অনুগামীবা হয়ে উঠবে হিংস্র।

কিন্তু এসব শুনবার পবেও ভারত সরকারেব স্ববাষ্ট্র দপ্তবেব অস্থায়ী সেক্রেটাবি স্টুযার্ট ভাবছেন (১১ জুলাই ১৯০৭) যে নির্বাসন-প্রস্তাবটা সমর্থন কববাব মতো নয়। ঠিকই, অশ্বিনীকুমাবেব আন্দোলন হযতো ভিতবে ভিতরে অনেককেই উত্তেজিত কবে তুলছে, কিন্তু পুলিশেব সংখ্যা কিছু বাড়িযে দিলেই তার প্রশমন সম্ভব। নির্বাসনে কোনো ফল হবে না, সেক্ষেত্রে এক নেতাব বদলে গজিযে উঠবে আবেক নেতা। তাব চেযে বরং— পবামর্শ দিচ্ছেন স্টুযার্ট—নেতাটির ওপর নজবদারি জোবালো কবা হোক, আব সেকাজে ব্যবহাব কবা হোক কোনো কোনো মুসলিম আব নমশূদ্রকে, গোপন চব হিসেবে। এদেব ওপব প্রভাব ছড়াতে চাইছেন বলে সভায় এদেব হাজিবা পছন্দই কববেন অশ্বিনীকুমাব। সবকাবেবও হাতে এসে পৌঁছবে অনেক তথ্য। এসব সম্ভাবনাময পথ দিযে কিছুদূর এগোবাব আগেই কথায কথায দণ্ডবিধানটা ভালো পদ্ধতি নয। নির্বাসনটা সহজ প্রতিবিধান, কিন্তু যে-কোনো সমযেই সেদিকে ঝুঁকে পড়বাব প্রবণতাটা বোধ কবতে হবে।

অশ্বিনীকুমাবেব কথা কাজ এবং চলাচলেব ওপব নজবদাবিটা বেশ ভালোভাবেই শুরু হলো তখন। কবে নলচিটিব গোপন সভায (যেখানে হাজিব ছিল বেশকিছু মুসলিম) টাকা তুলবাব কথা হচ্ছে 'arms and ammunition'-এব জন্য (ভাবুন, অশ্বিনীকুমাব!) , সালিশিব ব্যবস্থা কববাব জন্য, কবে ঝালকাঠিতে সাব্যস্ত হচ্ছে সকলেব হাতে তুলে দিতে হবে তীবধনুক, আব বিক্রিব শতকবা পাঁচ বা তিন পযসা দোকানদারদেব দিতে হবে আন্দোলন-তহবিলে, মাইসানিতে নৌকোব ওপব থেকে ভাষণ দিতে গিযে কবে অশ্বিনীকুমাব বলছেন 'আমবা তিবিশ কোটিব বেশি আব ইংবেজবা মাত্র আড়াই লক্ষ। নিজেদেব যদি অস্ত্রবলীযান কবি, যদি দশ কোটিও মবে যাই তবু তো ওদেব তাড়াতে পাবি ভাবত থেকে', এব সবই নথিবদ্ধ হযে যাচ্ছে ক্রমাগত। পবেব দিনই বলছেন আবাব, এক গাছতলাব সমাবেশে · বযকটের ফলে ব্রিটিশদেব ক্ষতি হচ্ছে, ধৈর্য ধবে থাকলে আবো হবে, বঙ্গভঙ্গ বদ কবতে তখন বাধ্য হবে ওবা। সবকাবি কোর্টে কোনো মামলা কবব না আমবা, পঞ্চাযেতেব ওপব নির্ভর করব, স্বদেশি মামলাব জন্য টাকা তুলব—

এসব প্রস্তাবেব পাশাপাশি এও বলছেন · 'সবকাবি পীডনেব বিরুদ্ধে সবাই রুখে দাঁড়াও। তোমাদেব বন্দুক নেই, বর্শা লাঠি ধনুক তুলে নাও। স্ট্যাম্প বা কাবেন্সি নোট নিযো না আব, কেননা ব্রিটিশ সবকাবেব অবসান হযে গেলে ওগুলি কোনো কাজে লাগবে না।' মাইসানিব ভাষণে না কি এও বলেছিলেন অশ্বিনীকুমাব যে শিখবা নিশ্চয দেশেব মানুষেব বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর্বেবে না, আব জাপানে যদি এক কোটি টাকা পাঠানো যায তাহলে তাবা সৈন্য পাঠাবে ভাবতেব জন্য। এই খববটা পাওযা গেছে একজন নমশূদ্রেব সূত্রে, আব যেহেতু 'শিখ' বা 'জাপান' জাতীয শব্দ বিষযে তাব নিজস্ব কোনো ধাবণা নেই তাই প্রতিবেদক এ-তথ্যকে নিছক তুচ্ছ বলে ভাবতে পাবছেন না।

একেবাবে এই শেষ অংশটুকুকে যদি গ্রাহ্য না-ও কবি, অন্যান্য ভাষণেব বা পবিকল্পনাব আঁচ থেকে বোঝা যায, মর্লি-কথিত দ্বিতীয থেকে তৃতীয শ্রেণীতে চলে আসবাব বদলে—সামযিকভাবে অন্তত—অশ্বিনীকুমাব সবে যাচ্ছিলেন প্রথম শ্রেণীবই দিকে, চবমপন্থীদেব দিকে, আব সেইজন্যেই নিশ্চয সুবাট কংগ্রেসে তিলকদেবই পক্ষ নিযেছিলেন তিনি, তিলকেব শাস্তিবিধানেব পব তাব প্রতিবাদে কেবলই সভামিছিল কবছিলেন। যদিও, সেই একইসঙ্গে সে-সভায কেউ তলোযাবেব সাহায্যে স্বাধীনতা আনবাব গান গেযে উঠলে এই বলে তাদেব নিবস্তও কবছেন যে 'না, এ-গানেব সময এখনও আসেনি'। একবছব আগে মাইসানিতে যেসব কথা বলেছিলেন তিনি, আপাতত সেসব স্থগিতও বাখছেন তাহলে।

দেড় বছবে জেলাব ভিতবকাব বাষট্টিটি সভায কখন কোথায গিযেছেন অশ্বিনীকুমাব, তাব হিসেব পাঠানোব সঙ্গে সঙ্গে জানানো হচ্ছে কীভাবে স্বদেশি সম্ভাব তাঁব বাড়িতেই এসে পৌঁছচ্ছে আব সেখানে থেকেই বিলি হযে যাচ্ছে হাটে, কীভাবে তিনি মালা দিচ্ছেন স্বদেশি শহিদেব, কীভাবে শহবেব বাববনিতাবা স্বদেশি কাজেব জন্য লিখেপড়ে দিচ্ছেন তাঁদেব সঞ্চয, কীভাবে তাঁদেবও তিনি ডাক দিচ্ছেন তাঁত বুনবাব কাজে, কীভাবে তাঁব উশকানিতে ববিশালে-বচিত বিদ্রোহী নানা পালাব অভিনয হচ্ছে মযমনসিংহেও। ইওবোপীযদেব সঙ্গে মামলায দেশবাসীব ন্যাযবিচাব পাবাব কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই ওসব সমযে নিজেবই হাতে আইন তুলে নেবাব পবামর্শ দিচ্ছেন তিনি। বযকট যাবা মানছে না, তাদেব পুবোপুবি একঘবে কববাব পবিকল্পনা জানাচ্ছেন তিনি, আব ব্যাপকভাবে ঘটছেও সেটা। সভায সভায তিনি বলে বেড়াচ্ছেন যে সবকাবি চাকবিব পিছনে দৌডেব অভ্যাস ছাডতে হবে সবাইকে, সাহেবদেব কিছুমাত্র খুশি কবতে চাইবে যাবা, সামাজিক ভাবেই শাস্তি দিতে হবে তাদেব। এইসবও 'খবব' হযে থাকছে যে ১৯০৭ সালেব ৬ জানুযাবি ববিশালে বাজা বাহাদুবেব হাভেলিতে হাজিব দুহাজাব শ্রোতাব মধ্যে সাডে তিনশো জন ছিলেন মুসলমান, কিংবা ১৬ জুন নাজিবপুবেব ঘাটে গাওযা গানগুলিব মধ্যে এমনও ভযানক কথা না কি ছিল যে হিন্দু আব মুসলমান মিলে এদেশে একটিই মাত্র জাতি।

৪

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব ফলেই হিন্দু-মুসলমানেব সম্পর্কসমস্যাটা একেবাবে সামনে এসে দাঁড়াল। অথচ, দেশেব বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতেব পক্ষে সেটা যে কতখানি কেন্দ্রীয চালক হয়ে উঠতে চলেছে, নেতাবা অনেকেই সেটা ঠাহব কবতে পাবেননি তখনও। সুবেন্দ্রনাথেব মতো নেতা তাঁব *A Nation in Making*-এব মতো বইযেব মধ্যে বঙ্গভঙ্গকালেব বিববণসূত্রে এত বড়ো প্রসঙ্গটিকে খুব সহজেই পাশ কাটিযে গেলেন, উপেক্ষাই কবলেন তাকে। এমনকী তাঁব মনে হলো যে পার্টিশন-প্রস্তাবেব বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভে জেগে উঠেছে দুই সম্প্রদাযই—'Hindus and Mahamedans alike'। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনে মুসলমানদেব কোনো ভূমিকাই ছিল না বা তাঁবা সকলেই ছিলেন ভঙ্গপ্রস্তাবেব পক্ষে, কোনো কোনো মহলে প্রচলিত এই ধাবণা যেমন অসার, ততটাই সাবহীন এই ধাবণা যে দুই সম্প্রদাযেব প্রতিক্রিযা ছিল একেবাবে একইবকম, alike। এই বোধেব মধ্যে ছিল অন্ধতা। সুরেন্দ্রনাথ একদিকে ভাবছেন এইবকম, আব অন্যদিকে গর্ব কবছেন এই বলে যে স্বদেশি 'মন্ত্র'ব উদ্‌গাতা ছিলেন তিনি, যে-মন্ত্রেব কথা হঠাৎ তাঁব মনে হযেছিল কোনো গ্রামেব এক মন্দিবেব সামনে ভাষণ দিতে গিযে। দেবমূর্তিব সামনে উদ্‌বুদ্ধ সেই মন্ত্রের প্রচাব দেশ আর ধর্মেব যে যোগ তৈবি কবে তুলছে, তাব একচক্ষু দিকটাব কথা ভাববাবই কোনো অবসব হলো না তাঁর মতো নেতাব। দুই সম্প্রদাযেব সম্পর্কেব মধ্যে ব্যবহারিক কোনো বিচ্ছেদ থেকে গেছে কি না, দীর্ঘস্থাযী কোনো পাপ থেকে গেছে কি না, থাকলে তাব থেকে মুক্তিব পথ কোথায, ভাবা হলো না তার কিছুই।

সকলেবই মনে পড়বে এই 'পাপ' শব্দটি প্রযোগ কবেছিলেন ববীন্দ্রনাথ, তাঁব ১৯০৭ সালেব 'ব্যাধি ও প্রতিকাব' নামেব প্রবন্ধে। 'আমবা বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত' এই সত্যটাকে বুঝে নিযে সেই বিচ্ছেদ ব্যাধিটা দূব করবাব আযোজন যে কবতে হবে আমাদেবই, সেই প্রবন্ধেব এমন প্রত্যক্ষ চেতাবনিও কোনো কাজে লাগল না। একে উপেক্ষা কবলেন কেউ, কেউ-বা কবলেন প্রতিবাদ। বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীব মতো সচেতন মানুষও সহজেই ভাবতে পাবলেন যে আন্দোলনমুহূর্তে হিন্দুব যে 'আস্ফালন' আব মুসলমানেব 'মতিভ্রম'—এ শুধু 'ক্ষণেকেব জন্য', এ নিযে সত্যিই দুর্ভাবিত হবাব কিছু নেই। যখন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হযে গেছে, যখন মুসলিমদেব কোনো কোনো অংশ থেকে স্বদেশি আন্দোলনেব বদলে 'স্বজাতি-আন্দোলন'-এব ডাক দেওযা হযে গেছে, যখন হিন্দু-সংস্রবটাকেই মুসলিম সমাজেব অবনতিব কারণ বলে প্রচাবপত্র বিলি হচ্ছে, যখন বলা হচ্ছে 'কবযোড়ে কই এবে শুনবে মোসলেম/হিন্দুব সহিত আব বাড়াইও না প্রেম', তখন বামেন্দ্রসুন্দব ববীন্দ্রনাথকে বোঝাতে চাইছেন যে দুই সম্প্রদাযই না কি 'পবস্পবকে ক্ষমা কবিযা নির্বিবোধে বাস কবিতে শিখিযাছেন', সম্পর্কসমস্যা মেটাবাব স্বতন্ত্র কোনো চেষ্টাব তেমন দবকার নেই।

সকলেই যে তা ভাবছিলেন এমন নিশ্চয নয। দুই সম্প্রদাযেই এমন মানুয তখন ছিলেন যাঁবা পবস্পরকে কেবলই ডাক দিচ্ছিলেন ঐক্যেব দিকে, কিন্তু ঠিক সেইখানেই

ছিল রবীন্দ্রনাথেব প্রশ্ন। পাপের মূলটাব দিকে নজব না দিযে, সেটাকে সরিযে নেবাব দৈনন্দিন আচবণগত কোনো ব্যবস্থাব কথা না ভেবে যদি ওই ডাক এসে পৌঁছয, তবে স্বভাবতই সেটা ফাঁপা ঠেকে। এতকালকাব উপেক্ষিত আহত অংশের তখন মনেই হয যে 'বাবুবা বোধ কবি বিপদে ঠেকিযাছে'। মিলন সম্পন্ন কবে তুলবাব জন্য এ ফাঁপা আহ্বান কোনো পদ্ধতি হতে পাবে না।

এইখানে, মনে হয, অশ্বিনীকুমাবেব একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। আমাদেব মনে বাখতে হবে যে এই 'ঠেকিযাছে'-পর্বেব তিবিশ বছব আগে থেকেই অশ্বিনীকুমাবেব স্পষ্ট একটা চেতনা ছিল আমাদেব ধর্মবিবোধেব জটিলতা নিযে। মাত্র আঠাবো বছব বযসে (১৮৭৪) যশোবে তিনি পত্তন কবেছিলেন এক 'সাধাবণ ধর্মসভা'ব, যে-সভা থেকে একই সঙ্গে প্রচাবিত হবে হিন্দুধর্ম ইসলামধর্ম আব খ্রিষ্টানধর্মেব সাবাৎসাব, একই আসবে বসে উপাসনা কববেন হিন্দু মুসলমান খ্রিষ্টান। তাঁর গানেব মধ্যে যে আহ্বান 'এ ধূলি মস্তকে লযে ভাবেতে প্রমত্ত হযে/হিন্দু-মোস্লেম কাজ কবিব, জাতিভেদ ভুলে'[৫], তাব একটা বাস্তব সূচনা ছিল ওই ধর্মসভায। 'হিন্দুমেলা-স্বদেশি মেলা'ব পটভূমিকা মনে বাখলে, সমযেব কথাটা মনে বাখলে ঘটনাটাকে বেশ সমীহা নিযেই বুঝতে হয।

'আযবে মুসলমান ভাই, আজ জাতিভেদ নাই' বা 'এখন তোবা আপন হলি'—এসব উচ্চাবণকে অশ্বিনীকুমাব যে কেবল মুখেব কথাতেই থম্‌কে রাখেননি, স্বদেশি পর্বে তাঁব কর্মসূচি থেকে এব অনেকটাই নজিব পাওযা যায়। শহবে দাঁড়িযেই আন্দোলন কবেননি তিনি। তিনি ঘুবে বেডিযেছেন যেখানেসেখানে, বৈঠক কবেছেন সাধাবণ মানুষজনের সঙ্গে, আব সে-সাধাবণেব মধ্যে আছে দুই সম্প্রদাযেবই মানুষ। সবকাবি নথিতে এও বলা আছে যে তাঁব কোনো গোপন বৈঠকেব বাইবে সতর্ক প্রহবী হযে কাজ কবছেন কযেকজন মুসলিম। কাজেব সূত্রে তাঁব এতটাই সংযোগ ছিল মুসলিম নিম্নবর্গেব সঙ্গে যে ঢাকাব নব্যব সলিমুল্লা দূত পাঠিযেও প্রত্যাশিত বিচ্ছেদটাকে তত প্রবল কবে তুলতে পারেননি দুই সম্প্রদাযের মধ্যে। ববিশালেব স্বরূপকাঠি থানায দত্তপাড়া গ্রামে মোহন খান নামে একজন প্রচাবক স্থানীয মুসলিমদেব জড়ো কবে জানিযেছিলেন যে ঢাকাব নবাবেব কাছে তিনি পবোযানা পেযেছেন, হিন্দুদেব বিরুদ্ধে মুসলমানদেব জাগিযে তুলতে হবে। বযকট-আন্দোলনকে প্রতিহত কববাব জন্য ববিশালেও বিলিতি হাট বসাবাব ব্যবস্থা করেছিলেন নবাব। কিন্তু মুসলিম প্রজাবা সেখান থেকে জিনিস না কিনে অশ্বিনীকুমাবেব পবিচালিত স্বদেশি হাট থেকেই কিনেছে, কেননা 'আপদে বিপদে আমাদেব খবব বাখেন বাবু'। এই খবব-বাখাটাকে বেশ ভযই পাচ্ছিল ব্রিটিশ সবকাব। খ্রিষ্টান শাসকদেব বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানকে একত্র কববাব লক্ষ্য নিযে উনি কাজ কবছেন, এই যে প্রতিবেদন, সেখানে এও বলা হচ্ছে যে 'হিন্দুদেব বিষযে উনি নিশ্চিত, এবাব তিনি মন দিযেছেন মুসলিমদেব দিকে, ঘনিষ্ঠভাবে তিনি মিশছেন নিচু শ্রেণীব মুসলমানদেব সঙ্গে।' জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভাবছেন, বিপিনচন্দ্র বা সুবেন্দ্রনাথেব চেযে অনেক বেশি ভযেব হযে দাঁড়িযেছেন

৫ আদি বচনায অবশ্য ছিল 'হিন্দু-যবন কাজ কবিব', 'মোস্লেম'-পাঠ পববর্তী কালেব।

অশ্বিনীকুমাব, কেননা তাঁব আছে মুসলিম জনমানসেব ওপব প্রভাব, সেখানে অবাধ তাঁব মেলামেশা। এই মেলামেশাব সঙ্গে সঙ্গে অশ্বিনীকুমাব একথা বলেও সাবধান কবছেন সবাইকে যে জেলায হিন্দুমুসলিম বিবোধ ঘনিযে তুলবাব জন্য কোনো কোনো মুসলমানকে কিন্তু ব্যবহাব করা হচ্ছে, যেমন একব'ব বলেছিলেন ঢাকাব এক বক্তৃতায (১৯ সেপ্টেম্বব ১৯০৬)। এও বলেছিলেন সেখানে 'যদি আমবা সতর্ক থাকি, যে-আগুন জ্বলে উঠেছে তাকে কেউ নেবাতে পাববে না—সলিমুল্লা, কার্জন, বা ফুলাব—কেউ না।' ছোটোখাটো দাঙ্গা বা মুসলিমপক্ষেব বযকট-প্রতিবোধ যে ববিশালেও ঘটেনি তা নয, তবু অশ্বিনীকুমাবেব প্রণোদনায় ববিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনেব সভাপতি হযেছিলেন আবদুল বসুল,[৬] তাঁবই আহ্বানে এ-অঞ্চলেব মুসলিমদেব কাছে প্রচাবেব জন্য সময দিযেছিলেন লিযাকৎ হোসেন, কাজেব মধ্যে নেমে এসেছিলেন তাঁবই গ্রাম বাটাজোডেব স্কুলশিক্ষক আবদুল গফুর। শুধু ভাষণ নয়, সাধারণ মানুষকে বোঝাবাব কাজ অনেক সহজ হয গান যাত্রা কথকতাব মধ্য দিয়ে ভাবনাগুলিকে পৌঁছে দিতে পাবলে—এই বিশ্বাস থেকে অশ্বিনীকুমাব যাঁদেব স্বদেশি গান-পালা রচনায উদ্‌বোধিত কবেছিলেন, তাঁদেব মধ্যে একদিকে যেমন ছিলেন যাত্রাগানের মুকুন্দদাস বা কথকতাব হেমচন্দ্র কবিবত্ন, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন জাবিগানেব মুসলিম কবিরা, যেমন মফিজুদ্দিন বযাতি, যিনি লিখেছিলেন 'এ দেবো তা দেবো বলে/অবশেষে ভুজঙ্গিনীব পা দেখায', কিংবা যেমন আলাম বযাতি। অশ্বিনীকুমাব লিখেছেন, এই গাযক 'যিনি বাজনীতি কাহাকে বলে তাহাব ক-অক্ষবও জানিতেন না, তিনি সবকার-প্রদত্ত উপাধির প্রতি আজ মহাত্মাজি যে বিরাগ দেখাইতেছেন, [স্বদেশি যুগে] তাহা দেখাইযা গাহিযাছিলেন কেহ হবে খাঁ বাহাদুব কেহ হবে বায বাহাদুব/ভাই, তুমি কি হবে লাঙল বাহাদুব?'

ববীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমবা সভাসমিতিতে 'ভাই ভাই' বলে ডাক দিই, কিন্তু আমাদের বিচ্ছেদমূলক বিদ্বেষমূলক আচবণেব মধ্যে তাব কোনো চিহ্ন থাকে না। বামেন্দ্রসুন্দব বলেছিলেন আচবণগত দূরত্বকে দুই সম্প্রদাযই স্বাভাবিক বলে মেনে নিযেছে। আব অশ্বিনীকুমাব, আহ্বানগান আব আহ্বানভাষণেব সঙ্গে সঙ্গে, বাস্তায বসে-থাকা বক্তবমনবত এক গবিব মুসলমানকে পিঠে বযে আনছেন শুশ্রূষাব জন্য। তাঁব বাডিতে একদিন বেঞ্চে বসে প্রতীক্ষা কবছিলেন এক মুসলমান চাযি, ঘবে ফিবে অশ্বিনীকুমাব তাঁব পাশে কাঁধে হাত বেখে বসাব পর সেই চাযিব মন্তব্য একটা প্রশ্ন নিযে এসেছিলাম কিন্তু তাব জবাব পেযে গেছি। আপনাবা বক্তৃতাব সমযে বলেন আমবা সকলেই সমান, ভাই ভাই। আমাব সন্দেহ ছিল কথাটা সত্য কি না। কিন্তু আপনি যখন আমাব পাশে আমাব কাঁধে হাত বেখে বসলেন, তখন আমাব মনে আব কোনো সন্দেহ নেই। 'বাবু, আপনাকে সেলাম'।[৭] ববীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন 'বাংলাদেশেব অনেক স্থানে একফবাশে

৬ সম্মেলনে অন্যান্য মুসলিম নেতাদেব মধ্যে ছিলেন হাজি মহম্মদ ইসমাইল চৌধুবী, আবদুব হোসেন, হেদাযেৎ বক্স, হামেজুদ্দিন আহমদ, দীন মহম্মদ, মোতাহব হোসেন, গোলাম মওলা চৌধুবী।

৭ এ-গল্পটি মুকুন্দ দাসেব অভিজ্ঞতা-অনুযাযী। কোনো-এক নমশূদ্রকে নিযেও অনুরূপ একটা ঘটনাব কথা আছে শবৎকুমাব বাযেব লেখায।

হিন্দু-মুসলমান বসে না—ঘবে মুসলমান আসিলে জাজিমেব এক অংশ তুলিযা দেওযা হয, হুঁকাব জল ফেলিয়া দেওযা হয', তাব বিরুদ্ধেই অশ্বিনীকুমাবের এইসব সচেতন আচবণগত প্রতিবাদ। আর এই প্রতিবাদেব দিক থেকেই তিনি মুসলমান সমাজেব অনেকটা ভিতবে গিযে দাঁড়াতে পাবছিলেন। এই পাবাটাকেই, এই এক হযে ওঠাটাকেই, ভয পাচ্ছিল ইংবেজ সবকাব।

৫

অর্থাৎ অশ্বিনীকুমার যখন আত্মপ্রতিষ্ঠাব কথা বলছিলেন তখন তাঁব সেই 'আত্ম'ব মধ্যে সহজেই অন্তর্গত ছিল মুসলমান সমাজও। সে-অন্তর্ভুক্তি ছাড়া ববিশালেব মতো মুসলিমপ্রধান জেলায বিস্তীর্ণভাবে কাজ কবা সম্ভবও ছিল না। কলকাতায 'আত্মোন্নতি সমিতি'ব প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, কিন্তু সে-আত্মব মধ্যে যে মিলতে পাবছে না 'আত্মোন্নতি'ব জিগিব-তোলা 'লাল-ইস্তাহার'-এব (১৯০৬) প্রকট এক মুসলিম 'আত্ম', অনেকেবই চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে সেটা।

আবার এও ঠিক, গোটা ববিশাল জেলা জুড়ে যেভাবে তাঁব কাজ বিছিযেছিলেন অশ্বিনীকুমার, কলকাতায বসে অনেকেই তাব পুবো চেহাবাটা জানতে পাবেননি। তাঁব আলোচনাব মধ্যে ইংলিশম্যান পত্রিকাব এই মন্তব্য সগর্বে ব্যবহাব করেছেন অশ্বিনীকুমাব 'Barisal is probably the only place where there is a systematic organization and where the volunteers have done enough mischief The organization is nowhere so complete as at Barisal'।[৮] সন্দেহ নেই এ-অর্গানাইজেশন মূলত বযকটপন্থী, কিন্তু বয়কট সম্পূর্ণ হতে পাবে না যদি স্বদেশি উৎপাদন তাব সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চলতে পাবে। ১৯০৬-এব ভাষণেই অশ্বিনীকুমাব প্রশ্ন কবেছিলেন যে ববিশালেব মতো পিছিযে থাকা একটা জেলা থেকে দুমাসেই দুহাজাব টাকাব নিব তৈরি কবে পাঠানো গেছে, এ কি অনেকখানি কথা নয? তাঁতিদেব জোলাদেব কাজ বাড়েনি কি অনেকখানি? আর সেইসঙ্গে 'ভদ্র' সমাজেব পবিচিত যুবকেবা নিজেদেব নিযোগ করছিলেন পুকুব খোঁড়াব বাস্তা বানানোব ডাকবিলি কববাব চৌকিদাবি করবাব কাজে। গ্রামে গ্রামে ছড়ানো স্বদেশবান্ধবসমিতিব শাখাগুলি থেকে চলছিল এইসব কাজ। 'স্বদেশ সম্বন্ধে স্বদেশীব যে দাযিত্ব আছে তাহা সর্বসাধাবণের কাছে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ কবিযা তুলিতে হইবে' বলেছিলেন ববীন্দ্রনাথ। বলেছিলেন যে নেতাদের 'মত কী সে তো বারংবাব শুনিযাছি, তাঁহাদেব কাজ কী কেবল সেইটেই দেখা হইল না'। হয়তো, অশ্বিনীকুমাবদেব ওইসব চর্চাব মধ্যে সে-বকম দেখাব একটা সুযোগ হতে পাবত।

৮ ববিশাল যে সবকাবকে কতদূব উত্যক্ত কবছিল, লর্ড মিন্টোব কাছে লেখা মর্লিব একটি চিঠিতে (১১ মে ১৯০৬) তাব খানিকটা পবিচয ধবা আছে। 'আত্মপ্রতিষ্ঠা'য চিঠিটিব এই অংশ ব্যবহাব কবেছেন অশ্বিনীকুমাব To speak quite frankly all depends on you and me keeping in step I am convinced we shall be unanimous about frontier army expenditure Barisal and all else that may arise Only you must consider my difficulties, as I assuredly consider yours

তা পারত, কিন্তু পুরোপুরি তাকে জানলেও রবীন্দ্রনাথ হয়তো বলতেন যে কাজের এই ভাবনাটা তৈরি হচ্ছে একটা না-এর দিক থেকে, সেটা অভাবাত্মক। হ্যাঁ-এর নয়, স্বপক্ষতার নয়, বিপক্ষতা বা বিরুদ্ধাচরণের দিক থেকে। বয়কট আছে, তাই স্বদেশি। রবীন্দ্রনাথ ভাবছিলেন বয়কট-নিরপেক্ষ এক স্বদেশি আবেগ প্রকাশের কথা। আর সে-আবেগটা না থাকলে কী হয়, বঙ্গভঙ্গ রদ হবার সঙ্গে সঙ্গে অশ্বিনীকুমার তার আন্দাজ পেয়েছেন। ১৯১৩ সালের প্রাদেশিক সম্মিলনীতে ধিক্কার দিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি, যে-স্বদেশি চেতনা হাজার হাজার লোকের ভরণপোষণ করতে পারছিল, তার আজ এমন নিষ্প্রভ হবার কারণ কী। বলা তো হয়েছিল বয়কট একটা সাময়িক ব্যবস্থা, বঙ্গভঙ্গ ফিরিয়ে নিলে তার কোনো দরকার হবে না আর, কিন্তু সেজন্য স্বদেশি আয়োজনের বিলোপ কেন হবে? এই কেনরই উত্তর ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়।

অশ্বিনীকুমারের জেলায় অশ্বিনীকুমারের গ্রেপ্তারের পরই স্তিমিত হয়ে আসছিল কাজ। সে কেবল এজন্য নয় যে নেতা অবরুদ্ধ, সেটা এইজন্যেও যে দেশজোড়া সমস্ত সমিতিকে —আর তার ফলে স্বদেশবান্ধবসমিতিকেও—একইসঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল সরকার। এ-সম্ভাবনার কথাটা অবশ্য অনেক আগেই বলেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্কসূত্রে প্রশ্ন তুলেছিলেন 'যতদিন ইংরেজের বাণিজ্যনীতির পশ্চাতে ইংরেজের বেয়নেট থাকিবে ততদিন অনেষ্ট স্বদেশীর মাথা তুলিবার ক্ষমতা কতটুকু?' স্বদেশি শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিলিতি শিল্পের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী বলে ইংরেজ যে এর বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেবেই, সেটা বোঝা চাই। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছিলেন, 'চীৎকার না করিয়া কাজ করা উচিত, ইহা ঠিক কথা; কিন্তু কাজ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের আছে কি?'

এইখানেই অশ্বিনীকুমারদের মনে একটা ভুল আশ্বাস কাজ করছিল। তাঁরা ধরে নিচ্ছিলেন যে ইংরেজদের একটা সদংশ আছে ('পাকা' আর 'কাঁচা'র বৈপরীত্য দিয়ে কথাটাকে ভাবছিলেন তিনি) যেখান থেকে পূর্ণ আত্মবিকাশের কাজে হয়তো একটা প্রশ্রয় পাওয়া যাবে। স্বদেশি কেন লুপ্ত হতে চলল, তার পুনরুদ্ধার করতে হবে, সমস্ত দেশের মধ্যে নতুন সাড়া জাগাতে হবে—এসব কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯১৩-র ভাষণে একথাও তিনি বলছিলেন 'And is it too much to hope that our Government should, as suggested by Lord Minto and Sir Edward Baker, take measures to protect our infant industries?' আমাদের সরকার আর আমরা চলব 'in love and confidence' অথবা 'we are proud of our Governor'—এইসব বিশ্বাসের ঘোষণার মধ্যেই ছিল ক্ষয়ে যাবার পথ। স্বদেশবান্ধবসমাজ নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবার পরে আবারও নতুন করে এক 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধায়িনী সমিতি'র পত্তন করেছিলেন অশ্বিনীকুমার, তাঁর অনুগত অন্য একজন (শরৎকুমার ঘোষ) গড়ে তুলেছিলেন এক 'স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ', এসবের মধ্য দিয়ে অশ্বিনীকুমার আবারও আশা করছিলেন এক দেশজোড়া চাঞ্চল্যের। স্বদেশি স্তিমিত হয়ে আসবার ফলে এক ১৯২০ সালেই বিদেশ থেকে কিনতে হয়েছে ষাট কোটি চুয়ান্ন লক্ষ টাকার সুতো আর কাপড়, কোর্ট ফি হিসেবে বাংলাতেই খরচ হয়েছে

১৮৯৬৪০০৮ টাকা। অশ্বিনীকুমার আবারও ভাবছেন যে এই খবরগুলি গ্রামে গ্রামে প্রচার করলে আমাদের আত্মদৃষ্টির পথ হয়তো আবার খুলে যাবে। আর, সে-ভরসা তিনি পাচ্ছেন গান্ধির নতুন আন্দোলনের সামনে দাঁড়িয়ে, অসহযোগের উন্মাদনা দেখে। দ্বিতীয় পাশমোড়ার এই সম্ভাবনার মুখোমুখি হয়ে 'আত্মপ্রতিষ্ঠা' নামের খুদে বইটিতে কংগ্রেসকে শেষবারের মতো আবারও শোনাচ্ছেন তাঁর বারবার বলা প্রিয় চারটি সূত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য স্বদেশি আর সালিশির ব্যবস্থাপনার কথা। কিন্তু তার কোনো প্রত্যাশিত রূপায়ণ দেখবার আগেই, দু-বছরের মধ্যে, মৃত্যু হলো তাঁর। অপূর্ণ থেকে গেল তাঁর—এবং দেশের—আত্মপ্রতিষ্ঠার কল্পনা।

"একটি ক'রে ইস্তাহারের জন্যে" : স্বদেশি আন্দোলন ও "সোণার বাঙ্গলা"

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

যে-কোনো আন্দোলনেই প্রচাবেব একটা বড ভূমিকা থাকে। প্রচাব কবা হয দুভাবে লিখে, অর্থাৎ মূলত ছাপাব হবফে, আব মুখে মুখে। এব প্রথমটিকে লেনিন যা বলেছিলেন, তাব ইংবিজি অনুবাদ কবা হযেছে 'প্রোপাগান্ডা', আব দ্বিতীযটিব, 'অ্যাজিটেশন'।[১]

লেনিন যে-কথা বলেন নি, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সকলেই জানেন . প্রোপাগান্ডা আব অ্যাজিটেশন-এব মধ্যে একটা ফাঁকা এলাকা থাকে। সেটি হলো ইস্তাহাব। লেখা হলেও তাব মূল লক্ষ্য হলো মুহূর্তেব জন্যে একটা কথা পৌঁছে দেওযা। ইংবিজিতে নানা নামে এটি চালু আছে। সবচেযে পুবনো নাম ব্রডশীট, কাগজেব একপিঠে ছাপা কোনো কবিতা, ব্যালাড বা গদ্য বচনা। আঠেবো শতকেব গোড়া থেকেই শব্দটি পাওযা যায। ঐ শতকেবই মাঝামাঝি হাতে হাতে বিলি বা দেওযালে সাঁটাব জন্যে একপাতাব বিজ্ঞাপন ছাপা হতো, তাব নাম ছিল হ্যান্ডবিল। উনিশ শতকেব মাঝামাঝি থেকে এক টুকবো কাগজেব দুপিঠে বা দু-তিন পাতায ছাপা জিনিস বিলি কবা হতো—তাব নাম লিফ্‌লেট। বাঙলায এমন আলাদা আলাদা শব্দ কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু স্বদেশি আন্দোলনেব সমযে নানা ধবনেব ইস্তাহাব ছাপিযে বিলি কবা হতো পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলাব দিকে দিকে।

স্বদেশি আন্দোলনেব যুগে, সেপ্টেম্বব ১৯০৫-এ ববীন্দ্রনাথ লিখলেন 'আমাব সোনাব বাংলা, আমি তোমায ভালবাসি'। গানটি প্রথম ছাপা হযেছিল *সঞ্জীবনী*, ২২ ভাদ্র ১৩১২-য। এমন আবও ছাব্বিশটি গান ববীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কযেক সপ্তাহেব মধ্যে।

ঘটনাচক্রে 'সোনাব বাংলা' হযে উঠল একসাবি ইস্তাহাবেব সাধাবণ নাম। একেব পব এক ছোটো-বড ইস্তাহাব বেবত বাঙলাব নানা কোণ থেকে, ছডিযে দেওযা হতো উত্তব ও দক্ষিণ বঙ্গব জেলা সদব ও মফস্‌সলে। তাব উদ্দেশ্য ছিল জনসাধাবণকে সাম্রাজ্যবাদেব বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত কবা, ইংবেজ সম্পর্কে ভয ভাঙানো। ইস্তাহাবে কোনো নাম থাকত না লেখক, প্রকাশক, ছাপাখানা, প্রকাশেব তাবিখ—কিছুই জানাব উপায নেই। ইস্তাহাবগুলি পডে চমকে উঠতেন শান্তশিষ্ট বাজভক্তবা। বিভক্ত বাঙলাব দুই প্রাদেশিক সবকাবকে তদন্ত কবতে হলো ঐ ইস্তাহাব নিয়ে।

সেই তদন্তেব গল্প এবাব বলব।

প্রধান শিক্ষকই খোঁচড়

কিশোবগঞ্জ (মৈমনসিংহ, এখন বাংলাদেশ-এব একটি জেলা)-এব এক স্কুলেব প্রধান

শিক্ষক, বাবু বমেশ চক্রবর্তী বাঙলাব জনশিক্ষা-অধিকর্তা (ডি পি আই) তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব উপাচার্য, এ পেডলাব সি আই ই, এফ. আব এস-এব কাছে ৩ অক্টোবব ১৯০৫-এ একটি চিঠি পাঠালেন। বঙ্গভঙ্গ-ব প্রশ্নে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে শুরু হযেছে বিক্ষোভ আন্দোলন। বমেশবাবুব অভিযোগ "কিছু বিবল ও সম্মাননীয ব্যতিক্রম" বাদে দেশেব লোক তাদেব মাত্রাজ্ঞান হাবিযে ফেলেছে। আব তাতে ক্ষতি হযেছে বেশিব ভাগ স্কুল-কলেজেব। হেডমাস্টাব মশাযেব মতে, এমন সন্দেহ ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে যে, ইওবোপীয মালপত্র বযকটেব কাজে স্কুলেব ছেলেবা সামনের সাবিতে আসত না, যদি না তলে তলে থাকতেন শিক্ষকবা। কিশোবগঞ্জব অন্য একটি স্কুলেব খোদ প্রধান শিক্ষকও যে স্বদেশি আন্দোলনেব প্রচাবক—একথা লিখতেও বমেশবাবু ভোলেন নি। 'কংগ্রেসওযালা'বাই, তাঁব মতে, সর্বত্র গোলমাল পাকাচ্ছে। সবশেযে বমেশবাবুব অভিযোগ , গত দু-মাসে কলকাতা থেকে কযেকটি রাজদ্রোহী আবেদন কিশোবগঞ্জে এসে পৌঁছেছে। সেগুলিতে লেখকেব নাম নেই। এমন দুটি কাগজ তিনি আগেই জেলাব হাকিমের কাছে পাঠিয়ে দিযেছিলেন। এবাবে, এই চিঠির সঙ্গে তিনি আব-একটি কাগজ পাঠিযে দিলেন। স্কুল-কলেজেব ছাত্রদেব যে সমস্ত রকমেব বযকট ও স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিতে প্রকাশ্যেই বলা হচ্ছে, তাতে বমেশবাবু খুবই দুঃখিত। তিনি লিখছেন . 'আমাদেব বর্তমান বড়লাটের [অর্থাৎ কার্জন-এব] মহান শব্দাবলী উদ্‌ধৃত কবে বলতে হয, এ হলো "বাজনীতিক ও অপেশাদাব লোকেদেব দিযে আমাদেব স্কুল-কলেজ পরিচালনাব পবিণাম।" '

বাজভক্তির নিদর্শনস্বৰূপ যে কাগজটি বমেশবাবু পাঠিযেছিলেন সেটি একটি ছোটো ইস্তাহাব। তার শিবোনাম "সোণার বাঙ্গলা"।

"সোণাব বাঙ্গলা" : আদি নিদর্শন

সবকাবি মহলে নোট চালাচালি থেকে জানা যায কিশোবগঞ্জেব বাজভক্ত প্রধান শিক্ষক যে ইস্তাহাবটি পাঠিযেছিলেন সেটিই সাযেবদেব হাতে প্রথম পড়ে নি। আগেও তাঁবা 'সোণাব বাঙ্গলা'-ব কথা জানতেন। তাঁব কাছে পাঠানো কপিটি পেডলাব সবাসবি পাঠিযে দিলেন বাঙলা সবকাবেব মুখ্য সচিব, আব ডবলু কার্লাইল [ইনিই সেই কুখ্যাত কার্লাইল সার্কুলাব-এব জনক]-কে (২৪ অক্টোবব, ১৯০৫)। কার্লাইল সেটি দেখান বাঙলাব ছোটোলাট, অ্যানড্রু ফ্রেজাব-কে। ফ্রেজাব-এব হুকুমমতো কিশোবগঞ্জ (সবকাবি) সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংবাজী বিদ্যালয-এব প্রধান শিক্ষকেব চিঠিটিব সঙ্গে "সোণাব বাঙ্গলা"-ব একটি ইংবিজি তর্জমা কবে পাঠিযে দেওযা হয পূর্ব বাঙলা ও আসাম সবকাবেব মুখ্যসচিব পি সি লাইঅন, আই সি এস-কে।

সবকাবি আমলাদেব মধ্যে সম্পর্কটা ছিল ভাই-বেবাদবিব। ২৪ অক্টোবব ১৯০৫-এ এইচ এল ফ্রেজাব-কে "সোণাব বাঙ্গলা" সংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠিযে কার্লাইল প্রস্তাব দিযেছিলেন,

"নতুন প্রদেশ (পূর্ববঙ্গ ও আসাম)-এও এই কাগজগুলি মি পেডলাব-এব পাঠানো উচিত।" ফ্রেজাব তাঁব নোট (৩১.১০ ১৯০৫)-এ কার্লাইলকে বললেন, "আপনিই ওটা নতুন প্রদেশের মুখ্য সচিবেব কাছে পাঠিযে দিন।" সেই অনুযাযী কার্লাইল চিঠি পাঠালেন লাইঅন-কে। তাঁব চিঠি (০৪ ১১ ১৯০৫) আব পূর্ব-বাঙলা ও আসাম প্রদেশেব নতুন ছোটোলাট, জে ব্যামফাইল্ড্ ফুলাব-এব মধ্যে নোট-বিনিমযটি পডাব মতো

His Honour,

The pamphlet is our old friend *Sonara Bangala* The Head Master's letter is not without interest Shall I tell him you have seen it?

4th November 1905 P C Lyon

Yes, I have read it with interest

4th November 1905 J B Fuller

ত্রিপুবাব জেলা পুলিশ সুপাব, এইচ এন. প্যারিশ-এব কাছে "সোণাব বাঙ্গলা"-ব কপিটি পাঠানো হলো ইংবিজি তর্জমাব জন্যে। "সোণাব বাঙ্গলা"-কে 'পুবনো দোস্ত' বলাব ন্যায্য কাবণ ছিল। এব আগেই, ১৯ অগস্ট ১৯০৫-এ একে একে এমন দুটি ইস্তাহাব এসেছিল বোগরা আব বাজসাহী থেকে। সেগুলোরও ইংরিজি তর্জমা কবা হয়েছিল।

ইস্তাহাবেব পেছনে কাবা?

কে বা কারা এই ইস্তাহার ছড়াচ্ছিল? প্রথম দফায তদন্ত কবে দেখা গেল ব্রত সমিতি নামে সদ্য তৈবি একটি সংগঠনেব পক্ষ থেকে কলকাতায এই ইস্তাহার বিলি করা হচ্ছে।[২] শেযালদা স্টেশনেব কাছে নভেম্বর, ১৯০৫-এব গোডায উর্দিপবা পুলিশ-এর হাতে এমন একটি ইস্তাহাব ধরিযে দিযেছিলেন ভদ্রদর্শন এক তরুণ। সবকাবেব সন্দেহ হযেছিল টহলবাম-এব সঙ্গে ব্রত সমিতিব যোগাযোগ আছে, কাবণ তাদেব ধ্যানধাবণায মিল দেখা যাচ্ছে।[৩]

১ সেপ্টেম্বব ১৯০৫-এব ববিশালের জমিদাব মনোবঞ্জন গুহ ও কলকাতাব ব্রাহ্ম নেতা বিপিনচন্দ্র পাল এই সমিতি প্রতিষ্ঠা কবেন বলে দাবি কবা হযেছে। তবে তাব সদস্য অল্পই—এই ছিল পুলিশেব ধাবণা।

ইংলিশম্যান-এব আতঙ্কিত হুমকি

৭ সেপ্টেম্বব ১৯০৬-এ দৈনিক *ইংলিশম্যান* পত্রিকায একটি "সোণাব বাঙ্গলা" ইস্তাহাব-এব অনুবাদ বেবল। আব সেই সঙ্গে সম্পাদকীয-য লেখা হলো 'সোণাব বাঙ্গলা' নাম দিযে একটি গুপ্ত সমিতি তৈবি হযেছে। মিশব-এর মতো ভাবতেও বাজদ্রোহসূচক প্রচাব চলতে দেওযা উচিত নয়। বাঙালিদেব সতর্ক কবে বলা হলো তাবা যদি ফিবিঙ্গি

লোকদেব গঙ্গায ছুঁড়ে ফেলতে চায ব্রিটিশবা তাদেব ওপব আগুন আব তলোযাব নিযে নেমে আসবে। ১৮৫৭-ব দিনগুলোব মতো—বা তাব চেযেও বেশি—তাদেব গুলি কবে মারবে ও ফাঁসি দেবে।

এম্প্রেস নামে বাজভক্ত একটি পত্রিকায সেপ্টেম্বব ১৯০৬-এ *ইংলিশম্যান* থেকে ইস্তাহাবটি আবাব ছাপা হলো।[৫] তাব গোড়ায সম্পাদক এক টীকায লিখলেন চুঁচড়ো থেকে এটি বেবিযেছে। এব লেখক "উন্মাদ" বা "স্কুলেব ছেলে" যা-ই হোক না কেন, এব উদ্দেশ্য ভালো নয।

"সোণাব বাঙ্গলা" ইস্তাহাবটি নিযে *ইংলিশম্যান* খুবই গোলমালে পড়েছিল। পত্রিকায লেখা হযেছিল (৭ সেপ্টেম্বব, ১৯০৬) · সোনা প্রাচ্য প্রতীকবাদেব অংশ। তাব জবাবে পরের দিনই *বন্দে মাতবম্*-এ ব্যঙ্গ কবে বলা হলো মনে হচ্ছে এই "সর্বত্র-উপস্থিত দানব" (Ubiquitous monster)-টি [অর্থাৎ বোমান্টিক নামওযালা গুপ্তসমিতি, "সোণাব বাঙ্গলা"] তিব্বতীদেব নির্দেশে চলে, বোধহয কলকাতায আসাব আগে তাশি লামা এই দানবটি গড়েছিলেন। *ইংলিশম্যান* ভাবে "গোল্ডেন" বলতে তিব্বতীরা বোঝান সেই লোকদেব যাঁবা কোনো এক উদ্দেশ্যে প্রাণ দেওযাব শপথ নিযেছেন। সাধাবণ বাঙলা কথায "সোনাব" হলো গর্ব ও স্নেহেব শব্দ, শেক্স্পিযব-এর "সোনাব ছেলেমেযে" (Golden lads and girls)-এব চেযে বেশি বহস্যবাদী বা প্রতীকী কিছু এব মধ্যে নেই। সব শেষে *বন্দে মাতবম্*-এ লেখা হয · কলকাতায ভালো হাসিব কাগজ নেই বলে *ইংলিশম্যান*-ই তা জোগান দিতে বদ্ধপবিকব বলে মনে হচ্ছে, স্পষ্ট বোঝা যায দাম কমিযেও কাগজটির প্রচাব বাড়ে নি।

ইংলিশম্যান বোধহয ভেবেছিল ইস্তাহাবটিব তর্জমা পড়ে সংবাদপত্র মহলে তথা সাবা দেশ জুড়ে হৈ চৈ পড়ে যাবে। কিন্তু *অমৃতবাজাব পত্রিকা, বেঙ্গলী, বন্দে মাতবম্*-এব মতো জাতীযতাবাদী কাগজ তো বটেই, *ইংলিশম্যান*-এর উদ্বেগ নিযে এমনকি *স্টেটসম্যান*-ও হাসিঠাট্টা লাগিযে দিল। গোটা ব্যাপাবটাকেই তাবা বলল "বিবাট ও মনোহব ঘোড়াব ডিম" ["Our Hare street contemporary has had the good fortune to discover a large and impressive mane's nest"]

তবে *ইংলিশম্যান* ব্যাপাবটা অত সহজে ছেড়ে দেয নি। ৮ সেপ্টেম্বব ১৯০৬-এ তাতে একটি চিঠি বেরল। তাব লেখক, জনৈক বি ওয্যাব অভিযোগ করলেন 'সোণাব বাঙ্গলা'-কে অমন তাচ্ছিল্য কবা ঠিক হচ্ছে না। সমস্ত ব্যাপাবটাই হযতো 'প্রলাপ'। কিন্তু তাঁব প্রশ্ন ১৮৫৭-ব আন্দোলনকাবীবা কী ধবনেব গুজব ছড়িযেছিল? কুসংস্কারে অন্ধ নয এমন যে-কোনো লোকেব কাছেও সেগুলো "প্রলাপ" বলেই মনে হযেছিল। কিন্তু তাব ফলটা কী দাঁড়িযেছিল?

বেঙ্গলী-তে পবিষ্কাব বলা হয আমবা এই প্রথম 'সোণাব বাঙ্গলা' নামে একটি সমিতিব কথা শুনলাম। তবে *ইংলিশম্যান*-এব দৌলতে তাব যে প্রচাব হযে গেল, তাবপব সেটিকে আব 'গুপ্ত' সমিতি বলা যাবে না। *ইংলিশম্যান* বড্ড বেশি কানপাতলা। সব

জাযগায এবা বাজদ্রোহব গন্ধ পায। এর ফলে বোকা খোকাবা *ইংলিশম্যান*-কে ঠকানোব জন্যে হবদম এমন ইস্তাহাব আবিষ্কাব কববে।

বন্দে মাতবম্-এব ব্যঙ্গ ছিল আবও তির্যক। *দ স্টেটস্‌ম্যান*-এব সুবেই তাতে বলা হলো "সোণাব বাঙ্গলা" ইস্তাহাবটি এক "উপাদেয ঘোড়াব ডিম" (delicious mare s nest)। চুঁচড়োতে এই গুপ্ত সমিতিব সদব দপ্তব—এই খবব নিযে ঠাট্টা কবে প্রশ্ন কবা হলো চুঁচড়ো না হযে "শিলিগুড়ি বা বেডলাম (পাগলা গাবদ) নয কেন?" ইস্তাহারটিকে এক কথায উড়িযে দিযে *বন্দে মাতবম্*-এ লেখা হযেছে স্বদেশি যুগেব অনেক আগে কিছু দাযদাযিত্বহীন ছোকবা কলমচি হযতো এটা লিখেছিল। *ইংলিশম্যান* ইচ্ছে কবলে তাব গালগল্পব সমর্থনে "মার্সেইজ" (ফবাসি জাতীয সঙ্গীত)-এব থেকে উদ্ধৃতি দিতে পাবত। দলিলটিতে সদস্যদেব নামও বয়েছে—এব উত্তবে *বন্দে মাতবম্* ব্যঙ্গ কবে বলল তাদেব পববর্তী সাধাবণ সভায যেন *ইংলিশম্যান*-এব সম্পাদককে সভাপতি কবা হয, আব ঐ ইস্তাহার-এ তাঁব নামটাও যেন দিযে দেওযা হয।

তাব পবেও *বন্দে মাতবম্*-এ 'সোণার বাঙ্গলা'-কে ঠাট্টা কবে 'চুঁচড়াব অগ্নিস্রাবী বাজদ্রোহী দানব' (fire breathing seditious monster of Chinsurah) বলে উল্লেখ করা হয (১০ সেপ্টেম্বব ১৯০৬)।[৫]

বি এ পাশ খোঁচড়েব বিবৃতি

ইংলিশম্যান কোথা থেকে "সোণাব বাঙ্গলা" পেয়েছিল? তা জানা যায আমীরুদ্দীন আমেদ বি এ-ব বিবৃতি থেকে। ১২ নভেম্বব ১৯০৬-এ পুলিশেব কাছে তিনি জানান মার্চ-এপ্রিল নাগাদ দেওযান আলী ইমদাদ খাঁ তাকে ঐ ইস্তাহারেব দুটি ছাপা কপি দেখিযেছিলেন। খান সাহেবেব কিছু হিন্দু মোসাযেব ছিল, তাদেবই একজন খান সাহেবকে সেগুলো দিযেছিলেন। মৈমনসিংহ-র হাকিম যখন কিশোবগঞ্জ-এ এলেন, দেওযান ও আমীরুদ্দীন তাঁকে ইস্তাহাবেব একটি কপি দেন। কিন্তু তাব ভিত্তিতে কিছু কবা হলো না দেখে আমীরুদ্দীন কপিটি তুলে দেন *ইংলিশম্যান*-এব সম্পাদকেব হাতে। আমীরুদ্দীন কলকাতায এসেছিলেন চিকিৎসাব জন্যে, বথ দেখাব সঙ্গে কলা বেচাব কাজটিও তিনি সেবে নিলেন। দেশে ফেবাব সময়ে স্টিমাবে ডা গোপালচন্দ্র মুখুজ্জে ও বাবু কে সি বাঁড়ুজ্জেব সঙ্গে তাব দেখা হয। দুজনেই ঢাকাব লোক। প্রথম জন ঢাকা মেডিকেল স্কুলেব শিক্ষক, দ্বিতীয জনকে ডা কে সি বাঁড়ুজ্জে বলা হয, ঢাকায শাহীন-এব কাছে তাঁব একটি ওষুধেব দোকান আছে। লোকটি ব্রাহ্ম, বযস্ক, খানিকটা সাদাসিধে আব স্বদেশির পক্ষে নন। স্টিমাবে কিছু বাবু ও ছাত্রবা তাব জন্য তাঁকে হেনস্থা কবছিলেন।

ইংলিশম্যান-এ "সোণাব বাঙ্গলা" বেবনোব পব বিবাট সাড়া পড়ে গিযেছিল, সকলেব মুখেই তাব কথা। গোপাল মুখুজ্জেব সঙ্গে আমীরুদ্দীনও কে সি বাঁড়ুজ্জেব কাছে গিযে বসলেন। বাঁড়ুজ্জেব কাছ থেকে খবব বাব কবাব জন্যে আমীরুদ্দীন বললেন *ইংলিশম্যান*-

এর প্রবন্ধটিকে বিশ্বাস করা যায় না। বাঁড়ুজ্জে চটেমটে জানালেন . "সোণার বাঙ্গলা" নামে সত্যিই একটি সমিতি আছে। আমীরুদ্দিন বললেন : "আপনি যদি সে খবর জানেন তবে আপনি নিজে নিশ্চয়ই তার সভ্য।" বাঁড়ুজ্জে সে কথা অস্বীকার করলেন। আমীরুদ্দীন তখন জানতে চাইলেন ঐ সমিতির খবর বাঁড়ুজ্জে কীভাবে পেয়েছেন। উত্তরে বাঁড়ুজ্জে বললেন ঢাকায় ঐ সমিতির একটি শাখা আছে। তাঁর পরিবারেরই একজন তার সঙ্গে যুক্ত। তিনি সমিতির নিয়মকানুন কিছু জানেন না। কিন্তু তাঁর পরিবারের লোকটির আচার আচরণ থেকে তিনি বুঝতে পারেন সেগুলো রাজদ্রোহী। পাছে সন্দেহ জাগে এই ভয়ে আমীরুদ্দীন এ বিষয়ে আর এগোলেন না।

সিরাজগঞ্জ-এ ফিরে আমীরুদ্দিন জানতে পারলেন . সেখানেও "সোণার বাঙ্গলা" বিলি করা হয়েছে। *হিতবাদী* পত্রিকার দপ্তর থেকে সেটি এসেছিল। কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না দেখে আমীরুদ্দীনও আর কোনো বিশেষ তদন্ত করেন নি। তবে নবাব বাহাদুর (সলিমুল্লা) সব খবর জানেন, তিনিও কিছু তদন্ত করছেন, আরও কিছু মূল্যবান তথ্য এ বিষয়ে তাঁর হাতে এসেছে। আমিরুদ্দীন তাঁর বিবৃতিতে এও জানান যে ইস্তাহারে 'ফিরিঙ্গী' শব্দটি *সন্ধ্যা*-য় প্রায়ই ব্যবহার করা হয়, *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় ঐ শব্দটি নিয়ে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। ঐ সমিতির স্থানীয় নেতা ও সদস্যদের তিনি চেনেন না।

পুলিশ সুপার তাঁর মতামতে বললেন · আরও হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত নবাবের এজাহার নেওয়া হবে না, জি সি মুখুজ্জে ও কে. সি. বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে এখুনি কথা বলাটা বিজ্ঞতার কাজ হবে না। তাতে ফাঁস হয়ে যাবে যে "সোণার বাঙ্গলা" নিয়ে তদন্ত চলছে, আর এ বিষয়ে খবর দিয়েছে কে।

সরকার পড়ল ফ্যাসাদে

ইংলিশম্যান-এ যে তর্জমাটি বেরিয়েছিল সেটি তাদের নিজেদের করানো। আগের ইস্তাহারটি এইচ এন প্যারিশ-এর হুকুম মোতাবেক সরকারিভাবে তর্জমার ব্যবস্থা করেছিলেন ই সি এস বেকার। ১৯০৫-এর অগস্ট-এ বোগরা ও রাজশাহী থেকে এমন দুটি ইস্তাহার পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলিরও ইংরিজি তর্জমা করা হয়। ত্রিপুরা থেকেও যে এমন একটি "রাজদ্রোহী নোটিশ" বেরিয়েছিল সে-কথাও বলা আছে।

ইতোমধ্যে *ইংলিশম্যান, স্টেটস্ম্যান* ও অন্যান্য কাগজে "সোণার বাঙ্গলা" নিয়ে লেখালিখি চলছে। পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও পূর্ব-পশ্চিম বাঙলার আমলারা দুটি 'সোণার বাঙ্গলা' নিয়ে খুবই মুশকিলে পড়ল। স্পেশাল ব্রাঞ্চ বলছে যে তারা এ বিষয়ে কিছু জানে না। ওদিকে পি সি লাইঅন ব্যাপারটিকে "ধাপ্পাবাজি" (hoaxing) বলে উড়িয়ে দিতে নারাজ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৬)। বেকারও তার সঙ্গে একমত। মুখ্য সচিবের কাছে বেকার জানতে চাইলেন . ব্যাপারটা গোপন থাকবে একথা জানিয়ে *ইংলিশম্যান*-কে কি বলে দেখব তারা আমাদের সাহায্য করতে পারে কিনা। লাইঅন অত আশাবাদী ছিলেন

না, তবে চেষ্টা কবে দেখায তাঁবও আপত্তি ছিল না (২২ সেপ্টেম্বব ১৯০৬)। ঐ দিনই বেকাব জিগেস কবে পাঠালেন Shall we abstract sidelines? এ হলো আমলা-জগতেব সন্ধ্যা ভাষা। এব মানে বোধহয এই অন্য কোনো গোপন উপাযে খোঁজ নেব (বেসবকাবি চব মাবফত)? লাইঅনও সংক্ষেপে জানালেন Yes, please।

সি আই ডি-ব ডেপুটি ডিবেক্টব, এ বি বার্নার্ড-এব কাছ থেকে বিপোর্ট এল ১ অক্টোবব ১৯০৬-এ। এবপব কিছু নোট-বিনিময হলো খুব তাডাতাডি

মুখ্য সচিব,

যা তথ্য পাওযাব সবই আমবা পেয়েছি বলে মনে হয। উত্তবেব খসড়া কবে কি আপনাব কাছে পাঠাব?

৬ অক্টোবব ১৯০৬ ই সি এস বেকাব

আমরা যথেষ্ট কবেছি কিনা সে-বিষযে আমাব সন্দেহ আছে। আমাব সঙ্গে এ বিষযে কথা বোলো।

৭ অক্টোবব ১৯০৬ পি সি লাইঅন

ফাইল ও চিঠি চালাচালি চলল ঢাকা থেকে সিমলা পর্যন্ত। ক্রিমিনাল ইন্‌টেলিজেন্‌স্ বিভাগেব অধিকর্তা ছাড়াও মুখ্য সচিবেব কাছে ফাইল পাঠানোব কথা হলো। মনে হয, *ইংলিশম্যান*-এব সম্পাদক, এ ই ডিউশেন (Duchensne) বোধহয় খুব একটা সাহায্য কবতে পাবেন নি। ঢাকা বিভাগেব কমিশনাব, এইচ লেমেজুবিএব (H LeMesurier)-ও "সোণাব বাঙ্গলা"-র উৎস সন্ধানে জডিয়ে পড়লেন। ফাইল-এ স্টুযার্ট-এব ব্যক্তিগত সহকাবী, পি লিও. ফকনাব বিশেষ কবে জানতে চাইলেন "মুসলমানদেব বিষয়ে তথ্যটি কি আপনি লক্ষ্য কবেছেন?" (Have you noted the fact *re Muhammadan?*)

১৬ নভেম্বব ১৯০৬-এ হুকুম হলো 'সোণাব বাঙ্গলা' বা Golden Bengal Society-ব, সমস্ত খবব সিমলাব ক্রিমিনাল ইনটেলিজেন্‌স্-এব অধিকর্তাকে পাঠানো হোক। বোঝা যায, তখনও পর্যন্ত এ বিষযে গোযেন্দা দপ্তব কোনো পাকা খবব পায নি।

ফুটল আশাব আলো

আশাব আলো দেখা দিল ঢাকায। আমীরুদ্দীন বিযে কবেছিলেন *মহামেডান অবজাবভাব*-এব সম্পাদক, আবদুল হামিদ-এব বোনকে। সেই পত্রিকায "সোণার বাঙ্গলা" নিযে কোনো লেখা বেবিযেছিল কিনা তাব খোঁজ করাব পবামর্শ দেন ঢাকাব পুলিশ সুপাব। বাঙলাব স্পেশাল ব্রাঞ্চ-এব কর্তা, মি ডালি (Daly) আবও নির্দিষ্ট খবব চান। পি লিও ফকনাব হতাশভাবে জানাচ্ছেন, "আমাদেব কাছে এখন অবশ্যই যা নেই" (which of course we have not at present)। স্টুযার্ট অবশ্য মৈমনসিংহ-ব দিকেই আঙুল উঁচিযে থাকলেন।

বন্দে মাতবম্-এ ২ মার্চ ১৯০৭-এ যা লেখা হলো, গোযেন্দা পুলিশেব তা নজব এড়াল

না। ঢাকাব কমিশনাব, আর. নাথান-এব কাছে সব কাগজপত্র যাচ্ছে। ফকনাব লিখছেন ব্যাপাবটা চিত্তাকর্ষক (this is interesting)। বেকারও মুখ্য সচিবকে জানালেন "সোণার বাঙ্গলা" ইস্তাহাবগুলো চূড়ান্ত অবস্থায পৌঁছেছে (৩০ এপ্রিল ১৯০৭)।

আমীরুদ্দীন আহ্‌মেদ-এব সঙ্গে পুলিশ আগেই যোগাযোগ কবেছিল। পুলিশেব কাছে তিনি একটি বিবৃতিও দিযেছিলেন। *স্টেট্‌স্‌ম্যান*-এ এ বিষযে একটি চিঠি বেবয (১২-১৩ নভেম্বব ১৯০৬)। পুলিশ সুপার মন্তব্য কবেন আমীরুদ্দীন যেটুকু খুলে বলেছে তাব চেযে আবও বেশি তাব জানা আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে আব কিছু বলতে নাবাজ, কাবণ ঢাকাব নবাব স্বযং এ বিষযে খোঁজখবব নিচ্ছেন। সবকাবি কর্তৃপক্ষকে আবও তথ্য দিযে তিনি সাহায্য কবতে চান। গোযেন্দা দপ্তবেব বড়কর্তা স্টুযার্ট-এব কিন্তু মনে হচ্ছিল 'সোণাব বাঙ্গলা সমিতি' বলে আদৌ কিছু নেই (২৭ নভেম্বব ১৯০৬)। ওদিকে ই সি স্টুযার্ট বেকাব অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন অনুশীলন সমিতিব সঙ্গে "সোণাব বাঙ্গলা" ইস্তাহাবেব যোগ আছে কিনা (৫ ডিসেম্বর ১৯০৬)। এফ সি ডালি-ব কাছে স্টুযার্ট বেকার জানতে চেযেছিলেন *ইংলিশম্যান-এ* "সোণাব বাঙ্গলা" বেরনোব আগেই *মহামেডান অবজাবভাব*-এ সেটি বেবিযেছিল কিনা। ডালি তাব কোনো উত্তব দিতে পাবেন নি; তিনি তাবিখ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি জানতে চেযেছিলেন। বোঝা যায, বঙ্গভঙ্গব পরেও ঢাকা-কলকাতাব যোগাযোগ ভালোভাবে গড়ে ওঠে নি।

আবাব এক "সোণাব বাঙ্গলা"

১৯০৭-এর মার্চে আবাব একটি নতুন 'সোণাব বাঙ্গলা' বেরল। *পাঞ্জাবী* পত্রিকাব ওপব সরকাবি খাঁড়াব কোপ পড়েছিল তাব কযেকদিন আগেই। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যাযেব সাপ্তাহিক *স্ববাজ* (২৬ ফাল্গুন ১৩১৩/মার্চ ১৯০৭)-এ সেটি ছেপে বেবয। *বন্দে মাতবম্*-এ আবাব ব্যঙ্গ কবে লেখা হলো জোব ধাক্কা দিলে প্রতিবাবই 'সোণাব বাঙ্গলা'-ব কাছ থেকে কিছু দামি ফল পাওযা যায় (At every violent jerk the tree *Golden Bengal* yields something precious)। *পাইওনিয়াব* (এলাহাবাদ থেকে প্রচাবিত বাজভক্ত পত্রিকা, ববীন্দ্রনাথেব ভাষায 'সাহেবানুজীবী')-এব দপ্তবে পঞ্জাব বিষযে একটি ইস্তাহাব পৌঁছেছিল। তাতে ডাক দেওযা ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের। *বন্দে মাতবম্* (২ মার্চ ১৯০৭)-এ লেখা হলো আমাদেব সমসাময়িক কাগজটি এখন খোশমেজাজে আছে , তাই বাজদ্রোহেব আস্তানা, বাঙলাকে এই ইস্তাহাবটিব জন্যে আব দাযী কবা হয নি।

পঞ্জাব থেকে বাঙলা

সবকাবি ফাইলে পাঁচটি "সোণাব বাঙ্গলা" ইস্তাহাবেব ইংবিজি তর্জমা পাওযা যায। তাব মধ্যে মাত্র একটিবই মূল বাঙলা কপি বক্ষা পেযেছে। সেটিব কথায পবে আসছি (যদিও সবকাবি নথিব বিচাবে সেটি চতুর্থ)।

পাঞ্জাবী পত্রিকাব ওপব সরকাবি দমননীতিব প্রতিবাদে যে "সোণাব বাঙ্গলা" বেবিযেছিল, তাব একটি তর্জমা ছাপা হয় *পাইওনিযব*-এ। বিনা মন্তব্যে বিপ্লবীদেব সাপ্তাহিক *যুগান্তব* (৩ মার্চ, ১৯০৭)-এ তাব বাঙলা অনুবাদ কবা হলো। শিবোনামেই লেখা আছে "আবাব 'সোনাব বাংলা' "। এব থেকেই বোঝা যায ঐ একই নামেব আগেব ইস্তাহাবগুলিব সম্পর্কে *যুগান্তব* বীতিমতো ওযাকিফহাল। তবে প্রথম দুটি ইস্তাহাব বেবিযেছিল ১৯০৫-এ, *যুগান্তব*-এব তখনও জন্ম হয নি। তৃতীযটি বেবয সেপ্টেম্বব ১৯০৬-য, *যুগান্তব* তখন মুখ খোলে নি। ১৯০৭-এ *যুগান্তব*-এব প্রতিবেদন ছিল এইবকম

আবার 'সোনার বাংলা'

এলাহাবাদ উকীলসভাব একজন অবৈতনিক কর্ম্মচাবীব নিকট হইতে একখণ্ড কাগজ পাইযা পাইওনীযব পত্রিকা তাহা প্রকাশ কবিযাছেন। কাগজ খণ্ডটীব শীর্যদেশে "সোনাব বাংলা" লিখিত ছিল, এবং তাহাতে লেখা ছিল—"ভাবতবাসি। পাঞ্জাবী পত্রিকাব প্রতি যে অন্যায কবা হইযাছে তাহা একবাব ভাবিযা দেখ। ভাবতবাসি। স্বাধীনতাব জন্য যুদ্ধ কব। নিজেকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত কবিযা বহুসংখ্যক দলে বিভক্ত হও। গুপ্তমণ্ডলী গঠন কবিযা প্রথমে রুয বৈপ্লবিকদেব ন্যায কার্য্য কর। সকল সবঞ্জামই পাইবে। তোমাব দেশে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র আছে। তাহা সংগ্রহ কব এবং যথেচ্ছাচাবীদিগকে ভাবতভূমি হইতে বিতাড়িত কবিযা দাও। বন্দে মাতবং।"

স্ববাজ-এ "সোণাব বাঙলা"

মজাব ব্যাপাব হলো, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যাযেব সাপ্তাহিক, *স্ববাজ* (১৯/২৬ ফাল্গুন, ১৩১৩)-এ ঐ একই ইস্তাহাবেব আর একটি বাঙলা তর্জমা দেওযা হযেছে একই সূত্র অর্থাৎ *পাইওনিযব* থেকে।[৬] *যুগান্তব* ও *স্ববাজ*-এব অনুবাদ পুবোপুবি এক নয 'act like Russian revolutionaries at first' বাক্যাংশটি এতে নেই। *স্ববাজ*-এব মন্তব্য থেকে মনে হয "সোণাব বাঙ্গলা" বিযযে আগেও তাদেব জানা ছিল, কিন্তু এই ইস্তাহাবটি আসল না পুলিশেব চক্রান্ত—সে নিযে ধন্দ কাটে নি। *স্ববাজ*-এব প্রতিবেদনটি এই

> প্রযাগেব ফিবিঙ্গী কাগজ একখানা ইস্তাহাব ছাপাইযাছে। উহাতে এই বকম লেখা আছে—
>
> "সোণাব বাঙলা"
>
> "হে ভাবতবাসী 'পাঞ্জাবীব' প্রতি যে অত্যাচাব হইযাছে তাহা বিবেচনা কব। ভাবতবাসী স্বাধীনতাব জন্য পণ কব। অস্ত্র শস্ত্র লও, পল্টন বাঁধো। গুপ্ত সভা স্থাপন কব। পবে ক্রমশঃ সমস্তই পাওযা যাইবে। তোমাদেব

> দেশে অনেক অস্ত্র শস্ত্র আছে। সে সকল কাড়িয়া লও এবং অত্যাচারীদের দেশ হইতে দূর করিয়া দাও। বন্দে মাতরম্।"

এরপর *স্বরাজ*-এর মন্তব্য

> আমরা শুনিলাম যে শুধু প্রযাগে নয—বাঙলা দেশেও ঐ ইস্তাহার বিলি হইয়াছে। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরেও ঐ রকম কাগজ গিয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি যে ইহা কি জুজু—না ইহার ভিতরে কোন সত্য আছে। বারে বারে এই রকম ইস্তাহার কেন জারি হইতেছে। যখনই অত্যাচার হয তখনই সোণার বাঙলা জাহির হয।
>
> দেশে যে রকম আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে—যে রকম লোকের ভাব দাঁড়াইয়াছে—তাহাতে সোণার বাঙলার মত গুপ্ত সভা হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয নহে। ফিরিঙ্গি হাসিযা উড়াইযা দিতে চায বটে—কিন্তু এদিকে ভযে প্রাণ গুরগুর। হাসো আর কাঁদো -পঞ্জাবীর মামলার মত আর দুচারিটা কেলেঙ্কারি হইলেই চার পোযা হইবে।
>
> ফিরিঙ্গী ভিক্ষাপুত্রেরাও হাসিযা উড়াইযা দিবার চেষ্টা করিতেছে। তারা ফিরিঙ্গীকে বটবৃক্ষ করিযা পূজা করিতে চায—তাই তারা—দেশে কি ভযানক বিদ্বেষের আগুন জ্বলিযা উঠিযাছে—বুঝিতে পারে না ও চাযও না। আমাদের মনে হয যে এই—'সোণার বাঙলা—ঐ আগুনের একটা ফিন্‌কি। জানা উচিত যে একটি ফিন্‌কিতে প্রকাণ্ড সহরও পুড়িযা যাইতে পারে। এই ভাবিযা ফিরিঙ্গীর হাসিকান্নার মাপ লওযা উচিত।

ভাষারীতি দেখে মনে হয · এই মন্তব্যর লেখক স্বযং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায।

রুশ জুজুর ভয

এই "সোণার বাঙ্গলা" ইস্তাহারটির তর্জমা *বন্দে মাতরম্* (২৮ ফেব্রুযারি ১৯০৭)-এও বেরিয়েছিল। কিন্তু সেটি দেখার সুযোগ হয নি। এবার আসা যাক "সোণার বাঙ্গলা"-র পঞ্চম ইস্তাহারে। বাকরগঞ্জে পাওযা একটি কপি থেকে সরকারি দপ্তরে তার ইংরিজি তর্জমা করা হযেছিল।

পরপর দুটি ইস্তাহারে রাশিযার উল্লেখ দেখে ব্রিটিশ আমলারা স্বভাবতই একটু ঘাবড়ে গেলেন। তার ওপর যে কোনো ধরনের অস্ত্র নিযে লড়াই-এর ডাক, স্রেফ বঙ্গভঙ্গ রদ নয, স্বাধীনতার দাবি—এগুলোও নিশ্চযই তাঁদের আরও বেশি মাথাব্যথার কারণ হযেছিল।

এই "সোণার বাঙ্গলা" ইস্তাহারটি এখনও পর্যন্ত জানা একমাত্র ইস্তাহার যার মূল বাঙলা রূপ পাওযা গেছে। চিন্মোহন সেহানবীশ এটি পেযেছিলেন স্বদেশি যুগের বিখ্যাত বক্তা ও আইনজীবী, বাঙলার অন্যতম প্রথম শ্রমিক-সংগঠক অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যাযের সংগ্রহ থেকে। তাঁর *রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয বিপ্লবী* (১৯৭৩)-তে মূলের প্রতিলিপি

ছাপা আছে।[৭] পবে, সম্ভবত চিন্মোহনবাবুব বই থেকেই নিযে ইস্তাহাবটিব ফটোকপি দেওযা হযেছে অনিল বিশ্বাস সম্পাদিত *বাংলাব কমিউনিস্ট আন্দোলন*, খণ্ড ১-এ। বাকি চাবটি "সোণাব বাঙ্গলা" ইস্তাহাবেব ইংবিজি অনুবাদই একমাত্র সম্বল। এখানে পঞ্চম ইস্তাহাবেব মূল বাঙলা বযান হুবহু দেওযা হলো

পঞ্চম ইস্তাহাবেব বযান

সোণার বাঙ্গলা

বাঙ্গালি। কুবিল্লাব হাঙ্গামায নিজের বাহু বলেব পবিচয পাইলে, এক্ষণে আব ভীত হইও না নিথেব [নিজেব] বাহুব শক্তিব বৃদ্ধি কব। জানিও যেবাহ ফুমিল্লায তোমাব ধন, প্রাণ, মান বক্ষা কবিযাছে, সেই বাহু বলই তোমায স্ববাজ্য দিবে। যে বাহুতে বন্দুক ধরিযা তুমি আত্ম বক্ষা কবিযাছ, সেই বন্দুক সংযুক্ত বাহুই তোমায স্বাধীনতা প্রদান করিবে।

বাঙ্গালি। কেন ভয পাও, কিসেব ভয [?] প্রত্যেক স্থানে দলবদ্ধ হও, গুপ্ত সভা কবিযা নিজদেব ও দেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামেব জন্য প্রস্তুত কব। যে, যে প্রকাবে পাব অস্ত্র সঞ্চয কবিযা বাখ। প্রত্যেকেই ব্যাযাম দ্বাবা শবীবকে সমযেব উপযোগী কব।

বাঙ্গালি। বন্দুক নাই বলিযা ভয পাও কেন? পৃথিবীব যেসব দেশ সংগ্রাম কবিযা স্বাধীনতা লাভ কবিযাছে, তাহাবাও প্রথমে নিবস্ত্রছিল, কুড়ল, বর্যা [বর্শা], তববাবীই তাহাদেব বিদ্রোহেব প্রথম উপকবণ ছিল। পবে শত্রুব হস্তেব অস্ত্র নানা প্রকাবে কাড়িযা লইযা কার্য্যোদ্ধাব কবিযাছিল। তোমাব দেশে অনেক অস্ত্র আছে, তাহা লইযাই কার্য্য আবম্ভ কবিতে হইবে।

বাঙ্গালি। নিবস্ত্র বলিযা হতাস [হতাশ] হইওনা কযেব দিকে দৃষ্টিপাত কব, দেখ তাহাবা কিরূপে বিপ্লব চালাইতেছে। তোমাকেও প্রথমে তদ্রূপ কবিতে হইবে। জানিও সাহসই মূলাধাব সাহস কব অস্ত্রেব জন্য ব্যাকুল হইওনা, অনুসন্ধান কবিলেই অস্ত্র মিলবে।

বাঙ্গালি। জানিও দুইবাব স্তুমি [তুমি] স্বাধীনতা লাভেব সুযোগ হাবাইযাছ, এক্ষণে বাববাব তিনবাব। এ সুযোগ হাবাইলে আব কখন সুবিধা পাইবে না, জানিও এইবাব জীবন মবণ খেলা, এইবাব শেষ পবীক্ষা।

বাঙ্গালি। মনে বাখিও তুমি "বযকট" প্রচলন কবিযা ইংবাজেব সহিত বিবোধ বাধাইয়াছ, এক্ষণে আব-হটিলে চলিবে না। এক্ষণে বল "হয স্বাধীনতা লাভ, নয বণক্ষেত্রে মৃত্যু।"

বাঙ্গালি। স্বাধীনতাব জন্য প্রস্তুত হও, উঠ জাগ, প্রাণ দিযা জন্মভূমিব বন্ধন মোচন কব।

ইস্তাহারেব ধাক্কা

সবকাবি সূত্রে পাওযা অনুবাদ থেকেই ইস্তাহাবগুলি নিযে আলোচনা কবেছেন হবিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায, সুমিত সবকাব আব সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায। সুমিতবাবু ও সন্দীপবাবু সঠিকভাবেই লক্ষ্য কবেছেন সেহানবীশ-এব অনুমান ঠিক নয। তাঁব দেখা "সোণার বাঙ্গলা" ইস্তাহাবটি ১৯০৬-এব টাউন হল-এ অনুষ্ঠিত প্রতিবাদসভায বিলি কবা হয নি। ইস্তাহাবে কুমিল্লাব হাঙ্গামার কথা আছে। সে হাঙ্গামা হযেছিল ৬ মার্চ ১৯০৭-এ। সুতবাং এই ইস্তাহাবটি তাব পবে লেখা ও বিলি কবা হযেছিল—এমন ভাবাই ঠিক হবে। অশ্বিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায এটি কলকাতায পেযেছিলেন। কিন্তু ২২ এপ্রিল ১৯০৭-এ বাকবগঞ্জ বাব লাইব্রেবিতে এমন গোটা পঁচিশ ইস্তাহাব দেখতে পান জনৈক ব্যারিস্টব শ্রীযুক্ত গুপ্ত। জেলা শাসকেব কাছে তিনি তাব একটি কপি পাঠিযে দেন। এই ইস্তাহাবটি কিছুদিন বাদে পাওযা গেল ববিশালেব বাব লাইব্রেবিতে। এই ইস্তাহাবটি নিযে সবকাবি মহলে উত্তেজনাব কাবণ খুব স্পষ্ট।

হিউজেস বুলাব জানিযেছিলেন "বাশিযাব উল্লেখটি তাৎপর্যপূর্ণ" ("The reference to Russia is significant")। নাথান আবার স্টুযার্ট বেকাবকে জানাচ্ছেন, মৈমনসিংহ এখন উত্তেজিত অবস্থায বযেছে, "সোণাব বাঙ্গলা" ধবনেব একটি 'নোটিস' সেখানেও সাঁটা হযেছে বলে জানিযেছেন ক্লার্ক।

"সোণাব বাঙ্গলা" ও বাঙলাব বিপ্লবীবা

কোনো ইস্তাহারেই লেখক প্রকাশক ইত্যাদিব নাম ছিল না। খুবই অপ্রত্যাশিত জাযগায সেটি হঠাৎ কবে দেখা দিচ্ছিল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন

> "সোনাব বাঙ্গলা" নামক প্রথম ম্যানিফেস্টো দেশে একটা চাঞ্চল্য আনিযাছিল। "বঙ্গ-ভঙ্গ" প্রতিবাদে কলিকাতায যে সর্ব্বপ্রথম প্রতিবাদ-সভা টাউন হলে আহূত হইযাছিল, তথায এই পত্র বিস্তৃতভাবে বিতবিত হয। এত [দ্]দ্বাবা সকলকাব দৃষ্টি আকর্ষিত হয যে, দেশে একদল আছেন, যাঁহাবা "আবেদন ও নিবেদনের থালা" বহিতে প্রস্তুত নহেন। ফুলাবের উদ্দেশ্যে বোমাফেলা সংক্রান্ত ব্যাপাব লইযা বারীন্দ্র ও আমি যখন সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযেব সিমূলতলাব গ্রীষ্মাবাসে গিযাছিলাম, তখন তিনি এই "সোনাব বাঙ্গলা" Pamphlet-এব কথা বলেন। তিনি বলিলেন, 'ইহা Distributed in hundreds and thousands' জানি না কে ভীড়ে আমাব পকেটে ইহা পুবিযা দিযাছিল। যখন অম্বিকা মজুমদাব (ফবিদপুবেব নেতা) বলিলেন, দেখুন মহাশয, কে আমাব পকেটে এই কাগজ পুবিযা দিযাছে, তখন আমি বলি, "বাখুন মহাশয বাখুন, আমাবও পকেটে দিযাছে"।[৮]

ভূপেন্দ্রনাথ জোব দিযে বলেছেন : এই ইস্তাহাব বাঙ্গলার বিপ্লবীদেবই কীর্তি। তবে এমন একটি ইস্তাহাব ছাপা হযেছিল *সন্ধ্যা*-ব [সাবস্বত] প্রেস থেকে। ইংবিজিতে লেখা অববিন্দব "No Compromise ইস্তাহাবটিব মতো "সোণাব বাঙ্গলা"-ও ছিল বিপ্লবী দলেবই ম্যানিফেস্টো, ব্রহ্মবান্ধব বোধহয একেই বলতেন 'কাঁচা সিডিশন'।

শশিভূষণ দে-ব প্রবেশ

পুলিশ কিন্তু হাত গুটিযে বসে ছিল না। শশিভূষণ দে নামে পুলিশেব এক স্পেশাল অফিসাবকে এই দুটি ইস্তাহাব দিযে তাব মতামত জানাতে বলা হলো। সেই মতো ২ নভেম্বব ১৯০৬-এ শশিভূষণ তাব প্রথম বিপোর্ট দাখিল কবল। খোঁজখবব নিযে সে জেনেছিল ১৬ অক্টোবব ১৯০৫-এব (যেদিন থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকব হলো) আগেব বাত্তিবে প্রথম "সোণাব বাঙ্গলা" বিলি কবা হয, বিভিন্ন জেলাব বাব লাইব্রেবিতেও ডাকে পাঠানো হয।

এইখানে বলে রাখি, কলকাতাব শিযালদা-বৌবাজাব অঞ্চলে যে শশিভূষণ দে-ব নামে একটি বাস্তা আছে তিনি এই শশিভূষণ নন। ৭ অগস্ট ১৯০৯-এ এই স্পেশাল অফিসারটি মাবা যায। *স্টেট্‌স্‌ম্যান*-এব প্রাক্তন সম্পাদক, এস কে ব্যাটক্লিফ-কে লেখা ভগিনী নিবেদিতা-ব চিঠি থেকে জানা যায মবার আগে শশিভূষণ মদ ধবেছিল,[১০]—হযতো আতঙ্কে, হযতো অনুশোচনায। ব্যাটক্লিফ-কে অন্য একটি চিঠিতে (২৫ ১১ ১৯০৯) নিবেদিতা জানিযেছিলেন সে [শশিভূষণ] জীবন সম্পর্কে আতঙ্কিত, যেমন শুনেছি কার্জন-এব হযেছিল।[১১]

শশিভূষণেব প্রথম প্রতিবেদনেব সাবকথা হলো

১. দুটি ইস্তাহাবেব শিবোনাম সোণাব বাঙ্গলা।

২ শিবোনামটি ছাপা হযেছে একই আকাবেব টাইপে।

৩ দুটি ইস্তাহাবেব লেখাব বীতিতে মিল আছে, জনসাধাবণকে উদ্দেশ কবে, উত্তেজিত কবে অনুবোধ পবামর্শ দেওযা হচ্ছে এক অদ্ভুত বকমেব হুকুমেব ভঙ্গিতে (in a peculiarly imperative manner)।

৪ দুটি ইস্তাহাবেই হিন্দু ও মুসলমানদেব উদ্দেশ কবে সনির্বন্ধ আবেদন জানানো হযেছে (addressed and exhorted)।

৫ দুটি ইস্তাহাবেই বাক্যগুলিব ফাঁকে ফাঁকে প্রাযই হাইফেন ব্যবহাব কবা হয। *বঙ্গবাসী* ও *সন্ধ্যা* ছাড়া বাঙলা লেখায এটি বিবল।

৬ অর্থেব দিকে না-তাকিযেই লেখাটিকে অস্বাভাবিকভাবে ও নির্বিচাবে একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ কবা হযেছে।

৭ "সোণাব বাঙ্গলা" ও "অক্ষয স্বর্গ" এই দুটি শব্দগুচ্ছ, অন্যান্য শব্দেব সঙ্গে, লেখাব মধ্যে মোটা হবফে ছাপা হযেছে।

৮. দুটিতে একই শব্দ ও বচন (expressions)-এর ব্যবহার করা হয়েছে।

এর ভিত্তিতে শশিভূষণের সিদ্ধান্ত দুটি ইস্তাহারই একই লোকের লেখা, যদিও আলাদা হরফে ও আলাদা সময়ে দুটি ছাপা হয়েছে।

এখানেই তদন্তর পালা চুকল না। পরের প্রতিবেদনে লেখকের পরিচয় দেওয়া হবে—লোয়ার প্রভিনসেস-এর আই জি-র ব্যক্তিগত সচিবকে এই আশ্বাস দিয়ে শশিভূষণের প্রথম প্রতিবেদন শেষ হয়।

শশিভূষণের দ্বিতীয় প্রতিবেদন

২০ নভেম্বর ১৯০৬-এ দ্বিতীয় দফায় শশিভূষণ জানাল দুটি ইস্তাহারই কুখ্যাতিকামী (seeking notoriety)। দুটিই যে এক পয়সার দিশি কাগজ, *সন্ধ্যা*-র সম্পাদকের লেখা—এমন ধারণা না হয়ে যায় না। প্রথম প্রতিবেদনে যা যা বলা হয়েছিল এখানে আবার সেগুলোই বলা হয়। যেমন,

১ *সন্ধ্যা*-র রীতির সঙ্গে ইস্তাহার দুটির রীতির মিল আছে।

২ অর্থ-র দিকে না তাকিয়ে অনুচ্ছেদ ভাগ করা হয়েছে।

৩ বাক্যর মধ্যে মধ্যে প্রচুর হাইফেন-এর ব্যবহার, *সন্ধ্যা* আর *বঙ্গবাসী* ছাড়া আর কোনো কাগজের বাঙলা লেখায় যা বিরল। কিন্তু অন্য কোনো দিক দিয়েই *বঙ্গবাসী*-র সঙ্গে [ইস্তাহারটির] কোনো মিল নেই।

৪ দুটি ইস্তাহারই হিন্দু ও মুসলমানদের উদ্দেশ করে লেখা হয়েছে, *সন্ধ্যা*-য় যা মাঝে মাঝে করা হয়।

৫ *সন্ধ্যা*-র সম্পাদকের প্রিয় কিছু শব্দ ও বচন দুটি ইস্তাহারেই দেখা যায়। তার একটি আলাদা তালিকাও এর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে

এর পরে *সন্ধ্যা*-র সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও উপ-সম্পাদক (Sub Editor) [সম্ভবত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী] সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা হয়েছে। এঁদের লেখার ধরন দু-রকমের। একজনের [অর্থাৎ শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী-র] রীতি ভদ্রগোছের, অন্যজনের রীতি বেশ খারাপ। এই দ্বিতীয়জনের রীতির সঙ্গে ইস্তাহার দুটির রীতি মেলে। সুতরাং শশিভূষণের মতে, ব্রহ্মবান্ধবই ঐ দুটির লেখক।

প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয় বাহ্য প্রমাণ বলতে তেমন কিছু নেই। ছাপার পর ইস্তাহার দুটির 'ম্যাটার' (সাজানো টাইপ) নিশ্চয়ই চেলে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। তেমন কোনো সরাসরি প্রমাণ থাকলেও, একবছর বাদে সেগুলি হাজির করলে জজ ও জুরিমণ্ডলী সেগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখবেন। তবে পুলিশের দৃষ্টিকোণ থেকে তেমন কোনো সাক্ষ্য যদি পাওয়া যায়, অবশ্যই তা জোগাড় করতে পারেন।

শশিভূষণ কেমন ঘুঘু লোক ছিল তা বোঝা যায় তার তৈরি ফিরিস্তি থেকে। ইস্তাহার-এ যে 'আটটি' শব্দ ব্যবহার হয়েছে সেগুলি *সন্ধ্যা*-তেও প্রায়ই পাওয়া যায়—তার চোখে সেটা

ধবা পডেছিল। শব্দগুলো এই

১. ফিবিঙ্গী
২. বাঙ্গালী
৩ ভাই
৪ ধন্য
৫ ইজ্জত
৬ শক্তি
৭ সাবধান
৮ নেতা

শশিভূষণেব প্রতিবেদনে শব্দগুলি আছে বোমান হবফে, উচ্চাবণসূচক কোনো চিহ্ন দেওযা নেই। কিন্তু পবে বাঙলা হবফে যে তুলনামূলক তালিকা সে দিযেছে তাতে এই বাঙলা হবফেই শব্দগুলি পাওযা যায।

এবপর শশিভূষণেব নজব গেছে বানানেব দিকে। দুটি ইস্তাহাব ও *সন্ধ্যা*-য তিনটি শব্দ লেখা হয়েছে এইভাবে . 'ফিবিঙ্গী', 'বাঙ্গালী', 'দেশী জিনিস'। ১৩১৩-ব ভাদ্র ও আশ্বিন মাসেব কোন্ কোন্ তাবিখেব *সন্ধ্যা*-য 'বাঙ্গালী' বানানটি পাওযা গেছে—তাও প্রতিবেদনে দেওযা আছে। তাবপব আসে চব্বিশটি শব্দ ও বচনেব তুলনামূলক ফিবিস্তি। সেটি এইবকম

সংখ্যা	ইস্তাহারগুলিতে শব্দ ও বচন	১নং না ২নং ইস্তেহাবে	*সন্ধ্যা*-য ব্যবহৃত একই ধবনেব শব্দ ও বচন	*সন্ধ্যা*-ব যে যে তাবিখে ব্যবহৃত হযেছে।
১.	নিমকহাবাম	১ ও ২	নিমকহাবামী	২২শে আযাঢ, ২৪শে ভাদ্র, ১৩, ১৬, ১৮, ২২ ও ২৭শে কার্তিক, ২, ৫, ১৫, ২৫শে অঘ্রান
২	হৈ চৈ	২	হৈ চৈ	১২, ২৭ শে শ্রাবণ, ২৬শে আশ্বিন, ১৫ই কার্তিক, ৩বা ও ৬ই পৌয।
৩	মবদ	১	মবদ	৩বা পৌয

৪	তেজ দেখাও,	১	তেজ দেখাইতে, মনেব তেজ, তেজেব সঞ্চাব, অত তেজ, তেজ	২৭ ও ২৯শে কার্তিক, ও ৯ই অঘ্রান, ২৩শে অঘ্রান, ৮ই অঘ্রান, ৩বা ও ৮ই পৌষ।
৫	ফিবিঙ্গী	১ ও ২	ফিবিঙ্গী	২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৭ ও ৩০শে ভাদ্র ও ৬ই আশ্বিন।
৬	মান ইজ্জত বজায	১ ও ২	মান ইজ্জত বজায়, মান ইজ্জত	১২ই অঘ্রান ২৩শে ভাদ্র, ১৪, ১৬, ২২ ও ২৮ কার্তিক, ৫, ৭, ১২ ও ২১শে অঘ্রান, ৫ ও ১২ই পৌষ।
৭	উঠ ভাই, জাগো ভাই	১	উঠ, উঠ, জাগ, জাগ এইবাব উঠ জাগ জাগো উঠ একবাব জাগ উঠ জাগ আর ঘুমাইলে চলিবেনা।	৩বা আশ্বিন ১৭ই আশ্বিন ২৫ আশ্বিন ২১ অঘ্রান ২৯ অঘ্রান
৮.	ভাই হিন্দুমুসলমান	১ ও ২	ভাই হিন্দু মুসলমান, মুসলমান ভাই	২৮শে অঘ্রান (দুবাব) ২৪শে ভাদ্র
৯	কাজ চাই, কথায চিড়ে ভিজিবে না	২	কথায চিড়ে ভিজিবে না কাজ চাই এখন যে ভাবে কথা হইতেছে তাহাতে চিড়া ভিজিতেছে কথায চিড়ে ভিজেনা	১৪ই কার্তিক ২৭ শে কার্তিক ৩বা আশ্বিন ৪ঠা পৌষ
১০	প্রস্তুত হও সদা প্রস্তুত	২ ১	প্রস্তুত হও	২৫শে আশ্বিন, ২৫শে কার্তিক
১১	শক্তি জাগাও	২	শক্তি জাগিলে	২৭শে আশ্বিন
১২	স্বর্গ হইতে গবীযসী	১	স্বর্গাদপি গবীযসী জননী	২০শে কার্তিক
১৩	চুপ কবিযা বসিযা	২	আব কি চুপ কবিযা থাকা	২৭শে কার্তিক

	আছ		যায	
১৪.	ভয নাই	২	ভয নাই	—
	ভয কিসেব	২		
১৫	মানুষেব মানুষ বলিযা যাবা পবিচয দিতে চায।	১	মানুষ হও	৩০শে কার্তিক
১৬	দল বাঁধ	১ ও ২	দল বাঁধিবাব ক্ষমতা আছে	২বা অগ্রান
			দল বেঁধে কাজ কর্ম্ম কবা	১২ই পৌয
১৭	সোনাব বাঙ্গালা	১ ও ২	সোনাব বাঙ্গলা	১২ই অগ্রান
	সোনাব মা	১	সোনাব ছেলে,	২বা অগ্রান, ৩বা
			সোনাব দেশ,	পৌয
			সোনাব ববিশাল	৮ই অগ্রান
১৮	চোক ফাটি বক্ত বাহিব হয না কেন?	১	চোক ফাটিযা জল বাহিব হয	২বা অগ্রান
১৯	কাটা ঘাযে নুনেব ছিটে দিতেছে	২	কাটা ঘাযে আবও নুনেব	৪ঠা অগ্রান,
			নুনেব ছিটে দিযাছে	১৯শে অগ্রান
২০.	কোমব বাঁধ	১ ও ২	কোমব বাঁধিযা লাগিযাছে	১৯শে অগ্রান
			কোমব বাঁধিযা দাঁড়াইয়াছি	২১শে অগ্রান
			কোমব বাঁধিযাছে	২৫শে অগ্রান
			মানুষেব মত কোমব বাঁধিযা দাড়াও	২৯শে অগ্রান
২১	মাযেব সন্তান	১ ও ২	মাযেব সন্তান	২৬ ও ২৯শে অগ্রান, ৭ই পৌয
২২	মাযেব ছেলে	১	মাযেব ছেলে	৪ঠা পৌয
২৩	বাঙ্গালা ভাঙিযা ফেলিল	২	বাঙ্গালা ভাঙ্গিতে	২বা অগ্রান
২৪	দেশী জিনিয		দেশী জিনিয	২৫ ও ২৭শে কার্তিক, ৫ই অগ্রান, ৬ই পৌয

তৃতীয প্রতিবেদন

৫ ডিসেম্বব ১৯০৬-এ শশিভূষণ তাব তৃতীয প্রতিবেদন দাখিল কবল। গোপন সূত্রে সে খবব পেযেছিল কালীঘাটেব জনৈক জ্যোতিলাল মুখোপাধ্যায *প্রতিজ্ঞা* নামে একটি বাঙলা

সাপ্তাহিকেব সঙ্গে যুক্ত। ১৯০৫-এ তিনি প্রতিজ্ঞা প্রেস থেকে প্রথম "সোণাব বাঙ্গলা" ইস্তাহারটি ছাপেন। *সন্ধ্যা*-র দপ্তবে বসে জ্যোতিলালেব সাহায্যে সেটিব খসড়া কবেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব। *সন্ধ্যা* ছিল দৈনিক কাগজ, তাই *সন্ধ্যা*-ব নিজস্ব প্রেস, সাবস্বত-এ ইস্তাহাবটি না ছেপে ছাপা হয প্রতিজ্ঞা প্রেস-এ। সেটি কম্পোজ্ কবেন জযনগব [(এখন দক্ষিণ) চব্বিশ পবগনা]-বাসী জনৈক ভূতনাথ মিত্র। সন্দেহ এড়ানোব জন্যে জ্যোতিলালেব উপস্থিতিতেই দিনেব বেলা সেটি ছাপা হয, ছাপাব ম্যাটাব, প্রুফ ইত্যাদি কাঁচি দিযে কেটে টুকবো টুকবো কবে ফেলা হয। জ্যোতিলালেব পবিচযও জানা গিযেছিল। তাঁব মা ছিলেন কালীঘাটেব ফকিবচাঁদ হালদাবেব মেযে, আব বাবা চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যাযেব দেশ ছিল নদীযাব শান্তিপুবে। জ্যোতিলাল এক সময়ে বেঙ্গল পুলিশেব সাব-ইন্‌স্‌পেকটব ছিলেন। মেদিনীপুরেব পুলিশ সুপাব, মিস্টাব ব্যাসল্-এব সঙ্গে তাঁব ঝগড়া হয। তাব দরুন তাঁব চাকবি যায।

বাঙলা সবকাবেব বাঙলা অনুবাদকেব দপ্তব থেকে জুলাই-ডিসেম্বব ১৯০৫-এব কপি আনিযে শশিভূষণ দেখাল

(ক) ইস্তাহাব ও *প্রতিজ্ঞা* পত্রিকায কযেকটি শব্দ ও পঙ্‌ক্তিব ক্ষেত্রে একই ধবনেব টাইপ ব্যবহাব কবা হযেছে।

(খ) হাইফেন-এব জাযগায তিনটি বিন্দু চিহ্ন আছে, আর

(গ) প্রাযই একই পঙ্‌ক্তিতে অক্ষবেব গবমিল [অর্থাৎ বং ফন্ট] দেখা যায। এছাড়া,

(ঘ) *প্রতিজ্ঞা* ও ইস্তাহার একই ধবনেব টাইপে ছাপা হয, ও

(ঙ) লাইন-এব ভেতবকাব স্পেস্ দু-এব ক্ষেত্রেই এক।

শশিভূষণ নিজ উদ্যোগে জ্যোতিলালেব হাতেব লেখা জোগাড় কবেছিল। সবকাবেব তবফে তাকে যে তিনটি নমুনা দেওযা হযেছিল (সেগুলো *পাবনা হিতৈষী* পত্রিকাব দফ্‌তবে ডাকে পাঠানো লেফাযার ওপবকাব হাতেব লেখা) সেগুলিব সঙ্গে মিলিয়ে তাব সিদ্ধান্ত দুটিই একই লোকেব হাতেব লেখা।

জাল গুটোনোব পালা

এইভাবে ব্রহ্মবান্ধব ও জ্যোতিলালেব বিরুদ্ধে পুলিশেব জাল গুটোনো শুরু হলো। কী কবে দুজনকেই মামলায জড়ানো যাবে তাব জন্যে শশিভূষণ আবও কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাডেব সুপাবিশ কবল, সে নিজে কী কী তদন্ত কববে তা-ও জানাল। "বাজা কে?" এই নামেব ইস্তাহাবগুলিব ব্যাপাবেও যে জ্যোতিলালেব হাত ছিল—সে-কথা জানাতেও শশিভূষণেব ভুল হলো না। তাব মতে, সব সাক্ষ্যপ্রমাণ জড়ো হলে যদি দেখা যায আইন 'আমাদেব পক্ষে', তাহলে ভূতনাথ মিত্রকে গ্রেপ্তাব কবতে হবে, কাবণ ব্রহ্মবান্ধব বা জ্যোতিলালেব চেযে তাকে দিযে স্বীকাবোক্তি কবানো সহজ। *প্রতিজ্ঞা*-ব ৩০ অগস্ট ১৯০৫

সংখ্যা থেকে একটি গদ্যবচনাব ইংবিজি অনুবাদ (Appeals to blows) ও একটি গানেব ("Awaking") সাবাংশও এই প্রতিবেদনে দেওযা ছিল। গানটিব ভূমিকায বলা হযেছে · অস্ট্রিয আধিপত্যেব বিরুদ্ধে এই ধবনেব একটি গান গেযে দুঃখিনি দেশমাতাব জন্যে সহানুভূতি কুড়োনোব উদ্দেশ্যে ইতালিয কোনো দেশপ্রেমিক দোবে দোবে ঘুবতেন।

চতুর্থ প্রতিবেদন

২ জানুযাবি ১৯০৭-এ শশিভূষণ তাব চতুর্থ প্রতিবেদন দাখিল কবল। সবকাবি হস্তাক্ষব-বিশাবদ, সি আব হাউলেস-ও তাব সঙ্গে একমত হযে জানিযেছেন লেফাফাব ওপবের হাতেব লেখাব সঙ্গে জ্যোতিলালেব হাতেব লেখাব মিল আছে। শশিভূষণ আবাব জানায প্রথম "সোণাব বাঙ্গলা" ও "বাজা কে?" নামেব দ্বিতীয ইস্তাহাবটি *সন্ধ্যা-ব* দপ্তবে বসে খসড়া কবেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব ও জ্যোতিলাল, ছাপা হযেছিল কালীঘাটেব প্রতিজ্ঞা প্রেস-এই—তবে, দিনেব বেলায নয, কাজটি হযেছিল বাত্তিবে, অমবনাথ মুখোপাধ্যায ও শ্রীপদ ভট্টাচার্য-ব তত্ত্বাবধানে। সেখানে হাজিব ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব ও জ্যোতিলাল। বড (অর্থাৎ প্রথম "সোণাব বাঙ্গলা") ইস্তাহাবটি ছাপা হযেছিল জুলাই ১৯০৫-এ, আব "বাজা কে?"—তাবই প্রায হপ্তা দুই পবে। *সন্ধ্যা* দপ্তব থেকে জ্যোতিলাল ও ব্রহ্মবান্ধবই সে-দুটি প্রচাব কবেন। প্রতিজ্ঞা প্রেস-এব হেড কম্পোজিটব ছিলেন ভূতনাথ মিত্র। বিপিনচন্দ্র দাস ও কলকাতাব ন্যাড়া গির্জাব বাসিন্দা, সতীশচন্দ্র কাইত-এব সাহায্যে তিনি ইস্তাহাব দুটি কম্পোজ কবেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেগুলি ছাপা হয খিদিবপুবে একটি প্রেস-এ। শেখ দেদাব ও শেখ মোজাহাব-এব সাহায্যে সেগুলি ছাপে শেখ ভানু। মোজাহাব এখন আলিপুব জেল প্রেস-এ কাজ কবে।

১১ ডিসেম্বব ১৯০৬-এ বাঙলা সবকাবেব বাঙলা অনুবাদক জানালেন "শশিবাবুব অনুমান ঠিক।" তিনি শুধু একটি নতুন কথা যোগ কবেন "যদিও দুটি ইস্তাহাবেব লেখক হিসেবে সমস্ত আভ্যন্তবীণ সাক্ষ্যই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যাযকে নির্দেশ কবে, তবে এও সম্ভব যে সেগুলি লিখেছিলেন ব্রহ্মবান্ধবেব লিখনবীতিব কোনো ঘনিষ্ঠ অনুকাবক ও তাঁব বাজনৈতিক মতেব আগ্রহী প্রচাবক (warm advocate)। তবে এটি একটি সম্ভাবনা মাত্র।" লোকটিব বুদ্ধি ছিল, সন্দেহ নেই।

পঞ্চম প্রতিবেদন

১৩ জানুআবি ১৯০৭-এ শশিভূষণ তাব পঞ্চম প্রতিবেদন পেশ কবল। তাতে বলা হলো "ভাবতীয দণ্ডবিধিব ১২৪ ক ধাবা অনুযাযী অভিযুক্তদেব বিচাব কবা যায।" "সোণাব বাঙ্গলা" ইস্তাহাবেব সঙ্গে যুক্ত দশ জনকেই গ্রেপ্তাব কবা যেতে পাবে। তবে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায ওবফে ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায, জ্যোতিলাল মুখোপাধ্যায, শ্রীপদ ভট্টাচার্য (তত্ত্বসাগব) ও অমরনাথ মুখোপাধ্যায অন্য ছ'জনেব চেযে "বেশি বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত।" ইস্তাহাবটিব খসড়া

কবা ও প্রুফ শোধবানোব কাজে এঁবা সবাসবি যুক্ত ছিলেন, তাই এঁদেব তবফে নিজেদেব অপবাধ স্বীকাব কবাব সম্ভাবনা কম। বিশেষ কবে জ্যোতিলাল একজন ছাঁটাই পুলিশ অফিসাব ও অন্য তিনজনেব প্রচণ্ড (staunch) বন্ধু'। শেখ ভানু, শেখ দেদাব ও শেখ মোজাহাব নিবক্ষব প্রেসম্যান, তাবা তাই বলতে পাবে কাজটা যে অপবাধমূলক সেটা তাবা জানত না। সুতবাং প্রতিজ্ঞা প্রেস-এ যে-দশজন হাজিব ছিল সেই ঘটনাব সাক্ষী হিসেবে তাদেব হাজিব কবা যেতে পাবে। বিপিনবিহাবী (-চন্দ্র?) দাস ও সতীশচন্দ্র নন্দী হেড কম্পোজিটব ভূতনাথ মিত্রকে সাহায্য কবেছিল মাত্র, তাই শুধু সাক্ষী হিসেবেই তাবা বিবেচনাব যোগ্য, কিন্তু ভূতনাথ যথেষ্ট বাঙলা জানে, ইস্তাহাবটি যে বাজদ্রোহী প্রকৃতিব সেটা সে বোঝে। সুতবাং তাকে অভিযুক্ত হিসেবে ধবা উচিত। লোকটি নার্ভাস স্বভাবেব, আর্থিক অবস্থাও ভালো নয়, প্রতিজ্ঞা প্রেস-এব কাজও সে ছেড়ে দিয়েছে। তাকে গুছিয়ে ও ভালোভাবে জেবা কবলে অপবাধেব পুবোটাই সে কবুল কবে ফেলতে পারে।

শশিভূষণ সেই সঙ্গে জানাল, (ব্রহ্মবান্ধব প্রমুখ) পাঁচজন অভিযুক্ত ব্যক্তিবই আর্থিক অবস্থা খাবাপ, কিন্তু তাদেব বন্ধু, বজতনাথ বায, চিত্তবঞ্জন দাস ও সুবেন্দ্রনাথ হালদাব— এই তিন ব্যবিস্টাব ও আবও কেউ কেউ হযতো বিনা পাবিশ্রমিকে আদালতে তাঁদেব পক্ষ সমর্থন কবতে পাবেন, যদিও টাকা দিয়ে তাঁদেব সাহায্য কববেন না। অভিযুক্তদেব গ্রেপ্তাব করা মাত্র সাক্ষীদেব জেবা কবা হবে, বিশেষত বিপিনচন্দ্র দাস ও সতীশচন্দ্র নন্দীব এজাহাবদুটি নথিভুক্ত কববেন কোনো ম্যাজিস্ট্রেট। মামলাটি যেহেতু কেবল কোর্ট অফ সেশনস্-এ বিচাবযোগ্য নয, তাই বিচাবেব দাযিত্বে চব্বিশ পবগনাব জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা আলিপুবেব সাবার্বান ম্যাজিস্ট্রেট-এব থাকা উচিত। সাবধান কবে দিযে শশিভূষণ বলে জুবিমণ্ডলীব কাছে মামলাটি যেন না যায, কাবণ জুবি-ব সদস্যবা ভাবতীয বলে অভিযুক্তদেব প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পাবেন। ঘটনাব দেড় বছব পবে যেসব প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল কবা হবে, সেগুলি তাঁবা বিশ্বাস কববেন না, আব সম্ভাবনাব ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞবা যে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়েছেন সেসব বুঝতে তাঁবা প্রায অপাবগ।

শশিভূষণ জানাল, গোপন তদন্ত এমন একটা জাযগায এসছে, যেখান থেকে আব এগোনো যায না। "আবও তদন্ত চালালে গোটা ব্যাপাবটাই জানাজানি হওযাব ঝুঁকি আছে।" মামলাব দাযিত্বে থাকা উচিত কলকাতা পুলিশেব ইন্স্পেকটব, বি সি ভৌমিকেব ওপব [যেহেতু ঘটনাটি কলকাতা এলাকায ঘটেছে]। তাঁদেব তত্ত্বাবধান কববেন কলকাতা পুলিশ-এব গোযেন্দা বিভাগেব সুপাবিনটেনডেন্ট্, মিস্টাব এলিস। সেই কাবণেই বি কে গুপ্তকে জোড়াসাঁকো থানাব ও সি-ব দাযিত্ব থেকে সবিযে ভবানীপুব থানায বদলি কবা দবকাব—প্রতিজ্ঞা প্রেস এখন তাবই স্থানীয এলাকায পড়ে আব বি কে গুপ্তকেই মামলায লক্ষণীয ভূমিকা নিতে হবে।

সবকাব এই সব সুপাবিশই তখনকাব মতো মেনে নিল।

সবকাবেব প্রতিক্রিয়া

এবাব প্রকাশ্য তদন্তব জন্যে নির্দেশ বেবল। ঠিক হলো শুধু "সোণাব বাঙ্গলা"-কেই মামলাব বিযয কবা হবে। শশিভূষণেব সুপাবিশ অনুযাযী সব অভিযুক্তব নাম, ঠিকানা জোগাড হলো। কলকাতা পুলিশ ও সি আই ডি-ব কোন্ কোন্ অফিসাব ক'জন কনস্টেবল নিযে কাব কাব বাড়ি হানা দেবে, কী কী কাগজ বাজেয়াপ্ত কবা হবে তাবও নির্দেশ দেওযা থাকল।[১১]

শশিভূষণেব শেষ সংযোজন

শশিভূষণ তাব পঞ্চম তথা শেয প্রতিবেদনেব সঙ্গে ১৭ জানুআবি ১৯০৭-এ আবও কিছু খবব যোগ কবল। যেমন, বিপিন দাস তখনও প্রতিজ্ঞা প্রেস-এ হেড কম্পোজিটব হিসেবে কাজ কবছে। সে আছে শ্রীপদ ভট্টাচার্য ও অমবপ্রসাদ মুখোপাধ্যাযেব হাতেব মুঠোয। সুতবাং তাকে সাক্ষী হিসেবে না ধবে অভিযুক্ত হিসেবে ধবা ছাড়া অন্য উপায নেই। বাকি চাব সাক্ষীব ঠিকানাও শশিভূষণ জোগাড় কবে ফেলেছিল।

যবনিকাপাত—অন্যভাবে

পাঠক-পাঠিকা হযতো ভাবছেন . এই ঘটনাব সূত্র ধরেই ব্রহ্মবান্ধব প্রমুখ পাঁচজনকে এবাব গ্রেপ্তাব কবা হবে। কিন্তু তা হলো না। শশিভূষণ দে-ব অত তদন্ত ও মেহনত বৃথা গেল। মুখ্যসচিবকে লেখা একটি নোট-এ কলকাতা পুলিশ-এব আই জি, সি জে স্টিভেনসন মুব গোটা ব্যাপাবটায জল ঢেলে দিলেন। তিনি জানালেন (২১ জানুআবি ১৯০৭) এ মামলা চালানো বাজনৈতিকভাবে ঠিক হবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি এব পক্ষে সুপাবিশ কবি না। ইস্তাহারটি প্রায দেড বছবেব পুবনো আব মামলা যদি সফলও হয তা পডতায পোযাবে না—খাজনাব চেযে বাজনা বেশি হযে যাবে। ব্রহ্মবান্ধব প্রমুখ ক জনকে শাস্তি দিলে দলেব নেতা, বিপিনচন্দ্র পাল গুকতবভাবে পঙ্গু হযে পড়বেন না। তিনি যে-লাইন ধবেছেন সেটি চালিযে গেলে শেষ অবধি তিনি আইনেব মুঠোয ধবা পডবেন।

আব মোকদ্দমায জেতাটা যদি রাজনৈতিকভাবে সমীচীনও হয, তাহলে একজন বাজসাক্ষী ছাডা এ মামলা টেঁকাব কোনো সম্ভাবনা নেই। *সন্ধ্যা*-ব সম্পাদকেব বচনাবীতি, জ্যোতিলালেব হাতেব লেখা ইত্যাদি প্রমাণ খুব জোবালো নয। ভূতনাথ আদৌ বাজসাক্ষী হবে কিনা সেটা নিশ্চিত না কবে এগিযে লাভ নেই।

২১ জানুআবি ১৯০৭-এ আব ডবলু কার্লাইল তাই বড়লাটকে লিখলেন "সোণাব বাঙ্গলা" নিযে এগিযে কোনো লাভ নেই। যদি মোকদ্দমা কবতেই হয তাহলে *সন্ধ্যা*-ব লেখাব ভিত্তিতেই তা কবা যেতে পাবে। প্রায এমন একটা হপ্তাও যায না যাতে *সন্ধ্যা*-য অমন লেখা না বেবয।

শেষ কথা

গল্প এখানেই শেষ। শশিভূষণ দে-ব পক্ষে ব্যাপাবটা কেমন যেন পবপব মই দিযে উঠে সাপেব মুখে পড়াব মতো। অলঙ্কাবশাস্ত্রে যাকে বলে নিকর্ষ বা অ্যান্টি-ক্ল্যাইম্যাক্স্। অবশ্য ব্রহ্মবান্ধব বেহাই পেলেন না। *সন্ধ্যা*-ব বিরুদ্ধে সবকাবি আঘাত নেমে এল ৭ অগস্ট ১৯০৭-এ। *সন্ধ্যা*-ব দপ্তবে খানাতল্লাশি কবতে এল পুলিশ বাহিনী। মোকদ্দমা শুরু হলো তিনটি সম্পাদকীয় বচনাব বিরুদ্ধে। বেপবোযা বিবৃতি দিলেন ব্রহ্মবান্ধব ঈশ্বব-নিযুক্ত স্ববাজ সাধনায নিযুক্ত থাকাব জন্যে তিনি বিদেশী সবকাবেব কাছে জবাবদিহি কবতে বাজি নন। "সোণাব বাঙ্গলা"-কে কেন্দ্র কবে যা ঘটল তাকে বহ্বাবম্ভে লঘুক্রিযা ছাডা আব কিছু বলা যায না।

তাহলে এ গল্প-বলাব কী দবকাব ছিল? "সোণাব বাঙ্গালা" তো কোথায হাবিযে গেছে। একটি ইস্তাহাব বাদে আব কোনোটিব মূল বাঙলা বযানেব হদিশই পাওযা যায না—কাঁচা ইংবিজিতে তাদেব তর্জমাই এখনও পর্যন্ত আমাদেব একমাত্র সম্বল। "বাজা কে?"-ব ক্ষেত্রেও একই কথা। ইস্তাহাবগুলিতে কোনো বাজনৈতিক দর্শনেব তত্ত্বকথা নেই, সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্থাযী মূল্য নেই, এমনকি ইস্তাহাবটি নিযে ব্যাপক জনসমাজেব মধ্যে বিবাট আলোড়ন ঘটেছিল—এমনও কোনো প্রমাণ নেই। তবে এব গুরুত্ব কোথায?

গুরুত্ব এইখানেই যে প্রকাশ্যে স্বাধীনতাব দাবি এব আগে কেউ তোলে নি। প্রথম "সোণাব বাঙ্গলা" ইস্তাহাব বেবিযেছিল ১৯০৫-এ। দ্বিতীয কথা, ব্রহ্মবান্ধবেব সঙ্গে জ্যোতিলাল মুখোপাধ্যাযেব এই গোপন যোগেব কথা স্বদেশি আন্দোলন বা উপাধ্যায বিষযক কোনো বই-এ পাওযা যায না। জ্যোতিলালেব পববর্তী জীবন ইত্যাদি সম্পর্কেও কিছু জানা যায নি। তৃতীয কথা, "সোণাব বাঙ্গলা"-ব প্রচাব যে শুধু কলকাতা ও চুঁচডোয হয নি, পাবনা ও মৈমনসিংহ পর্যন্ত পৌঁছেছিল—কোনো ঐতিহাসিক তাব গুরুত্ব বোঝেন নি। ফলে সবদিক থেকেই কালীঘাটেব অখ্যাত পত্রিকা, *প্রতিজ্ঞা* ও "সোণাব বাঙ্গলা" ইস্তাহাবমালায জ্যোতিলালেব ভূমিকা মনে বাখাব মতো।

কিন্তু অন্য একটি কাবণেও "সোণাব বাঙ্গলা" নিযে পুলিশি কার্যকলাপেব ধবনধাবণ লক্ষ্য কবা উচিত। *ইংলিশম্যান* পত্রিকা যখন শেষ ইস্তাহাবটি নিযে শোবগোল বাধাল, তখন প্রায সকলেই ব্যাপাবটিকে 'মিথ্যে আতঙ্ক' বলে উডিযে দিযেছিলেন। এমনকি *স্টেট্স্ম্যান*-ও একটা চোথা ইস্তাহাবকে আমল দিতে চায নি। কিন্তু ব্রিটিশ সবকাব নডেচডে বসেছিল, তদন্ত শুরু কবেছিল গোপনে। আব সেই তদন্তে ভারপ্রাপ্ত স্পেশাল অফিসাব শশিভূষণ দে-ব কেবামতি দেখে অবাক হতে হয। বীতিবিদ্যা বা স্টাইলিস্টিক্স্ নামটিব উদ্ভব হলেও তখনও সেটি তেমন চালু হয নি।[১১] কিন্তু বক্তশোঁকা ব্লাডহাউন্ড-এব মতো, ভাষা ও ছাপাব টাইপ অনুসবণ কবে, জ্যোতিলাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁব সহযোগীদেব ঠিক খুঁজে বাব কবেছিল শশিভূষণ। কুকুবেব সঙ্গে তুলনা দেওযাটা ভুল নয, কাবণ প্রভুভক্তিতেও শশিভূষণ যে-কোনো পোষা কুকুবেব

সঙ্গে টেক্কা দিতে পাবত। ভাবতীয দণ্ডবিধিব কোন্ ধাবা অনুযাযী মামলা দাযেব কবা হবে, কোন্ থানাব ও সি-কে কোথায বদলি কবে আনতে হবে, জুবিদেব মাবফত যেন বিচাব না হয—এসব ব্যাপাবে অযাচিত পবামর্শ দিতেও লোকটা কসুব কবে নি।

আব একটি কথা দিযে শেষ কবি। "সোণাব বাঙ্গলা" ইস্তাহাবগুলি অনুশীলন সমিতিব কর্মীবাই লিখতেন ও প্রচাব কবতেন—এতে সন্দেহ নেই। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায পর্যন্ত সকলেই সে-কথা লিখেছেন। কিন্তু হবিদাস ও উমা মুখোপাধ্যাযেব কথাও ফেলে দেওযা যায না। অন্তত একটি ইস্তাহাবেব খসডায ব্রহ্মবান্ধবেব হাত ছিল—একথাও শশিভূষণেব পাঁচটি প্রতিবেদন থেকে খুবই স্পষ্ট। "বাজা কে?" ইস্তাহাবটি যে জ্যোতিলাল মুখোপাধ্যাযেব লেখা—এ তথ্যও আগে জানা ছিল না। "No Compromise" ইস্তাহাবটি ইংবিজিতে লিখে অববিন্দ ঘোষ যেমন ইংবিজি-জানা মহলে সাড়া ফেলে দিযেছিলেন,[১৪] "সোণাব বাঙ্গলা" আব "বাজা কে?" সেই কাজই কবেছিল সাধাবণ মানুষেব স্তবে।

শেষেব পবে

"সোণাব বাঙ্গলা" উপদ্রবেব এখানেই শেষ হয নি। ইস্তাহাবেব পবে দেখা দিল ঐ একই নামেব পুস্তিকা। "সোণাব বাঙ্গলা" নামটি তখন পুলিশেব কাছে আত্মাবাম খাঁচাছাড়া অবস্থা হয। এবাব তাদেব গোযেন্দা খবব দিল শ্যামবাজাবেব কেশব প্রিন্টিং ওযার্কস্-এ "সোণাব বাঙ্গলা" পুস্তিকা ছাপা হচ্ছে। ঘটনাচক্রে ঐ প্রেসেই তখন বিপ্লবীদেব সাপ্তাহিক *যুগান্তব*-ও ছাপা হচ্ছিল। এ বিষযে *যুগান্তব* (২ ১৪, ১৬ জুন ১৯০৭)-এ বসিযে লেখা হযেছিল

> [*যুগান্তব*] ছাপা চলিতেছে হেনকালে ডিটেক্টিভ পুলিসেব সর্দ্দাব ব্রাহ্মণবংশ সম্ভূত মহামান্য শ্রীমান পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ি একজন ফিবিঙ্গী ও গুটিকত লালপাগড়ী ছাপাখানায আসিবা উপস্থিত। কি সংবাদ? —না 'সোনাব বাংলা' বলিযা শ্রীমান বাসুদেব ভট্টাচার্য্যেব একখানি পুস্তিকা এখানে ছাপা হইযাছে, যেখানিতে সিডিসন গিজগিজ কবিতেছে, সুতবাং ছাপাখানা খানাতল্লাসি কবিযা সিডিসনেব মূল শিকড কাটিযা দিতে হইবে। এখন মূল শিকড় কাটিতে গিযা শ্রীমানেবা *দেখিলেন যে আদি ও অকৃত্রিম সিডিসন* ও মূর্ত্তিমান বাজদ্রোহ স্বরূপ 'যুগান্তব' তববাবি ও ত্রিশূল সমেত সেইখানে ছাপা হইতেছে। আবে বাপ।—আব যায কোথা? যুগান্তবেব ফর্ম্মা দুইখানি লইযা মহাপুরুযেবা একেবাবে লালবাজাবেব দিকে টোঁচা দৌড।[১৫]

এই পুস্তিকাব কপি আলিপুব [illegible] কোর্টে "স্মবণীয বিচাব সংগ্রহশালা"য কাচেব শো-কেসেব মধ্যে আছে। ছোঁযা বাবণ। তবে মাইক্রোফিল্ম পড়া যেতে পাবে। কিন্তু সমস্যা একটাই কোনো মাইক্রোফিল্ম-বিডাব নেই। মাইক্রোফিল্ম কবানোব সমযে সেটা কাবুব খেযাল হয নি।

'সোনাব বাংলা' ১৯৭১ থেকেই বাঙলাদেশেব জাতীয সঙ্গীত। ববীন্দ্রনাথেব পছন্দ হোক বা না হোক, "সোণাব বাঙ্গলা" একসমযে হযে উঠেছিল সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী উত্থানেব ডাক। সেই ইতিহাসও সমান গৌববেব।

পরিশিষ্ট ক

শেয "সোণাব বাঙ্গলা" ইস্তাহাবে কুমিল্লাব ঘটনাব কথা এসেছে। ঘটনাটি হলো সাম্প্রদাযিক দাঙ্গা।

৪ মার্চ ১৯০৭-এ ঢাকাব নবাব সলিমুল্লা কুমিল্লায আসেন বঙ্গভঙ্গেব সপক্ষে প্রচাবেব জন্যে। সবকাবি মতে, তাব আগে অবধি কুমিল্লায বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী প্রচাব নির্বিঘ্নে চলছিল। ৬ মার্চ সলিমুল্লাব একান্ত সচিব, জনৈক পাবসি, একা বাস্তা দিযে হেঁটে যাচ্ছিলেন। কিছু লোক (হিন্দু) তাঁব ওপব চড়াও হযে লাঠিব বাড়ি মাবে। ৬ মার্চ সন্ধেয কিছু মুসলমান 'আল্লা হো আকবব' নাবা তুলে একটি মিছিল বেব কবে। কোনো অজ্ঞাতপবিচয ব্যক্তি তাব ওপব গুলি চালায। একজন মিছিলকাবী তাতে মাবা যায। বাত্তিবে মুসলমানবাও গাড়িভর্তি হিন্দুদেব আক্রমণ কবে। ব্যাপাব সেখানেই চুকে যায।

সবকাবি বিবৃতিব তীব্র প্রতিবাদ কবে *বন্দে মাতবম্* (১৫ মার্চ ১৯০৭)-এ লেখা হয নবাব সলিমুল্লা-ই মৈমনসিংহ-ব মতো কুমিল্লায "হিন্দু-বিবোধী প্রচাব" শুরু কবেছিলেন, সবকাবি কর্তৃপক্ষ ছিল নিষ্ক্রিয , নবাবেব একান্ত সচিব, কুবেশি-কে মাবধোবেব ব্যাপাবে প্রবোচনাব কথা চেপে যাওযা হযেছে। মাবদাঙ্গাব জন্যে অববিন্দ দাযী কবেছেন—গোটা মুসলমান সমাজকে নয, "মুসলমানদেব স্বদেশী-বিবোধী অংশ"-কে। এই ব্যাপাবে কুমিল্লাব জাতীযবাদীদেব মোকদ্দমায যেতে বাবণ কবা হয। তাব কাবণ ব্রিটিশ আদালত থেকে কোনো প্রতিকার পাওযা যাবে না।

সুমিত সবকাব ঐ ইস্তাহাবে হিন্দুত্বেব লক্ষণ দেখেছেন (২৭৪)। কিন্তু অন্যান্য "সোণাব বাঙ্গলা" ইস্তাহাবে মুসলমানদেব কাছে 'ভাই' বলে যে আবেদন জানানো হযেছিল, লাঠি বর্শা বন্দুক সবকিছু নিযে তাঁদেবও জাগতে বলা হযেছিল—সে কথাও বলেছেন (২৭৩)। তৃতীয "সোণাব বাঙ্গালা" ইস্তাহাবেব ইংবিজি অনুবাদ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটি তুলে দিচ্ছি

> Join in one assembly all races, Hindu or Mussalmans, loudly shouting, "Jai Bangla" Bhikari Boisnab, Fakir let all these assemble Let them all bewail the mother's sorrows Let them excite the sons and daughters of the mother by such sad songs, by which they will banish the fear of death Delay not Delay will ruin all there is still time, rise all (সেপ্টেম্বব ১৯০৬-এব গোড়ায এটি বিলি হযেছিল)।

এও দেখবাব যে ইস্তাহাবটিব সূচনায ব্রাহ্মণ, কাযস্থ, শূদ্র, চণ্ডাল-এব সঙ্গে মুসলমান ও খ্রিস্টানদেবও ডাক দেওযা হযেছে। ফিবিঙ্গী শব্দেব ব্যাপক প্রযোগেব সঙ্গে খ্রিস্টানদেব

উল্লেখ থেকে অনুমান কবি : মূল বাঙলা ইস্তাহাবটি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যাযেব বচনা। "জয বাঙ্গলা" আওযাজটিও তাহলে ১৯০৬-এই প্রথম উঠেছিল। (ইস্তাহাবটিব পুবো বযান শঙ্কবীপ্রসাদ বসু, খণ্ড ৩, ১১৪-১৬-য পাওযা যাবে)।

পরিশিষ্ট খ

"সোণাব বাঙ্গলা" ইস্তাহাবটি নিযে *বন্দে মাতবম্*-এ সাধাবণত ঠাট্টা ইযাবকি কবা হতো। কিন্তু ৩ অক্টোবব ১৯০৬-এ সেখানে হঠাৎ একটি সম্পাদকীয বেবোয। তাব বিযয "সোণাব বাঙ্গলা আতঙ্ক" (The Golden Bengal Scare)। প্রবন্ধটি সম্ভবত বিপিনচন্দ্র পালেব লেখা। এতে বলা হযেছিল "পাগলা গাবদেব বাইবে এমন কেউ নেই যে ভাবতে হিংসাত্মক বা বেআইনী পথ নেওযাব কথা ভাববে, বা সে বিযযে পবামর্শ দেবে।" গিবিজাশঙ্কব বাযচৌধুবী ও তাঁব অনুসবণে শঙ্কবীপ্রসাদ বসু লিখেছেন বাঙলাব বিপ্লবীবা এতে ক্ষুব্ধ হন ও বিপিনচন্দ্রকে *বন্দে মাতরম্* থেকে সবে যেতে বাধ্য কবেন। বিপিনচন্দ্র নিজেই সে-কথা পবে জানিযেছেন। গিবিজাশঙ্কব-শঙ্কবীবাবু মনে কবেন আলিপুব বোমাব মামলাব সমযে *বন্দে মাতবম্* ১৮ সেপ্টেম্বব ও ৩ অক্টোবব ১৯০৬-এব দুটি সম্পাদকীয দাখিল কবে অববিন্দব কৌঁসুলি, চিত্তবঞ্জন দাস দাবি কবেন . এগুলি থেকেই বোঝা যায যে অববিন্দ গুপ্ত সমিতিব বিবোধী (যদিও দুটি সম্পাদকীযই বিপিনচন্দ্রব লেখা, অববিন্দব নয)। গিবিজাশঙ্কব এমন কথাও বলেছেন যে, বিপিনচন্দ্র-ব লেখা দিযেই চিত্তবঞ্জন অববিন্দকে খালাস কবেন।[১৬]

মনে হয, বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে ব্যক্তিগত বিবাগেব দরুনই এমন অতিসবল উক্তি কবা হযেছে। চিত্তবঞ্জনেব বক্তৃতা থেকে দেখা যায *বন্দে মাতবম্* যডযন্ত্রব উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হযেছিল—এই অভিযোগ অপ্রমাণ কবাব জন্যেই তিনি ঐ বচনা দুটিব উল্লেখ কবেছিলেন, "যেখানে হিংসাত্মক কার্যকলাপেব ইঙ্গিত আছে সেখানেই মাননীয ধর্মাবতাব কোনো আক্রমণ প্রতিবোধ কবাব পরিচয পাবেন।" ঐ দ্বিতীয বচনাটি যে আদৌ অববিন্দব নয সে-ইঙ্গিতও চিত্তবঞ্জন দিযেছিলেন। তিনি বলেন অক্টোবব ১৯০৬ থেকে এপ্রিল ১৯০৭ পর্যন্ত অসুস্থ থাকাব দরুন অববিন্দ *বন্দে মাতবম্*-এব কোনো কাজ কবতে পাবেন নি।[১৭]

সংযোজন ১

"সোনার বাঙ্গলা" বিলি কবাব সঙ্গে দুই বিপ্লবী শহিদেব নাম জড়িত ক্ষুদিবাম বসু ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু। হেমচন্দ্র কানুনগো লিখেছেন .

> ঐ বছব ফেব্রুযাবী মাসে মেদিনীপুবে কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী খোলা হযেছিল। এই সময ইংবেজেব প্রতি বিদ্বেষ ও গালাগালিপূর্ণ 'সোনাব বাংলা' নামক বেনামী বাংলা 'প্যাম্ফলেট' একটা না-কি প্রচাবিত হযেছিল। তাব ইংবেজী অনুবাদ 'পাইওনিযাব' পত্রে প্রকাশিত হলে ইংবেজ মহলে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিযেছিল। সত্যেন তাব আবাব

বাংলা অনুবাদ করে হাজার খানেক ছাপিয়েছিল। উক্ত প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বারের কাছে ক্ষুদিরাম নির্বিচার সকলকে ঐ প্যাম্ফলেটগুলি বিলি করছিল, এমন সময় একজন হেড কনস্টেবল এসে তাকে গ্রেপ্তার করতে সে না-কি বক্সিং-এর খুব কেরামতি দেখিয়েছিল। ইত্যবসরে সত্যেন সেখানে এসে পড়ে বলে উঠল "উও ডিপ্‌টীকা লেড়কা হ্যায়, উসকো কেঁও পাকড়ায়া।" সত্যেন ছিল প্রদর্শনীর সহকারী সম্পাদক এবং তখন কালেক্টরীতে একজন ডেপুটীবাবুর এজলাসে কেরানীর কাজ করত। জমাদার সত্যেনকে চিনত, সে ডেপুটীর নাম শুনে, নাকে রক্তপাত সত্ত্বেও ক্ষুদিরামকে ছেড়ে দিয়েছিল। পরক্ষণে যখন তার ভুল ভাঙল, তখন আর ক্ষুদিরামকে খুঁজে পাওয়া গেল না। (*বাঙ্গলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা,* চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮৪ (প্রথম প্রকাশ ১৯২৮), পৃ ৭১)

সন্দেহ হয়, *পাইওনিয়র* থেকে অনুবাদের নাম করে আসলে মূল বাঙলা ইস্তাহারটিই ছাপিয়ে বিলি করা হয়েছিল। এই অছিলায় অবশ্য শেষরক্ষা হয় নি। অন্য সূত্রে জানা যায়, ইস্তাহারটির লেখক ছিলেন পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রকাশক মন্ডলাল (?) রায়চৌধুরী। ইস্তাহারের সূত্রে তাঁরা দুজনেই গ্রেপ্তার হন (সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৫)।

সংযোজন ২

যে "সোনার বাঙ্গলা" ইস্তাহার এককালে অত সাড়া ফেলেছিল, জেম্‌স ক্যাম্পবেল কার-এর গোপন সরকারি বিবরণ, *ভারতের রাজনৈতিক উপদ্রব (১৯০৭-১৭)* (১৯১৭) ও রাওলাট কমিটির রিপোর্ট (১৯১৮)-এ তার নামটুকুও নেই। পূর্ববঙ্গ তথা পূর্বভারত নিয়ে আরও অন্তত সাতটি সরকারি প্রকাশনার কথা জানা যায়। সেগুলোয় "সোনার বাঙ্গলা"-র কথা ছিল কি না তা দেখার সুযোগ এখনও হয় নি। জ্যোতিলাল মুখোপাধ্যায়ের নাম আর কোথাও দেখা যায় না। আপত্তিকর প্রকাশনার তালিকাতে *প্রতিজ্ঞা* কাগজটির নাম নেই, যদিও *সুপ্রভাত*-এর কথা কার-এর বিবরণে আছে। রাওলাট রিপোর্ট-এ "ভবানী মন্দির"-এর নাম থাকলেও *যুগান্তর* ও *সন্ধ্যা* ছাড়া আর কোনো পত্রিকার নাম আসে নি। শুধু *যুগান্তর* থেকে সঙ্কলিত *বর্তমান রণনীতি* আর *মুক্তি কোন্ পথে* সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে।

এর থেকেই বোঝা যায় পুলিশ রিপোর্ট, সরকারি প্রতিবেদন ইত্যাদি কত অসম্পূর্ণ।

সংযোজন ৩

বাসুদেব ভট্টাচার্য যে *সোনার বাংলা* (এই বানানে বা অন্য বানানে) নামে একটি পত্রিকা বার করতেন—পুস্তিকা বা ইস্তাহার নয়—তার খবর জানিয়েছেন শিশির কর। বিনা ডিক্লারেশন-এ *সোনার বাংলা, যুগান্তর* ও *নবশক্তি* ছাপার জন্যে প্রেস আইনের ১৫নং ধারা অনুযায়ী কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এর স্বত্বাধিকারী, কেশবচন্দ্র

সেন, মুদ্রাকর শ্রীমন্তন (?) বাযচৌধুবী ও *সোনাব বাঙলা*-ব সম্পাদক ও প্রকাশক বাসুদেব ভট্টাচার্যকে অভিযুক্ত কবা হয। শাস্তি হিসেবে বাসুদেব ভট্টাচার্যব ২০০ টাকা জবিমানা হয। ঐ পত্রিকাব দুটি সংখ্যাব বিরুদ্ধে মামলাও হযেছিল।

(*ব্রিটিশ শাসনে বাজেযাপ্ত বাংলা বই*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃ ৩৩৫)

টীকা

"সোনাব বাঙ্গলা" ইস্তাহাব সংক্রান্ত সমস্ত খববই জোগাড হযেছে বাঙলা সবকাব আব পূর্ব বাঙলা ও আসাম সবকাব-এব নথিপত্র থেকে। প্রতিটি ফাইল-এব সংখ্যা ইত্যাদি দেওযা হয নি। হবিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায আব সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যাযেব বই-এ সেগুলি পাওযা যাবে। মূলত ১৭৬ক সংখ্যক ফাইল-এই বেশিব ভাগ খবব পাওযা যায। নানা মহাফেজখানা ইত্যাদি ঘুবে বহু তথ্য খুঁজে বাব কবেছেন শ্রীঅস্মিতা চৌধুবী। তাঁকে এই নিবন্ধব সহ-লেখক বলেই ধবা উচিত।

শিরোনামেব উদ্ধৃতিটি নেওযা হযেছে সুভায মুখোপাধ্যাযেব "সুন্দব" (*ফুল ফুটুক*) থেকে।

১ *কী কবতে হবে*, পবিচ্ছেদ ৩ (খ)। মূল রুশ-এ শব্দদুটি হলো agitatsiya, propaganda। দুটিই লাতিনমূলক শব্দ। মূল রুশ বই দেখে নিশ্চিত কবেছেন গৌতম ঘোষ ও প্রভাসকুমাব সিংহ।

২ নামটি অবশ্য ছিল ব্রতী সমিতি। এ বিষযে খুব বেশি তথ্য পাওযা যায না। সুমিত সবকাব, ৩৬৬-৬৭ দ্র।

৩ টহলবাম-এব কাজকর্ম সম্পর্কে খবব আছে প্রেমাঙ্কুব আতর্থীব *মহাস্থবিব জাতক*, খণ্ড ১, ১৩৫-এ। এছাড়া সুমিত সবকাব, ৪৯ দ্র.।

৪ শঙ্কবীপ্রসাদ বসু, খণ্ড ৩, ১১৪-১৬। ইস্তাহাবেব অনুবাদ ছাপা হযেছে *ইংলিশম্যান*-এ প্রকাশিত অনুবাদেব কাছে ঋণ স্বীকাব কবে। তবু শঙ্কবীবাবু কেন এটিকে "[এলাহাবাদেব] পাযোনীযাব-কৃত এই অনুবাদ" বলে উল্লেখ কবেছেন তা বোঝা যায না। সবকাবি ফাইল-এও এই তর্জমাটিই ছাপা হযেছে *ইংলিশম্যান* থেকে। ইস্তাহাবটিব অংশবিশেষেব বাঙলা অনুবাদ পাওযা যাবে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায, ২০০৫, ২৭-২৮-এ। সন্দীপবাবুব লেখাটি প্রথম বেবিযেছিল *জলার্ক*, বৈশাখ-পৌয ১৩৯৭, ৮৭-৯২-এ। হবিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায, ১৯৬১, ১৬৬-১৭৯-তে এ নিযে আলোচনা কবেছেন। তবে বাববাব 'পুস্তিকা' শব্দটি ব্যবহাব কবায বিভ্রান্ত হযেছেন লিপনাব (৩৬৫)।

৫ *বন্দে মাতবম্*, ১৫৯।

৬ সুমিত সবকাব *স্ববাজ*-এব ২৬ ফাল্গুন ১৩১৩ সংখ্যাটিব উল্লেখ কবেছেন (২৭৪)। কিন্তু *স্ববাজ*-এব ঐ সংখ্যাব প্রথম পৃষ্ঠায ছাপা হযেছে ১৯ ফাল্গুন, তাবপব থেকে ২৬ ফাল্গুন। *স্ববাজ* এই ইস্তাহাবটি পেযেছিল "প্রযাগেব ফিবিঙ্গি কাগজ",

অর্থাৎ পাইওনিযব-এ ছাপা বযান থেকে (১২)।

৭. সেহানবীশ, ১৯৭৩, ৩২-এব পবে ইস্তাহাবটিব ফটো ব্লক কবে ছাপা হযেছে। সুমিত সবকাব জানিযেছেন, এই ইস্তাহাবটি ২০ এপ্রিল ১৯৪৭-এ মৈমনসিংহ থেকে ডাক মাবফত অশ্বিনীকুমাবকে পাঠানো হযেছিল (২৭৪)।

৮ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৮৩, ১৪৬।

৯ ঐ, ১৯৮।

১০ নিবেদিতা, *পত্রাবলি,* খণ্ড ২ ১০৩২।

১১ ঐ, ২ ১১২৮। শঙ্কবীপ্রসাদ বসু, খণ্ড ৩, ৫০-এ চিঠিব তাবিখটি ভুল কবে ১০ ৮ ১৯০১ ছাপা হযেছে (সেটি হবে ১৯১০)। শঙ্কবীবাবু লিখেছেন, "কার্জনেব ভাগ্য—তাঁকে বিপ্লবীদেব হাতে প্রাণ দিতে হযনি, যদিও নিবেদিতাব চিঠিতে তাঁব সঙ্গে বন্ধনীবদ্ধ শশিভূষণ দে-কে অচিবে সেই ভাগ্য পেতে হযেছিল" (৫০)। এব কোনো ইঙ্গিত নিবেদিতাব ১০ ৮ ১৯১০-এব চিঠিতে নেই। শঙ্কবীবাবু কি অন্য কোনো সূত্র থেকে খববটি পেযেছেন?

১২ ব্রহ্মবান্ধবেব নিজেব কোনো আস্তানা ছিল না। তিনি থাকতেন কার্ত্তিকচন্দ্র নান-এব ১৮ কৃষ্ণ সিংহ লেন (বেথুন বো), কলকাতা-৬-এব বাড়িতে। তাঁকে ধবাব জন্যে যে পুলিশবাহিনী যাবে তাব প্রস্তাবিত তালিকায প্রথম নাম আছে পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ীব। *যুগান্তব* দপ্তব খানাতল্লাশিব সমযে এই লাহিড়ীব হাজিবা নিযে *যুগান্তব* (১৬ জুন ১৯০৭)-এ খুব বঙ্গ কবা হযেছিল। এই নিবন্ধেব শেষে সেটি উদ্ধৃত হযেছে।

১৩ স্টাইলিস্টিক্স্ নামটি ১৮৪৬-এ তৈবি হলেও ১৯৬০-এব দশকেব আগে ব্যাপকভাবে চালু হয নি।

১৪ বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য জানিযেছেন "No Compromise" ইস্তাহাবটি নিযে তিনি সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযেব কাছে যান। "তিনি সেটা মনোযোগ দিযা পাঠ কবিযা চমকিযা উঠিলেন এবং বলিলেন, এই বকম ইংবেজী কে লিখিযাছেন, কোন বাঙ্গালী এই বকম লিখিতে পাবেন না। আমি উত্তবে তখন অববিন্দেব পবিচয তাঁহাব কাছে দিলাম।" ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৮৩, ১৯৩-এ উদ্ধৃত। ভূপেন্দ্রনাথও লিখেছেন, "নো কম্প্রোমাইজ"-ই "সর্ব্বপ্রথম গোপনে এবং বেনামীতে বৈপ্লবিক পুস্তিকা প্রচাব" (ঐ, ১২৩)।

১৫ অংশুমান বন্দোপাধ্যায, ৬০৫। বাসুদেব ভট্টাচার্য বিষযে খবব আছে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৭০, ৭৩, ১১৩, ১১৭ ও অবিনাশ ভট্টাচার্য, ১৩৮৫, ৭০, ৮৫-৮৬ দ্র। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, বাসুদেব ভট্টাচার্যব "সোনাব বাঙ্গলা" ছিল 'পাক্ষিক পত্রিকা'। "পুলিশ তাহাব লেখাব উপব আপত্তি কবিযা মামলা রুজু কবে। কিন্তু তাহাকে Warning দিযা ছাড়িযা দেয" (১৩৭০, ১১৭ টী ২)।

১৬ শঙ্কবীপ্রসাদ বসু, খণ্ড ৩, ১১৫-১৬।

১৭ সুকুমাব বসু ও সুহৃদগোপাল দত্ত, *মনস্পতি শ্রীঅববিন্দ*-য চিত্তরঞ্জন দাসের ভাষণটির অনুবাদ দেওযা আছে। প্রাসঙ্গিক অংশব জন্যে পৃ. ৭৩-৭৬ দ্র.। এছাড়া গিবিজাশঙ্কব বাযচৌধুবী, ৫৯৩-৯৪ দ্র।

কৃতজ্ঞতা স্বীকাব . প্রদ্যুৎকুমাব দত্ত, সিদ্ধার্থ দত্ত, সাযক দেব ও অমিতাভ ভট্টাচার্য।

রচনাপঞ্জী

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। *ইযোবোপে ভাবতীয বিপ্লবের সাধনা।* পপুলাব লাইব্রেবী। ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

অংশুমান বন্দোপাধ্যায সম্পা। *অগ্নিযুগেব অগ্নিকথা 'যুগান্তব'।* পণ্ডিচেবী · শ্রীঅববিন্দ আশ্রম। ২০০১।

গিরিজাশঙ্কব বাযচৌধুবী। *শ্রীঅববিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ।* নবভাবত পাবলিশার্স, ১৯৫৬।

চিন্মোহন সেহানবীশ। *রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভাবতীয় বিপ্লবী।* মনীষা। ১৯৭৩।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। *ভাবতেব দ্বিতীয স্বাধীনতাব সংগ্রাম (অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস—প্রথম খণ্ড)।* নবভাবত পাবলিশার্স। ১৯৮৩।

—*অপ্রকাশিত বাজনীতিক ইতিহাস (দ্বিতীয খণ্ড)।* নবভাবত পাবলিশার্স। ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।।

মহাস্থবিব (প্রেমাঙ্কুব আতর্থী)। *মহাস্থবিব জাতক* (অখণ্ড সংস্কবণ)। দে'জ পালবিশিং। ২০০০।

শঙ্কবীপ্রসাদ বসু। *নিবেদিতা লোকমাতা।* খণ্ড ৩। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায। নথিপত্রে স্বদেশী আন্দোলন। গ্রন্থমিত্র। ২০০৪।

সুকুমার বসু ও সুহৃদগোপাল দত্ত। *মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ।* রূপা। ১৯৭৩।

হবিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়। *উপাধ্যায ব্রহ্মবান্ধব ও ভাবতীয জাতীযতাবাদ।* ফার্মা কে, এল্, মুখোপাধ্যায। ১৯৬১।

Basu, Sankarı Prasad (cd) *Letters of Sıster Nıvedıta* 2 Vols Nababharat Publishers 1982

Lıpner, Julıus J *Brahmabandhab Upadhyav The Lıfe and Thought of a Revolutıonary,* Delhı Oxford Unıversıty Press 1999

Sarkar, Sumıt *Swadeshı Movement ın Bengal 1905-08* New Delhı People's Publıshıng House. 1973

Srı Aurobındo *Bande Mataram Early Polıtıcal Wrıtıngs (=Colleted Works Vol 1)* Pondıcherry Srı Aurobındo Ashram. 1973

ফুরায় সত্যের যত পুঁজি

দেবেশ রায়

'আমি কিছুরই নিষ্পত্তি করি নে। সংকট থেকে সংকটে নিয়ে চলি।'

'ফাল্গুনী, রবীন্দ্রনাথ

আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে তিন-চারটি ঘটনাকে একটা বিশিষ্টতায় আলাদা করা যায়। সেই আন্দোলনগুলি কার্যকর হওয়ার আগেই সেই আন্দোলনের তত্ত্ব চিন্তা-ভাবনাকে বদলে দিয়েছিল।

গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে (১৯১৫) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে একটা নৈতিক ভিত্তি দেন। বলেন, ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি চাওয়া একটি নৈতিক অধিকার। সেই অধিকারের নৈতিকতা চোখে দেখা যায়, যদি তার ভিত্তিতে তৈরি আন্দোলন অহিংস হয়। সেই অহিংস নৈতিক আন্দোলনের জন্য গান্ধীজি একটি নতুন শব্দ তৈরি করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকাতেই—সত্যাগ্রহ। এমন কী, একটি সৈন্যবাহিনীর যেমন ইউনিফর্ম থাকে, এই সত্যাগ্রহীদের তেমন একটি পোশাকও তিনি তৈরি করিয়েছিলেন—দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু উপজাতির কৃষকরা যে-কাপড়ের-টুপি ব্যবহার করতেন, সেই টুপির অনুকরণে, গান্ধীটুপি। এই ইউনিফর্মের কল্পনার পেছনে হয়তো ছিল একটা অর্থাভাস—সৈন্যবাহিনী যেমন শৃঙ্খলা মেনে চলে ও জয় ছাড়া সেই বাহিনীর যেমন অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, সত্যাগ্রহীদের সে-রকম আমৃত্যু শৃঙ্খলা। গান্ধীজির নীতিবোধে যিনি বিশ্বাস করেন না তিনি গান্ধীজির আন্দোলনে মিলতে পারেন না।

দ্বিতীয় যে-উদাহরণ মনে আসছে যেটা সেটি মহম্মদ আলি জিন্নাকে নিয়ে। দ্বিজাতি তত্ত্ব ভারতের মুসলমানদের একটা অধিকার বিষয়ে নৈতিকতার ভিত্তিতে এক করতে পেরেছিল। দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা প্রথম কে ভেবেছিলেন ও বলেছিলেন, সেটা বিবেচ্য নয়। নথিপত্রের বিচারে সম্ভবত বেরবে বঙ্কিমচন্দ্রই এই ধারণার প্রবর্তক। কে এই তত্ত্বকে রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি করে তুলতে পেরেছিলেন, সেটাই বিবেচ্য। জিন্না-র আন্দোলনকে দ্বিজাতি-তত্ত্বভিত্তিক না বলে, এখন যদি আমরা মুসলমানের জাতিত্বভিত্তিক বলি, তা হলে বোধহয় ঠিক বলা হবে। ভারতীয় মুসলমানরা ভারতের একটা আলাদা জাতি ও সংখ্যার জোরে তারা আলাদা একটা রাষ্ট্র তৈরি করতে পারে। জিন্নার এই জাতিস্বাতন্ত্র্যে যিনি বিশ্বাস করেন না; তিনি জিন্নার আন্দোলনেও মিলতে পারেন না। জাতিস্বাতন্ত্র্যের কারণেই রাষ্ট্রস্বাতন্ত্র্য—এটাই বিশ শতকের রাষ্ট্রগঠনের প্রধানতম ভিত্তি।

তৃতীয় উদাহরণটি কমিউনিস্ট আন্দোলনের। মার্ক্স-এর তত্ত্ব কোন আকারে কবে আমাদের কাছে এসেছে, তার কালপঞ্জি ও সোভিয়েত বিপ্লব ও ব্যবস্থায় কবে থেকে আমাদের বিশ্বাস

তৈবি হতে শুরু কবে তাব ইতিহাস এখানে আমাদেব বিবেচ্য নয। আমবা শুধু এটুকুই এখন দাগাতে চাইছি যে কমিউনিস্টবা নিজেদেব আলাদা কবে নিযেছিলেন শ্রেণীতত্ত্বে। প্রতিটি মানুষ উৎপাদন সম্পর্ক দিযে নির্ধাবিত একটি শ্রেণী, মানুষেব এ-যাবৎকালেব ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামেব ইতিহাস। একটি শ্রেণীকে—শুধু শ্রমিকশ্রেণী নয, শুধু কৃষিশ্রমিক নয, শুধু শ্রমিক-কৃষকেব ঐক্য থেকে তৈবি কোনো শ্রেণী নয—শ্রেণীসচেতন কবে তোলাই কমিউনিস্ট আন্দোলনেব একমাত্র লক্ষ। শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া সে-সচেতনতা কোনো ইন্দ্রিযগ্রাহ্য আকাব পায না। আব, শ্রেণীব কোনো দেশ হয না। শ্রেণীতে যিনি বিশ্বাস কবেন না, তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে শামিল হতে পাবেন না।

চতুর্থ উদাহবণটি নকশালবাড়ি আন্দোলনেব। সে-আন্দোলনকে কমিউনিস্ট আন্দোলনেব একটা প্রক্ষেপ বলে চিহ্নিত কবা উচিত নয। ৬৯ সালেব নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন ভাবতে বাজনৈতিক আন্দোলনেব একটি বিকল্প উপায মধ্যবিত্ত ছাত্র-যুবকদেব কাছে আযত্তগম্য কবে তুলেছিল। নকশালবাড়ি-তত্ত্ব কতটা ছড়িযেছে, বাকিটা কেন ছড়াযনি—এই সব বিষয আমাদেব বিবেচ্য নয। শ্রেণী-সংগ্রামেব অর্থ শেষ পর্যন্ত বাষ্ট্রেব সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ—এই বিশ্বাস ও তত্ত্ব নকশালবাড়িকে একটা নৈতিকতা দিযেছে। সেই নৈতিকতাবোধ আমাদেব তত্ত্বচিন্তাব এতই গভীবে চাবিযে গেছে ও সাবা দেশেব সামাজিক রূপান্তবেব নতুনতব কর্মসূচিকে ও আমাদেব ইতিহাসকে এমন মৌলিক প্রশ্নেব ভিতব দিনবাত ঠেলে দিচ্ছে যে কোনো সামাজিক-বাষ্ট্রীয উদ্যোগই আর সম্মতিব কোনো ভিত্ খুঁজে পায না। সম্মতি ছাড়া সমাজ হয না, সমাজ ছাড়া বাষ্ট্র হয না, বাষ্ট্র ছাড়া উৎপাদন হয না। নকশালবাড়ি আমাদেব চিন্তাভাবনা এত গভীবে বদলে দিযেছে যে সবকাব ইত্যাদি সংগঠনগুলি সম্পর্কে আমাদেব সহ্যশক্তি অনেক বেড়ে গেছে, কাবণ, প্রত্যাশা গিযে তলানিতে ঠেকেছে। গুজবাতেব মুসলমান-নিধনেব মত ঘটনায মিডিযা, অন্যান্য বাজ্যসবকাব, বিভিন্ন বৃত্তিজীবীবা ও বিচাব-ব্যবস্থা যে-বকম সক্রিযতায সংহত হযেছিল, তাকে ভাবতেব পৌবজীবনেব (সিভিল সোসাইটি) লক্ষণ বলে সেই দুর্দিনে হযতো মনে হযেছিল কিন্তু যে-পৌবজীবনেব লক্ষণ'প্রমাণেব জন্য গুজবাত-বীভৎসতাব দবকাব পড়ে, সেটা আব কতটাই-বা নির্ভবযোগ্য? নকশালবাড়ি আমাদেব সমাজ ও সবকাবেব পাকাপোক্ত সব পবিপ্রেক্ষিত একেবাবে ভেঙে দিযেছে—কোনো কিছুই আব নিশানা হতে পাবছে না, কাছেব কিংবা দূবেব।

কিন্তু এব উল্টো কিছু কি হতে পাবত?

যে-চাবটি তত্ত্বেব উদাহবণ দিযেছি, প্রসাবে ও গভীবে তাব সমতুল্য কোনো তত্ত্ব যদি আমাদেব প্রশ্নাতুব কবে তুলত—জমিব মালিকানা ও উৎপাদনক্রিযা নিযে, নদীব জলব্যবহাবেব স্বাধীনতা নিযে, বনেপাহাড়ে বংশানুক্রমিক বসবাসেব অধিকাব নিযে, পুবনো ও প্রতিবোধ্য মহামাবীব প্রতিবাদে, যে-প্রযুক্তি আমাদেব সৃষ্টি নয তার ওপব ভব দিযে শিল্পবিপ্লবেব প্রহসন সম্পর্কে নানা বৃত্তিতে যুক্ত মধ্যবিত্তদেব অর্থোপার্জনেব লালসা সম্পর্কে, গবিব মানুষদেব উচ্ছেদ কবে নগববিলাসেব ভাঁড়ামি বিষযে, যদি ভোট দিযে সমাজ বদলাবাব আশু-বিশ্বাসে চিড খেযে যেত, যদি শিক্ষা ও কর্মেব অধিকাব নিযে আমবা বিপন্ন হযে পডতাম, এগুলো

যদি আমাদেব চিন্তা ও অনুভবেও কিছুটা সত্য হযে থাকত, আব সেই বাঁচা থেকে তৈবি হযে উঠত এক সচেতন তত্ত্ব তাহলে কি সবকাব ইত্যাদি সংগঠনগুলিব সঙ্গে আমাদেব সহাবস্থানেব নিবাপত্তা আমবা ভেঙে ফেলতাম, তা হলে কি যে-কোনো, যে-কোনো, যে-কোনো উপাযে আবো, আবো, আবো বেশি টাকা কবাব সমাজসম্মত পথ আমবা মাইন পুঁতে বিপজ্জনক কবে তুলতাম, তাহলে ইতিহাসেব ভিতবে কি আমবা গ্রহিষ্ণু হাত ঢুকিযে দিতাম? তাহলে নাবীপুরুষেব সমানাধিকাব, সমকামিতাব অধিকাব, যৌনবৃত্তিব আইনি অধিকাব, ব্যাহত-বিকাশ শিশুদেব অধিকাব, প্রতিবন্ধীদেব চাকবিব অধিকাব, দেশেব নানা অঞ্চলেব কেতাবি সাহিত্যেব বিনিমযেব অধিকাব, বিশেষ কবে মেযেদেব টাকাপযসায স্বযম্ভব হওযাব অধিকাব, মৃত্যুদণ্ড বদ চাইবাব অধিকাব, ইচ্ছামৃত্যুব অধিকাব, তথ্য জানাব অধিকাব, প্রকৃতিব ওপব সেখানে যাঁবা বসবাস কবছেন তাঁদেব অধিকাব, পবিবেশদোষ থেকে আত্মবক্ষাব অধিকাব, বাস্তাব ওপবে কাটা খাশি দেখতে না-চাওযাব অধিকাব, মৃত্যুব পবে চক্ষুদান ও দেহদানেব অধিকাব, শিশুশ্রমেব নিষিদ্ধতা চাইবাব অধিকাব—এইসব ও আবো এ-বকম সব অধিকাব চাইবাব এন-জি-ও ভিত্তিক কর্মসূচিব বদলে কি আমবা এমন কোনো দিগ্‌দেশব্যাপ্ত সমাবেশ তৈবি কবে তুলতে পাবতাম, যে সমাবেশ এই সব পৃথক অধিকাবগুলিকে নিজেব ভিতবে ধাবণ কবতে পাবে ও আমাদেব জীবনটাকে বদলে দিতে পাবে? আমূল?

গান্ধীবাদ ও ধর্মীয জাতিবাদ বা শ্রেণীসংগ্রাম বা নকশালবাডি-তুল্য কোনো তত্ত্ব যদি আমাদেব চিন্তায শিকড় পেত ও সেই শিকড দিয়ে মৃত্তিকাব অতল থেকে প্রাণেব জোব শুযে নিযে যদি আমবা শূন্যতা ভেদ কবে উঠতাম তাহলে আমবা আমাদেব জীবনটাকে বদলে নিতে পাবতাম? আমূল?

অভাব কি তাহলে তেমন তত্ত্বেবই? সে-তত্ত্ব আসবে কোত্থেকে? ইতিহাস থেকে নাকী আমাদেব নিত্যকর্ম থেকে? ইতিহাস কি অনেক সমযই সেফটি লকাব হযে ওঠে না? নিত্যকর্মও কি হযে ওঠে না এক অনড অভ্যাস?

দুই

আমাদেব দেশে ও পৃথিবীব অনেক দেশেই মার্ক্সবাদ, ইতিহাস আব নিত্যকর্মেব ভিতবকাব সম্পর্কগুলিকে পূর্বনির্দিষ্ট ধবে নেযা হয। ফলে মার্ক্সবাদী ইতিহাসচর্চায, ঘটনাব একটা শৃঙ্খলা আবোপিত হয ও কার্যকাবণেব নিপাতন উপেক্ষিত হয। ১৯০৫ সালেব বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলন কি জাতীযতাবাদেব প্রথম সংগঠিত প্রকাশ? অথবা আমাদেব বাজনৈতিক বোধ আব সক্রিযতাকে যেমন অনেক সমযই আমবা শুরু-শেষেব একটা প্রক্রিযা বলে দেখতে চাই তেমন কিছু?

মার্ক্সবাদ যে কোনো পূর্বনির্দিষ্টতায বিশ্বাসই কবে না আব সেই অবিশ্বাসই যে হেগেলেব ডাযালেকটিকস থেকে মার্ক্সকে আলাদা কবে দিল—এ-কথাটা এত বেমালুম হযে গেল কী কবে?

একটা কাবণ হতে পাবে মার্ক্সবাদ যখন বাজনৈতিক কর্মসূচিব আদিযুগে নিযন্ত্রক তত্ত্ব হযে উঠছে, তখন 'মার্ক্সবাদেব তিনটি উপাদান' বচনাটিতে লেনিন কিছু কথা সবল কবে বলেছিলেন। স্তালিনেব 'দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' বইটি হযে উঠেছিল মার্ক্সবাদেব একমাত্র বর্ণপবিচয। তাতে মার্ক্সবাদকে এতটা সাফসুরুৎ কবা হযেছে যে পাশ্চাত্য দর্শনে মার্ক্স যে মৌলিক ও একক—সেই ধাবণাটি তৈবিই হয় না।

যে-কোনো তত্ত্বই আমবা আমাদেব মত কবে বুঝে নিতে চাই। লেনিন ও স্তালিনেব বচনাদুটি আবো সোজা কবে বুঝতে মার্ক্স-এব একটি মূলসূত্র—'মানুযেব সমাজসত্তাই তার চৈতন্য নির্ধাবণ কবে'[১]—একেবাবে যান্ত্রিক হযে গেল। ভুলেই যাওযা হল, মার্ক্স-এব এই সূত্র কোনো জীববৈজ্ঞানিক আবিষ্কাব নয, সত্তা নিযে একটি দার্শনিক সূত্র। সেটা ব্যাখ্যা কবে তিনি বলছেন, 'যেমন কোনো একটি লোককে বোঝাব সময সে তাব নিজেব সম্পর্কে কী ভাবে সে-কথাটি মনে রাখি না, তেমনি কোনো সামাজিক রূপান্তবেব পর্বকে বোঝার সময সেই পর্বটি নিজেকে নিয়ে কী ভেবেছিল, তা বিচার করি না।'[১]

মার্ক্স যখন এ-কথা লিখেছিলেন, তখন তিনি পর্বের বা যুগেব নিজেকে নিযে নিজেব ধাবণা বলতে বুঝিযেছিলেন—সমাজবদলেব ফলে যারা সুবিধে পেযেছে, সেই শ্রেণীব কথা। মার্ক্স-এর পবে ইতিহাসেব সাক্ষ্য খোঁজাব এমন সব উপায ঐতিহাসিকবা তৈরি কবেছেন ও কাজে লাগিযেছেন, বেশিব ভাগ সমযই মার্ক্স-এর পদ্ধতিতে, অনেক সময় তা থেকে আলাদা হযে গিয়েও যে এই কথাটি আব এখন আক্ষরিক সত্য নেই। কিন্তু মৌলিক অর্থে গভীব সত্য। মার্ক্স সাবধান কবে দিয়েছেন, পূর্বনির্দিষ্টতাব সূত্র দিযে পর্বেব কোষ্ঠিবিচাব সম্পর্কে। তেমন যদি কেউ ভাবেন বা কবেন—মার্ক্সবাদ দিযে ভবিষ্যৎ বলে দেন—তাহলে, সমাজবদলেব প্রক্রিযায নতুন সব উপাদানেব সমাবেশ ও সে-সব উপাদানেব বাসাযনিক বিক্রিযা তিনি বুঝতেই পারবেন না।

মার্ক্স তাই চৈতন্য বা সত্তাবোধেব ওপব জোর দিয়ে বলেছেন, 'তত্ত্ব বা চিন্তা যখন জনসাধাবণেব কাছে নির্ভরযোগ্য হযে ওঠে, তখন সেটা একটা বাস্তব শক্তি হযে ওঠে।'[১]

নিউটন-এব অভিকর্ষ তত্ত্ব বিশ্বাস্য হযে উঠেছে তখন, যখন সেটা উৎপাদনের কাজে লেগেছে। বা, জন ভন নিউমান (১৯০৪-৫৮) ও অ্যালান ম্যাথিসন টুবিন (১৯১২-১৯৫৪) ইলেক্ট্রনিক্স ও বোবোটোলজি নিযে যে গবেষণা পৃথকভাবে কবেছিলেন—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময—তা থেকেই তো আজকেব তথ্যপ্রযুক্তি।

তত্ত্ব বা চিন্তাব শক্তিব এই বাস্তব শক্তিতে রূপান্তবণ মার্ক্স-এব হয়তো সবচেযে মৌলিক আবিষ্কাব। মার্ক্সবাদে তাই শ্রমিক শ্রেণীব অনুভবেব ওপব এত জোব দেবা হয়েছে—তাব চাবপাশে কী ঘটছে ও তাব কী করণীয, এই অনুভব। এটাই মার্ক্সবাদেব নিত্যকর্ম। তাব ফলে তত্ত্বেব ভূমিকা আগেব চাইতে অনেকগুণ বেডে যায। উদ্দেশ্যহীন আন্দোলন হযে ওঠে শ্রেণীসংগ্রাম। অন্ধ সমাবেশ হযে ওঠে তাইবেসিযাসেব মত প্রজ্ঞাবান।

মার্ক্স কোনো ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষি নন। তিনি ভবিষ্যতেব সংজ্ঞা দিযেছিলেন, 'মানুয যখন প্রযোজনেব জীবন থেকে স্বাধীনতাব জীবনে প্রবেশ কবে।'[১] সেটা কোনো আধ্যাত্মিক পথে

ঘটবে না। ঘটবে বস্তুসম্পদেব অবিশ্বাস্য প্রাচুর্যে। মার্ক্স কোনো শস্তা কথায় বিশ্বাস কবতেন না যে সমাজতন্ত্র একদিন আসবেই বা ধনতন্ত্র নিজেব ভারে মুখ থুবড়ে পড়বে। তাঁব কাছে তত্ত্বযুদ্ধেব তাই কোনো বিবতি নেই।

কোনো এক সময়ে কোনো এক দেশে বা কখনো-কখনো কোনো এক দেশেব একটা টুকরোয যে-সব শ্রেণী থাকে, সব দেশে সব সময তা থাকে না। শ্রেণী ভাবতীয বর্ণভেদ নয যে বামুনেব ছেলে বামুনই হবে। শ্রেণী সব সময়ই বদলায়।

কার্ল মার্ক্স অন্তত শ্রেণীকে কোনো দেশকালনিবপেক্ষতায চিহ্নিত কবেননি। যদি কবতেন, তা'হলে হেগেল থেকে তিনি তাঁব পদ্ধতি বা মেথডকে আলাদা কবে নেয়ার কোনো জাযগা পেতেন না। ক্যাটিগবিব সপ্রাণ অদলবদলই মার্ক্সেব সবচেযে বড় সৃষ্টি পশ্চিমি জ্ঞানতত্ত্বে। সে-অদলবদল প্রাচ্যে, ভাবতে ও চিনে, ইযোবোপীয় ইতিহাস থেকে ভিন্ন ও শঙ্খিল। অথচ আধুনিক ইতিহাসে ও সমাজতত্ত্বে আমাদেব অশিক্ষা, সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রেব ক্যাটিগবিব অপরিবর্তনীযতা ও ভাবতীয হিন্দুসমাজেব জাতপাঁতের ক্যাটিগরিব অলঙ্ঘনীযতা—এই তিনটি কাবণেব সঙ্গে স্তালিনভাষ্যের মার্ক্সবাদ আমাদের একমাত্র শাস্ত্র হয়ে ওঠায় আমবা, শুধু শ্রেণীর লেবেলই লাগিযে গিযেছি। লেবেল মেনে নিলেই নাম মেনে নিতে হবে। পুবনো লেবেলে আমাদেব ইচ্ছানুযাযী ভাগাভাগি কবা না গেলে, নতুন নামের নতুন লেবেল তৈরি করা হবে। লেবেলে তো কোনো কিছু অনির্দেশ্য রাখা যায না। আমাদের মার্ক্সবাদ চর্চা এই লেবেলের ফাঁদে আটকে গেছে। একবাব আমবা উনিশ শতকেব ইংবেজ-সমর্থিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সমাজ সংস্কাবকে বেনাসান্স বলি, তাবপরেই আমবা সেই রেনাসান্সকে নস্যাৎ কবে তাকে সাম্রাজ্যতোষকদেব কাণ্ডকারখানা বলি। লেবেল মাত্র গুটিকয়েক আব ইতিহাসেব ঘটনা তো অগুনতি। তাই একই লেবেল আমরা এক-একসময়ে এক-একটা ঘটনার গাযে সাঁটি।

আমাদেব জাতীযতাবাদেব শুরু কোথায ধবা হবে—১৮৫৭-ব প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে? ১৮৮৫-তে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায? নাকী ১৯০৫-এব স্বদেশীতে? আর, সে-লেবেলটাতে 'জাতীযতাবাদ'ই লিখতে হবে কেন? যদি লিখতেও হয়, তাহলেও তো আমবা স্থিব কবতে পারি নি বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দেব সাম্প্রদাযিকতা কি জাতীযতাবাদী সাম্প্রদায়িকতা, নাকী, সাম্প্রদাযিক জাতীযতাবাদ?

শ্রেণীবিভাজনেব এই কুটিল ও শঙ্খিল গতিব প্রমাণ তাঁব সমস্ত লেখালেখিতে মার্ক্স ছড়িযে বেখেছেন। তখনকার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজবেলি-ব একটি বক্তৃতা ব্যাখ্যা কবে ১৮৫৩-ব ২৫ জুলাই মার্ক্স লিখছেন, 'ট্রিবিউন' কাগজে, ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানিব 'আর্থিক বিপন্নতা'ব কারণে, 'জোর খাটিয়ে দেশীয বাজ্যগুলিকে ধ্বংস করাব গতি' এমন বেড়ে গেছে। এই সংকট ১৮৪৩-এ চবম হয়ে উঠেছিল। দেশীয রাজাদেব সম্পর্কে মার্ক্সেব কোনো সমর্থন ছিল না, তিনি বলেওছেন, 'এদের কোনো প্রাচীনতাও নেই, ইংরেজদেব স্বেচ্ছাচাবেব এবা ক্রীতদাসতুল্য বাহন।' তবু ১৮৫৬-তে আউধেব দখল যে-ভাবে নিল কোম্পানি, তাতে মার্ক্স লিখলেন, 'দেশেব প্রত্যেকটি একব জমি বাজেযাপ্ত করা—এই তো ভাবতবাসীর প্রতি ব্রিটিশেব বিশ্বাসঘাতী ও বর্বব ব্যবহার।'[১] ১৮৫৩ নাগাদ মার্ক্স এশীয উৎপাদন ব্যবস্থাব উদ্যোগহীনতা,

উৎপাদনবিমুখতা আব অচলতাব বিরুদ্ধে বলতে গিযে এ-পর্যন্তও ভেবেছিলেন, 'ভাবতে ইংবেজেব দুটি কাজ কবাব আছে—পুবনো এশীয সমাজ ভেঙে দেযা ও এশিযাতে পাশ্চাত্য সমাজেব বাস্তব ভিত্তি গড়ে তোলা' (ট্রিবিউন, ২২ জুলাই, ১৮৫৩)।[৮] সেই একই লেখায লিখছেন, ইংবেজেব এই গঠনকর্তব্য লক্ষ্যহীন ও উদ্দেশ্যহীন, সব দেশেব পুঁজিপতিদেব মত ব্রিটেনও 'নতুন পৃথিবী গড়ে তোলাব বাস্তব পবিস্থিতি তৈবি কবছে, যেমন কবে ভূতাত্ত্বিক সব আলোড়ন পৃথিবীব উপবিতল তৈবি কবে।' ঐ একই লেখায মার্ক্স একটা লিস্টি কবেছেন কী কী সেই ভূত্বকেব আলোড়নতুল্য প্রাকৃতিক, অন্ধ ও নিরুদ্দিষ্ট ঘটনা। ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফে দেশটাকে একটা-দেশ কবে তোলা, 'দেশীয সেপাই'দের দিযে দেশেব প্রতিবক্ষাব ব্যবস্থা, 'স্বাধীন সাংবাদিকতায' লালিত নতুন অধিকাব, জমিব ব্যক্তিগত মালিকানা, খুব সঙ্কীর্ণ হলেও পাশ্চাত্য শিক্ষা, বেলপথ আব স্টিমাব—এগুলো ভাবতকে পাশ্চাত্যেব ঘনিষ্ঠ কবেছে। 'ভাবতীযদের ভিতব থেকে একটা নতুন শ্রেণী তৈবি হচ্ছে। এবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ও কিছু বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও কলকাতায কিছু লেখাপড়া শিখেছে। এদেব ভিতবে ইযোবোপীয বিজ্ঞানচেতনা সঞ্চাবিত হযেছে ও সবকাবি কাজকর্ম কবাব মত যোগ্যতা এদেব আছে।'

দুটো বিষয দাগাতে এই কথা তুলছি। প্রথম কথা—মার্ক্স ঐ নতুন শ্রেণীকে কোনো লেবেল দেননি, বুর্জোযা বা আধা-বুর্জোযা বা কমপ্রাদোব-বুর্জোযা বা অভিজাত বা মধ্যবিত্ত বা ফিউডাল। দ্বিতীয কথা—মার্ক্স তাঁব 'এশীয উৎপাদন ব্যবস্থা'র তত্ত্ব ও তাব আনুষঙ্গিক ব্রিটিশেব সৃষ্টিশীল ঐতিহাসিক কর্তব্যেব তত্ত্ব ছেড়ে সবে আসছেন। ১৮৭১-এ কলকাতা থেকে মার্ক্স-এব কাছে একটি চিঠি পৌঁছয। কে যে লিখেছিলেন, তা জানা যাযনি। তাতে 'জনসাধাবণেব মধ্যে গভীব অসন্তোষ ও ভাবতেব শ্রমজীবী মানুষেব দশা' জানানো হযেছিল।[৯] ১৮৮১-ব ১৯ ফেব্রুযাবি মার্ক্স একটি চিঠি লিখছেন এন ওযাই দানিযেলসন-কে,

'তাদেব [ভাবতেব জনসাধাবণেব] কাছ থেকে ইংবেজবা প্রতি বছব আদায কবে—বাজস্ব, হিন্দু [ভাবতীয]দেব যা কাজে আসে না সেই বেলপথেব লভ্যাংশ, সেনাবাহিনী ও সবকাবি কর্মীদেব পেনশন, আফগানিস্তান ও অন্যান্য জাযগায যুদ্ধব্যয, ইত্যাদি। ইংবেজদেব কাছে এই আদাযেব কোনো দব নেই। ভাবতেব ভিতবে ইংবেজবা ভাবতীযদেব কাছ থেকে বাৎসবিক যা আদায কবে, তাব সঙ্গেও এই আদাযেব কোনো সম্পর্ক নেই। যে-সব জিনিশ বাধ্যবাধকতাব সঙ্গে ভাবতীযদেব ইংল্যান্ডে প্রতি বছব পাঠাতে হয, তাব মূল্য ভাবতেব ছ-কোটি কৃষি ও শিল্পশ্রমিকদেব মোট উপার্জনেব চাইতেও বেশি। প্রতিশোধ নেযাব জন্য বক্তপাত ঘটিযে যাওযাব এই প্রক্রিযা।'[১০]

ইন্ডিযা কোম্পানিব চার্টাব বিনিউ কবা নিযে ব্রিটিশ পার্লামেন্টেব বিতর্কেব ফলে ১৮৫৩-তে মার্ক্স ভাবত সম্পর্কে কৌতূহলী হযে ওঠেন। এই চার্টাব উপলক্ষেই কলকাতায দাবিদাওযা ওঠে—ভাবতীযদেব জন্য বড সবকাবি চাকবি খুলে দিতে হবে, ভাবত-শাসনে ভাবতীযদেব মতামত প্রকাশেব জাযগা চাই, ব্রিটিশপ্রজাদেব মৌলিক অধিকাব ভাবতবাসীদেবও দিতে হবে। মার্ক্স যাকে 'নতুন শ্রেণী' বলেছিলেন সেই শ্রেণী নিজেদেব জাযগা খুঁজছিল, ব্রিটিশেব ভাবতসাম্রাজ্যেব ভিতবে। একটা নতুন দ্বন্দ্ব তৈবি হচ্ছিল।

তিন

১৮৫৭-ব প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধেব ঘটনায ভাবতেব জনসাধাবণেব সক্রিযতাব ও ইংবেজ বিবোধিতাব নতুন দ্বন্দ্ব মার্ক্স লক্ষ কবেন। ১৮৫৩-তেই মার্ক্স বলেছিলেন, '[ভাবতেব] ইতিহাস বলতে বোঝায একেব পব এক আক্রমণকাবীব ইতিহাস। তাবা ঐ [ভাবতীয] সমাজেব প্রতিবোধহীনতা ও অপবিবর্তনীযতাব ভিতবে নিষ্ক্রিযতাব যে-ভিত্ আছে তাতে ভব কবে এক-এক সাম্রাজ্য তৈবি কবেছে'।[৬]

১৮৫৭-তে মার্ক্স দেখছেন সেই বিদ্রোহ—ভাবতেব বিপুল সংখ্যক মানুযেব কজিবোজগাব হাবানো ও অভ্যস্ত প্রাচীন জীবন থেকে আমূল উচ্ছিন্নতাব ফলে পুবনো শ্রেণীগুলি শেয পর্যন্ত বিদ্রোহে গিযে ঠেকেছে। মার্ক্স যে 'নতুন শ্রেণী' ও সেই শ্রেণীব সঙ্গে ইংবেজদেব 'নতুন শত্রুতা' দেখতে চাইছিলেন, সিপাহি বিদ্রোহ সেই শ্রেণীব নেতৃত্বে ঘটেনি। মার্ক্স-কথিত 'নতুন শ্রেণী'ব সঙ্গে ইংবেজদেব নতুন শত্রুতা ববং ১৮৫৮-তে এক উল্টো যুদ্ধে ফেঁসে গেল। এই 'নতুন শ্রেণী' সিপাহি বিদ্রোহে আঁতকে উঠেছিল। ঘটনা ঘটামাত্র তাবা সিপাইদেব বিরুদ্ধে মালকোঁচা মেবে নেমে পডল, লেঠেলদেব দল পাকাল ও শাহেবদেব জানাতে লাগল—তাবা আছে শাহেবদেব সঙ্গে। ভাবতীয সমাজেব নিজস্ব শ্রেণীদ্বন্দ্বেব নিষ্পত্তি ঘটল তাদেব একটি শ্রেণী শাহেবদেব দিকে চলে যাওযায। এই 'নতুন শ্রেণী'ই মহাবানী ভিক্টোবিযাব সবাসবি প্রজা হতে পেবে নতুন গৌবব ও অধিকাবেব স্বপ্ন দেখতে শুরু কবল, যেন, ব্রিটিশ-ইন্ডিযা, গ্রেট ব্রিটেনেব একটি প্রদেশমাত্র। মহাবাণীব এক ব্রিটিশপ্রজা যে সব অধিকাব পান, ভাবতেব প্রজাবা তা পাবেন না কেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও এ নিযে তর্ক হযেছে। শাহেবদেব কোনো-কোনো শ্রেণীতে এ-কথা উঠেছিল—সংবাদপত্রেব স্বাধীনতা নিযে, কৃযকপ্রজাব অধিকাব নিযে, স্থানীয প্রশাসনেব ক্ষমতা নিযে।[৭]

এখনকাব বুলিতে যাকে আমবা মানবাধিকাব, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মতপ্রকাশেব স্বাধীনতা বলেও চিনতে পাবি—সেগুলি একটা স্পষ্ট আকাব নিচ্ছিল, মহাবিদ্রোহেব পবেব দুই দশকে। সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, পাবনা কৃযক বিদ্রোহ এ-বকম সব আন্দোলনের বিযযে ও আসামেব চা-বাগানে কুলি নিযে যাওযাব ব্যবস্থাব বিরুদ্ধে কোম্পানিব সবকাব ও মহাবাণীব সবকাবেব নীতি নিযে বাঙালিদেব কাগজপত্রে প্রতিবাদ কবা হচ্ছিল।[৮] সে-প্রতিবাদেব দুটি পবস্পব বিপবীত উপাদানেব ভিতব দ্বন্দ্ব ছিল। ব্রিটিশ পাবলিকম্যানেব আদর্শ তখন একটা নতুন নীতিবোধেব জন্ম দিযেছে ও সেই নীতিবোধ ভূদেব মুখোপাধ্যায থেকে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায পর্যন্ত উঁচু সবকাবি চাকুবেদেব পালনীয হিন্দু-আচাবেব নীতিবোধেব সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। তেমনি আবাব ছিল—আইন-শৃঙ্খলাব সবকাবি সংজ্ঞা ও সেই আইন-শৃঙ্খলা বক্ষাব প্রশাসনিক ব্যবস্থাব ব্যক্তিনিবপেক্ষ নিষ্ঠুবতাব ট্রমা। বর্ণভেদে টুকবো-টুকবো হিন্দু সমাজে দু-একজন নিম্নশ্রেণীব মানুযকে বর্ণহিন্দুবা অনেক সমযেই এমনই সব শাস্তি দিযেছেন। কিন্তু একটা পুবো জনগোষ্ঠীকেই এমন শাস্তি দেযাব প্রক্রিযা এমন মুখোমুখি কখনো দেখা যাযনি। প্রত্যক্ষতা ও ট্রমা এই নতুন শ্রেণীব ভিতব একটা সংহতি তৈবি কবে তুলছিল।[৯]

সময়টা অস্থির হয়ে উঠছিল। ১৮৭২-এ বাংলা কাগজের বিরুদ্ধে আইন হল, বঙ্কিমচন্দ্রেব 'বঙ্গদর্শন' শুরু হয, কলকাতায প্রথম টিকিট বিক্রি কবে থিযেটাব খোলে। ৭৫-এ দাক্ষিণাত্যেব কৃষকদেব বিদ্রোহ। ৭৯-তে সুতিকাপড়েব ওপর আমদানি কব তুলে দেযাব প্রতিবাদ কবল দেশী সুতা-ব্যবসাযীবা। ১৮৭৫ থেকে শুরু হয সম্ভাব্য মহানগব-কর্পোবেশনে ও স্বাযত্তশাসনেব বোর্ডে বাঙালিদেব ঢোকাব চেষ্টা। আবার সেই বোর্ড যখন নতুন-নতুন কব বসাল তখন বাংলার জমিদাববা সংগঠিত আপত্তি কবলেন যে এব ফলে চিবস্থাযী বন্দবস্তেব শর্ত লঙ্ঘিত হচ্ছে (১৮৯২)। মাড়োযারি ব্যবসাযীদেব বিনিযোগ ও বিশেষজ্ঞতায এগিযে যাওযাব তাৎপর্য বাঙালি ব্যবসাযীবা বুঝতেও পাবেন নি। সেই 'নতুন শ্রেণী'ব কর্তৃত্ব বাঙালি ব্যবসাযীদেব হাত থেকে চাকুবেদেব হাতে চলে গেছে। ১৮৮১-ব হিশেব অনুযাযী কলকাতায উঁচু হিন্দুদেব তিনটি বর্ণ, মোট হিন্দুদেব তুলনায ছিল, ২৮·৪ শতাংশ। দু-এক কলম ইংবেজি জানে এমন সব হিন্দুবা অফিস-কাছাবিতে কেরানির চাকরি পাচ্ছিলেন। এক বিক্রমপুব থেকেই নাকী সবকাবি-কেবানিদেব প্রায ৮০ শতাংশ আসতেন।[১০] কলকাতা ছাড়াও পড়াশুনোর নতুন-নতন জাযগা তৈবি হচ্ছিল—বাজশাহি, পাবনা, ঢাকা, নোযাখালিতে। কিন্তু বাঙালি বর্ণ হিন্দু কোনো-না-কোনো ছুতোতে ভূসম্পত্তি ছুঁযে থাকতে পারত—কর্নওযালিশের (১৭৯৩) চিবস্থাযী বন্দবস্তের সুবাদে, যদিও সে-সব অনেক জমিদারির তালপুকুরে ঘটি ডুবত না। বাঙালি বর্ণ হিন্দু পরিবারে ছেলেদেব লেখাপড়া শেখানো, মেয়েদের বিযে দেযার মতই, একটি অবশ্য পালনীয কর্তব্যেব মর্যাদা পাচ্ছিল উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ-তিরিশ বছরে। ১৮৭৫-এব পব মেয়েদেবও স্কুলে পড়ানোর ঝোঁক বেশ বেড়ে যায়, মেযেদেব স্কুলেব সংখ্যাও কলকাতায় ও পুব বাংলায় বাড়তে থাকে। ১৮৫৮তে কোম্পানিব-ভারত ব্রিটিশ-ইন্ডিযা হযে ওঠায বাংলাব সব জিলা-মহকুমা-থানায ও ভারতের সব প্রদেশে সবকাবি চাকরির সংখ্যা এত বাড়তে থাকে যে যোগ্য ব্যক্তি পাওযা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। সাবা ভাবতে বাঙালিবাই এই সরকাবি কাজগুলিতে সবচেযে বেশি নিযুক্ত হযেছিল—ডাক ব্যবস্থায, বেল-স্টিমাব, ইত্যাদি পবিবহণে, থানাব দাবোগা-পুলিশ হিশেবে, জিলা-মহকুমায কাছাবিগুলিতে ও মুন্সেফ্ কোর্ট থেকে জিলা কোর্টে নানা ধরণের ও স্তবের কর্মচারী, আইন ব্যবসাযের সঙ্গে জড়িত—উকিল-মোক্তাব-মুহুবি, ডাক্তার, স্কুলেব শিক্ষক ইত্যাদি পেশায। হিন্দু বাঙালি পবিবাবেব মোক্ষ হযে ওঠে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওযা।

সবকাবি চাকবিতে ঢোকাব এই বাঙালি ঝোঁক কিন্তু এমন দুর্দমনীয হযে উঠেছিল হিন্দু বর্ণভেদেব ধাঁচার মধ্যে। বর্ণ হিন্দু বলতে যে ব্রাহ্মণ, কাযস্থ, বৈদ্য বর্ণ বোঝাত, তাদেব ঘবেব ছেলেবাই পড়াশুনো করত—গ্রামে, সদবে ও কলকাতায। নিম্ন বর্ণের হিন্দুবা চৌকিদাব পর্যন্ত হতে পাবতেন বা পোস্টাফিসেব বানাব বা বেল-স্টিমাবেব সিগন্যালার। উচ্চবর্ণের কোনো হিন্দু, পুলিশেব জমাদাব হযেছে—এমন তো শোনাও যাযনি যদিও কিছুদিনেব মধ্যেই বিহাবেব ব্রাহ্মণবা ঐ পদগুলিতে ঢুকে পড়েন।

বর্ণহিন্দু বাড়িব ছেলেদেব আধুনিক লেখাপড়া শেখা আব পুবনো ধর্মকর্মে থাকার সঙ্গে সঙ্গে ভূসম্পত্তিব শবিক থাকাটাও ছিল অপরিহার্য। যখন সবকাবি চাকরিতে ঢোকেন তখনো

এই তিন-চার রকমের আত্মতায় তাঁরা সংলগ্ন থাকতেন। তাঁবা ছিলেন তাঁদেব 'দেশ'-এর (গ্রামের) স্বাভাবিক নেতা। তাঁরা কলকাতাতে ছিলেন সব সময়ই বাসাবাড়িব লোক— কলকাতায কেউ ঘর-সংসাব বসাতেন না।

অথচ কলকাতা সম্পর্কে তাঁদেব ছিল গর্ব, কলকাতাব নাগবিক জীবন সম্পর্কে ছিল তাঁদেব উচ্ছ্বাস, নতুন সব আমোদ-প্রমোদে ছিল তাঁদেব উৎসাহ। নানাদিকে কীর্তিমান বাঙালিবা তখন কলকাতাব প্রতীক। আই-সি-এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুব, বিহাবীলাল গুপ্ত, বমেশচন্দ্র দত্ত, প্রথম ভাবতীয ব্যাবিস্টাব জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুব, বিশ্বে পবিচিত প্রথম ভাবতীয বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু—এঁবা বাঙালি সমাজের আদর্শ হযে উঠছেন। বিদ্যাসাগব ও বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকেব শেষ দশকেব শুরুতে জীবিত। বিদ্যাসাগবেব ছবি তখন কলকাতাব দোকানে বিক্রি হত। উনিশ শতকের শেষে ববীন্দ্রনাথেব বযস ৩৯। তাঁব খ্যাতি তখন এতটাই ছড়িযেছে যে তাঁব ছবিব জন্য খদ্দেরদের কাছ থেকে অনুবোধ আসছে। সত্যজিৎ বাযেব তৈবি রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্প থেকে 'চারুলতা' নামেব সিনেমাটিতে আব ববীন্দ্রনাথেব 'চোখেব বালি' থেকে ঋতুপর্ণ ঘোষ-এব তৈরি সিনেমাটিতে উনিশ-বিশ শতকে ছড়ানো সমযেব ভিতব বাঙালি সমাজেব অন্তর্লোড়েব কিছু প্রামাণিক সংকেত আছে। মেযেদেব লেখাপড়া শেখা (চারু ও বিনোদিনী), বাঙালি সমাজেব নতুন সব পেশা (সাংবাদিকতা ও ডাক্তাবি), স্বামী-স্ত্রীব গার্হস্থ্য ভূমিকাব পার্থক্য (চারুব একাকিত্ব ও ভূপতিব সামাজিকতা, আশা-ব একাকিত্ব ও মহেন্দ্রেব স্বাধীনতা), যে-মেয়েরা পড়াশুনো শিখেছে তাদেব প্রায সমবযসী ও সহমনা পুরুষদের সঙ্গে বন্ধুত্বের পবিসর, (অমল ও চারু, বিহাবী ও বিনোদিনী), ইংরেজি ভাষায লেখা বাজনৈতিক নিবন্ধ ও নাবীশরীর নিযে লেখা কবিতায বাঙালি পুরুষেব অনাস্বাদিতপূর্ব ক্ষমতাব আস্বাদ (ভূপতির গ্ল্যাডস্টোন-বিজয়েব, পার্টি ও বিহাবীব কাছে পাঠানো মহেন্দ্রব মেযেশরীব নিযে লেখা কবিতা)—এই জায়গাগুলিতে 'নতুন শ্রেণী' বাঙালিব সমাজ-পবিবারেব ধারণা ও অভ্যেস, কখনো আবজানো দবজাব আড়ালে ('চোখেব বালি'ব চা-খাওযা, চারুব এমব্রযডাবি-ব্রোকেট) কখনো নাবীশবীবেব অভ্যস্ত বৌদ্রোজ্জ্বল প্রকাশ্যতায (স্নানেব পব জামা না-পরে কাপড় মেলার সময মেযেদেব গোপন শবীবেব অব্যবহিত ইতিহাস ফাঁস হয়ে যাওযা। ফাঁস হযে যাওযাই-বা কেন। মেযেদেব শবীব তো ঢাকা হয পুরুযেব ইচ্ছায। নইলে তো তারা খালি গাযে খালি পাযেই থাকে) দেখা যায। 'ঘবে বাইবে' সিনেমাটিতে সন্দীপ পরপব দুটি গান শোনায বিমলাকে,—প্রথমটি স্বদেশসঙ্গীত, দ্বিতীযটি খেমটা। সত্যজিৎ বায এই সময সম্পর্কে এমনই সংকেত তৈবি কবেছিলেন 'চারুলতা'তেও—বামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতের সঙ্গে নিধুর টপ্পা।

চাব

১৮৯১ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত লেখা ববীন্দ্রনাথেব গল্পগুলিতে ও চোখেব বালি-নৌকাডুবি এই দুটি উপন্যাসে এই 'নতুন শ্রেণী'ব গড়ে ওঠাব বেগ, বিস্তাব ও বাস্তব আব নতুন ধবণের

সব দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে বাঙালি হিন্দু মানুষজনের হাঁসফাঁস, মহাভারততুল্য মানবদলিল, হিউম্যান ডকুমেন্ট, হয়ে আছে।[১১] এমন এক পরিবর্তমান ইতিহাস তো এক-একজন বেঁচে-থাকা মানুষের বেঁচে-থাকার রক্তমাংসের প্রতিদিন। 'দেনাপাওনা' গল্পের স্বামীটি তার বাবার ব্যবহারের প্রতিবাদ করতে পারে বিয়ের আসরে কিন্তু তার বাড়িতে তার মা-বাবার প্রতিদিনের ব্যবহারের কোনো প্রতিকার নেই, সে দ্বিতীয়বারও পিতৃনির্দেশেই বিয়ে করে। নব্য যুবক হিন্দুর কাছে দুটোই সমান আচরণীয়। জন্মান্তরে হিন্দু বিশ্বাসে রাইচরণ নিজের ছেলেকে বাবুর ছেলে ভাবে আর কাদম্বিনী নিজের জীবনকে প্রেতের জীবন মনে করে। আমার জানা নেই—একটি বিশেষ সময়ে ব্যক্তির বিশ্বাস ও তার বেঁচে থাকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এই জটিলতা পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষার সাহিত্যে এমন লেখা আছে কীনা। গোগোল ও চেখভে এমন কিছু পরিস্থিতি আছে—গল্পেও, নাটকেও। স্তাঁদাল ও বালজাক ফরাসি সমাজের মানুষজনের সম্পর্কের যে-বদল দেখিয়েছিলেন, জটিলতার দিক থেকে ও শিল্পকর্ম হিশেবে রবীন্দ্রনাথের এই গল্পগুলি ও ঐ দুটি উপন্যাসের সিদ্ধি তার চাইতে বেশি।

উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বছর থেকে হিন্দু বাঙালি কোনো পুরুষ বা নারীর বেঁচে-থাকা ও স্বভাব-সংস্কার-ধারণার অখণ্ডতায় ছিন্নতার অনিবার্য যে-প্রাকৃতিক টান লেগেছিল, তাকে সরাসরি তাঁর এই কয়েকটি গল্প-উপন্যাসে প্রায় চৌদ্দ বছর ধরে ধরছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তখনকার ও তার পরের সামাজিক নীতি অনুযায়ী মহেন্দ্রের রক্ষিতা হিশেবে থাকার কোনো বাধা বিনোদিনীর ছিল না। বরং তাতে শরীরের স্বভাব বাঁচত, পারিবারিক বা ধর্মীয় সংস্কারও বাঁচত। বাধা ছিল বিনোদিনীর নতুন ধারণায় যেখানে সে শরীরকে ছাড়াতে চাইছিল। ও পরে, মহেন্দ্রেরও নতুন ধারণায় যেখানে সে 'প্রেম' আবেগটি প্রথম বুঝতে পারে। 'নৌকাডুবি'তে রমেশকে তো হিন্দু সংস্কারে স্বামী বলেই জেনেছে কমলা। শারীরিক সম্পর্ক ছাড়া তাদের দাম্পত্যে, কমলার দিক থেকে তো কোনো শূন্যতার বোধ ছিল না। অথচ, যখন কমলা জানতে পারে তখন দাম্পত্যের ঐ অভিজ্ঞতাকে, সংস্কারগত ধারণার জোরে বাতিল করতে তার মুহূর্তের দ্বিধাও থাকে না। মার্ক্স একেই বলেছিলেন—তত্ত্ববিশ্বের নিজস্ব অভিকর্ষ।[১২]

আমরা যে-বাঙালিকে ধরে তত্ত্ববিশ্বের গঠন-উপাদান খুঁজছি তাঁদের বর্ণহিন্দু বলা হয়েছে, তাঁদের প্রধানত চাকুরে বলা হয়েছে, তাঁদের দেশের বাড়ি ও কলকাতার বাসার কথা বলা হয়েছে, 'দেশে' সামাজিক নানা কাজকর্মে তাঁদের স্বাভাবিক নেতাও বলা হয়েছে, কলকাতার আধুনিকতার প্রতি তাঁদের টানের কথাও বলা হয়েছে। কলকাতার আধুনিকতার প্রতি এই টানকে নাগরিকতাবোধই বলা উচিত। কলকাতার কাছাকাছি জিলা-মহকুমা শহরগুলিতে ও পুব বাংলায় এই আধুনিক নাগরিকতার চেতনা ছড়িয়ে পড়ছিল। কলকাতার বাইরের এই বাংলা শহরের নাগরিকতার আখ্যান তৈরি করে তোলা যায়, ঐ সময়কার অনেকের আত্মজীবনী থেকে। সেই লেখাগুলিতে নিজেদের দেশের, গ্রামের ও শহরের, গৌরবই যেন তাঁদের প্রধান বিষয় মনে হয়। আবার, কোথাও বংশমর্যাদাও বেশ ফলাও করে বলা হয়েছে। বিশ শতকের সাম্প্রতিকতর সময়ে যাঁরা এই আত্মজীবনী লিখেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ

কবে নীবদ সি চৌধুবী-ব ইংবেজি বইটিতে, গোপাল হালদাবেব 'বূপনাবানেব কূলে'তে ও সুধীবঞ্জন দাশেব স্মৃতিকথায পড়া যায কলকাতাব বাইবেব এই 'দেশ', নাগবিকতা ও কাবো-কাবো বংশমর্যাদাবোধ কী বকম এক চেতনা তৈবি কবছিল। হালে ববীন্দ্রকুমাব দাশগুপ্ত-এব যে-আত্মজীবনী বেবচ্ছে, তাতেও সেই পুবনো বাংলাকে খুব চেনা যাচ্ছে।[১]

কলকাতা থেকে দূবে এই নাগবিকতা ভিতবে-ভিতবে ছিল কলকাতাবই সম্প্রসাবণ। কলকাতা হযে এই নাগবিকতা বিলেত পর্যন্তও প্রসাবিত হচ্ছিল। গ্রাম-বাংলাব যাঁবা স্থাযী চাকবি-বাকবি সত্ত্বেও কলকাতায থাকতেন অস্থাযীভাবে আব অস্থাযীভাবে গ্রামে গেলেও গ্রামই ছিল যাঁদেব ভদ্রাসন, তাঁবা এই একমুখো সেতুব কাজটা কবতেন—কলকাতা থেকে গ্রাম। বর্ণহিন্দু, শিক্ষিত, চাকুবে, মধ্যস্বত্বভোগী বাঙালিব চেতনায কলকাতা ছিল একেবাবে কেন্দ্রে। একটু সম্পন্ন পবিবাবেব ছেলেদেব বিলেত যাওযাটা ক্রমেই বাড়ছিল।[১০] সেই বৃহৎ বিশ্বেব সিংহদ্বাব ছিল কলকাতা। ১৮৭০-এ কেশবচন্দ্র সেনের বিলেত যাওযা, সেখানে বক্তৃতা ও মহাবাণী ভিক্টোবিযাব সঙ্গে তাঁব দেখা-হওযা আর ১৮৯৩-এ স্বামী বিবেকানন্দেব আমেবিকা যাওযা আব তাবও পবে দু-চাব বছবেব মধ্যে বিলেত ও আমেবিকায গিযে ধর্মপ্রচাব, সেখানে বক্তৃতা, বাঙালি জীবনেব লোককথা হযে ওঠে। যদিও বিলেত-আমেবিকা যাওযাব আগে কলকাতা ও বাংলায তাঁদেব চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মেব তেমন কোনো সক্রিযতা ছিল না। বেদান্তধর্ম বলে বিবেকানন্দ বিদেশে যা প্রচাব কবেছিলেন, তাঁব তেমন কোনো মতামত, তিনি আমেবিকা যাওযাব আগে কোথাও বলেন নি। বামকৃষ্ণেব বৈদান্তিকতা তো পববর্তী আবিষ্কাব। ইতিপূর্বে কেশবচন্দ্রও কবেননি। বামকৃষ্ণ পবমহংসেব ধর্মতত্ত্ব বলে কোনো সঙ্গতিশীল যুক্তি-পবম্পবা যদি সাজিযে তোলা যায তা হলেও বোঝা যাবে না—বামকৃষ্ণেব মত ও আচবণেব সঙ্গে কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দেব প্রচাবিত ব্রাহ্ম হিন্দুধর্মেব সম্পর্ক কোথায? বা, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ প্রচাবিত ধর্মমতেব মধ্যে কোনো পবম্পবা আছে কী না। তাঁদেব বযসেব তফাৎ ছিল ২৬ বৎসব। কেশবচন্দ্র বিলেতে গিযে যখন বক্তৃতা কবে ভাবতীয হিন্দুধর্মেব কথা বলছিলেন, তখন বিবেকানন্দেব বযস মাত্রই সাত আব কেশবচন্দ্র তখন ব্রাহ্ম ধর্মেব প্রবীণ নেতা। সেই নেতৃত্বই তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিযেছিল ও দেবেন্দ্রনাথেব নেতৃত্বাধীন আদি ব্রাহ্মসমাজেব প্রধান কবে তুলেছিল।

১৮৫৩ সালেব নতুন চার্টাব চাকবি-বাকবিতে বর্ণহিন্দু শিক্ষিত বাঙালিব সম্মুখে দবজা খুলে দিযেছিল আব সিপাহি-বিদ্রোহেব ফলে শাহেবদেব বিপন্ন শাসন ও ব্যবসাযে এ-দেশীয মানুষজনেব সমর্থন অনিবার্য হযে ওঠে। সেই সময কলকাতাব একটি বিশিষ্ট পবিবাবেব ছেলেব ব্রাহ্ম হযে যাওযা (১৮৫৭), পবিবাবেব বিবোধিতা কবে চাকবি ছেড়ে দিযে পুবো সমযেব ধর্মপ্রচাবক হযে ওঠা আব আদর্শ ও নিত্যকর্মেব ভিতবকাব পার্থক্যেব কাবণে আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে, তাব অর্থ ঠাকুববাড়িব সমর্থন থেকে, সবে এসে 'সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা (১৮৬৫)—কেশবচন্দ্রকে জননেতা কবে তুলেছিল। যদি তখন বাজনৈতিক আন্দোলন আব-একটু স্পষ্ট হত, তা হলে হযতো কেশবচন্দ্র বাজনীতিতেই যেতেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ, পবিবাবেব সঙ্গে বিবোধ, সম্পন্নতা থেকে বেবিযে এসে আশ্রিতেব ভূমিকায চলে যাওযা

অথচ সেই আদর্শেব কাবণেই নতুন ধর্মও ত্যাগ কবে নতুনতর ধর্ম ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, আব একই সঙ্গে ইংবেজি ও বাংলায় বক্তৃতা ও সাংবাদিকতা, খুব অল্প সময়েব মধ্যে তাঁকে নতুন বাঙালিব নেতা কবে তুলতে পেরেছিল। আবাব ১৮৭৫-এ তাঁব মেয়ের সঙ্গে কোচবিহাবেব বাজাব বিয়েতে তাঁব সম্মতি ও যুক্তিব প্রকাশ্য স্ববিবোধিতা কেশবচন্দ্রকে তাঁব তৈবি সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কবে দিল। তাঁব প্রধান অনুগামীবা প্রায় সকলেই তাঁকে ছেড়ে নতুন সমাজ তৈবি কবলেন আব কেশবচন্দ্রকে 'নববিধান' নামে নতুন একটি সমাজ তৈবি কবতে হল। কিন্তু এই সবেব ফলে কেশবচন্দ্রেব প্রতি নাগবিক, চাকুবে, শিক্ষিত, বর্ণহিন্দু বাঙালিব প্রশস্তি ও স্বীকৃতিতে খুব একটা ছোঁয়া লেগেছিল—মনে তো হয় না।

তাব একটা কাবণ হতে পাবে যে বর্ণহিন্দু শিক্ষিতবা সংখ্যায় ব্রাহ্মশিক্ষিতদেব চাইতে বেশি ছিলেন, তাঁবা ব্রাহ্মবিবাহেব তিন-আইন পছন্দ কবতেন না। মেয়েব বিয়ে দিতে গিয়ে কেশবচন্দ্র যে তাঁব নিজেব কথাবই উল্টো কাজ কবলেন—সেটা বর্ণহিন্দুদেব কাছে এমন কিছু অপবাধ মনে হয়েছিল বলে তো বোঝা যায় না। মেয়েকে যোগ্য ও সৎপাত্রে বিয়ে দেযাব সঙ্গে আইনি বিবাহ বা অগ্নিসাক্ষী বিবাহেব ভিতবকাব বিবোধেব সম্পর্ক কী? বর্ণহিন্দু ও ব্রাহ্মদেব মধ্যে প্রধান পার্থক্য আকাব-নিবাকাব তখনো নয়। অনেক নাম-কবা ব্রাহ্মেব 'দেশেব বাড়ি'তে বেশ ধুমধাম করে দুর্গাপূজা হত। কলকাতাতেও হত। আকাব-নিবাকারের ব্রহ্মতত্ত্বেব চাইতে অনেক বেশি সত্য হয়ে উঠেছিল শিক্ষিত বর্ণহিন্দু চাকুবে বাঙালিব পাবিবাবিক কর্তব্য—কলকাতায় মেসবাড়িতে বা বাসাবাড়িতে থেকে পযসা জমিয়ে ছুটিছাটায় 'দেশে' গিয়ে, পুজোব ছুটিতে তো নিশ্চযই, নিজেদেব ভদ্রাসন নতুন কবা, নিজেদেব পুকুব কাটানো বা পবিষ্কার করানো, পাবলে বাড়িতে খাওযাব জলেব কুযো খোঁড়া ও বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসবেব অনুষ্ঠান শুরু কবা। গ্রামেব সমাজে তাঁদেব যদি ওপবেব দিকে উঠতে হয—তা হলে তিনটি কাজ কবতেই হত যেন। টিনেব চাল বা দালান বাড়ি, কুযো আব পুজো। পূর্ব ও উত্তব বাংলায় দালান-বাড়ি কম হত হযতো ওখানকাব মাটি ইট পোড়ানোব মত নয বলে, তা ছাড়া খালবিল নদীনালা পেবিয়ে দালান তৈবিব জিনিশপত্র আনাব সমস্যা ছিল, মনে হয। মাব নৌকো-বা গয়নাব নৌকো পাহাড়েব মত মাল বইত বটে, কিন্তু সে মাল হয বস্তাবন্দি ধানচাল বা পাটের গাদা। পাট ও বস্তাব ওজন নৌকোয নানাভাবে ছড়িযে দেযা যায। ইটেব ওজন তো খাড়া ওজন—নৌকোভর্তি ইট নিতে তো দেখা যায না। তাই গঙ্গাব দক্ষিণ পাবেব তুলনায উত্তর পাবে পাকাবাড়ি কম ছিল? জিলা শহবে বা মহকুমা শহবে বা গ্রামে টিনেব চাল ছিল যেন মধ্যস্বত্বেব ঘোষণা, কুযো ছিল যেন পশ্চিমি শিক্ষা ও কলকাতাবাসের প্রমাণ আব দোল-দুর্গোৎসব যেন বর্ণহিন্দু পবিবেশেব ভিতব প্রাধান্যেব স্বীকৃতি।

এই বর্ণহিন্দু পাবিবেশ ও তাব ভিতবই স্বীকৃত এই 'নতুন শ্রেণী'ব ভিত তৈবি হযেছিল কলকাতা থেকেই। 'নতুন শ্রেণী'র এমন সাংস্কৃতিক-ধর্মীয সংহতি নির্মাণে কেশবচন্দ্র ও কেশবচন্দ্রেব উপস্থাপনায বামকৃষ্ণ পবমহংসেব প্রভাব ঘটেছিল সবচেযে নাটকীয, দ্রুত ও ব্যাপক।

বামকৃষ্ণ তো তাঁর দাদা বামকুমাবেব সঙ্গে কলকাতায ছিলেন ১৮৫২-৫৩ থেকেই। দক্ষিণেশ্বেব আসাযাওযা ছিল মন্দিব-প্রতিষ্ঠাব সময (১৮৫৫) থেকেই। তিনি বাধামাধবেব পূজাবী নিযুক্ত হন ১৮৫৮তে ও এবপবই তাব বিযে হয—তখন তাঁব বযস ২৫-এব এদিক-ওদিক।[১১] সেই সময়ে অত বযস পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা, বিশেষ কবে কোনো ব্রাহ্মণ-পুরুষেব পক্ষে, কিছুটা ব্যতিক্রম মনে হয। ২৫-২৬ বছব বযস, তিনি বিযে কবতে বাজিও ছিলেন। এমনও হতে পাবে যে বডভাই বামকুমাবেব একাব আযে সংসাব চালানো কঠিন ছিল বলেই তাঁব নিজেব আয নিশ্চিত হওযাব আগে বিযেব কথা ওঠেনি। ঐ বযসে তাঁব মনে কোনো সন্ন্যাসভাব আসেনি। তিনি যে মাঝেমধ্যে হঠাৎ মূর্ছিতপ্রায হতেন—সেই কাবণেই তাঁব অভিভার্বকবা হযতো তাঁব বিযেব উদ্যোগ নেননি। আবাব, জীবনীতে যা পাওযা যায তাতে মনে হয, ঐ মূর্ছা ক্রমে বেড়ে যাওযায তাঁদেব পবিবাবেব প্রবীণবা মনে কবেন—বিযে দিলে সেবে যাবে। বর্ণহিন্দু বাঙালি পবিবাবে নাবীপুরুষেব অচেনা অসুখ সাবানোব জন্য বিযে দেয়াটা এখনো প্রচলিত। ফলে, অনেক সময় স্কিজোফ্রেনিযাব বোগিনী দাম্পত্যেব দায মেটাতে ও নিজেব অসুখ গোপন কবতে-কবতে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা ছাড়া কোথাও পবিত্রাণ পান না। বামকৃষ্ণেব ২৫-২৬ বছব বযস পর্যন্ত তাঁব ঐ মূর্ছাবেশকে কোনো আধ্যাত্মিক লক্ষণ বলে তাঁব পবিবাবেব কেউই মনে কবেননি।

তাঁব ঐ বিযেব পবপবই তিনি ব্রাহ্মণী ও তোতাপুবী নামের দুই পবিব্রাজক সন্ন্যাসীব কাছাকাছি আসেন, দক্ষিণেশ্বরেই। দক্ষিণেশ্বে প্রতিদিনই, ও এখনো, তীর্থযাত্রীদেব বিনি পযসায খেতে দেযা হত, গঙ্গাব ওপবে খোলা দবদালানে বাত্রিবাসেব সুবিধে ছিল। এতটা 'কালীঘাট'-এ ছিল না। ভাবতেব পর্যটক্ত সাধু-সন্ন্যাসীদেব ঘুবে-বেড়ানোব একটা পঞ্জি থাকত। সেই পঞ্জি ধবেই তাঁবা তীর্থ থেকে তীর্থে যেতেন। দক্ষিণেশ্বব এমন অল্প সমযেব মধ্যে এতটা প্রাধান্য পেযেছিল যেহেতু পর্যটক্ত সাধু-সন্ন্যাসীদেব পঞ্জিতে সেটা ঢুকে গিযেছিল।[১২] সেই কাবণে, নানা দেশেব, নানা ভাষাব সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীব সঙ্গে বামকৃষ্ণেব দেখাসাক্ষাৎ হওযা ও কথাবার্তা বলা ছিল খুবই স্বাভাবিক। বামকৃষ্ণ একটু খোলামেলা মানুষ ছিলেন, মানুষজনেব সঙ্গে মিশতে পছন্দ কবতেন, মিশতে পাবতেনও—নইলে এত গল্প তাঁব মনে থাকত কী কবে? তাঁব অগোছালো জীবনযাপনেব জন্য পুজোব প্রতিদিনেব দায-দাযিত্ব, কাজকর্ম ও ব্যবস্থায তাঁকে খুব লাগানো হত মনে হয না। দক্ষিণেশ্ববেব পুবোহিতবা সকলেই তো ছিলেন তাঁর বাড়িব মানুষজন। এত মেলামেশাব ফলে ও তিনি খুব 'মিষ্টস্ববে' গাইতে পাবতেন বলে তাঁব একটু জনপ্রিযতাও ছিল।

১৮৫৯ থেকে ব্রাহ্মণীব কাছে তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র আব ১৮৬৬ থেকে তোতাপুবীব কাছে অদ্বৈতধর্মে শিক্ষাদীক্ষা নিযেছিলেন বলে যা বলা হয, সেটা যেন জীবনযাপনেব স্বাভাবিকতাব ওপব একটা নকশা আবোপ কবা। ব্রাহ্মণীই সম্ভবত বামকৃষ্ণকে অবতাব বলেন ও বামকৃষ্ণেব মূর্ছাবেশকে ঈশ্ববলক্ষণ হিশেবে বর্ণনা কবতে চান। তন্ত্র ও অদ্বৈত—দুটি প্রক্রিযাই শিক্ষাসাপেক্ষ। মননেব সেই গ্রহণক্ষমতা বামকৃষ্ণেব ছিল না। তবে, এই দুই প্রক্রিযাবই কিছু লৌকিক আচাবপ্রধান সংস্কবণ ছিল। সম্ভবত ব্রাহ্মণী ও তোতাপুবী সেই আচাব-আচবণ

বামকৃষ্ণকে দেখিয়েছিলেন। বামকৃষ্ণেব জীবনে তাঁব কর্তৃত্বে ঘটিত কোনো ঘটনাপঞ্জি নির্মাণ অসম্ভব, যা থেকে আধ্যাত্মিক-'সাধনা'র নানা ধর্মীয় নানা পদ্ধতিব ভিতর দিযে তাঁব আত্মসাধনাব প্রমাণ পাওযা যায। বামকৃষ্ণেব কাছ থেকে বেদান্তেব পাঠ নিযে বিবেকানন্দ বিশ্বজযে বেবলেন আর বামকৃষ্ণ বেদান্তে পৌঁছেছিলেন নানা ধর্মেব নির্ধাবিত ব্যবস্থা দিযে—এমন একটা সিনেমাব চিত্রনাট্য বামকৃষ্ণেব জীবন নিযে যে বানানো ও বিশ্বাস্য হযে থাকল, একশ বছবেব ওপব, তাব কাবণ, বর্ণহিন্দু শিক্ষিত এই 'নতুন শ্রেণী'ব তখন দবকাব হযে পড়েছিল নিজেব দ্বন্দ্বেব—চাকবি ও জমিদাবি, শিক্ষা ও বর্ণভেদ, যুক্তি ও আচাব—একটা আধিভৌতিক নিরসন। বামকৃষ্ণকে অবতাব কবে তোলায ও তাঁব ধর্মমত নিযে কোনো একটি যুক্তিকাঠামো গঠন কবায কেশবচন্দ্রেব নেতৃত্বই ছিল প্রধান, নবেন্দ্রনাথ বা আব-কারো নয।

পাঁচ

ঐ ১৮৭৫-৭৬-এ কেশবচন্দ্র তাঁব নিজেব কাগজ 'দি ইনডিযান মিবব'-এ রামকৃষ্ণকে নিযে তিনটি ইংবেজি লেখায তাঁকে, হিন্দুধর্মেব শ্রেষ্ঠ সব কিছুব আধার বলেছিলেন। 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এব লেখক-সম্পাদক বলেছেন যে ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৫-ব মধ্যে বামকৃষ্ণেব কাছে তাঁব বিখ্যাত ভক্তবা এসে যান। তিনি একটি তালিকাও দিযেছেন।[১৭]

তাঁব নতুন সমাজ 'নববিধান'-এ কেশবচন্দ্র চৈতন্য-প্রবর্তিত সংকীর্তন, সমবেত গান, সমবেত ধ্যান ইত্যাদি শুরু কবেন। সেই সব আচবণে খ্রিস্টধর্মীদেব কোনো-কোনো গোষ্ঠীব প্রভাবও ছিল। কেশবচন্দ্রেব এই বিশেষ ধবণেব ধর্মচর্চাব সামাজিক কাবণ থাকাব কথা। সেগুলি আমাদেব খুব একটা জানা নেই। ফলে হিন্দুদেব কাছে কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিকচর্চাব ধবণধাবণ অনেকটা চেনা ঠেকে। বাংলাব বর্ণহিন্দু সমাজ ব্রাহ্ম ও হিন্দুতে ভাগাভাগি হযে ছিল। সেই ভাগাভাগিব ফলে হিন্দুত্ব-ব্রাহ্মত্ব নিবপেক্ষ কোনো বাঙালি পবিচয সত্য হযে উঠতে পারেনি। বামকৃষ্ণ-কেশবচন্দ্র সম্পর্ক সেই নাগবিক বাঙালিব পবিচযকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। বামকৃষ্ণেব মৃত্যুব আগে কেশবচন্দ্রেব মৃত্যু হয ১৮৮৪-তে।

কেশবচন্দ্র ও তাঁব মধ্যস্থতায তখনকাব অনেক বিখ্যাত বাঙালিই বামকৃষ্ণকে দিব্যপুরুষ মনে কবতেন। কেউ-কেউ অবতারও ভাবতেন। সেই দিব্যতায ও অবতাবত্বে চৈতন্যেব জীবনযাপন ও স্বভাবেব প্রতিফলন খুঁজে পাওযা হত। চৈতন্যেব যেমন মূর্ছা হত, বামকৃষ্ণেবও সে-বকম মূর্ছা হত—এটা একটা প্রধান মিল। বামকৃষ্ণেব সহজ কথা, সবলতা, ব্যবহাবেব অনিশ্চযতা—এই বুকে টানছেন, এই দূব-দূব কবছেন, তাঁব গান-ভালবাসা ও গান গাইতে পাবা, সংকীর্তনে নাচা ও ঈশ্বব-সম্পর্কিত কথাবার্তাতেই ব্যস্ততা আব সেই সব কথাবার্তাকে কোনো দার্শনিক-আধ্যাত্মিক তত্ত্বেব আকাব না দিযে, বোজকাব জীবনেব অন্তর্গত কবে নেযা, তাঁর একেবাবে শাদাসিধে জীবনযাপন ও কোনো বকম আচাব পালনেব কোনো দর্শনীযতা তাঁব না-থাকায তিনি কলকাতাব শিক্ষিত হিন্দু-ব্রাহ্ম বাঙালিব কাছে খুব সহজেই দিব্যপুরুষ ও অবতাবেব মর্যাদা পেযেছিলেন।[১৮]

কে তাঁকে কী মনে কবে তা নিযে তাঁব নিজের কৌতূহল কম ছিল না। কেশবচন্দ্র তাঁকে অবতাব মনে করেন কী না, গিবিশ ঘোষ কী মনে কবেন, কেশবচন্দ্র তাঁব জামাই কোচবিহাবেব মহাবাজাব স্টিমাবে চড়িযে যে-শাহেবসুবোদেব নিযে আসতেন, তাঁবাই-বা তাঁকে কী ভাবছেন, এ-সব নিযে বামকৃষ্ণ খোঁজখবব কবতেন। এটাও খেযাল বাখতেন কে ক'দিন পব দক্ষিণেশ্ববে এল। কোনো নতুন দর্শণার্থী যদি কম দিনেব মধ্যেই আবাব আসতেন তা হলে তিনি খুশি হযেই বলে উঠতেন, 'আবাব এযেছে'।[১৯]

কেশবচন্দ্র তাঁকে নিযে ইংবেজিতে কী লিখেছেন তা তিনি বাববাব শুনতে চাইতেন। ইংবেজি ভাষা তাঁব কাছে অভ্রান্ত ক্ষমতাব চিহ্ন মনে হত। 'কথামৃত'কাব শ্রীমকে তিনি বলেছিলেন, তাঁব সম্মুখে বসে নবেন্দ্রনাথেব সঙ্গে ইংবেজিতে কথা বলতে। 'কথামৃত'কাবেব কাছে ইংবেজি তর্কবিজ্ঞানেব ধাঁচ বুঝতে চেষ্টা কবেছিলেন। ১৮৮৪-ব ৬ ডিসেম্বব বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁব কিছুটা তর্কমতই হযেছিল। বঙ্কিচন্দ্র তখন বাঙালিব চিন্তাভাবনা ও আবেগেব বিখ্যাততম স্রষ্টা। তিনি ও আবো কযেকজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শোভাবাজাবে তাঁদেব সহকর্মী অধবকুমাব সেন-এব বাড়িতে বামকৃষ্ণকে দেখতে এসেছেন—'তাঁহারা নিজে ঠাকুবকে দেখিবেন ও বলিবেন যথার্থ তিনি মহাপুরুষ কি না' (শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম অখণ্ড সংস্কবণ, ১৯৮৬-৮৭, দশম পুনর্মুদ্রণ অক্টোবব, ১৯৯৮, পৃ ১১১৫)। সেখানে একেবাবে প্রাথমিক আলাপেব পব বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্যবা নিচু স্ববে নিজেদেব মধ্যে কথা বলায বামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা কবেন, 'ইংবেজিতে কি কথাবার্তা কবছো?' আব, তাবপবই একটা গল্প বলে বললেন, 'ড্যাম মানে যদি ভাল হয, তাহলে আমি ড্যাম, আমাব বাপ ড্যাম, আমাব চৌদ্দ পুরুষ ড্যাম। আব ড্যাম মানে যদি খাবাপ হয়, তাহলে তুমি ড্যাম, তোমাব বাবা ড্যাম, তোমাব চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। আর শুধু ড্যাম নয, ড্যাম ড্যাম ড্যাম ড্যা ড্যাম ড্যাম।' এই সাক্ষাতেই এমন একটা তীব্র আযবনি তৈবি হয়েছিল। কথামৃতকাবেব বিববণে মিনিটখানেক আগেই বামকৃষ্ণেব সঙ্গে পবিচয করিযে দেযা হযেছে বঙ্কিমেব। 'শ্রীবামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বঙ্কিম! তুমি আবাব কাব ভাবে বাঁকা গো! বঙ্কিম (হাসিতে-হাসিতে)—আব মহাশয! জুতোব চোটে। (সকলের হাস্য) শাহেবেব জুতোব চোটে বাঁকা।' এব পবেই সেই শাহেবেব ভাযাব ওপব তাঁদেব অধিকাবে, বামকৃষ্ণেব সম্মুখেই, নিশ্চযই তাঁকে গোপন কবতেই, তাঁবা ইংবেজিতে কথা বলছিলেন। অসামান্য ক্ষিপ্রতায বামকৃষ্ণ জানিযে দিলেন তাঁদেব ভাযাব সঙ্গে বিযযেব ফাবাক কতটাই![২০]

এই সাক্ষাতেই বঙ্কিমচন্দ্র বামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন, আপনি প্রচাব কবেন না কেন। আব, বামকৃষ্ণেব প্রশ্নেব জবাবে বলেছিলেন, 'পবকাল আবাব কী', মানুযেব কর্তব্য 'আহাব, নিদ্রা ও মৈথুন', ঈশ্ববকে জানাব জন্য 'আগে পড়াশুনা কবে জানতে হয।' বঙ্কিমচন্দ্রেব পজিটিভিজম, উপযোগিতাবাদ ও যুক্তিবাদকে বামকৃষ্ণ এই সাক্ষাতেই সবাসবি আক্রমণ কবেছেন একেবাবে সহজ ও প্রত্যক্ষ, বিশ্বাস-অনুভব-আনন্দেব কথা বলে।

বামকৃষ্ণকে শাস্ত্রভুক্ত না কবেও বোঝা যায, সচ্চিদানন্দেব ধাবণাটি তাঁব মনে ছিল। বামকৃষ্ণেব আলাপচাবি থেকে কোনো একটি পদ্ধতি খুঁজে বের করা যায না। এই সাক্ষাতেব

বিববণ পড়লে মনে হয—বঙ্কিমচন্দ্রেব দার্শনিক মন না জেনে কি এমন লক্ষনিবদ্ধ আক্রমণ কবা সম্ভব? এমনও হতে পাবে, কথামৃতকাব, এই দু-জনেব এই বৈপবীত্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তাই তাঁব বিববণে সেই বৈপবীত্যই এতটা স্পষ্ট হযে উঠেছে। উপমা ছিল বামকৃষ্ণেব সবচেযে বড় অস্ত্র, বঙ্কিমচন্দ্র সেখানেও তাঁব উপমা উল্টে দিচ্ছিলেন,

" 'আম খেতে এসেছিল আম খেযেই যা।'

বঙ্কিম—আম পাই কই?

শ্রীবামকৃষ্ণ—..কেউ হযতো বলে দেয

বঙ্কিম—কে? গুরু। তিনি আপনি ভাল আম খেযে, আমায খাবাপ আম দেন।"

এই সাক্ষাতেই বঙ্কিমচন্দ্র বামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন—ভক্তি কী?`` দু-বছব আগে 'আনন্দমঠ' বই হযে বেবিযেছে। তাব আগে সঞ্জীবচন্দ্রেব 'বঙ্গদর্শন'-এ ধাবাবাহিক হযেছে। 'আনন্দমঠ'-এ উপন্যাস শুরু হওযাব আগেই এই দ্বিধা, প্রশ্ন, প্রায-আদেশ উচ্চাবিত হযেছে—

আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না?

তোমাব পণ কি?

পণ আমাব জীবনসর্বস্ব—

জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ কবিতে পাবে।

আব কি আছে? আব কি দিব?

ভক্তি।

এই সমযটি, এই আটেব দশকেব শেয পাঁচ-ছ বছবে কতকগুলি ঘটনা পবপব ঘটতে থাকে বা বলা চলে, একই সঙ্গে ঘটতে থাকে। সেই ঘটনাগুলিতে এই 'নতুন শ্রেণী'ব উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতিব ভিতব আলাদা-আলাদা অন্তর্দ্বন্দ্ব এখন খুঁজে পাওযা যেতে পাবে। যেমন, 'জাতিবৈব' সম্পর্কিত ধাবণা। জাতিবৈবেব ধাবণাকে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণযোগ্য কবে তুলেছিলেন এই যুক্তিতে যে ইংবেজেব সমকক্ষতা 'আমাদেব' ইংবেজতুল্য কবে তুলবে, ইংবেজেব প্রতি দাস্যতাবোধ থেকে 'আমবা' ইংবেজতুল্য হযে উঠতে পাবব না। যেমন, সংগঠন সম্পর্কিত ধাবণা। 'ভাবতসভা' ও 'কংগ্রেস'-এব প্রতি 'আমাদেব' আচবণ কী হওযা উচিত, তা নিযে কাগজে আলোচনা হত। বঙ্কিমচন্দ্র এই দুটি প্রতিষ্ঠানেব প্রযোজনীযতা স্বীকাব কবতেন।` যেমন, 'অবতাবতত্ত্ব'। অবতাবে বিশ্বাস বাঙালি বর্ণহিন্দুব একটি অভ্যাস। এটা যদি বিশ্বাস কবা যায যে ঈশ্বব কোনো-কোনো বিশেয সমযে কোনো বিশেয কাজ সম্পন্ন কবতে কোনো এক অবতাব হযে জন্মাতে পাবেন, তাহলে ইহলোকেব বিযযসম্পত্তিব তত্ত্বাবধানে ঈশ্ববকে প্রায সবাসবিই পাওযা যায। ঈশ্ববেব অংশ নিযে অবতাব, অবতাবেব অংশ নিযে স্থানীয

অবতার, অবতারেব স্থানীয় প্রভাবেব মধ্যে পাবিবাবিক অবতাব বা গুরু। বর্ণহিন্দুব মধ্যস্বত্বভোগী যৌথ পবিবাবে চাকবিজীবীব প্রবাসেব টান লাগছিল। অবতাবে বিশ্বাস যৌথ পবিবাবেব থাক-কাটা কর্তৃত্বেব সংগঠনকে প্রশ্রয় দিত। সেই প্রশ্রয়েব দবকাবে কুলদেবতা, কুলগুরু—এ-সবেবও দবকাব। প্রাক্‌-ব্রিটিশ বাংলাব দেবতাদেব কালকেতু বা চাঁদবণিক হলেই চলত। ব্রিটিশ আমলে হিন্দুদেব অবতাব ছাড়া চলে না।

অবতাবতত্ত্ব নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রেব অনিশ্চযতা ছিল। সম্ভবত তিনি সমকালীন অবতাবত্বে বিশ্বাস কবতেন না, আবাব, সম্ভবত তিনি শ্রীকৃষ্ণেব অবতাবত্বে বিশ্বাস কবতেন। শ্রীকৃষ্ণেব তুল্য একজন নেতা ব্যতীত যে ইংবেজসমতুল্যতা অর্জন সম্ভব নয়—একথা বঙ্কিমচন্দ্র মানতেন। ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৪-এ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র এই দুটি প্রশ্নেব মীমাংসা খুঁজেছেন নানা নিবন্ধে, নানা মন্তব্যে। প্রশ্নদুটি হল—'দেশ' বা সমষ্টি বা বর্ণহিন্দু সমাজেব কাছে কোন আবেগ প্রধান হওযা উচিত। আব, বর্ণহিন্দুব প্রাচীনতম আদর্শ হতে পাবেন কোন পুরুষ।

বঙ্কিমচন্দ্রেব গদ্যভাষাব একটি বৈশিষ্ট্য হল—সে ভাষা লেখকেব দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ কবতে পাবে না, প্রকাশ কবতে পাবে শুধু সিদ্ধান্তটুকু। তাতে এই ভুল ধাবণা হতে পাবে যে তাঁব 'জাতিবৈব', 'সংগঠন', 'অবতাবত্ব', 'ভক্তি'—এই তত্ত্বগুলি যেন কিছুটা স্বনিযন্ত্রিত পদ্ধতিতেই তত্ত্বের স্বযংসিদ্ধতা অর্জন কবে ফেলেছে।

স্বনিযন্ত্রণের ফলে তত্ত্ব থেকে যুদ্ধচিহ্নগুলি মুছে যায। সেগুলি শাস্ত্রীয হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র যে এই নামচিহ্নে তত্ত্বগুলিকে চিনতে চাইছিলেন, সেটা ন্যাযশাস্ত্রেব বিধান অনুযাযী বর্গীকরণেব উদ্দেশ্যে নয, সেটা বাঙালিব সমষ্টিজীবনেব কর্মসূচি নির্ধাবণেব প্রযোজনে ও এই প্রত্যেকটি শব্দ বা নামেব পেছনে ছিল তাব আগের ৫০ বছবেব নানা সামাজিক সংস্কাবেব আন্দোলন।

তিনি যখন 'জাতিবৈরিতা' ধাবণাটি ব্যবহাব করেন তখন তাঁব কাছে শব্দেব অর্থনিষ্পত্তি প্রধান থাকে না, প্রধান হযে ওঠে—এই ধারণাটি যে ব্যবহাব কববে, তাব আত্মতা বা সাবজেকটিভিটি। সে আত্মগতভাবে নিজেকে ইংবেজেব সমতুল্য ভাবুক, প্রতিযোগী ভাবুক। অথচ 'বৈবী' শব্দটিরই মধ্যে শত্রুতা ও সংঘাতেব ইঙ্গিত এমনই মাখামাখি হযে আছে যে বাস্তবে এই ধাবণাব চর্চা শুধু আত্মগতভাবে সম্ভবই নয। 'সংগঠন' ও অবতাবত্ব' নিযেও সেই একই সঙ্কট। 'ভক্তি' শব্দটিকেও বঙ্কিমচন্দ্র নিষ্ক্রিয বিশেষ্যপদ হিশেবে ব্যবহাব কবেন নি। তাঁব কাছে 'ভক্তি' যেন বহুবাচিক এক ক্রিযা যা জীবনেব চাইতে মহত্তব। বঙ্কিমচন্দ্রেব 'ভক্তি'ব মধ্যে 'বিশ্বাস' বা 'আস্তিক্য'ই প্রধান। 'আনন্দমঠ'-এ সেই আস্তিক্য একটি প্রতিমা পেযেছে—সাকাব প্রতিমা ও সেই প্রতিমাকে পূজাব মন্ত্র পেযেছে—সংস্কৃত শব্দ ও প্রত্যয ব্যবহাবে যা সত্যিই মন্ত্র। বাংলাদেশেব মনে ও মননে এই বিবোধগুলি যখন সমাধানেব সঙ্কেতবহ এক-একটি ধাবণা হতে চাইছে ও সেই 'নতুন শ্রেণী'ব তত্ত্ববিশ্ব একটি আকাব হযে উঠছে, তখনই, তখনো বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত, ববীন্দ্রনাথ এই 'ভক্তি'ব ধাবণাকে আবাব নিযে যাচ্ছেন এক নির্বিশেষে আব সেই কাবণেই ইন্দ্রিযঘনিষ্ঠ কবে,

মৃত্যুবে না কবি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধাবা

মস্তকে পডিবে ঝবি—তারি মাঝে যাব অভিসাবে
তার কাছে, জীবনসর্বস্ব ধন অর্পিযাছি যাবে
জন্ম জন্ম ধবি।
 সর্ব প্রিযবস্তু তাব অকাতবে কবিযা ইন্ধন
চিবজন্ম তাবি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন—
হৃৎপিণ্ড কবিযা ছিন্ন বক্তপদ্ম-অর্ঘ্য-উপহাবে
ভক্তিভবে জন্মশোধ শেয পূজা পূজিযাছে তাবে
মবণে কৃতার্থ করি প্রাণ. '
(এবাব ফিবাও মোবে, ১৮৯৩)।

ছয

হ্যাঁ, কথাটা এমন গিঁট পাকিযে-পাকিযেই তুলতে চাইছি। যাতে ভুলেও কেউ এটাকে গজফিতে বা গজকাঠি না ভাবেন। গজফিতে খুব টানটান বাখতে হয, নইলে ঠিক মাপ পাওযা যায না।

ব্রিটিশ-কলোনি হিশেবে আমাদেব সত্তা কী প্রক্রিযায কোন্ বদলেব মধ্যে ঢুকে পডল—সেটার একটা মাপ পাওযা যেতে পারে ব্রিটিশ-ইতিহাস থেকেই। সেই মাপ-অনুযাযী—হিন্দুধর্মীয কিছু সামাজিক সংস্কাব, প্রধানত হিন্দুদেব জন্য স্কুল-কলেজ, ইনজিনিযাবিং ও মেডিক্যাল শিক্ষা, মেযেদেবও বিলেত যাওযা, প্রশাসন, পুলিশ, আইন-আদালত, কালেক্টাবি—এই সব নানা হেডিং আমাদেব চেনা। এই হেডিংগুলি অন্য একটা পদ্ধতিতেও সাজানো হয়ে থাকে। 'ইডিযোলজি, সোসিওলজি, ইকনমি' ইত্যাদি।

আবাব, এই প্রক্রিযা ছেড়ে দিযে জাতীযতাবাদেব স্বপ্নলব্ধ ইতিহাস, গোপন ইতিহাস, বর্তমান ইতিহাস, সম্ভাব্য-ইতিহাস, অন্য কোনো-কোনো পদ্ধতিও, ব্যবহাব কবা হয। সেই বিভাজনে ভূমিব্যবস্থা, জাতিব ভগ্নাংশ, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণেব প্রতিক্রিযাব পার্থক্য—এমন ভাগও কবা হয। যেমনই কবা হোক তাতে অনেক নতুন তথ্য বেবিযে পড়ে ও পুবনো তথ্যেবও অনেক নতুন অন্বয প্রাসঙ্গিক হযে ওঠে।[২৪]

কিন্তু আমাদেব না-জানাব অস্বস্তি তাতে কাটে না। ভাবতেব মত এত জনবহুল, ধর্মবহুল, আচাববহুল, নিসর্গবহুল, জলবাযুবহুল, লিপিবহুল, ভাযাবহুল ও আবো যা-কিছু ভাবা যায সে-সবই বহুল, দেশে, ঔপনিবেশিক শক্তিব শাসনে ও বিশেয বকমেব শোযণে কতদূর, কত বকমেব ও কত গভীবেব বদল ঘটতে পাবে? ইংবেজেব উপনিবেশ হিশেবে এই বাংলায ও কলকাতায ইযোবোপতুল্য বেনাসাঁসকে অত্যন্ত প্রামাণিক ঠেকে। বেনাসাঁস-মানুয বলে যে এক ব্যক্তিত্বেব কল্পনা আমরা ইয়োবোপীয ইতিহাস থেকে পেযেছি, তাব প্রামাণিক মানুয উনিশ শতকেব কলকাতা ও বাংলায় কম ছিলেন না। বেনাসাঁস ছাড়া কোনো আধুনিকতাব কথা ভাবা প্রায অসম্ভব।

আবাব, একই সঙ্গে বাঙালি সমাজেব বিপুলতর স্তবে এ বেনাসান্সেব কোনো নতুন হদিশই গিযে পৌঁছয নি। বাংলাব মুসলমান জনগোষ্ঠী, হিন্দু অবর্ণ জনগোষ্ঠী ও হিন্দু-মুসলমান মেয়েদের সংখ্যা ধবলে এই পবিবর্তন-নিবপেক্ষ স্তরেব যে-বিস্তাব আন্দাজে আসে, বেনাসান্স-টেনাসান্সকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে হয়। আবার, এ-কথাটিও তো সত্য যে এই সব জনগোষ্ঠীব কাছে প্রাগিংবেজ সমাজও খুব প্রত্যক্ষ ছিল না। ফলে, তাঁদেব চৈতন্যে বা সত্তায পবিবর্তন মাপাব বা বোঝাব কোনো নিবিখই ছিল না।

সঙ্গে-সঙ্গেই এই কথাটিও একই বকম সত্য—যখনই এই বদল তাঁদেব নিবিখেব আওতায গেছে, তখনই তাঁবা সক্রিয হযে উঠেছেন।

অথচ সেই পবিবর্তন আর এই অপবিবর্তিত বিস্তার, দুটোই তো আমাদেব অস্তিত্বের বা সত্তাব (অনটোলজি) অবিভাজ্য উপাদান হযে উঠেছিল। এই সত্তাকে অনেক দিন পর্যন্ত, তাব স্বতোবৈপবীত্য সত্ত্বেও, সমন্বয়িতই মনে হত। এখন আব তেমন কিছু কল্পনা কবাও যায না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব আগে পর্যন্ত বাঙালি বর্ণহিন্দু পবিবাবেব মেযেদেব বিযে দেযা হত, সবচেযে বেশি হলেও, ১৪-১৫ বছর বযসেব মধ্যে। অবর্ণহিন্দু সমাজে আবো কমে। স্বামী-স্ত্রীব বয়সেব গড় পার্থক্য ছিল ১০ বছবেব মত। এব মধ্যে কী সমন্বয হবে—স্বামীস্ত্রী যেখানে দিনেব আলোতে পবস্পরকে দেখতেই পেতেন না। বড় জোব উপাদানগুলিব প্রযোগক্ষেত্রগুলি পবস্পরের সমকালীন ও নিঃসম্পর্ক হযেও বিস্তাবিত হতে পাবত।

যশোর থেকে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' বলে একটি কাগজ বেবত। সেই কাগজের সঙ্গে কিছু ব্রাহ্মযুবকও যুক্ত ছিলেন। জোড়াসাঁকো-র ঠাকুরদেব বেশ বড় জমিদাবি ছিল ওখানে। ঐ কাগজটিতে খবব বেবতে শুরু কবে যে ঠাকুব-জমিদাববা তাঁদের জমিদারিতে প্রজাদেব ওপব কী বকম অত্যাচার কবে থাকেন। ব্রাহ্ম-যুবকগণ এ-রকম ব্যবহাবের ঔচিত্য নিযে প্রশ্ন তোলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন জানান, বিষযসম্পত্তি-বক্ষাব সঙ্গে ধর্মাচরণেব সম্পর্ক কী, দুটো দুই নিযমে চলবে।[২৫] এমন কথাব বাস্তবযুক্তিব জোব উপেক্ষা কবা যায না। কেশবচন্দ্রেব তিন-আইনেব বিযের পক্ষে আন্দোলন ও কোচবিহাবেব বাজার সঙ্গে তাঁব মেযেব বিযেব সম্বন্ধও তো সেই একই বাস্তববুদ্ধিতে অস্বীকাব কবা যায় না। এই পুবনো ছক তো এখন বোধ হয স্কুলেও পড়ানো হয না—নবজাগবণ থেকে স্বদেশী। এ-বকম একটা ছকও আব নতুন নেই—নবজাগবণ-টাগবণ ফালতু কথা, বাবুবা শাসন ক্ষমতাব ভাগ চাইছিলেন, তাবই নাম জাতীযতাবাদ। সে-সবেব সঙ্গে ঐ তিন জনগোষ্ঠীব কোনো সম্পর্কই ছিল না।

ধর্মবুদ্ধি ও বিষয়বুদ্ধি, অর্থ ও পবমার্থ, আসক্তি ও ভক্তিব ভিতবকাব বিবোধ নয, ভিতবকাব অদৃশ্য গ্রন্থনই, উনিশ শতকেব শেযে বাঙালিব দৈনন্দিন জীবনেব পক্ষে অপবিহার্য হযে উঠেছিল। এখানে 'বাঙালি' বলতে আমবা সেই 'নতুন শ্রেণী'কে বোঝাচ্ছি। পড়াশুনো জানা, বৃত্তিশিক্ষিত, নানা স্তবে মধ্য বা উপস্বত্বভোগী, কলকাতা বা অন্যত্র সবকাবি চাকুবে, মাঝেমধ্যে ছুটিছাটায় দেশেব বাড়ি আসেন, বাড়িতে নতুন ঘবদোব হচ্ছে, পুজোআর্চা বাড়ছে—দোল, দুর্গোৎসব। আর একান্নবর্তিতার একটা অস্পষ্ট ধাবণাও এই নতুন শ্রেণীব ভিতব বেশ স্পষ্ট হযে ওঠে। একে বাঙালিত্ব বলা যায়, জাতীযতাবাদও বলা যায, ভাবতীযতাও বলা

যায়। 'নতুন শ্রেণী'ব এই নতুন আত্মপবিচয় আকাঙ্ক্ষা ব্রাহ্ম-হিন্দু বিবোধেব চাইতে প্রবলতব হযে ওঠে। তেমন একটা মডেলও বাঙালিব এই 'নতুন শ্রেণী'ব মনে ছিল—শ্রীচৈতন্য। উনিশ শতকেব শেযার্ধেই বৈষ্ণব ব্রত ও আচাব বাংলায নতুন চেহাবায পালনীয হযে উঠেছিল। কেশবচন্দ্র তাঁব তৈবি ব্রাহ্মআচাবে চৈতন্যেব প্রবর্তিত ফর্মগুলিকে নিযেছিলেন। কেন নিযেছিলেন তা অনুমানেব মত তথ্যও তাঁব জীবন সম্পর্কে আমি জানি না। আমি এ-বকম একটা আন্দাজেব সমর্থন খুঁজছি যে কেশবচন্দ্রই ধর্মাচবণকে একটা বাজনৈতিক সমাবেশেব প্রতিৰূপ ভেবেছিলেন। তাঁব 'ইন্ডিযান মিবব'-এ ইংবেজিতে ও 'সুলভ সমাচাব'-এ বাংলায, বাজনীতি নিযে খুব অন্তবঙ্গতাঁব সঙ্গে লেখা হত।[৬]

সাত

বর্ণহিন্দু সমাজেব এই ছকটা প্রায পুবো খ্রিস্টীয দ্বিতীয সহস্রাব্দ ধবে আত্মবক্ষাব ও সব বকম অভিঘাতকে ফিবিযে দেওযার একটি সমবাযিক কৌশল আযত্ত কবে ফেলেছিল। নিজেব হিন্দুবর্ণেব প্রাধান্য বাখতে বর্ণহিন্দুবা খুব সংগঠিত প্রতিবোধ তৈবি কবছে—ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনা ঘটে নি। বর্ণভেদ, পবজন্ম ও পিণ্ডদান এই ধারণাগুলি সেই ত্রযোদশ শতক থেকেই পাকেব পব পাকে বর্ণহিন্দুব কেন্দ্রীযতাকে—ব্রাহ্মণেব প্রাধান্য—বক্ষা কবে এসেছে, মুহূর্তে নিজেকে কুণ্ডলী পাকিযে ফেলতে পাবে, এমন এক বিশিষ্ট পশুস্বভাবে। তের শতক থেকে বর্ণহিন্দু বাঙালি অত্যন্ত কৃতার্থতার সঙ্গে নবাব, সুলতান ও মুঘল সম্রাটদেব অধীনে কাজ কবেছে ও সেই বৃত্তিনামকেই নিজের বংশানুক্রমিক নামেব পদবী হিসেবে ব্যবহাব কবেছে—তাতে তাব হিন্দু বর্ণত্বেব কোনো হানি ঘটে নি। বায, চৌধুবী, সবকাব, মজুমদার, হাজাবি, হাজবা, তালুকদাব, হালদাব, খাঁ—এই সব পদবী ব্রাহ্মণেব ব্রাহ্মণত্বে বা অন্যান্য বর্ণহিন্দুব বর্ণত্বে কোনো দাগ বসাতে পাবে নি। বর্ণহিন্দু সমাজ কী কবে নিজেব বর্ণপ্রাধান্য বক্ষা কবে এসেছে—তাব কাবণ এখন আমবা খুঁজছি না। আমবা শুধু এই ঘটনাটিই দাগাতে চাই যে বর্ণহিন্দু-পুনরুত্থান বা হিন্দু-জাগবণ বলে উনিশ শতকেব শেষ বিশ-পঁচিশ বছবেব বাঙালিব নতুন কোনো সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত কবা ঠিক নয।

ঠিক তেমনি, ১৮৩০ থেকে বছব চল্লিশ-পঞ্চাশ নানা ভাঙাভাঙিব মধ্য দিযে হিন্দু সমাজেব নানা ধবণেব সংস্কাব—সতীদাহরদ, বিধবাবিবাহ-আইন, বাল্যবিবাহে ও বহুবিবাহে নিষেধ—ও ব্রাহ্মধর্মপ্রচাব, বর্ণহিন্দু সমাজেব জীবনধাবণায কোনো বদল ঘটাতে পাবে নি। সেই নীবব সংখ্যাগবিষ্ঠবা তাঁদেব পবিবাবে-গ্রামে তাঁদেব ধাবণা অনুযাযীই জীবন যাপন কবেছেন। তাঁদেব বংশধবদেবও সেই জীবনেবই শিক্ষা দিযেছেন। বর্ণহিন্দুব ব্রাহ্মণত্বেব সঙ্গে ইংবেজ-ভক্তির কোনো অসংগতি বা দ্বন্দ্ব ছিল না। মার্ক্স-কথিত 'নতুন শ্রেণী'ব মধ্যে তত্ত্ব, বস্তুশক্তিতে ৰূপান্তবিত হল না।

বিফর্মেশন থেকেই যেমন কাউন্টাব-বিফর্মেশন ঘটেছিল, তেমনি বাংলাব বেনাসান্স থেকে কাউন্টাব-বেনাসান্স ঘটছিল, ঐ ১৯০৫-এ। তাকে 'জাতীযতাবাদ' বা 'স্বদেশী' নাম দেযা হযেছে

১৯০৫-এব বঙ্গভঙ্গ বিবোধী সমাবেশটিকে ধরে। যেন তা হলে এই ছকটা তৈবি কবে তোলা যায়—বেনাসান্স, জাতীযতাবাদ, জাতিবাষ্ট্র, স্বাধীনতা। বাংলার বেনাসান্স বর্ণহিন্দুব জীবনেব প্রধান ভিত্তিগুলি একটুও নাড়াতে পাবে নি। সে ভিত্তিগুলো অসম্পূর্ণ ভাবেও চিনে নেযা যায—পবজন্মে বিশ্বাস, আত্মায বিশ্বাস, পিণ্ডদানে বিশ্বাস, বংশবক্ষায বিশ্বাস, বিবাহে যৌটকতয বিশ্বাস, মেযেদেব প্রতি অবিশ্বাস—এই সব।

ভিতগুলিব ওপব বর্ণহিন্দুব যে-জীবনধাবণা তৈবি হযে উঠছিল উনিশ শতকেব শেষ দুই দশকে, সেটাই ১৯০৫ হযে বাংলাব অবর্ণ হিন্দুদেব, কোথাও-কোথাও আদিবাসীদেবও একমাত্র জীবনধাবণা হযে উঠছিল। বিশ শতকের প্রথম ত্রিশ বছবে বাঙালি অবর্ণ হিন্দু জন-গোষ্ঠীব মধ্যে সামাজিক সংস্কাবেব প্রধান কর্মসূচি হযে ওঠে—পৈতে নেযা ও নিজেদেব বংশপবিচয়কে আর্যদের সঙ্গে যুক্ত কবা। উগ্র ক্ষত্রিয, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয, গুপ্ত ক্ষত্রিয, সদ্‌গোপ, মাহিষ্য—এই সব জাতিকল্পনাব উৎস তো বর্ণহিন্দু সমাজ। ফলে, মা-বাবা মারা গেলে অশৌচেব বর্ণানুগ কাল কমিযে ব্রাহ্মণদেব জন্য নির্ধারিত কালকেই সকলে মেনে-চলা শুরু কবে।

ফার্নান্দ ব্রদেল, তাঁব 'সিভিলাইজেশন অ্যাণ্ড ক্যাপিট্যালিজম', নামক বিশাল ইতিহাসগ্রন্থেব তৃতীয খণ্ডে সমাজ পবিবর্তন সম্পর্কে বলেছিলেন, 'সমাজ যে খুব ধীবে-ধীবে বদলায—তার ফলে তাব ইতিহাস বেশ নজব কবে দেখা যায। এক ধবণেব বা আবেক ধরণেব মান্দাবিন চিনে চিরকালই আছে—কোনোদিন কি চিন তা থেকে মুক্তি পাবে? ভাবতে বর্ণভেদ প্রথা, মুঘলদের জাযগিবদাবি...। এমন কী ইযোবোপীয সমাজগুলি বদলায ধীব গতিতে, যদিও সে-সমাজেব গতি হযতো তুলনায বেশি। আঠার শতকের ইংল্যাণ্ড দেখে তখনকাব অনিংবেজ ইযোবোপীযবা তাজ্জব হযে যেত. তিনশ বছব আগেব গোলাপেব যুদ্ধেব পব ইংল্যাণ্ডেব রূপান্তব দেখে। . এমন কী বিপ্লবও অতীতেব সঙ্গে বাঁধন সম্পূর্ণ ছিঁড়তে পাবে না।'[৭]

বস্তুজগৎই চৈতন্যেব নিযামক—মার্ক্স-এব এই কথাব সঙ্গে ব্রদেলেব কথাব অমিলটাও মিটিযে নেযা যায এই বলে যে চৈতন্য যদি বস্তুব শক্তির (যে-অর্থে বিদ্যুৎকে পাওযাব বলা হয) প্রজনন কবতে না পাবে (যে-অর্থে বিদ্যুৎ-উৎপাদনকে বলা হয পাওযাব জেনাবেশন), তা হলে, চৈতন্যেব জীবনও তৈরি হবে না। কিন্তু তেমন একটা মিল বেব কবাব মধ্যেই গোঁজামিল আছে।

দুইশ বছব ধবে নিজেবই দেশে কলোনিব প্রজা হযে বেঁচে থাকাব পুরুষানুক্রমিক দৈনন্দিন সংঘর্ষেও বাংলার, বা ভাবতেবই, বর্ণহিন্দু জীবনযাপনেব আত্মবক্ষাব কুণ্ডলী ভাঙাব মত শক্তি আমাদেব চৈতন্য প্রজনন করতে পাবে নি। আমাদেব সমাজ-সংস্কাব হযে দাঁড়িযেছে ধর্মেব বিধিবিধান সংস্কাব। তেমন সংস্কাব তো মনুব বাবাব আমল থেকেই চলছে। এখনো শাসক কমিউনিস্ট পার্টিকে নির্দেশ দিতে হয দুর্গাপূজা বা কালীপূজায সদস্য ও সমর্থকদেব যুক্ত থাকতে হবে। পশ্চিমবাংলার ছোট ছোট শহবেও এখন চিনে খাবাব, নানাবকম চিকেন, কাবাব, মুঘলাই বান্না রাস্তায দাঁড়িযে বা বাড়িতে আনিযে খাওযা যায। বিযেশাদিতে খাওযানোও যায, আব শুযোবেব মাংসেব একটা পর্দা দিযে হ্যামস্যাণ্ডউইচ—টিফিন ছেলেমেয়েদেব

দেওযাও হয। অথচ এমন সব দোকানে গরুর মাংস বাখাব ও বেচার কথা ভাবাই যায না। এখনো বাঙালি হিন্দুব বোজকাব খাওযায গরুব মাংস আসে না, বর্ণহিন্দুব জীবনধাবণায তা অনুমোদিত নয বলেই। এখনো হিন্দুধর্মীয জ্যোতিষী টিভিতে নিদান ও প্রতিবিধান হেঁকে যেতে পাবে। বাঙালি মেযেবা শাড়ি ছাডলেও সিঁদুঁব ও লোহা ছাড়তে পাবেন নি ও বাঙালি গৃহকর্তা বাবমুডা পবে বাজাব কবলেও তাব পোলো-নেক গেঞ্জিব ভিতব থেকে পৈতে বেবিযে পড়ে। তা হলে, এটা অন্তত মেনে নেযা ভাল যে গান্ধী, জিন্না, কমিউনিস্ট পার্টি ও নকশালবাড়ি তাঁদেব তত্ত্বকে যেমন দৈনিক জীবনযাপন পর্যন্ত চাবিযে দিতে পেবেছিলেন, তেমন কিছু এখন আব আমাদেব বক্তে বান ডাকাচ্ছে না, মাথা-হৃৎপিণ্ডজোড়া কোনা স্বপ্ন আমাদেব আব মাতাল কবছে না, আমাদেব জাতীযতাবাদ যেমন কলোনিব জীবনকেও হজম কবে নিযেছে, তেমনি নিচ্ছে আমাদেব কলোনি-উত্তব জীবনকে। এখনো ভাবতেব, পশ্চিমবঙ্গ সেই ভাবতেই অংশ, হিন্দুই বাজনৈতিক আন্দোলনেব নিযন্তা হযে ওঠে, তারা যতদূব পর্যন্ত সেকিউলাব, সেকিউলাবিজমের সীমাও যেন ততটাই, কারণ, তাবা ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক বাজনীতি থেকে রাজনীতিব শিক্ষা নিযেছেন।[২৯]

বামকৃষ্ণেব গৃহস্থ-সন্ন্যাস ও লোকায়ত বৈদান্তিকতা, কেশবচন্দ্রের ধর্মচর্চাব ও রাজনীতির সামাজিক সমাবেশেব[২৮] আকার, আব বঙ্কিমচন্দ্রেব ধর্মতত্ত্বেব আনন্দমঠীয সংগঠন কি কোথাও বাংলাব সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম ইসলামেব জন্য কোনো পথ খোলা রেখেছিল? 'যত মত তত পথ' যাঁব সবচেয়ে কার্যকব ঐতিহাসিক নির্দেশ বলে প্রচাবিত হয়েছে, সেই বামকৃষ্ণও তো একটি কালীমন্দিরকেই তাঁব শিক্ষাপ্রচারের ও ভক্ত সমাবেশের জাযগা হিশেবে বেছে নিযেছিলেন। যেমন, 'আচণ্ডালে দেহ কোল' এই ঐতিহাসিক নির্দেশেব কর্তা হিশেবে চৈতন্যের আধুনিকতা সত্ত্বেও যবন হবিদাসের সঙ্গে তাঁবা এক পংক্তিতে বসে বৈষ্ণব মহোৎসবেও খাননি—অন্তত কৃষ্ণদাস কবিবাজেব বিববণ অনুযাযী। এই ঘটনাটিও কি শুধুই আপাতিক যে-বলবাম বসুব বাড়ি রামকৃষ্ণ পরমহংসের সম্পর্কেব কাবণে এত খ্যাতি পেযেছে, সেই বাডিতেই গঙ্গাস্নানেব পব বাখী উৎসব হল ঐ ১৯০৫-এব আশ্বিনে। গঙ্গা হিন্দুব নদী, পুণ্যকর্মেব আগে গঙ্গাস্নান তো হিন্দুবীতি। সাম্প্রতিক গবেষণায়[৩০] জানা যাচ্ছে—উনিশ শতকেব শেষ পনেব-বিশ বছবে পর্যাপ্ত হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীব স্বাদেশিকতা প্রচাবেব কাজে যুক্ত থাকতেন।

আট

বাঙালিব এই 'নতুন শ্রেণী' যে শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনকে জাতীযতাবাদী আন্দোলনেব আবম্ভ বলে চিনে নিতে চায—তাব বোম্যান্টিক সংবাদী স্বব বাঙালি শুনতে চাইছিল কোন উৎস থেকে। তেমন কোনো স্পষ্ট উৎস প্রত্যক্ষ কবতে না পাবলে কোনো সমাবেশ বা ব্যক্তিগত আত্মোৎসর্গ সমষ্টিব বা ব্যক্তিব কর্মসূচি হযে উঠতে পাবত না।

১৯০৫-এ বাংলাব ১৫টি জিলাব সঙ্গে আসাম ও সুরমা ভ্যালিকে মিলিযে নতুন একটি

প্রদেশ তৈরি হয়েছিল—'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' নামে। এই নতুন প্রদেশ গঠনকেই বলা হযে থাকে—বঙ্গভঙ্গ। বাংলাই ছিল ব্রিটিশ ভারতেব কেন্দ্র। বিস্তাবেব সঙ্গে সঙ্গে সেই কেন্দ্রেব সঙ্গেই জুড়ে দেযা হত নতুন অঞ্চল। সেই কারণ ছাড়াও, মুঘল আমল থেকে সুবে-বাংলা বলতে বাংলা-বিহাব-ওড়িশা বোঝায। ১৮৫৩তে চার্টাব বিনিউয্যালেব সময এব সঙ্গে আসামকে মিলিয়ে লেফটেনান্ট গভর্নব শাসিত একটি প্রদেশ তৈবি হযেছিল। ১৮৫৭-এ ইংরেজবা উত্তব-ব্রহ্মেব দখল নিযেছে। ১৯০৩-এর মধ্যে তিব্বত ও চিনেব সঙ্গে সীমান্ত, বিনিময-বাণিজ্য ও ব্রিটিশ স্বার্থবক্ষা নিযে চুক্তি হযেছিল। সুতবাং উত্তব-পূর্ব ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থ বক্ষাব নতুন প্রয়োজনে একটি নতুন প্রদেশ গঠন, ব্রিটিশদেব পক্ষে প্রায অনিবার্যই ছিল। বাঙালিদেব জাতীয় চেতনার ভিত্ গুঁড়িযে দিতেই লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গেব কথা ভাবতে পেবেছিলেন—এ-কথাটি ইতিহাসেব দিক থেকে তত প্রামাণিক নয। আত্মগৌবব বটনা জাতীযতাবাদেব একটি প্রধান কাজ। বঙ্গভঙ্গের পেছনে বাঙালি-বিদ্বেষ সম্ভবত সেই কর্মসূচিব অংশ। পূর্ববঙ্গ-আসাম যাতাযাতেব সুবিধে ও সন্নিহিত অবস্থানও হযতো তাঁকে সমর্থন কবেছে। তা ছাড়াও আসামের চা কলকাতা বন্দবে নিযে যাওয়াব একটা বিকল্প পথও তিনি খোলা বাখছিলেন। এব আগে বিহাব ও ওড়িশাকে বাংলা প্রদেশ থেকে বাদ দেয়া হযেছে। তখন কিন্তু কোনো প্রতিবাদ হয নি। বঙ্গভঙ্গের কারণেই বাঙালির বাজবিরোধী চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম জাতীযতাবাদে সংহত হযে উঠল—এটা পবে কল্পনা করা হযেছে।

কিন্তু এই কল্পনাটা কবা গেল কেন?

বাঙালি বর্ণহিন্দুব সিপাহি-বিদ্রোহ বিবোধিতা ছিল সন্ত্রস্ত, হাস্যকব ও আন্তবিক। বছব চাব কাটতে না-কাটতেই সেই 'নতুন শ্রেণী' মহারাণীব সবকাবেব বিরুদ্ধে সমবেত দাবি জানাল যে সিভিল-সার্ভিসেব উচ্চতম পদে মহারাণীব ভাবতীয প্রজাব প্রবেশাধিকার চাই। দাবি আবো ছিল—পবীক্ষার্থীব উচ্চতম বযস নিযে, লণ্ডনে গিযে পবীক্ষা দেযা নিযে ও শাহেবদেব বিচাব-অধিকাব নিযে। এই দাবিগুলির মধ্যে অনেক ঘোবপ্যাঁচ ছিল। উনিশ বছব বযস হযে গেলে আব সিভিল সার্ভিস পবীক্ষা দেযা যাবে না। উনিশ বছব বযসে ইংবেজি শিক্ষায বাঙালি বালকেব এক শাহেব বালকের সমতুল্য হওযা অসম্ভব। লণ্ডনে গিযে পবীক্ষা দেযা সকলেব পক্ষে সম্ভব হয না—পযসাব জন্য। আসল কাবণ ছিল, কালাপানি পাব না-হওযাব হিন্দু নিষেধ।

সুবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিব বযস নিযে উত্থাপিত ঝামেলা লণ্ডনেব আদালতেব আদেশে কেটে গেলেও ও তাঁকে আই সি এসে প্রবেশাধিকাব দিলেও, ভাবতে তাঁব প্রথম চাকবি, থেকে তাঁকে সবিযে দেযা হল। যিনি হতে চেযেছিলেন মহাবাণীব উচ্চতম চাকুবে সেবক, তিনিই হয়ে উঠলেন মহাবাণীব প্রধান প্রতিপক্ষ, বাঙালি-ভাবতীয়েব নেতা ও প্রথম জাতীয সংগঠনেব প্রতিষ্ঠাতা (ইনডিযান অ্যাসোসিযেশন)। আই-সি-এস ছেড়ে, আই-সি-এস ফেল কবে বা আই-সি-এস থেকে বিতাড়িত হয়ে জাতীয ও বামপন্থী আন্দোলনেব নেতা হযে যাওযাব হিন্দু বাঙালি প্রথা চালু হযে গেল। বর্ণহিন্দুদেব জীবনধাবণায় কোথাও একটা ফাঁক জুটে গেল, যে-ফাঁক পূবণে ইংবেজ শাসনেব লৌহস্তম্ভ হযে-ওঠা বা ইংবেজেব আপোশহীন শত্রু হযে ওঠাব ভিতব কোনো সংঘর্ষ ঘটল না। এমন কী ব্যক্তিগত স্তবেও ঘটল না।

এই বিবোধহীন স্থান সঙ্কুলান ঘটল কী করে?

সেই পবিসব তৈবি কবে তোলাব যুক্তিবাদী ও বোম্যান্টিক উপকবণ বর্ণহিন্দু বাঙালিব হাতে এসে গিয়েছিল।

যিনি বাঙালিকে সাহিত্যে প্রথম বোম্যান্টিকতাব স্বাদ দিয়েছিলেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁব 'শ্রীকৃষ্ণচবিত্র', গীতাভাষ্য ও তাঁব মৃত্যুব পবে সঙ্কলিত 'ধর্মতত্ত্ব' বই তিনটিতে বোম্যান্টিককে যুক্তি কবে তুলেছিলেন তাঁব কৃষ্ণচবিত্রের পুনর্নির্মাণে। সেই কৃষ্ণচবিত্রকে দেশব্যাপী মহৎ কর্মযজ্ঞেব হোতা করে তুলেছিলেন, কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭—১৯০৯), চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪—১৯১১), অক্ষযচন্দ্র সবকাব (১৮৪৬—১৯১৭)। ১৮৭০-৭১-এব পব 'গীতা' পড়া ও ব্যাখ্যাব একটা বড হওযা উঠেছিল। অনেকেই 'গীতা'ব ব্যাখ্যা লিখেছেন, তাব মধ্যে দামোদব মুখোপাধ্যায-এব তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ গীতাব্যাখ্যান পডা হত বেশি।

'গীতা' বোম্যান্টিক কবে তুলছিল—ঐ-যে এক ফাঁকে দুই সত্তাব স্থান সঙ্কুলানে—মহাবাণীব সেবক আব মহামাযাব সাধক। 'গীতা' বাঙালি বর্ণহিন্দুব আত্মতাগুলিকে স্পষ্ট কবে তুলছিল। আমি তো কিছু কবছি না, কিছু কবাব ক্ষমতা আমাব আসবে কোত্থেকে? 'সর্বধর্মান্ পবিত্যজ্য' আমাকে, কেবল আমাকে, কেবলই আমাকে মনে বেখো। মানে কৃষ্ণকে। আব আমি কবছি, আমি বলছি—এ-সব মনে এলে ভেবো, আমি ইচ্ছে না কবলে তুমি একটা ঘাসও তুলতে পাববে না। অর্জুন, ক্লৈব্য ত্যাগ কবো।

সবল এই পবাশ্রযিতা বামকৃষ্ণকে সত্য কবে তুলেছে।

এ-কথা সত্য যে তাঁব সমসময়েব কোনো প্রধান ব্যক্তি, সামাজিক নেতৃত্বে যিনি প্রতিষ্ঠিত, বামকৃষ্ণেব শিষ্য হন নি। তবু এ-কথাও সত্য, দক্ষিণেশ্বব মন্দিবেব চাতালে, বাবান্দায ও তাঁব ঘবে, প্রতিদিন নানা বৃত্তিব ও শ্রেণীব মানুষেব সঙ্গে কথোপকথন ও তাঁব নিজেবই উদ্যোগে বিদ্যাসাগব, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ খ্যাতিমানদেব সঙ্গে তাঁব দেখাক্ষাসাতেব ফলে বামকৃষ্ণ একটা স্বতন্ত্র বিগ্রহ হিশেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তাঁব সেই প্রতিষ্ঠাব সামাজিক ভিত্তি ছিল—চাকুবে, গৃহস্থ, ছোট ও বড় ব্যবসাযী, লেখাপডা কবা বাঙালি। এই বাঙালি সমাজ তাঁদেব জীবনেব একটা ছাঁদ ততদিনে তৈবি কবে ফেলেছেন। রামকৃষ্ণ সেই ছাঁচটিকে মান্যতা দিয়েছেন। 'কথামৃত'তে তিনি কামিনীকাঞ্চনেব বিরুদ্ধে বলেছেন, বিবাহ ও সংসাবেব বিরুদ্ধে বলেছেন, যুক্তিনির্ভব শিক্ষাব বিবোধিতা কবেছেন—সব সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ তাঁব জীবনযাপনে ও অভ্যাসে বাঙালি হিন্দুকে গৃহীসন্ন্যাসীব একটা মডেল দিতে পেরেছিলেন। তিনি শাদা ধুতি-পাঞ্জাবি, চটি-পাম্প শু পবতেন, বিয়ে কবেছিলেন, মাঝেমধ্যে দেশেব বাডিতে যেতেন, ভাগ্নে-ভাইপোদেব নিয়ে বেশ একটা সংসাবই পেতেছিলেন, দক্ষিণেশ্ববে। আবাব, তাব মূর্ছা, কাপড-চোপড না পবা, মা-কালীব সঙ্গেই প্রধানত নানা পাবিবাবিক ঘনিষ্ঠতায কথাবার্তা বলা, সেখানে বামপ্রসাদী আচবণেব পুনবাবৃত্তি—সংসাবেব সীমান্ত মুছে দেযায বাঙালিব কাছে তিনি আধ্যাত্মিক পুরুষও হয়ে উঠতে পেবেছিলেন। বাঙালিব সেই আধ্যাত্মিকতা ইতিমধ্যে আবো ধর্মীয তত্ত্ব, শ্লোগান, সঙ্গীত ও সংগঠন 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) থেকে বিদ্রোহ ও সংগঠনেব নকশাও পেয়ে গিয়েছিল।

নয়

ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসন যে-ভাবে চলত, তাতে, ছোট কিংবা বড় যে-কোনো লাটশাহেবের ব্যক্তিগত ইচ্ছেতেই একটা প্রদেশ বা জিলা ভাঙাগড়া চলত। উনিশ শতকের একেবারে শেষে সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া আর ভাইসরয়ের ক্ষমতা নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের মধ্যেই একটু গোলমাল বাধে। তা ছাড়া ১৮৭০ নাগাদ টেলিগ্রাফ চালু হয়ে গেলে ভাইসরয় সমস্ত ঘটনাই সঙ্গে-সঙ্গে লণ্ডনে জানাতে বাধ্য থাকলেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ভাইসরয়ের অনেকটাই কমে গেল। ১৮৬১ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিলের গড়ন ও অধিকার অনেকবার পাল্টানো হয়েছে। সেই আইনের জোরেই ভারতীয়রা ভারতশাসনের সাংবিধানিক চূড়ায় প্রথম এক দ্বিধান্বিত জায়গা পেয়েছিল। সিপাহি বিদ্রোহের ফলেই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতশাসনে ভারতীয়দের সঙ্গে নেয়ার নীতি মানতে বাধ্য হল আর সেটাই একটা জয়চিহ্ন হয়ে গেল বর্ণহিন্দুদের।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই ভাইসরয়-পদটিকে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে ব্যবহার করতেন—ফলে, ভারতের ইতিহাসে গভর্নর-জেনারেল-ভাইসরয়রা যেন অশোক-আকবরের মত এক-একটা শাসন-পুরুষ হয়ে গিয়েছিলেন—হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিস, ওয়েলেসলি, কার্জন-রিপন ইত্যাদির রাজত্বকাল। বাংলার বা কলকাতার কাজগপত্রে বাঙালিরা এক-একজন লাটসাহেবের ব্যক্তিগত স্বভাব বা অভ্যেস নিয়ে পর্যন্ত লিখতেন—যেন বড় পরিবারের কর্তাকে নিয়ে লেখা হচ্ছে।[১৮]

উনিশ শতকের শেষে দেশের ভিতরের অর্থনীতিতে বোম্বাই কিন্তু বাংলাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ১৮৮৫-তে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন সেই কারণেই বোম্বাইয়ে বসল। স্বাভাবিক ছিল কলকাতায় বসা। ১৯০৫—০৮ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও দু-চার বছর পর থেকে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে রাজনীতিতে বাঙালির কর্তৃত্ব ফিরে এল।[১৯]

যে-ভাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন—বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন যদি কোনো জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়ে থাকে, তবে, সে-জাতীয়তাবাদ হিন্দু সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ। এ জাতীয়তাবাদে মুসলমানদের জন্য কোনো জায়গা ছিল না। এ জাতীয়তাবাদে অবর্ণ হিন্দু বা প্রান্তিক হিন্দুর কোনো জায়গা ছিল না। আদিবাসী বলে যে-কোনো জনগোষ্ঠী আছে তা এই আন্দোলনের কোনো তত্ত্বের কোনো পরিধিতেই ছিল না। যদিও কোনো-কোনো মুসলমান পত্র-পত্রিকায় বা মুসলমান প্রধান গ্রামে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করা হয়েছে—তবে এই বিরোধিতার কোনো ভিত ছিল না।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হওয়ার মাস ছ-সাতের মধ্যে তা কলকাতার বাইরের জেলা-মহকুমা শহর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বিদেশী পণ্য বয়কট ছিল সেই আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচি। বছর খানেকের মধ্যেই সেই বয়কট কর্মসূচি হিন্দু সাম্প্রদায়িক আকার নিল। 'স্বদেশী' বলে নির্ধারিত কর্তব্য থেকে স্খলনের শাস্তি হল সামাজিক-বয়কট, ধোপা-নাপিত-পুরোহিত বন্ধ করা ও অশৌচ ঘোষণা করে দেয়া। কোনো 'অপরাধী'র পক্ষে সমাজের মধ্যে এই

নির্বাসিত জীবন মেনে নেয়া সম্ভবই নয়—তার কাছ থেকে কেউ কিছু নেবে না, তাকে কেউ কিছু দেবে না, তার বাড়িতে কেউ যাবে না, তার সঙ্গে কেউ কথা বলবে না, তার ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে না, তার বাড়ির অসুখবিসুখে ডাক্তার-কবিরাজ যাবে না, বাড়ির কেউ মারা গেলে সে মৃতকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাঁধ দেয়ার লোক পাবে না। সুতরাং তাকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। বর্ণহিন্দু সমাজ তখন তার প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেবে। সে মাথা নেড়া করবে প্রায়শ্চিত্তের টাকা গুনে-গুনে দেবে।[১০]

রণজিৎ গুহ খুব সরাসরি এই প্রশ্ন করেছেন, 'বর্ণভেদের প্রাচীন ও রক্ষণশীল তত্ত্বযুক্তি এক বিকাশোন্মুখ জাতীয়তাবাদের ঘাড়ে চেপে বসল—যদিও সেই জাতীয়তাবাদ ধ্যানধারণায় আধুনিক ও প্রগতিশীল হবে এটাই প্রত্যাশিত ছিল।'

রণজিৎ গুহ মার্ক্সবাদী ও ইতিহাসচর্চাতেও শ্রেণী দ্বন্দ্বে বিশ্বাস করেন—অন্তত তাঁর লেখাপত্র থেকে তাই মনে হয়। তিনি সাহস করে এতটা বললেও যেন সবটা বলা হল না। বঙ্গভঙ্গবিরোধী জাতীয়তাবাদ আধুনিক ও প্রগতিশীল হবে এটা কার প্রত্যাশিত ছিল? এই আন্দোলনের নেতারা তেমন আশা করেছিলেন, নাকী এই আন্দোলনের নেতাদের কাছ থেকে তেমন আশা জনসাধারণ করেছিলেন? কারা এই নেতা? সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিন পাল, যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু, চন্দ্রনাথ বসু, শশধর তর্কচূড়ামণি, তাহিরপুরের রাজা, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা? বছর কুড়ি-পঁচিশ ধরে এঁরাই হিন্দুত্বকে একটা সাম্প্রদায়িক আকার দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এঁরা 'সহবাস সম্মতি আইন'-এর এই সামান্য সংশোধনেও আপত্তি করেছেন যে ১২ বছর বয়স যার হয় নি, তেমন কোনো মেয়ের সঙ্গে সহবাস করা যাবে না—আগেই আইনটিতে নিষেধসীমা ছিল দশ বছর। সুরেন্দ্রনাথের মত জাতীয় নেতা 'স্বদেশী'-বিরোধীদের একঘরে রাখার ও প্রায়শ্চিত্তের হিন্দু দলীয় বিধান সমর্থন করেছিলেন। বিপিন পালের মত 'চরমপন্থী' নেতা, তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, '..এই রকম ভাবালুতা, বর্বরতা ও অপ-ব্যবহারের অশালীনতা অর্ধশিক্ষিত বাঙালিদের পক্ষে স্বাভাবিকই হয়ে উঠেছিল কারণ তাঁরা অ্যাংলোইনডিয়ান রাজনীতির বর্বরতায় আহত হয়েছিল।' 'হিন্দু স্ত্রী তার স্বামীর সম্পত্তি—এ-কথা স্বীকার করতে কোনো লজ্জা নেই', চন্দ্রনাথ বসু লিখেছিলেন স্ত্রী-সহবাসে সম্মতির প্রয়োজন অস্বীকার করতে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচিতে কোথাও জাতি গঠনের দায় ছিল না। একমাত্র দায় ছিল, হিন্দু গোঁড়ামিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার দায়।

আমরা এই প্রসঙ্গে একবারও রবীন্দ্রনাথের কথা তুলি নি। মাস ছয়-আটেকের মত রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের সঙ্গে খুব বেশি জড়িয়ে ছিলেন, এই আন্দোলনের নানা ফর্ম রচনা করেছিলেন, এই আন্দোলন তাঁর সৃজন কল্পনার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গিয়েছিল, এই আন্দোলন তাঁর বছর বার-তের ধরে জমিদারি চালানোর সূত্রে বাংলার স্বকীয় অর্থনীতি সম্পর্কে আহৃত অভিজ্ঞতাকে বৃহত্তর তাৎপর্যে অন্বিত করেছিল, এই আন্দোলন তাঁকে তাঁর অব্যবহিত সমষ্টির জীবনধারণের ধারণা বদলানোর কাজে যুক্ত করেছিল। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের আগেই লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলিতে ও ভাষণসমূহে তিনি যে-কর্মসূচি প্রস্তাব করেছিলেন, তার

সঙ্গে বঙ্গভঙ্গবিবোধী জাতীযত'বাদী ধ্যানধাবণা ও কাজকর্মেব কোনো সম্বন্ধ নেই। আন্দোলন থেকে সবে শান্তিনিকেতনে স্বেচ্ছানির্বাসনে গেলেন—তাঁব সম্পর্কে নিন্দাবাদ ও কলঙ্ক রটনাব সুযোগ অনর্গল কবে দিয়ে। ববীন্দ্রনাথ যখন আন্দোলন থেকে সবে গেছেন, ববীন্দ্রনাথেব 'স্বদেশী সমাজ', 'আত্মশক্তি', 'বাজপ্রজা'য় জাতি ও দেশেব যে-নতুন ধাবণা তিনি সৃষ্টি কবেছিলেন ও সেই ধাবণা কার্যকব কবে তোলাব কর্মসূচি প্রচাব কবেছিলেন—সেই ধাবণা ও কর্মসূচিব সমালোচনা শুরু হয জাতীযতাবাদেব পক্ষ থেকে। তাঁব প্রধান প্রতিবাদী ছিলেন অববিন্দ ঘোষ। পবমহংসেব অবতাবত্বে যে হিন্দু জাতীযতাবাদেব জন্ম, অববিন্দেব ঋযিত্বে তাব একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। মহাযোগী অববিন্দ বাংলা জানতেন না, তিনটি ইযোবোপীয ভাষা জানতেন, আই-সি-এস পান নি বা নেন নি। তিনি এই নতুন শ্রেণীব যথাবিহিত নেতা। এই আন্দোলন থেকে সবে আসাব বছর দশেক পবে, বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহৃত হওযাব পাঁচ বচব পবে ববীন্দ্রনাথ 'ঘবে বাইবে' উপন্যাসটি লিখলেন শুধু এইটুকু জানতে যে বঙ্গভঙ্গ বিবোধীদেব এই চৈতন্যবিভ্রমেব, ফল্‌স্ কনসাসনেসেব, মানবিক দাম ছিল কতই নিষ্ঠুব মুনাফালোভী। তখন তো কোনো তর্কাতর্কি নেই। সবাই চুপচাপ। ববীন্দ্রনাথ উপন্যাসটি লিখে জানালেন—তাঁব বলবাব কথা কিন্তু শেষ হয নি। শেষ তো হযই নি—ববং নতুন কবে শুরু হচ্ছে বছব তিনেকেব মধ্যেই গান্ধীজিব অসহযোগ আন্দোলন নিযে।

বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনে ববীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই ছিলেন ও ছিলেনও না। প্রথম কার্যনির্বাহী সমিতিব সদস্য তিনি ছিলেন না। তিনি কলকাতাতেই ছিলেন না। আন্দোলনেব প্রথম স্তবে যে স্বদেশী গানেব নতুন জীবনে তিনি নিজেকে ও বাঙালি সমাজকে উদ্বুদ্ধ কবেছিলেন, তাব বেশিব ভাগটাই লেখা হযেছে গিবিডিতে। মাঝে-মাঝে তিনি কলকাতায এসেছেন, একটু-আধটু সভাসমিতি কবে আবাব চলে গেছেন। ততদিনে 'শিবাজী-উৎসব', ''প্রতাপাদিত্য-উৎসব' এ-সব শুরু হযে গেছে। ববীন্দ্রনাথ তাঁব গানে-কবিতায এক বিপবীত ক্রিযায ব্যস্ত—কখনো তিনি নিভৃত থেকে নিভৃতে ঢুকে পডছেন, কখনো তিনি বহু মানুষেব মনেব সঙ্গে নিজেকে মেলাচ্ছেন। আব, এটা খুব আকস্মিক নয যে বঙ্গভঙ্গবিবোধী আন্দোলনেব মধ্যেই তিনি তাঁব 'গোবা' শুরু কবেন।

অথচ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনেব মর্যাদা পেযে আসছে ববীন্দ্রনাথেব কাবণেই। সে আন্দোলন যে বাঙালিব সাংস্কৃতিক ইতিহাসে স্থাযী হযে গেল—সে-ও তাঁব গান-কবিতা-নিবন্ধেব জন্য।

স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনে ববীন্দ্রনাথ ছিলেন আন্দোলনেব সেই ছডিদাব যিনি পথ দেখিযেছিলেন বটে কিন্তু আন্দোলন সে-পথ মানে নি। তাবপব, যিনি ছিলেন দিশাবী, তিনিই নিজেকে ছাড়িযে নিলেন—দল থেকে।' তাঁব পাযেব চলাব ছন্দ, আন্দোলনেব ছন্দেব সঙ্গে মিলল না। দুইযেব সম্পর্ক আলগা হতে-হতে ছিঁডে গেল। ববীন্দ্রনাথ তাঁব নিভৃতি দিযে নিজেকে ঘিবে ফেললেন এক বেদনায—যেখানে বিচ্ছেদ, যেখানে সহযাত্রাব ভাঙন ও বিবহ। খেয়া-গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি লেখা হচ্ছিল।

আজ, বঙ্গভঙ্গ বিরাধী স্বদেশী আন্দোলনেব শতবর্ষে তিনিই হযে উঠেছেন সেই

আন্দোলনেব প্রধান বিগ্রহ (আইকন), আবাব জাতীযতাবাদী এই আন্দোলন জাতি ধাবণা তৈবি কবতে ও জাতি গঠন কবতে যে ব্যর্থ হল তাবও প্রধান দাযিক কবা হয তাঁকেই। তাঁব সেই সমযেব সব লেখা নিযে এখনো নতুন কবে প্রশ্ন ওঠে—কিন্তু নেশন বলতে ববীন্দ্রনাথ বুঝছিলেনটা কী।

ববীন্দ্রনাথ তাই বঙ্গভঙ্গ বিবোধী স্বদেশী আন্দোলনেব তাত্ত্বিক কর্মীও নন বা নান্দনিক নেতাও নন। অথচ ববীন্দ্রনাথেব কাছে এ-আন্দোলন ছিল এক উদ্ভাসন।

তাঁব কথা আন্দোলন থেকে আলাদা।

যে-তত্ত্বেব কথা এই লেখাব শুরুতে বলেছিলাম জীবনমবণ জোড়া, একজন মানুষেব ও একটি জাতিব জীবনাধিক ও মবণাধিক বাঁচাব অবিচ্ছেদ্য তত্ত্ব—সে তত্ত্ব সত্য হযে উঠল না।

দশ

বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনেব নেতা বিপিন পাল বিদেশী পণ্য বযকটেব উল্লাস দেখে লিখে ফেলেছিলেন, যাই হোক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেব যেন কোনো ক্ষতি না হয। ঐ আন্দোলনেব সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন তৈবি হযে উঠেছিল, তাঁদেব প্রতিনিধি ইযোবোপে গিযেছিলেন বোমা বানানো শিখতে। তাঁদেব প্রধান প্রেবণা সিস্টাব নিবেদিতা উদ্বেগ জানিযে ফেলেছিলেন, সাম্রাজ্যেব যেন ক্ষতি না হয। গান্ধীজি যখন ভাবতবাসীকে শেখালেন—অহিংস অসহযোগ, এই প্রতিশ্রুতিব প্রতিটি সিলেব্‌ল, প্রতিটি শব্দাংশ ও প্রতিটি শব্দ একই বকম গুরুত্ব বহন কবছে, তখন তাঁব নোঙব বাঁধা ছিল অহিংসায—চৌবিচৌবা তাই তাঁব কাছে এত নির্ধাবক শক্তি হযে ওঠে। তেভাগা আন্দোলন ও তেলেঙ্গানা আন্দোলন যখন বাধ্যত সশস্ত্র হযে উঠল ও বিকল্প বাষ্ট্রকল্পনা যখন্ কমিউনিস্টদেব নেতৃত্বে প্রায সত্য হযে উঠছিল, যত ছোট হোক, যত অল্পদিনেব জন্য হোক, তখনই তাকে হাতেব বাইবে গলে যেতে দেযা হল। নিবপেক্ষ তথ্যে আজও প্রমাণিত হবে, বাষ্ট্রশক্তি কাকদ্বীপে, দিনাজপুবে ও তেলেঙ্গানায শক্তিব নিবিখে হেবে গিযেছিল। নকশালবাড়িতে কৃষকবা নিজেব শ্রেণীব সংহত একটা আকাব পাওযা মাত্র, বাষ্ট্রশক্তি সেই শ্রেণীকে আক্রমণ কবল ও প্রায পুবো মন্ত্রিসভা গিযে কৃষকদেব বোঝাতে লাগল—যুক্তফ্রন্টকে বক্ষা কবা তখন বৃহত্তব-মহত্তব শ্রেণীকর্তব্য, এমন কী কৃষকেব শ্রেণী কর্তব্যেব চাইতেও বৃহত্তব-মহত্তব আব তাবপব বছব না গড়াতেই এই নেতাবাই যুক্তফ্রন্ট ভেঙে . ন।

আমি [illegible]নি, আমাব এ-লেখা বঙ্গভঙ্গ বিবোধিতাকে জাতীয আন্দোলনেব শুরু বলে স্বীকাব কবছে না। তাব সঙ্গে-সঙ্গে আমি আবো কিছু স্বীকাব কবতে চাই—আমাদেব জাতিসত্তাব কল্পনাবিভ্রাট, আমাদেব শ্রেণীসংগ্রামেব চৈতন্য বিভ্রাট ও আমাদেব শ্রেণীলক্ষে এক অনির্দিষ্ট সার্বভৌমেব সংযুক্তি।

টীকা

১ মার্ক্স-এব এই কথাগুলি খুব বেশি চেনা, একটু বেশিই চেনা। বেশিব ভাগই 'কমিউনিস্ট ইশতেহাব'-এ, কিছু 'এইটিনথ ব্রুমেযাব'-এ। খুব বেশি চেনা হযে গেলে যে-কোনো কথা কেন, কবে, কী কাবণে বলা হযেছিল, তা আব আলাদা কবে খেযাল থাকে না। আমাদেব মার্ক্সপাঠে তেমন প্রসঙ্গ বিস্মবণ প্রাযই ঘটেছে। ফলে, কেন 'ইশতেহাব' আজও এতটাই অবশ্যপাঠ্য—এই প্রশ্নটি খুব প্রখব হযে উঠছে না।

একেবাবে হালে, আমাদেব প্রবীণ তাত্ত্বিক অশোক সেন-এব একটি বই বেবিযেছে, 'ইতিহাসেব ঠিকঠিকানা', সেবিবান, জানুযাবি, ২০০৫-এ। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাব আত্মলোপেব পব মার্ক্সবাদীদেব কাছে যে-প্রশ্নগুলি প্রধানতম হতে পাবে, অশোক সেন, সেই প্রশ্নগুলিব এখনো অতুলনীয এক আখ্যান লিখেছেন। এমন আস্তিক্যময প্রশ্নাতুব লেখা এখন খুব সুলভ নয।

'ইশতেহাব' এখন কি শুধু ইতিহাসগ্রন্থ হিশেবে পাঠ্য? 'ইশতেহাব' কর্মসূচি হিশেবে বাতিল হযে গেছে না কী? সেই কর্মসূচি ছিল—দুনিযাকে শুধুই ব্যাখ্যা কবা নয, বদলে ফেলা। ইশতেহাবে কর্মসূচিব দুটো মুখই কি এখন ভোঁতা—পুবনো সব কামানেব মত? 'একটি বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থাব ভিতব নির্মিত, আব ঠিক সেই কাবণেই সেই বিশেষ অবস্থাব দ্বাবা নিযন্ত্রিত। ম্যানিফেস্টোকে বহস্যমুক্ত ও শাস্ত্রমুক্ত কবাটা খুব জৰুবি ও তার সঙ্গেই ম্যানিফেস্টোকে সমাজতন্ত্রেব জন্য সংগ্রামের দলিল হিশেবে—নিশ্চযই সব চাইতে মুক্তক দলিল হিশেবেই দেখা, পডা ও বোঝা দবকাব।' বব বিযামিস (Beamısh), 'দি মেকিং অব দি মেনিফেস্টো', সোস্যালিস্ট বেজিস্টাব, ১৯৯৮।

'ইশতেহাব'-এব মূল কর্মসূচি নিযে ১৯৬৬-তেই দার্শনিক প্রশ্ন তুলেছিলেন থিযোডব অ্যাডবনো। যুদ্ধে ফ্যাসিস্ত শক্তি কি নির্মূল হল, না কী, তাব বীজ অপেক্ষায থাকল, ছডিয়ে পডাব অপেক্ষায?

'যে-সচেতনতাকে এই নীতিশিক্ষা দেযা হযেছে যে তাকে আগে থাকতেই সিদ্ধান্ত নিযে রাখতে হবে—তাব কাছেই গিযে কী না বিকল্প দাবিগুলিব ন্যায্যতা জানতে হবে?. যেমন, মার্ক্স আব এঙ্গেলস কি বাজি হযেছিলেন—তাঁদেব গতিপ্রাণ শ্রেণীতত্ত্ব ও তাঁদেব ক্ষুবস্য ধাবা আর্থিক বিশ্লেষণেব জটিল শৃঙ্খলা বাদ দিযে 'গবিব' আব 'বডলোক'—এই সহজবোধ্য, শাদাসিধে দুটি ভাগ কবে তত্ত্ব বলতে?'

থিযোডব অ্যাডবনো, নিগেটিভ ডাযালেকটিক্স, রুটলেজ, ১৯৭৩, পৃ ৩২।

আমাদেব জাতীযতাবোধেব চেহাবা এমনই কেন হল ও কখনোই কি চেহাবা তৈবি হওযা শেষ হল—এই প্রশ্নগুলিব উত্তব খুঁজতে মার্ক্সকে এই লেখাটিতে উল্টে ব্যবহাব কবব। সমাজেব উৎপাদন শক্তি থেকেই সামাজিক চৈতন্য নির্ধাবিত হয। আমাদেব মত কলোনিতে প্রক্রিযাটা আবো জটিল। সেখানে, 'সমাজেব উৎপাদনশক্তি' বলতে বোঝায, একটি দেশেব উৎপাদন শক্তি ব্যবহাব কবে আব-একটি প্রভু দেশ তাব 'সামাজিক চৈতন্য' নির্ধারণ কবছে। 'উৎপাদন

থেকে চৈতন্য' এমন একটা সূত্র কলোনিব বেলায বদলে গিযে হয এ-বকম ঘোবালো-প্যাঁচালো—প্রভু দেশেব উৎপাদন শক্তি > প্রভুদেশেব সামাজিক চৈতন্য > উপনিবেশ-বিস্তাব > প্রভুদেশেব উৎপাদন শক্তি > দাসদেশেব সামাজিক চৈতন্য > উপনিবেশমান্যতা > প্রভুদেশেব উৎপাদন শক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি।

'If any nation's history, then the history of the English in India is a string of futile and really absurd (in practice infamous) economic experiments In Bengal they created a caricature of large-scale English landed estates, in South-Eastern India a caricature of small parcelled properties, in the north-west they did all they could to transform the Indian economic community with common ownership of the soil into a caricature of itself' Karl Marx, Capital III, Progress Publication, Moscow, 1966, p 333-334 footnote

২ ভাবতেব ইতিহাস ও ব্রিটিশ-ভারত নিযে মার্ক্স-এব লেখাগুলিব নানাবকম সংকলন ১৯৪৩ সাল থেকেই এদেশে বেবিযে আসছে। ১৮৫৩, ১৮৫৬, ১৮৫৭ ও ১৮৫৯-এ বিভিন্ন উপলক্ষে এই লেখাগুলি লেখা হযেছিল। এখন এই লেখাগুলি একসঙ্গে পাওযা যায 'কার্ল মার্ক্স অ্যান্ড ফ্রেডবিখ এঙ্গেলস, দি ফার্স্ট ইনডিযান ওযাব অব ইনডিপেনডেন্স ১৮৫৭-১৮৫৯, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, তৃতীয মুদ্রণ ১৯৬৮।' বইটিব নামকবণে বিভ্রান্তি আছে। 'নিউ ইযর্ক ডেইলি ট্রিবিউন' কাগজে ১৮৫৭ থেকে ৫৯, প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ নিযে মার্ক্স ও এঙ্গেলস যে-বচনাগুলি লিখেছিলেন, সেগুলিই এই সংকলনেব প্রধান অংশ হলেও, ১৮৫৩-তে ভাবতে কোম্পানিব চার্টাব বিনিউযালেব সময লেখা দুটি রচনা আব ১৮৫৯ পর্যন্ত লেখা কোনো-কোনো চিঠিব টুকবোও এতে আছে। ফলে এটাকে বলা উচিত ছিল, '১৮৫৩-৫৯'।

এই সংকলনটি ভাবতে বাববাব এসেছে ও বিক্রি হযেছে। এগুলিই ভাবত-ব্রিটিশ সম্পর্ক নিযে মার্ক্স-এব অপবিবর্তিত ব্যাখ্যা বলে আমবা জেনে এসেছি। সেই জানাটা ভুল। ফলে এই ১৮৫৩-৫৬ সালেব লেখাগুলি থেকে ভাবত সম্পর্কে ব্রিটেনেব দুটি কর্তব্য ও এশিযাটিক মোড অব প্রোডাকশন—আমাদেব দেশেব মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত কবেছে। মার্ক্স ৫৯ সাল থেকেই তাঁব এই দুটি ধাবণাই কাটিযে উঠছিলেন। ১৮৬৭ পর্যন্ত তো মার্ক্স ভাবত নিযে তাঁব চিন্তা পুনর্গঠিত কবে গেছেনই। ১৮৭৯-তে বেবিযেছিল কোভালেভাস্কি (Kovalevasky) প্রণীত 'কমিউন্যাল ল্যান্ডহোলডিং'। মার্ক্স তাঁব নোটখাতায লিখে বেখেছেন—'ভাবতেব গ্রামসমাজে ব্যক্তিমালিকানা জাবি হচ্ছে ও নতুন সব দ্বান্দ্বিকতা ফুটে বেবচ্ছে।' কোভালেভাস্কি-ব ওপব এই নোটটাতে মার্ক্স আবো লিখে বেখেছেন, জার্মান-বোম সামন্ততন্ত্র থেকে ভাবতবাসীদেব জীবনব্যবস্থা ছিল স্বতন্ত্র। মার্ক্স লিখেও গেছেন কোথায-কোথায এই স্বাতন্ত্র্য—দাসব্যবস্থা নেই ও অনভিজাতবাও জমি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এই উল্লেখগুলি এখনো সব সংকলিত হযনি। যেমন, এই শেষ ব্যাখ্যাটি মার্ক্স-এব পাণ্ডুলিপি থেকে হবসবোম তাঁব 'প্রাক্ ধনতান্ত্রিক সমাজ'-এ উদ্ধাব কবেছেন। অধ্যাপক ইবফান হাবিব 'ভাবত নিযে মার্ক্স-

এব অনুভব' নামেব একটি নিবন্ধে, 'এসেজ ইন ইন্ডিযান হিস্ট্রি' গ্রন্থটিতে, (তুলিকা, ১৯৯৫) অনেক তথ্য সাজিযে দিযেছেন। তাতেও তাঁকে পবোক্ষ সাক্ষ্য মানতে হযেছে।

৩. সন-তাবিখেব একটু বৈষম্য থাকলেও প্রোগ্রেস পাবলিশার্স-এব সংকলনটিতে এই লেখাগুলি আছে। পৃ ৭৮, পৃ ৩১।

৪ ইবফান হাবিব, ১৯৯৫, পৃ ৫৭।

৫ ইবফান হাবিব, ১৯৯৫, পৃ ৪৩।

৬ কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডবিখ এঙ্গেলস, 'দি ফার্স্ট ইনডিযান ওযাব অব ইনডিপেনডেন্স, ১৮৫৩-১৮৫৯', প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, ১৯৫৯ পৃ ১৭।

৭ দেবেশ বায, 'উপনিবেশেব সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য', প্যাপিবাস।

৮ দেবেশ বায, 'উপনিবেশেব সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য', প্যাপিবাস। একটি কথা নতুন কবে ভাবতে হবে—হিস্ট্রি অব আইডিযাজ বা চিন্তাভাবনাব ইতিহাস হিশেবেও। 'সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষাসূচি—এই সব বিষযে কলকাতা শহবেব ও কলকাতাব বাইবেব কোনো-কোনো জিলা-মহকুমা শহবেও, শিক্ষিত শহববাসীবা ও পুজোব মন্ত্রপাঠেব চাইতে বেশি শিক্ষিত নন এমন ব্রাহ্মণবা, আব উঁচু বর্ণেব হিন্দুবা, পক্ষে ও বিপক্ষে ভাগ হযে এসেছেন। এই কোন সূচি শাস্ত্রীয অশাস্ত্রীয সেটা স্থিব কবতেই ব্রাহ্মণবা এত প্রাধান্য পেযেছিলেন। ১৮৫৭-ব মহাবিদ্রোহেব পব থেকে বা ব্রিটিশ পার্লামেন্টেব শাসন শুরু হওয়াব পব থেকে সামাজিক বিষয়েব ঔচিত্য-অনৌচিত্য হিন্দু বিচাবে বা শাস্ত্রীযতাব নিবিখেব ব্যবহাব ও ব্রাহ্মণদেব প্রাধান্য ইংবেজদেব কাছে কমে আসতে থাকে। কিন্তু ঐ 'নতুন শ্রেণী' হিন্দুশাস্ত্র-নির্দেশকেই সামাজিক বিষয কবে তুলছিল। ব্রিটিশ উদাবপন্থীদেব অনুকরণে নানা আঞ্চলিক বিদ্রোহেব প্রতি সমর্থন—পাবনা, সাঁওতাল, নীল, পাগলাই, কোলে, সন্ন্যাসী-ফকিব, মগ আব পার্লামেন্টেব শাসনকে, আমাদেব দেশেব শাসনেব ইতিহাসেব জানা আদলে, 'মহাবাণীব শাসন'-এ বদলে নেযা একই সঙ্গে ঘটছে। গৌতম ভদ্র, 'ইমান ও নিশান', সুবর্ণবেখা, ১৯৯৫—বইটিব 'গৌবচন্দ্রিকা' ও 'একটি আনুগত্যেব দলিল '—এই দুটি অধ্যাযে এই বিষযটি নিযে কিছু কথা আছে।

Ranajit Guha, 'Dominance without hegemony', OUP, 1998 p 78।

৯ মার্ক্স-এব শ্রেণী-সংজ্ঞা নিযে তাঁব বিভিন্ন দেশেব অনুগামী, বিবোধী ও তাত্ত্বিকদেব মধ্যে সবচেযে বেশি মতান্তব ঘটে আসছে ও তাঁবা প্রত্যেকেই নিজেব-নিজেব মত-অনুযাযী সাক্ষ্য মার্ক্স থেকেই পেযে আসছেন। এই আলোচনায সে-বিষযে ঢোকাব সুযোগ নেই। তিনটি বুনিযাদি শ্রেণীব ভিতবে মার্ক্স অসংখ্য আবো শ্রেণীব কথা বাববাব বলেছেন।

'নতুন শ্রেণী' ছাডা আব 'নতুন নীতিবোধ'-এব দবকাব থাকবে কাব। উচ্চবর্ণেব হিন্দুদেব পাবিবাবিক স্থাযী নীতিবোধ ও ভিক্টোবিযাব ইংল্যান্ডেব স্থিতিস্থাপন নীতিবোধ মিলে বাংলায, একটা সামাজিক নীতিবোধেব বিভ্রম ঘটাচ্ছিল ১৮৭০-নাগাদ। সেই 'সামাজিক নীতিবোধ'—তৈবিব কিছু উদাহবণ ভূদেব মুখোপাধ্যায-এব 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'পাবিবাবিক প্রবন্ধ' বইদুটিতে ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ-এব 'প্রভাত চিন্তা', 'নিশীথচিন্তা' বইদুটিতে আছে। এমন আবো সব

প্রমাণ আছে, তখনকাব সংবাদ ও সাময়িকপত্রে। এই 'নতুন শ্রেণী'ব নতুন নীতিবোধ বক্ষা কবতে চাইছিল, মহাবাণীব শাসনেব প্রতি বিশ্বাস, সবকাবি চাকবি-বাকবিব ওপব নির্ভবতা, চিবস্থাযী বন্দবস্ত, আব নিজেদেব হিন্দু প্রথা ও পবিবাব সম্পর্কে পুবনো ধাবণা। অথচ, ঠিক এই পর্ব জুড়েই, ধবা যাক উনিশ শতকেব শেষ ত্রিশ-চল্লিশ বছব শাহেবদেব আইনি ও বেআইনি অত্যাচাব থেকে চোখ ফিবিযে নেযাব মত একটু জাযগাও ছিল না—উচ্চবর্ণেব বাঙালি হিন্দুব। সবকাবি চাকবিব সুবাদে সেই অত্যাচাব ঘটানোব মাধ্যম হিশেবে তাদেবই কাজ কবতে হত। এই পর্বে চাকবিজীবী বাঙালি হিন্দু লেখকদেব আত্মজীবনীগুলিতে, তাঁদেব নিযে অন্য অনেকেব লেখা স্মৃতিকথায, সংবাদ-সাময়িকপত্রের লেখাগুলিতে ও কখনো-সখনো চিঠিপত্রে, সবকাবি চাকবিব গৌববোধেব সঙ্গে দাসত্ববোধেব যন্ত্রণাব অস্বস্তি লক্ষ না কবে পাবা যায না। এই অন্তবীণ ট্রমা কখনো ক্ষেত্রমণি-বোগ-তোবাপ ('নীলদর্পণ' ১৮৫৮) আখ্যান তৈবি কবে ফেলে, কখনো হিন্দু-অবতাব তত্ত্বে, বিশেযত 'গীতা'য, একটা ব্যাখ্যা বা পবিত্রাণ কিছু খোঁজে। দীনবন্ধু-বঙ্কিমচন্দ্র-হবিশচন্দ্র-কেশবচন্দ্র-দ্বাবকানাথ বিদ্যাভূষণ-যোগীন্দ্রনাথ বসু-অক্ষযকুমাব মৈত্রেয—এঁদেব অনেক অখ্যাত লেখায এই অন্তবীণ ট্রমাব লক্ষণ পডা যায। এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ, যেমন, গিবিশচন্দ্র ঘোষ, অক্ষযকুমাব সবকাব, অক্ষযকুমাব মৈত্রেয—বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব পব স্বদেশী নাটক-প্রবন্ধ লিখেছেন। আমবা এখানে সেই লেখাগুলিব কথা বলছি না। আমবা বলছি—তাব আগেব লেখাগুলিতেই শাহেবদেব অত্যাচাব থেকে একটা শাবীবিক ভয ঢুকে পডছে। এখানে সেই ট্রমা-ব কথা বলছি—ভাবতেব, বাংলাব, মার্ক্স-কথিত 'নতুন শ্রেণী'ব সাম্রাজ্যবাদেব স্বৰূপ দেখে ফেলা, বুঝে ফেলা ও ভয পাওযাব কথা। প্রসঙ্গত, ১৮৭০-এ ফ্রান্সেব সঙ্গে জার্মানিব যুদ্ধেব বিপোর্টে জার্মান সেনাবাহিনী কী ভাবে যুদ্ধেব প্রচলিত বীতিব তোযাক্কা না কবে ফ্রান্সেব গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে সাধাবণ মানুযজনকে খুন কবছে, তার বিববণ দিতে গিযে এঙ্গেলস লিখছেন, '[শত্রুপক্ষকে] মুছে ফেলাব এই বাতিল যুদ্ধনীতিব দুটিমাত্র আধুনিক উদাহবণ আছে। ভারতে ইংবেজদেব সিপাহি বিদ্রোহ দমন ও ব্রাজিলে বাঁজাব ফ্রেঞ্চ বাহিনীব অভিযান' (কার্ল মার্ক্স-ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, কালেকটেড ওর্যার্কস, ২২তম খণ্ড, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৮৬, পৃ ১৬৬)।

বাংলাব, ভাবতেব এই 'নতুন শ্রেণী' সিপাহি বিদ্রোহেব চবম বিবোধিতা কবেছিল কেন ও কেনই-বা সিপাহি বিদ্রোহেব পবেব বিশ বছব ধবে নানা আঞ্চলিক বিদ্রোহ সমর্থন কবেছিল? এমন প্রশ্নেব আনুমানিক একটি উত্তব হতে পাবে—একমাত্র সিপাহি বিদ্রোহেবই লক্ষ ছিল বাজনৈতিক। তখনো অসংগঠিত এই 'নতুন শ্রেণী' সেই বাজনৈতিক লক্ষেব সঙ্গে একমত হতে পাবেনি। ১৮৫৩-ব চার্টাব বিনিউ হযেছিল আইনসভা গঠনেব প্রস্তাবে। সেই প্রস্তাবটিই ব্রিটিশ-ভাবতে প্রথম সাংবিধানিক শাসনেব শুরু। সেই 'নতুন শ্রেণী' তাব নতুন ভূমিকা দেখতে পাচ্ছিল। এব পবেব বিদ্রোহগুলি প্রধানত ছিল আঞ্চলিক কৃযক বিদ্রোহ ও তাতে কৃযক-চাযীব অর্থনৈতিক দাবিব সঙ্গে বাযত-কৃযকেব অর্থনৈতিক দাবিব মিল ছিল অনেক জাযগাতেই, উদাহবণ, নীলবিদ্রোহ। আব ততদিনে চাকবিজীবী ও বৃত্তিজীবী এই নতুন শ্রেণী সংহতও হযেছে। আবো একটি প্রধান কাবণ ছিল—হিন্দুদেব ইসলামবিবোধী সাম্প্রদাযিকতা।

তখনকাব আর্যাবর্তেব নতুন সংস্কৃতিতে হিন্দুপ্রাধান্য ছিল এতটাই। সেই হিন্দু সাম্প্রদাযিকতাব কাবণেই ঈশ্বব গুপ্ত থেকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায সকলেই মুসলমানদেব এমন ইতব ভাষায বর্ণনা কবেছেন, সামান্য ব্যতিক্রমসহ—প্যাবীচাঁদ, মধুসূদন, দীনবন্ধু। কোনো ব্যাখ্যাতেই, এমন কী 'সীতাবাম' উপন্যাসেব শুরুতে বঙ্কিমচন্দ্রেব নিজেব জবানি সত্ত্বেও এ-সত্য ঢাকা পড়ে না যে আমাদেব জাতীযতাবাদেব প্রথম 'ঋষি' একটি সাম্প্রদাযিক ভাবতেব জাতীয সঙ্গীত ও জাতীয কাহিনী লিখেছিলেন।

১০ উনিশ শতকেব শেযার্ধ থেকে বিশ শতকেব প্রথম পনেব বছব বাঙালিব সামাজিক রূপান্তবে চাকবিজীবীবা অনেক সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি নিরূপণ কবেছেন—এ-কথা প্রথম বলেন সুমিত সবকাব। তাঁব 'রাইটিং সোস্যাল হিস্ট্রি', ও-ইউ-পি, ১৯৯৭ গ্রন্থটিব দুটি নিবন্ধে, 'দি সিটি ইম্যাজিনড্ ' ও 'কলিযুগ, চাকবি অ্যান্ড ভক্তি..', এ-নিযে তথ্যপ্রমাণিত কিছু কথা আছে।

১১ দেবেশ বায, 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁব ছোটগল্প ১৮৯১-১৯০২।'

১২. এই লেখাটিব 'দুই' অংশ।

১৩ মধ্যবিত্ত কোনো শ্রেণী হতে পাবে না। বাংলাব সামাজিক ইতিহাসেব আলোচনায 'মধ্যবিত্ত' বা 'মধ্যশ্রেণী'র উল্লেখ প্রথম কবেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায, তাঁব 'কলিকাতা কমলালয'-এ। চাকরিজীবী, মধ্যস্বত্বভোগী, 'দেশ' ও কলকাতায বিভাজিত জীবন, 'দেশ'-এব স্বাভাবিক নেতা, ডাক্তারি-ওকালতি ইত্যাদি বৃত্তিজীবী, বর্ণহিন্দুব তত্ত্ববিশ্বে দৃঢমূল, বর্ণভাগ-অভ্যস্ত—এই বিবিধ গোষ্ঠীকে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীব অন্তর্গত কবা সমাজ-ইতিহাস ঘটিত চিন্তার অপরিহার্য ক্যাটিগবি হযে উঠেছে। মার্ক্সবাদী আলোচনাতেই এটা হয বেশি। গত ত্রিশ-পঁযত্রিশ বছবে এই 'মধ্যবিত্ত'-ব বদলে 'ভদ্রলোক', 'বাবু' এই পবিভাষা তৈবি হযেছে। এ পবিভাষাব ভিত্তি শাহেবদের নামকরণ—'জেন্টুস', 'বাবুস'। আবাব, এ-কথাও সত্য যে আমাদেব সমাজ-ইতিহাসে এমন একটা ক্যাটিগবিকে অস্বীকাবও করা যায না। ধনী ও সম্পত্তিবান অবর্ণ হিন্দু, এই ক্যাটিগবিব দৌলতেই বর্ণভেদেব বেড়া খানিকটা টপকাতে পাবতেন।

১৪ বাঙলা লেখকদেব মধ্যে গোপাল হালদাব একটা পবিকল্পনা কবেছিলেন ১৮৫০ থেকে ১৯৫০—এই একশ বছবে বাঙালি মধ্যবিত্তের উত্থান-বিকাশ-অবসান নিযে একটি এপিক বচনাব। 'ভাঙন', 'স্রোতেব দ্বীপ', উজানগঙ্গা'—এই তিন খণ্ড লেখা হয়েছিল।

১৫ জন্মতাবিখ নিযে মতপার্থক্য আছে, 'বামকৃষ্ণ কথামৃত', অখণ্ড সংস্কবণ, ১৯৮৬-৮৭, দশম মুদ্রণ ১৯৯৮, পৃ ১। যদিও এখন বেলুড় মঠের সুবাদে ১৮৩৬-ই মানা হয় বেশি।

১৬ এব ব্যাখ্যা বামকৃষ্ণই সবচেযে ঠিকঠাক দিযেছেন। সাগরমেলা থেকে জগন্নাথ দেখে ফেবা, তখনো ও এখনো, তীর্থযাত্রীদেব মধ্যে প্রচলিত। বামকৃষ্ণ বলেছেন—যতদিন ট্রেন হয়নি ততদিন বাসমণিব বাগান তীর্থযাত্রীদেব বিবামস্থল হিশেবে জনপ্রিয ছিল। স্বামী সাবদানন্দ, 'শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ', উদ্বোধন, দ্বিতীয ভাগ, একাদশ সংস্কবণ, ১৯৬৩, চতুর্বিংশতিতম মুদ্রণ, পৃ ২৫-৫৪।

১৭ রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে কতকগুলি বিরোধ খুব স্পষ্ট। রামকৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠায় তাঁর কলকাতার ভক্তরা বেশি সক্রিয় ছিলেন, নাকী, তাঁরা আসার আগেই তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ—এ নিয়ে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-রচয়িতা স্বামী সারদানন্দ ও 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-প্রণেতা শ্রীম-এর মত আলাদা। এমন বিরোধ বেলুড় মঠ ও দক্ষিণেশ্বরের মধ্যেও ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ ও বরানগর মঠে তাঁর সতীর্থ সন্ন্যাসীদের মধ্যেও বিরোধ ছিল।

১৮ রামকৃষ্ণের মূর্ছা রোগ ও আনুষঙ্গিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য মথুর-এর নানা চেষ্টা, সাধুসঙ্গম আহ্বান করে রামকৃষ্ণের দশা-পরীক্ষা ও তিনি ঈশ্বরপ্রাণিত নাকী ব্যাধিগ্রস্ত তা নির্ণয়ের উদ্যোগ, তখনকার কিছু বিখ্যাত সাধু-সন্ন্যাসীর রামকৃষ্ণ-ভক্তি তাঁর অবতারত্বের একটা জায়গা তৈরি করেছিল কিন্তু কেশবচন্দ্র ছাড়া সেই জমিন্ চাষ হত না। যে-'নতুন শ্রেণী'র কথা আমরা বলছি তার বিগ্রহ হতে হলে নাগরিকতা, বিলিতিয়ানা, ইংরেজি, অথচ একটা আধুনিক হিন্দুয়ানার দরকার ছিল। আমাদের জাতীয়তাবাদ তার বিগ্রহের তল্লাসে একটা বিকল্পের দুটো কানাগলি খুঁজে পেয়েছিল—'হয় পাগল, নয় অবতার।'

১৯ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', উল্লিখিত সংস্করণ, পৃ ২৯।

২০ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', উল্লিখিত সংস্করণ, পৃ ১১১৬।

২১ ঐ পৃ ১১১৮।

২২. যোগেশচন্দ্র বাগল ভূমিকা, বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ সাহিত্য সংসদ ১ম খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ।

২৩ দেবেশ রায়, 'আত্মার ইতিহাস', বঙ্গদর্শন[১], বঙ্কিমভবন, নৈহাটি, ২০০০।

২৪ বাঙালির জাতিগঠন নিয়ে পঁচিশ বছর ধরে ধারাবাহিক গবেষণা করে যাচ্ছেন অধ্যাপক পার্থ চ্যাটার্জি। 'বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭', 'ন্যাশন্যালিজম অ্যান্ড ইটস ফ্র্যাগমেন্টস', 'এ প্রিন্সলি ইমপোস্টর—দি সিক্রেট হিস্টরি অব ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যালিজম', 'দি প্রেজেন্ট হিস্ট্রি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল', 'এ পসিব্‌ল্ ইন্ডিয়া'—এগুলি তাঁর লেখা কয়েকটি বই। পার্থ চ্যাটার্জির এই ধারাবাহিক গবেষণার ফলে নতুন তথ্য তো পাওয়া যাচ্ছেই, তার চেয়েও যেটা বড় কথা—তিনি সব সময়ই এই ইতিহাসে ঢুকছেন, তাঁর বর্তমান থেকে। তাঁর অনুসন্ধানে বাঙালির অতীত-বর্তমানের সংলাপটিই আমাদের উৎসাহ দেয়।

২৯ সুজিত চৌধুরী, 'বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালি', নির্বাচিত প্রবন্ধ, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, ২০০৩। এই খুব ছোট লেখাতেও সুজিত চৌধুরী ভারতীয় শিল্পের বিকাশ, রাজনীতির বিকাশ ও শিল্প-রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে নতুন তথ্য উদ্ধার করেছেন।

২৫ সুধীর চক্রবর্তী, 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন', পুস্তক বিপণি, ১৯৯২, পৃ ১৬৪।

২৬ দেবেশ রায়, 'চৈতন্য ও আধুনিকতা'।

২৭ ফার্নাদ ব্রদেল, 'সিভিলাইজেশন অ্যান্ড ক্যাপিটালিজম'।

২৮ 'ইনডিয়ান মিরর'—সংকলন, প্যাপিরাস।

২৯ সুজিত চৌধুরী, উল্লিখিত।

৩০ ল্যাডলিমোহন রায়চৌধুরী. " 'রাজনৈতিক সাধু' ও রামকৃষ্ণ মিশন এবং ", বিভাব, শরৎকালীন সংখ্যা, ১৪১১।

বাঙালির আত্মপরিচয় : উনিশশো পাঁচ থেকে একাত্তর

অরুণ সেন

বলা বাহুল্য, বাঙালিব পবিচয এবং বাঙালিব আত্মপবিচয এক বস্তু নয। বাঙালিব নৃতাত্ত্বিক উৎস, বাঙালিব জীবনযাপন ও তাব উপকবণ, বাঙালিব আবেগ ও কল্পনাব নিজস্ব ধরণ (যাব পেছনে আছে বাংলাব ভূগোল, প্রকৃতি, সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদি অনেক কিছুই), সর্বোপবি বাঙালিব ভাষা—এ সবেব মধ্য দিযেই তো তাব হাজাব বছবেব ইতিহাস। পবে দেখব, বিবেচ্য এমনকী বাঙালিব ধর্মও। কাবণ, যাই বলি না কেন, বাঙালি হিন্দু সর্বভাবতীয হিন্দু থেকে আলাদা, বাঙালি মুসলমান বিশ্বেব অন্য জাযগাব মুসলমান থেকে আলাদা। বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানেব মধ্যে তাই প্রভূত অমিল সত্ত্বেও আছে গভীবের এক মিল। তাবই নাম বাঙালিব পবিচয বা চবিত্র। কিন্তু সেই পবিচয থাকা এক জিনিস, আব তাকে চেনা আবেক। বাঙালিব আত্মপবিচযেব সূচনা তখনই, যখন এই পবিচযেব মধ্যে নানা দিক থেকে, নিজের ভেতব থেকেও, বাধা আসে, সমস্যা ও সংকট তৈবি হয। নিজেব পবিচয সম্পর্কে বাঙালি সচেতন হযে ওঠে।

একেবাবে গোড়াব ইতিহাস বাদ দিলে বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানেব প্রথম সংযোগেই বাঙালি জাতিব উত্থান ও বিকাশ, যদিও হযতো উভযেব ঐক্য ও বিবোধেব একটা দ্বৈত সম্পর্ক প্রথম থেকেই ছিল। সমন্বয়েবও একটা বড়ো দিকই ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। বাঙালি হিন্দুরা তুর্কি-আক্রমণেব পব থেকেই আববি-ফাবসিকে অনাযাসে বাংলায গ্রহণ কবতে থাকে। আব বাঙালি মুসলমানেবা বাংলাতেই (কখনো হযতো আববি-ফাবসিব ব্যাপক মিশেল থাকে তাতে কিন্তু সেটা বাংলাই) বহু উল্লেখযোগ্য লেখা লেখেন প্রাক-ব্রিটিশ মধ্যযুগে।

অবশ্য বাঙালি মুসলমানেব ওপব আববি-ফারসি উপাদান ও ভাষাব সূত্রে বাইবেব একটা চাপ ববাববই ছিল, কিন্তু বেশ কযেকজন বাঙালি মুসলমান কবি তাকে অগ্রাহ্য কবে মধ্যযুগেই বাংলাব সপক্ষে সোচ্চাব হন। ষোড়শ শতকেব দুই কবি সৈয়দ সুলতান ও হাজী মুহম্মদ 'দেশী ভাষা' ও 'হিন্দুযানি' অক্ষবে পবিচিত বাংলা সম্পর্কে সমকালীন মুসলিম সমাজেব অবজ্ঞাব প্রতিবাদ কবেন। হাজী মুহম্মদ লেখেন "দেশী ভাষা দেখি মনে না কবিও ঘিন।" সপ্তদশ শতকের শেখ মুত্তালিব আবো স্পষ্ট "আববীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ। তেকাবণে দেশী ভাষে বচিলু প্রবন্ধ।" আব্ তখনই কঠোবতব উক্তি আবদুল হাকিমেব "যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। সে সব কাহাব জন্ম নির্ণয ন জানি॥ দেশী ভাষা বিদ্যা যাব মনে ন জুযায। নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায়॥ মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি। দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি ॥"[১] বাঙালিব আত্মপবিচযেব প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে এই বাঙালি মুসলমান কবিদেব ভাষা-সচেতনতাকে তুলে ধবা যায়।

ইংবেজ শাসনকালে ইংবেজি-শিক্ষা এবং ইংবেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাব পবিণামে বাঙালিব আত্মপবিচযেব সমস্যা আবাব একটা নতুন মোড নিল। বাঙালি দবিদ্র মুসলমানেবা যে কাবণেই হোক সেই শিক্ষা থেকে দূবে সবে ছিল। আব শহবেব বাঙালি হিন্দুবা কেউ-কেউ এতই কাছে ঘেঁযল যে প্রায 'সাহেব' বনে উঠতে চাইল! যাবা চাইল না, তাবাও ইংবেজি-শিক্ষাকে বর্জন কবেনি, ববং উনিশশতক থেকেই শুরু শহুবে ইংবেজি-জানা বাঙালি হিন্দুদেব নতুন বাংলা লেখালেখি। শিক্ষিত বলতে ক্রমশই বোঝাল ইংবেজি-শিক্ষিত মানুযকে। বাঙালি মুসলমানেবা তো কার্যত কোনো শিক্ষাই গ্রহণ কবেনি তখন, অথবা যাবা কবেছে তাবা বানিযেছে মুসলমানি বাংলা বলে একটা বস্তু। গ্রামেব হিন্দুবাও তো বাংলা ছাড়া কিছুই জানে না। গ্রামেব ইংবেজি-অজ্ঞ হিন্দু-মুসলমান ও শহবেব ইংরেজি-জানা হিন্দুদেব মধ্যে ব্যবধান তখন তাই দুস্তব। আর তাব ফলে হিন্দুদের নিজেদেব ভেতব এবং হিন্দু ও মুসলমানেব মধ্যে পাবস্পবিক সম্পর্কে একটা বিচ্ছেদ রইলই, শুধু ভাযাব ব্যাপাবে নয, সংস্কৃতিব অন্য ক্ষেত্রেও। বাঙালি-পবিচয নিযে আত্মসচেতনতাব কথাই ওঠে না মূলত এই অবজ্ঞাত অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুযেব মধ্যে। বাঙালির আত্মপবিচয বলতে শিক্ষিত শহুরে হিন্দুবই আত্মপবিচয। মুসলমান সম্পর্কে ও গ্রামেব নিম্নবর্ণ হিন্দু সম্পর্কে অপবিসীম অজ্ঞতা ও উপেক্ষাই তাদেব।

অবশ্য নিজেদেব সীমিত পবিধিতেও শিক্ষিত বাঙালিব সমস্যা যে খুব আলোচিত হত তা নয। তখনও ভাবতীয-পবিচয় ও বাঙালি-পবিচয ছিল মূলত অঙ্গাঙ্গি। উনিশশতকে বাঙালি শিক্ষিত মানুযের মধ্যে যে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হত প্রধানত শিক্ষা ও সমাজকে কেন্দ্র কবে, তাতে বাঙালিব সমস্যা পৃথকভাবে তেমন উঠত না—বোধহয একমাত্র বেথুন সোসাইটিতে ছাড়া। সেখানে "অধিকাংশ আলোচনাই বাংলা দেশেব সমস্যা নিযে কবা হত।"[১]

বাঙালিব স্বতন্ত্র পবিচয় এবং আত্মপবিচযেব দ্বন্দ্বমুখব স্বভাব ভালোভাবে টেব পাওয়া গেল উনিশশতকেব দ্বিতীযার্ধে, বঙ্কিমচন্দ্রেব মধ্য দিয়ে। তাব আগেই ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালিব প্রশ্রয নেই জেনেও তিনিই প্রথম বাংলা উপন্যাস লিখলেন। 'বঙ্গদর্শন'-এব পাতায বাঙালিব ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ভাযা নিযে—সে যুগেব জ্ঞানেব পবিসীমায—আলোচনা কবলেন প্রবল দাযবোধে। উনিশশতকেব চিন্তাভাবনাব যে ক্রম-পবিণতি বাঙালিব জাতীযতাবোধে তাব সাক্ষ্য পাওযা গেল। বাঙালিব উৎপত্তিব কথা বলতে গিযে তিনি যেমন বাঙালি মুসলমানেব কথা বলতে ভোলেননি, তেমনি সেই সঙ্গে বাঙালিব আত্মপবিচয প্রত্যাখ্যানের ও সাহেবিযানাব সেই আবহাওযায তাঁব তীব্র শ্লেয ফুটে উঠেছিল 'লোকবহস্য' গ্রন্থে 'উচ্চদবেব উচ্চশিক্ষিত বাঙালী বাবু' আব 'তস্য ভার্যা' কিংবা বামবাবু-শ্যামবাবু আব পর্দাব আড়ালে থাকা বামবাবুব 'পাড়াগেঁযে' স্ত্রী-ব নাট্য-কথোপকথনে। ভাযা-পবিচয যখন অনিশ্চিত, তখনই তো তাব জাতি-পবিচযেব সংকট—বঙ্কিমচন্দ্র তাবই মুখোমুখি হযেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমেব প্রকল্পে, তাঁব নিজেব ভাবনাব অবযব যাই হোক, বাঙালিব জাতীযতাব একটা পবিণতিই দেখা দিল হিন্দু জাতীযতাবাদেব দিকে।

এবং এই জাতীযতাবোধ উনিশশতকেব শেযে ক্রমশ টেনে নিযে গেল হিন্দুধর্মেব পুনরুত্থানেব দিকে। সর্বভারতীয জাতীযতা, বাঙালি জাতীযতা ও হিন্দুত্ব, এ সবেবই মিশ্রণ

যেন সে-সময়েব 'হিন্দুমেলা'য়। এই জাতীয়তার বোধে মুসলমানদেব কোনো স্থান ছিল না—যারা এতদিন ইংবেজি-শিক্ষা ও হিন্দু-সান্নিধ্য বর্জন কবে প্রায় আড়ালে চলে গিয়েছিল, তাবাও ওয়াহবি-আন্দোলনের গোঁড়ামিব প্রভাবে সাম্প্রদায়িকভাবে আবো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ইংবেজ-আমলেব আধুনিকতায় বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান একে অন্যেব কাছ থেকে দূবে সবেই বইল, যদিও ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল উভয় সম্প্রদায়েব মধ্যেই। মূলত যা ঘটতে থাকল তা এই · বাঙালি-পবিচয় আব হিন্দু-পবিচয়ের সমীকবণ এবং বাঙালি-পবিচয় আব মুসলমান-পরিচয়েব বিচ্ছিন্নতা। উনিশশতকেই যা শুরু হয়েছিল, বিশশতকে তা বেড়েই গেল।

২

এই পটভূমিতেই বিশ শতকেব গোড়ায় পরিকল্পিত ও ঘোষিত হল বঙ্গবঙ্গ। ইংবেজ-শাসকদেব কাছ থেকে যুক্তি হিসেবে মূলত হাজিব কবা হয়েছিল প্রশাসনিক সুবিধা-অসুবিধা। কিন্তু, যেহেতু মুসলমান-প্রধান এলাকাকে বিযুক্ত করে ভিন্ন প্রদেশ গড়া হয়েছিল, তাই অনেকেই বঙ্গভঙ্গের পেছনে ইংবেজদেব যে মতলব আছে বলে মনে কবেছেন তা হল এই বাঙালি হিন্দু জাতীয়তাবাদেব একটা ঝোঁক, সে-সময়ে যতই ক্ষীণভাবে হোক, আত্মনিয়ন্ত্রণেব ঐক্যবদ্ধ ও সম্ভাবনাময় শক্তি অর্জনের দিকে, তাই বাংলাকে যদি টুকবো করে দেওয়া যায়, এবং বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে যে দূরত্ব ইতিমধ্যেই আছে, তাকে আবো প্রকট কবা হয়, তবে শাসকেবা 'নিবাপদ' হবে।

প্রথমে কিন্তু ইংরেজ-কর্তৃপক্ষ যা ভেবেছিল তা ঘটেনি। হিন্দু-মুসলমান একই সঙ্গে বঙ্গ ভঙ্গের প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিল। একই ভূখণ্ডের মানুষ হিসেবে এই সংহতিব বোধ যে খানিকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হবে তা স্বাভাবিক। বহিবঙ্গে হিন্দু-মুসলমানেব বিভিন্নতা যা-ই থাকুক, প্রতিবেশিত্বেব একটা সত্য তো ছিলই। প্রথমাবস্থায় স্বদেশকে এভাবে খণ্ডিত হতে দেখে আপামব মানুষই তাই বেদনা অনুভব কবেছে। কলকাতাকে কেন্দ্র কবে যে তীব্র আলোড়ন তা হয়তো প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু কলকাতাকে ছাড়িয়ে পূর্ববঙ্গেও যে তুলনীয় প্রতিবাদ ঘটবে তা বোধহয় ভাবা হয়নি। বস্তুত বঙ্গভঙ্গেব সিদ্ধান্ত যখন প্রথম কবা হয়, তখনই পূর্ববঙ্গে যে বিপুল-সংখ্যক হিন্দু সে-সময়েও বাস কবত তাবা তো বটেই, সেখানকাব বিভিন্ন অঞ্চলেব মুসলমানদেব কাছ থেকেও সম্মিলিতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তুমুল প্রতিবাদ শোনা গেছে।[৩]

কিন্তু অল্প কিছুকালেব মধ্যেই দ্রুত এই চিত্রটি পালটে যায়। বিশেষ কবে বঙ্গ-ভঙ্গেব পরে নতুন প্রদেশেব গঠন ও লক্ষ্য কী হবে, সে-সম্পর্কে যখন শিক্ষিত মুসলমানেবা জানতে পাবে এবং ইংবেজ-শাসকদের এই 'শুভ' পবিকল্পনা সাধাবণ মুসলমানদেব জানাতে পাবে। অবশ্য সাধারণ মুসলমান, যাবা সংখ্যাগবিষ্ঠ বললেও কম বলা হয়, তাবা তো বঙ্গ ভঙ্গেব ব্যাপাবে কখনোই মাথা ঘামায়নি। (বস্তুত কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত হিন্দু বাঙালিব নেতৃত্বে পবিচালিত এই আন্দোলনে দবিদ্র অশিক্ষিত হিন্দুবাই বা কতটা যুক্ত ছিল?) কিন্তু মুসলমান নেতাবা অধিকাংশই বঙ্গভঙ্গেব পক্ষে মতামত প্রকাশ কবতে থাকেন—বিশাল

জনসভা ও মিছিল করে, হিন্দুবিরোধী উত্তেজক পুস্তিকা ও বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। একটু অবাকই লাগে ভাষা ও ভূখণ্ডের বন্ধন কি এত তাড়াতাড়ি শিথিল হয়ে গেল? ইংরেজদের অভিপ্রায় সম্পর্কে যে সন্দেহ তা-ই ঠিক প্রমাণিত হল?

সত্যি বলতে কী, প্রথম পর্বে পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ প্রতিবাদের যে-কথা আমরা শুনি, তা বস্তুত পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দু জমিদার ও হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির অংশগ্রহণে ও নেতৃত্বে। কোনো-কোনো মুসলমান জমিদার ও স্বল্পসংখ্যক মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত (প্রধানত শহরকেন্দ্রিক) তাদেরই অনুপ্রেরণায় এই বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে বা বয়কট-স্বদেশি আন্দোলনে সোৎসাহে যোগ দিয়েছিল। কোনো-কোনো জায়গায় একই কারণে সাধারণ মুসলমানেরাও তাতে শামিল হয়েছিল, এই মাত্র। কিন্তু কখনো মুসলমান সভাপতি ও বক্তা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের এই সভাগুলি যে মূলত হিন্দুপ্রধান ও হিন্দুপরিচালিত, তা সে-সময়ের পত্রপত্রিকার বিবরণ থেকে বোঝা যায়।[৩]

তবে, এটা সবটাই সত্য তা নয়। এমন শিক্ষিত মুসলমানের কথাও আমরা জানি, যাঁরা এই পরিবর্তমান অবস্থাতেও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন, এমন সভাও ডাকা হয়েছে যেখানে মুসলমান বক্তারা অখণ্ড বঙ্গের পক্ষে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। 'দি মুসলমান' পত্রিকার পাতা ওলটালে টের পাওয়া যায় এরকমই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে সম্পাদকীয়তে বা পরিবেশিত সংবাদে। 'স্বদেশি বয়কটের 'শুভদিন' হিসেবে বঙ্গভঙ্গের বার্ষিকীতে শোভাযাত্রা, সভা, রাখিবন্ধন ইত্যাদিও পালিত হয়েছে ১৯০৭-এ ফরিদপুরে পাবনায় বরিশালে মাদারিপুরে রংপুরে খুলনায়, কিংবা ১৯০৮-এ পাবনায় ও ময়মনসিংহে। অবশ্য এই আয়োজনগুলির পেছনেও হিন্দুদের উপস্থিতি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু 'মহামেডান প্রোটেস্ট' বা 'মুসলমানের প্রতিবাদ'টাও স্পষ্ট।[৪]

কিন্তু পুরো ছবিটা দেখলে এ সবকেই নিতান্ত ব্যতিক্রম বলে মনে হবে। ইতিমধ্যেই বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে বেশির ভাগ মুসলিম নেতারা ও তাঁদের প্রভাবে চালিত হতে পারে এমন ব্যাপকতর মুসলিম জনগণ একত্র হয়েছে। তাদের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্যের একটা চাপ সবসময়ই কমবেশি ছিল, তাকে বাড়িয়ে তুলেছে, যতই সংখ্যাল্প হোক, আগন্তুক অবাঙালি মুসলমান অভিজাতদের মন্ত্রণা ও প্ররোচনা। যে বাঙালি মুসলমান আরবি-ফারসি জানে না, ইসলামের কোনো জ্ঞানই নেই, সে-ও প্রচারের ফলে আরবি-ফারসি বা অজানা ইসলামি প্রথা সম্পর্কে সম্ভ্রম ও আনুগত্য তৈরি করেছে। বাঙালি মুসলমানদের সর্বাঙ্গ থেকে বাঙালি-পরিচয় খসিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছে। "মিথ্যার জাল" তৈরি করে 'প্রমাণ' করতে চেয়েছে তুর্কি-মোঘল শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব।[৫] রাজনীতিতেও এ-সময়ে মুসলিম লীগের জন্ম (১৯০৬) এই মনোভাবকে শক্ত জমি দিয়েছে। বঙ্গভঙ্গের সমর্থন হয়েছে তারই একটি প্রধান কার্যক্রম।

অবশ্য মুসলমানদের এই প্রতিক্রিয়ার পেছনে হিন্দুদের ভূমিকাকেও দায়ী করা যায়। কারণ, স্বদেশি আন্দোলনের সূত্রপাতেই আমরা দেখেছি, যতই হিন্দুমুসলমানের সম্প্রীতির কথা বলা হোক, কলকাতাকেন্দ্রিক বয়কট বা বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচিতে এমন কিছু হিন্দুদের ধর্মীয় আচারের যোগ ঘটতে থাকে যা হয়তো ওই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করেছে,

কিন্তু তাতে আন্দোলনেব অসাম্প্রদাযিক চরিত্রও ক্ষুণ্ণ হযেছে। ১৯০৫ সালেই বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদীব কীর্তি 'বঙ্গলক্ষ্মীব ব্রতকথা'য যে 'লক্ষ্মী'ব কথা বলা হযেছে, তিনি অবশ্যই 'বাংলাব লক্ষ্মী', যুগপৎ হিন্দু ও মুসলমানেব লক্ষ্মী। কিন্তু বাংলাব লক্ষ্মী যখন 'বাঙালিকে দযা কবে' কালীঘাটেব 'মা-কালীতে' আবির্ভূত হন, এবং বিলেতি দ্রব্য বর্জনেব সঙ্গে-সঙ্গে অবন্ধন, ঘট-স্থাপন, সিঁদুব-ধাবণ, শঙ্খ-বাদন, হবীতকী ও সুপাবি হাতে ব্রতকথা শোনাব নির্দেশ আসে, তখন হিন্দুত্ববাদী প্রবণতাকে অস্বীকাব কবা অসম্ভব হযে পড়ে। ক্রমশ দেখি, স্বদেশি আন্দোলনেব একাংশ বিপ্লবী কর্মসূচিব দিকে গড়ায স্পষ্টত এই ধর্মীয উচ্চাবণ নিযেই। ববীন্দ্রনাথ যে আত্মশক্তিব সাধনাব সঙ্গে জড়িযে ওই আন্দোলনকে দেখেছিলেন, এমনকী তাঁব সেই পথেব পথিকেবাও অভিযুক্ত হযেছে ধর্মীয নির্ভবতা বা আনুগত্যেব জন্য—যদিও আমবা জানি, স্বদেশি আন্দোলনেব শ্রেষ্ঠ উপার্জন ববীন্দ্রনাথেব এই সমযেব ভাবনাই, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেব সংসর্গ বা বৈপ্লবিক লিপ্ততা কোনোটাই ছিল না। ববীন্দ্রনাথকে তাই অনেকসমযই কিছুটা আড়ালেই থাকতে হযেছে। আব মূল ধাবাব আবেগ হিন্দুধর্মেব অনুষঙ্গ বাহী উপমায উল্লেখে বাচনে কিংবা বৈপ্লবিক বাজনীতিব অকাল তীব্রতায 'বন্দেমাতবম্' ধ্বনিতে এতটাই ভবপুব থেকেছে যে, আন্দোলন-বিবোধীদেব সুবিধাই হযেছে এই আন্দোলনকে হিন্দুত্বেব বা বিপ্লববাদেব তকমা পবানোব। শাসক-ইংবেজদেব স্বার্থ ও হিন্দু-মুসলমান উভযেবই ধর্মীয বা বৈপ্লবিক এই ঝোঁক এক জাযগায এসে মিলেছিল এবং নষ্ট কবে দিতে পেবেছিল বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের আবহমান সম্পর্ককে।

হিন্দুদেব, বিশেষত উচ্চবর্ণ হিন্দুদেব স্বাভাবিক ছুঁতমার্গী প্রবণতা যে ছিল, তাব প্রমাণ আমবা অনেক আগে থেকেই তো পাই নিম্নবর্ণ হিন্দুদেব সঙ্গে তাদেব অমানবিক ব্যবহাবে। বাঙালি মুসলমানেবা যেহেতু মূলত সেই নিম্নবর্ণেব হিন্দুদেব থেকেই এসেছে, তাই বাঙালি মুসলমান বাঙালি হিন্দুব চোখে 'হীন' এবং তাদেব দ্বাবা দীর্ঘকাল ধবেই বঞ্চিত ও উপেক্ষিত, আর্থিক সামাজিক শিক্ষাগত সবদিক থেকে। হিন্দুবা অনেকেই তাদেব 'বাঙালি' বলে গ্রহণ কবে না, মুসলমানেবাও সেই পবিচযকে আমল দেয না। ববং বাঙালি হিন্দু সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক বিবোধ বা বিদ্বেষ মুসলমানদের মনে জমতে থাকে। গ্রামেব দবিদ্র কৃষক ছাড়া শহবেব যে-সব মুসলমান নিরুপায দাবিদ্র্যে কিংবা স্বেচ্ছাকৃত জেদে ইংবেজ-আমলেব শিক্ষা থেকে পিঠ ফিবিযে থেকেছে, তাবা বলা বাহুল্য ইংরেজ-আমলেব চাকবিবাকবি থেকেও অনেকটাই বঞ্চিত ছিল। কাবণ যা-ই হোক, হিন্দুদেব পাশে তাদেব এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাদপদতায তাবা খুবই বিক্ষুব্ধ ছিল। হিন্দু ও মুসলমানেব এই বিদ্বিষ্ট মনোভাবেবই পবিণতি সাম্প্রদাযিক দাঙ্গা, যা বঙ্গভঙ্গেব সময বাববাব ঘটতে থাকে দুই অঞ্চলেই। মযমনসিংহেব জামালপুবেব দাঙ্গা তাব কুখ্যাত উদাহবণ।

পক্ষান্তবে, বঙ্গভঙ্গেব প্রাক্কালেই মুসলমানদেব মনে এই আশা ঢুকিযে দেওযা হযেছিল যে, মুসলমানপ্রধান একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হলে বিভিন্ন সুযোগ তাদেব কবাযত্ত হবে, এবং হিন্দুপ্রাধান্য থেকে তাবা বেহাই পাবে। ইংবেজ-শাসকেবা এই প্রতিশ্রুতিকেই ক্রমশ কেন্দ্রবিন্দু করেছিল এবং বঙ্গভঙ্গ-সমর্থক মৌলবাদী মুসলমানেবা তাব প্রচাবে সহাযক

হয়েছিল। ঢাকাব নবাব সলিমুল্লাহ্ ও সদ্যপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগেব একটি বিরাট ভূমিকা ছিল এ-ব্যাপাবে। অনেকেই মনে কবেন, এই আঞ্চলিকতাব বোধ সঞ্চাবিত কবে দেওযাটাই বঙ্গভঙ্গেব সপক্ষে মুসলমানদেব জড়ো কবার ব্যাপারে সবচেযে বড়ো কাজ দিযেছে। (ঠিক যেমন পূর্ববঙ্গে জমিদাবি বা অন্যান্য সুযোগ হাত ছাড়াব সম্ভাবনায বঙ্গভঙ্গেব স্বভাব-বিবোধী হযেছিল সম্পন্ন হিন্দুবা)।

ইংবেজ-শাসকদেব প্রতিশ্রুতি এবং বঙ্গভঙ্গেব সমর্থক মুসলমান-নেতাদেব প্রত্যাশা যে সম্পূর্ণ অমূলক প্রমাণিত হযেছিল তা নয। এটা ঠিক, উনিশশতকেব শেষভাগ থেকেই বাঙালি মুসলমানদেব সংখ্যাই শুধু বাড়েনি, মুসলমান-সমাজে শিক্ষিতেব সংখ্যাও একটু-একটু কবে বাড়ছিল—তবু, শিক্ষার হাব, সহজেই অনুমেয, হিন্দুদেব তুলনায খুবই নগণ্য। বঙ্গভঙ্গেব পবে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম সবকাব শিক্ষাব উন্নযনেব ব্যাপাবে অনেকগুলো পদক্ষেপ নিযেছিল এবং তাতে বিভিন্ন স্তবে স্কুলেব সংখ্যা বা ছাত্র ও শিক্ষকদেব সংখ্যা বেশ কিছুটা বেড়ে যায। সবকাবি চাকুবিতে মুসলমানদেব নিযোগও বেশি হয, অন্তত হিন্দুদেব তুলনায়।[৭] ইংবেজ-শাসকদেব তাকে 'সর্বক্ষেত্রে উন্নতি' বলতেও বাধেনি এবং তাদেব মতে সে-উন্নতি বাণিজ্য আইনশৃঙ্খলা পবিবহণ নাবীশিক্ষা ইত্যাদি আবো নানা ক্ষেত্রে। এব পবিমাপ ও বিস্তাব নিয়ে সন্দেহ পোষণ কবলেও উন্নতি যে ঘটেছিল তা অস্বীকাব করেননি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকেরাও। মুসলমানদেব ফলাকাঙ্ক্ষা বেশ খানিকটা পূবণ হযেছিল।

তাই, ১৯১১-তে বঙ্গভঙ্গ বদ হওযাব আদেশে এতই আক্রান্ত বোধ কবেছিল তারা যে এ ধাবণা তাদেব মনে বদ্ধমূল হযেছিল, আন্দোলনের চাপে নয, হিন্দু উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত ও ইংবেজ-শাসকদেব যোগসাজশেই ঘটেছে এটা, যদিও একই সঙ্গে বঙ্গভঙ্গেব পোষক ইংরেজ বাজপুরুযেবা অনেকেই বিস্মিত ও আহত হয়েছিলেন এই আদেশে। আব এব ফলে বঙ্গ ভঙ্গ বদ হওযাব পবেব বছবগুলিতে ক্রমশই হিন্দু ও মুসলমানেব পাবস্পবিক অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ বাডতেই থাকল এবং তাব পরিণতিতে দাঙ্গা-সংঘর্ষ।

বঙ্গভঙ্গ বদেব ফলে হিন্দুদেব মধ্যে উল্লাস ও মুসলমানদের মধ্যে নৈবাশ্যেব যে বিববণ পাই, তা বলা বাহুল্য উভয সম্প্রদায়েবই সুবিধাভোগী শ্রেণিব মধ্যে। এ ব্যাপাবেও সাধাবণ মানুযেব কাছে তাব গুরুত্ব কতখানি ছিল তা খুবই সন্দেহজনক। জিল্লুব বহমান সিদ্দিকী একসময বলেছেন, "বঙ্গভঙ্গ বহিত হলে বাঙালি মুসলমান সমাজে গভীব নৈবাশ্য নেমে এসেছিল, এমন কোনো তথ্য আমাব জানা নেই", কাবণ "বাংলাব মুসলমান তখনও চাওযাব স্তবে পৌছোতে পাবেননি।"[৮] তবে বঙ্গভঙ্গেব সমযকালে (১৯০৫-১১) মুসলমানদেব জন্য মক্তব ও মাদ্রাসাব সংখ্যাবৃদ্ধি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উর্দু ও ফাবসি পড়াব ব্যবস্থাব সম্প্রসাবণ, আববি বিভাগ খোলা, ধর্মীয শিক্ষাব বিস্তাব, মসজিদ থেকে চাঁদা তুলে বিদ্যালয খোলা—এসব পন্থা বেশ জোবদাব হয। মুসলমান ছাত্রদেব বৃত্তি দিযে অতিবিক্ত উৎসাহ দান এবং মুসলমান কর্মকর্তা ও পবিদর্শক নিযোগ, ইত্যাদি ব্যবস্থাও চালু হয। এগুলোই প্রমাণ কবে, মুসলমানদেব বাঙালি-পবিচযকে রুদ্ধ কবাব পবিকল্পনা কীভাবে চলছে। মুসলমানদেব মধ্যে শিক্ষাব প্রসাব ও অর্থনৈতিক সুবিধাদানেব এই প্রক্রিয়া বঙ্গভঙ্গ

-বদেব পবেও অব্যাহত বইল। ফলে, সামগ্রিক ভাবেই এ-সময়ে মুসলিম উগ্র স্বাতন্ত্র্যবাদেব প্রসাব ঘটতেই থাকল।

৩

বাঙালি মুসলমানদেব সবাইকে অবশ্য কখনোই একটি পবিচযেব মধ্যে এনে ফেলা সংগত নয। একই সঙ্গে হিন্দুদেব সঙ্গে সম্পর্কে দূবত্ব যেমন, তেমনি নৈকট্যও ছিল সবসময। বিশশতকেব সূচনায মুসলমানদের মধ্যে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তেব জাগবণেব কথা বলা হয এবং যাব বিকাশ ঘটে বিশশতকেব প্রথমার্ধে, সেখানে হিন্দু-মুসলমানেব ঐক্যেব ভাবটাও যথেষ্টই ছিল। বাঙালি মুসলমানদেব মধ্যেও আববি-ফাবসি গ্রহণেব যে ঝোঁক বাববাবই মাথা চাড়া দিতে চায বাইবেব প্রভাবে, তাবা প্রতিবাদে ভিন্ন স্ববও শোনা যায। বাঙালি মুসলমান বাংলাভাযাকেও আঁকড়ে ধবাব কথা বলে। পোশাকে-আশাকে, চলনে-বলনে, প্রতিবেশীব সঙ্গে সহমর্মিতায একটা মিলই ববং চায। তাই তো এমন বলা হযেছে, জাতীযতাবাদী মুসলমান যাঁবা বঙ্গভঙ্গেব বিরুদ্ধে গিযেছিলেন, তাঁবা প্রায প্রত্যেকেই 'ব্যক্তিগত' চেতনায তাড়িত হযেই সেই দিকে গেছেন, কোনো সাংগঠনিক হাতছানিতে নয।[৯] এই ভাবেই অসাম্প্রদাযিক বাঙালি মুসলমানেব অস্তিত্ব অন্তত ব্যক্তিগত স্তবে অবশ্যই ছিল। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনেব সূচনাতে এই বাঙালি মুসলমানই তো আন্তবিকভাবে অংশ নিযেছিল বাঙালি হিন্দুদেব সঙ্গে একত্রে। তা বলে তারা যে মুসলমান-পরিচয ত্যাগ করে অসাম্প্রদাযিক হতে চেযেছে তা-ও নয। 'খাঁটি' মুসলমান হযেও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পথে চলা যে সম্ভব তাব অনুকূল মানসিকতাও দেখা গেছে। তাই মুসলমানেব অকপট কণ্ঠস্বব শোনা গেছে "ভাই হিন্দু, অগ্রে আমাদিগকে মুসলমান হইতে অবসবটুকু দাও, . তাবপব বাজনীতিক্ষেত্রে এক হইতে ডাকিও।"[১০]

১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধিতায় মুসলিম জনমতকে সংহত কবাব জন্যই প্রকাশিত হযেছিল 'দি মুসলমান' নামে পত্রিকা। কলকাতা থেকে বেব হলেও, এই মুখপত্র অখণ্ড বাংলাব মুসলমানদেব, বিশেযভাবে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদেব, আত্মসচেতনতাব দিকটিকে উন্মোচিত কবেছিল দীর্ঘকাল। আবদুব বসুল, মৌলবী মুজীবব বহমান, আবুল কাসেম, আবদুল হালীম গযনবী—দুই বঙ্গের এই কযেকজন প্রগতিমনা মুসলমানদেব উদ্যোগে প্রকাশিত হযেছিল। বঙ্গভঙ্গেব সময মুসলিম শিক্ষা, হিন্দুমুসলিম ঐক্য ও সহযোগিতা, মুসলিম সাম্প্রদাযিকতাব রোধ ইত্যাদি নিযে সংবাদ বা সম্পাদকীয বা নিবন্ধ নিবন্তব প্রকাশ কবে গেছে পত্রিকাটি। বঙ্গভঙ্গ বদ হওযাব পবেও ১৯৩৬ অবধি 'দি মুসলমান' এই ভূমিকা পালন কবে এসেছে—কেউ-কেউ প্রযাত হলেও বা পক্ষবদল কবলেও। কিন্তু এখানে হিন্দু-মুসলমানেব ঐক্যেব প্রসঙ্গটাই ঘুবেফিবে এসেছে, বাঙালি মুসলমানেব বাঙালি হিসেবে আত্মপ্রকাশেব প্রসঙ্গ কদাচিৎ। পত্রিকাব ভাযা ইংবেজি, লেখকেবাও সকলে বাংলায অভ্যস্ত এমন নয—যদিও আবদুল কবিম, সৈযদ এমদাদ আলী, বোকেযা সাখাওযাত হোসেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এস ওযাজেদ আলী, মোহাম্মদ ওযাজেদ আলী, আবুল মনসুব আহমদ, আবুল শামসুদ্দীনেব মতো ব্যক্তিবা এতে লিখেছেন বা আলোচিত হযেছেন।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন ও স্বদেশি আন্দোলন, এই দুযেবই ভেতব অনেক প্রসঙ্গ বা লক্ষ্য আছে। বঙ্গভঙ্গেব সমর্থন ও বিবোধিতা উভযেব মধ্যেই বযেছে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সাম্প্রদাযিক বা বাজনৈতিক নানা দৃষ্টিকোণ ও স্বার্থ। কিন্তু এসব ছাড়াও আবেকটি বডো দিককে সবচেযে আগে ধবতে হয। তা হল, বঙ্গভঙ্গেব ফলে বাঙালিব যে জাতিগত গর্ববোধ ও আবেগ আহত হযেছে, তাব কথা। বঙ্গভঙ্গেব বিরুদ্ধে ১৯০৪-এব ১৮ মার্চ কলকাতাব টাউন হলে যে প্রথম প্রতিবাদী সভা ডাকা হযেছিল, তাতে জানানো হযেছে বাঙালিব বীতি ও আচাব ব্যবহাব সম্পর্কে শাসকদেব সম্পূর্ণ অজ্ঞতাব ফলেই শুধু মনে কবা যায, এই প্রতিবাদ নিছকই "অলস ভাবালুতা"—ইংবেজবা বুঝতে পাবেনি কীভাবে বাঙালি "জাতিগতভাবে, ভাষা বিচাবে, এবং সামাজিক দিক থেকে' আঘাত পেতে পাবে।[১১] বাঙালিব এই জাতি হিসেবে যে আবেগ ও গর্ববোধ তাকে হিন্দুদেব আবেগেব সঙ্গে এক কবে দেখা হযেছে। অনেক মুসলমানই যে সেই আবেগকে অনুভব কবতে পাবে না তা-ও সত্যি, বিশেষ কবে যাবা অবাঙালি কিংবা যাবা বাঙালি হযেও তাদেবই প্রভাবে বাঙালি-পবিচয জানে না বা মানে না। কিন্তু পূর্ববঙ্গে সেই আবেগেব শবিকও যে অনেকে ছিল তাবও তো প্রমাণ আছে। ১৯০৭-এ ফরিদপুবেব মুসলমান উকিল বা খানপাবাব মুসলমান জমিদাব 'মুসলিম প্রতিবাদ' হিসেবেই জানিযেছেন : কলকাতা বাঙালিব শিক্ষা মনন সংস্কৃতিব 'সুস্থ' কেন্দ্র—তা থেকে নতুন প্রদেশেব বিচ্ছিন্নতা বাংলাব প্রগতির ওপব একটা বড়ো আঘাত।"[১২]

অবশ্যই, 'বঙ্গেব অঙ্গচ্ছেদে'ব কাবণে বাঙালিব এই যে বেদনাবোধ, বাঙালি হিসেবে তাব আহত আবেগ ও গর্ববোধ, তাব সঙ্গে একটা গভীব যোগ আছে বাঙালিব আত্মপবিচযেব শিকড সন্ধানেব। তাবই অন্তঃসাবকে চেনা যায বযকট-আন্দোলন বা স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র কবে বাঙালিব পবিচিত অনুষ্ঠানগুলিব উদ্‌যাপনে—প্রভাতফেরি, সংগীতমুখব শোভাযাত্রা, বাখিবন্ধন ইত্যাদিতে। তাব অনুষঙ্গে বচিত ববীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলাল বা বজনীকান্তেব গানে। বিভিন্ন যাত্রায বা নাট্যে। এই উপলক্ষে লেখা অজস্র কবিতায, গল্পে, প্রবন্ধে। এই সবকিছুব মধ্যে স্বদেশি আন্দোলনে নিহিত বাঙালিব আবেগ ও আত্মবোধেব সবকটি দিকই। স্বদেশি আন্দোলনেব সঙ্গে এই যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বদেশ-সন্ধান তাব ইশাবা পাওযা গিযেছিল সামান্য কিছু আগেই। প্রধানত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিযে সংগঠন গড়াব ভাবনাতেই তাব সূত্রপাত উনিশশতকেব শেষে, আব যাত্রা শুরু স্বদেশি আন্দোলনেব প্রায সমকালে।

১৯০২-এ প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয সাহিত্য পবিষৎ এবং ১৯০৫-এব স্বদেশি আন্দোলন সমযেব ব্যবধান খুব সামান্যই। স্বদেশি আন্দোলনেব স্মবণীয দিনগুলিতেই বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিব গবেষণাব যে উজ্জ্বল কর্মকাণ্ড চলেছিল তাব সূত্রেই তো বলা যায, এটা ছিল এই পবিষদেব গৌববময অবদানেব কাল, বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী ও ব্যোমকেশ মুস্তাফি-ব পবিচালনায ও ববীন্দ্রনাথেব অনুপ্রেবণায। বঙ্গীয সাহিত্য পবিষৎ-এব একজন প্রধান সংগঠক ব্যোমকেশ মুস্তাফিই তো ছিলেন 'স্বদেশী সমাজ'-এব অন্যতম পবিকল্পক।[১৩] পবিষৎ ও স্বদেশি আন্দোলন,

দুইকেই ছুঁয়েছিলেন যে-ববীন্দ্রনাথ, এবং যেভাবে, তাঁকে ধবেই চেনা যায তাদেব ভাব ও লক্ষ্যেব সমান্তবালতা। বাঙালিব আত্ম-আবিষ্কাব ও আত্ম-প্রতিষ্ঠাব চেতনা উভযেব মধ্যেই বিবাজমান, যদিও তাদেব ক্ষেত্র একেবাবেই ভিন্ন। বলা বাহুল্য, সাহিত্য পবিষৎ-এব প্রধান এলাকা ভাষা ও সাহিত্য। কিন্তু ভাষাব 'ছাঁদ' এবং সর্বাঙ্গীণ পবিচযেব মধ্যেই তো সেই ভাষা যাবা বলে তাদেব জাতি-পবিচয। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব মধ্য দিযেই, ববীন্দ্রনাথেব কথায, 'বাঙালিব চবিত্র'। সেই চবিত্রকে খুঁজে বেব কবাই সাহিত্য পবিষৎ-এব 'ব্রত'। পবিষৎ-এব গৃহপ্রবেশেব উৎসবে ববীন্দ্রনাথ তাঁব ভাষণে তাই একে বলেন 'বাংলাদেশেব আত্মপবিচযেব চেষ্টা'। ভাষা বা সাহিত্যই শুধু নয, তাব সঙ্গে সংলগ্ন বাংলাব পুবাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভৌগোলিক-তত্ত্ব, পল্লি ও লোকসংস্কৃতি—এককথায বাঙালিব সংস্কৃতিব সম্পূর্ণ অবযব দেখতে ও গড়তে চায বঙ্গীয সাহিত্য পবিষৎ।

কিন্তু, এ-সূত্রেও একটা বড়ো প্রশ্ন ওঠে, অবযবেব একটি প্রধান দৃশ্য বা তাব দ্রষ্টা যদি গবহাজিব থাকে, তবে কি ব্রত সম্পূর্ণতা পাবে? তাই, আজ ইতিহাস লিখতে গিযে লক্ষ কবা যায, "সাহিত্য পবিষদেব ক্রিযাকলাপে মুনশী আবদুল কবিম সাহিত্য বিশাবদ বা গফুব সিদ্দিকিব ভূমিকা ও দান সত্ত্বেও মুসলমান সাহিত্যসেবীদেব কাছে বঙ্গীয সাহিত্য পবিষৎ জনপ্রিয হযনি।"[১৪] 'সাহিত্য পবিষৎ কার্যবিববণী'ব 'নিবেদন'-এ বলা হযেছে "অধুনা সকল ক্ষেত্রেই মুসলমান স্বীয অধিকাব সপ্রমাণ কবিবাব জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ কবেছেন। কিন্তু এই মাতৃমন্দিবেব সেবাযেৎ শ্রেণীভুক্ত হইবাব আগ্রহেব এত অভাব দেখা হয কেন?" কিংবা "বঙ্গভাষাব উন্নতিতে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান উভযেবই সমান স্বার্থ ও অধিকাব। শিক্ষিত মুসলমানগণ কেন যে পবিষৎকে তাহাদেব কৃপা হইতে বঞ্চিত কবিযাছেন, তাহা বুঝিতে পাবিতেছি না।"[১৫] কিন্তু, শুধু দোযাবোপ কবলেই চলে না, মুসলমান সাহিত্যসেবীবা সেখানে শনাক্ত কবেছিলেন 'হিন্দুযানিব ছোঁযাচ', ভাষাব ব্যাপাবে এক ধবণেব আধিপত্য।[১৬] যে-কাবণে ববীন্দ্রনাথ কলকাতাব ভাষাব সার্বজনীনতা মেনে নিযেও বলেন, "ঢাকাতেই যদি সমস্ত বাংলাব বাজধানী হইত তবে এতদিনে নিশ্চযই ঢাকাব লোকভাষাব উপব আমাদেব সাধাবণ ভাষার পত্তন হইত।"[১৭] এটা তো বাঙালি মুসলমানদেবও মনে হতেই পাবে। এব পেছনে আছে একটা অনিবার্য আঞ্চলিকতাব বা স্বাতন্ত্র্যেব বোধ, শুধু অর্থনৈতিক বা সামাজিক দিক থেকেই নয, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও— যে-আঞ্চলিকতাব তাড়নায বঙ্গভঙ্গবিবোধী আন্দোলনেও চিড় ধবেছিল।

১৯২৫-২৬-এব বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব ছাত্র-সম্মিলনীতে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পবিষৎ থাকা সত্ত্বেও "বাংলাব নিভৃত কোণে গুপ্ত" বাঙালি উপাদানকে প্রকাশ্য কবাব অসমাপ্ত কাজে আহ্বান জানিযেছিলেন—এতে মনে হয একটা অভাববোধ তাঁব মধ্যেও ছিল। তখনও "বঙ্গীয মুসলমানেব সাংস্কৃতিক বিকাশেব প্রশ্নগুলি" স্বতন্ত্রভাবে ওঠেনি, কিন্তু "শহীদুল্লাহ্-ব মনে সেই জিনিসগুলি যে কাজ কবেছিল তাব সুপ্ত ইঙ্গিত হযতো তাঁব উক্ত ভাষণেৰ মধ্যে বযেছে।"[১৮] ১৯৪৭-এব দেশভাগেব পবে দেখতে পাই, পূর্ববঙ্গে বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদেব আদলে বাংলা একাডেমী গড়াব কথা তাই প্রথম থেকেই উঠেছে।

৪

বঙ্গভঙ্গ বদ হওযাব ঘটনায উঁচুতলাব মুসলমানেবা যে প্রকাশ্যতই বিচলিত হযেছিল তাতে সন্দেহ নেই। সে-সমযের অনেক সভা ও ডেপুটেশনেব বিববণ থেকে তা বোঝা যায।[১১] এব ফাঁকে দিল্লিতে বাজধানী স্থানান্তবিত হওযাব মধ্য দিযে কলকাতা ও সেই সূত্রে সমগ্র বাঙালিব ক্ষমতা যে খর্বিত হল, সে-বিষযে উভয সম্প্রদাযই অন্যমনস্ক ছিল বলেই মনে হয। বিক্ষুব্ধ মুসলমানেব উত্তেজনা প্রশমিত কবাব জন্য তাদেব স্বার্থ-সংবক্ষণেব যে প্রতিশ্রুতি দেওযা হল ইংবেজ-শাসকদেব পক্ষ থেকে, তাব মধ্যে প্রধান ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেব স্থাপন। একেই তাবা নিজেরাই বলেছে 'চমৎকাব ক্ষতিপূবণ'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব এক্তিযাবকে খর্ব কবাব জন্য এটাও হিন্দু-মুসলমানেব মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি কবেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয প্রস্তাবিত হযেছিল ১৯১২-তে, বঙ্গভঙ্গ বদ হওযাব এক বছব পবে—আব তা রূপ পেল ১৯২১-এ। তখনও মুসলিম-স্বাতন্ত্র্যকে প্রশ্রয দিযে হিন্দু-মুসলমানেব বিভেদই যে ইংবেজবা বজায বাখতে চায, এমনকী এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেব মধ্যে দিযেও, তাব প্রমাণ বিশ্ববিদ্যালযেব প্রথম কোর্ট-মিটিঙে ইংবেজ ভাইস-চ্যান্সেলব হার্টগ বললেন, "ইসলামেব ইতিহাস ও ঐতিহ্যেব অধ্যযনই এই বিশ্ববিদ্যালযেব অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে।"[২০] সৌভাগ্যের বিষয, তা হযনি—জ্ঞানবিজ্ঞানেব বহু আধুনিক বিষযই বিশ্ববিদ্যালযেব পাঠ্যতালিকাব অন্তর্ভুক্ত হল। তবে প্রথমাবস্থায মুসলমান ছাত্রবা এই উচ্চশিক্ষা কতদূর গ্রহণ কবেছিল সন্দেহ। বঙ্গভঙ্গ বদেব ক্ষতিপূবণ হিসেবে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয পবিকল্পিত হযেছিল, তখনই পূর্ববাংলাব মুসলমানদেব এক প্রতিনিধিদল তৎকালীন ভাইসরয লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে দেখা করে বলেছিল পূর্ববঙ্গেব মুসলমানদেব বিপুল সংখ্যাগবিষ্ঠ অংশই তো কৃষিজীবী, বিশ্ববিদ্যালযেব প্রতিষ্ঠায তারা অল্পই উপকৃত হবে।"[২১] যতই স্তোকবাক্য শোনানো হোক তাদেব, প্রথম পর্বে সত্যিই মুসলমান ছাত্রেব সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু ক্রমশই মুসলমান ছাত্রদেব সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকল এবং তাবা এক ধাপ কবে-কবে কৃতিত্বেব সোপানে উঠল—তাব চমৎকাব বিববণ দিযেছেন পববর্তীযুগেব প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক আবদুব বাজ্জাক। কাবণ, ইতিমধ্যেই, "বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রথম মহাযুদ্ধ এবং দ্বিতীয মহাযুদ্ধেব পূর্বকালীন অবস্থা, কলকাবখানাব বৃদ্ধি, কৃষিজাত পণ্যেব চাহিদা, পাটেব মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কাবণে পূর্ববঙ্গে মধ্য এবং উচ্চ কৃষক যেমন তৈরি হযেছে, তেমনি তাদেব সন্তানবা স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালযে আসতে শুরু কবেছে।"[২২]

মনে বাখতে হবে, বঙ্গভঙ্গ বদ হওযাব পবে পূর্ববঙ্গে তখন মৌলবাদ ক্রমশই দানা বাঁধছে—ইসলাম ধর্মেব প্রভাব ও মুসলিম লীগেব বাজনীতিব প্রতাপ ক্রমশই বাড়ছে। এমনকী একসমযেব বঙ্গভঙ্গেব বিবোধী জাতীযতাবাদী মুসলমানেবাও অনেকে (যেমন আবদুব বসুল, মওলানা মোহাম্মদ আকবম খাঁ) স্থানবদল কবে ওইদিকে ঝুঁকেছে।[২৩] মুসলিম নেতাদেব নিজেদেব মধ্যে অন্তর্কলহ থাকলেও, মুসলিম-পবিচযেব একান্ত নির্ভবতায কোনো ফাঁকি নেই। কিন্তু, এবই মধ্যে, ১৯২৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয ও ঢাকা ইন্টাবমিডিযেট কলেজেব কযেকজন তরুণ শিক্ষক ও ছাত্র গড়ে তুললেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। প্রথম উদ্যোক্তা হিসেবে যাঁদেব নাম পাওযা যায, তাঁরা হলেন আবুল হুসাইন, কাজী মুতাহাব হুসাইন ও কাজী আবদুল

ওদুদ। ১৯২৭ থেকে বেবোল তাঁদেব বার্ষিক মুখপত্র 'শিখা'। তখন তো, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, মুসলমানদেব প্রায় সব পত্রপত্রিকাবই নাম ছিল আববি-ফাবসিতে ও ধর্মীয ব্যঞ্জনাযুক্ত। কিন্তু 'শিখা'-ব নামকরণে বাঙালি মানসটা লক্ষ কবেছেন মুস্তাফা নূবউল ইসলাম।[২৪] 'শিখা'-ব প্রকাশক ছিলেন আবদুল কাদিব। আব সম্পাদনায কালক্রমে আবুল হুসেন, কাজী মোতাহাব হোসেন, মোহাম্মদ আবদুব বশীদ ও আবুল ফজল। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এব ঘোষিত 'মন্ত্র' ছিল 'বুদ্ধিব মুক্তি'। কাজী আবদুল ওদুদেব ভাষায "বুদ্ধিব মুক্তি অর্থাৎ বিচাববুদ্ধিকে অন্ধসংস্কাব ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তি দান। বাংলাব মুসলমান সমাজে (হযতো বা ভাবতেব মুসলমান সমাজে) এ ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপাব। কিন্তু সেদিন বিস্ময়কব হযেছিল বাংলাব শিক্ষিত মুসলমানদেব উপব এব প্রভাব—একটি জিজ্ঞাসু ও সহৃদয গোষ্ঠীব সৃষ্টি সম্ভবপব হযেছিল এব দ্বাবা।"[২৫] কিংবা " 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' সেই দিনে বাংলাব শিক্ষিত মুসলমানদেব উপবে উল্লেখযোগ্য প্রভাবই বিস্তাব কবেছিল—তবে কোনো স্থাযী প্রভাব বিস্তাব কবতে পেবেছে কি না জানা যাবে ভবিষ্যতে। বাংলাব জাগবণেব একটি অপেক্ষাকৃত-অল্প-পবিসব কিন্তু বেগবন্ত ধাবা যে এই দল বাংলাব মুসলমানদেব মধ্যে অল্প কিছু কালেব জন্য প্রবাহিত হতে পেবেছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।"[২৬] মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এব প্রভাবেব যে সম্ভাবনাব আশা ব্যক্ত কবেছিলেন ওদুদ, তা-ই যেন শোনা যায পববর্তীকালে · "বাংলাদেশেব অনেকেই এখন মনে কবেন, দেশভাগেব পব ঢাকাকে কেন্দ্র কবে পূর্ববঙ্গে বাঙালি মুসলমানেব মুক্তমনেব যে নতুন একটা সমাজ গড়ে উঠতে শুরু কবল তাকে সেই বিশেব দশকেব 'বুদ্ধিব মুক্তি' আন্দোলনেবই উত্তবাধিকাব বলা যেতে পাবে।"[২৭] 'শিখা' বেবিযেছিল মাত্র পাঁচ বছব—পত্রিকাব প্রচাব বা পাঠকসংখ্যাও ছিল সীমাবদ্ধ। যদিও পূর্ববাংলাব এই জাগবণকে ভাবতেব জাগবণেব সঙ্গেই এক কবে দেখতে চেযেছিলেন তাঁবা, তবু পাঁচটি সংখ্যাব তালিকা থেকে বোঝা যায বাঙালি মুসলমানেব আত্মপবিচযই কীভাবে সামনে উঠে এসেছে। এ প্রসঙ্গেই স্মবণীয কযেকটি প্রবন্ধেব নাম কাজী আবদুল ওদুদেব 'বাঙালী মুসলমানেব সাহিত্য সমস্যা' ও 'বাঙ্‌লাব জাগবণ', আনোযারুল কাদিবেব 'বাঙালী মুসলমানেব সামাজিক গলদ', নাজিবউদ্দীন আহমদেব 'মুসলিম জাগবণ', আবুল ফজলেব 'তরুণ আন্দোলনেব গতি', সৈযদ আবদুল ওযাহেদেব 'বাঙ্‌লায পীবপূজা', বকীবউদ্দীন আহমদেব 'বাঙালী মুসলমানেব আর্থিক সমস্যা', আবুল হুসেনেব 'বাঙালী মুসলমানেব শিক্ষা সমস্যা', কাজী মোতাহাব হোসেনেব 'সঙ্গীতচর্চায মুসলমান', আবদুল কাদেবেব 'বাংলাব লোকসঙ্গীত' ইত্যাদি।

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) থেকে দেশভাগ (১৯৪৭) পর্যন্ত বিশশতকেব প্রথমার্ধ বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমানেব জাগবণেব কাল যেমন, তেমনি বাঙালি সত্তাকে স্বেচ্ছায বিসর্জন দেওযাবও কাল। বাঙালি মুসলমানেব একটা বিবাট অংশ বাঙালি হিন্দুদেব কাছ থেকে ক্রমশই দূবে সবে গেল শুধু তা-ই নয, অবাঙালি মুসলমানেব সঙ্গে আত্মীযতা স্থাপন কবতেও চাইল। অবশ্য এই প্রক্রিযা শুরু হযেছিল আগেই, উনিশশতকেব শেষে আলিগড-আন্দোলনেব সমসাময়িক কালে। বঙ্গভঙ্গ মুসলমানেবা নিজেবাই চেযেছিল এমন তো নয, কিন্তু বঙ্গভঙ্গেব ঘোষণাতেই তাদেব

চাওযাটা তৈবি হল এবং ততই বাঙালি-পবিচযকে অস্বীকাব কবাব জমিটা চওডা হল। হিন্দু-মুসলমানেব বিচ্ছেদকে আবো পাকিযে তুলে দফায-দফায সাম্প্রদাযিক দাঙ্গা ও চূডান্ত দেশভাগেব মধ্য দিযে মুসলমানদেব বাঙালি-পবিচযকে প্রায সম্পূর্ণ অবাস্তব কবে দিতে সফল হল ব্রিটিশবাজ।

কিন্তু, বলবাব কথা এখানে এটাই, এই বিরূপ কঠিন সমযেও বাঙালি-পবিচযেব গৌবব নিযেই কেউ-কেউ সক্রিয ছিলেন, সংখ্যায তাঁবা যতই নগণ্য হোন। 'বুদ্ধিব মুক্তি' আন্দোলনেব অনেক আগে থেকেই তাব শুরু ও তাব ধাবাবাহিকতা। মুস্তাফা নূবউল ইসলামেব লেখা থেকে কযেকটি উদ্ধৃতি দিই :

ক "আমবা বাংলা দেশেব কথা বিশদরূপে বুঝি। বাঙালি বলিযা নিজেদেব পবিচয দিযা সন্তুষ্ট হই। সহস্র বৎসব যে দেশে বাস কবিযা আসিতেছি, যাহাব শীত গ্রীষ্ম, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য দুর্ভিক্ষ, সুখ সম্পদ, হর্ষ বিষাদ সমভাবে ভোগ কবিযা আসিতেছি, সে আমাব স্বদেশ নহে, তাহাব বাহিবে আবাব আমাব এক নিজেব দেশ আছে, এ কথাও কেহ মনে কবিতে পাবে না।" (বেওযাজ অল দিন আহম্মদ, 'প্রচাবক', আষাঢ ১৩০৭, ১৯০০)।

খ "আমাদেব পূর্বপুরুষ আবব, পাবস্য, আফগানিস্তান অথবা তাতাবেব অধিবাসীই হউন আর এতদ্দেশবাসী হিন্দুই হউন, আমবা এক্ষণে বাঙালি, আমাদেব মাতৃভাষা বাংলা।" (হামেদ আলী, 'বাসনা', বৈশাখ ১৩১৬, ১৯০৯)।

গ "বাঙালিকে, বাঙালিব ছেলেমেযেকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও /এই পবিত্র বাংলাদেশ/বাঙালিব—আমাদেব।/বাংলা বাঙালিব হোক। বাংলাব জয হোক।/বাঙালিব জয হোক।" (কাজী নজরুল ইসলাম, 'বাঙালীব বাংলা', 'নবযুগ', ৩ বৈশাখ ১৩৪৯, ১৯৪২)।

ঙ "আমবা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তাব চেযে বেশি সত্য আমবা বাঙালি। এটি কোনও আদর্শেব কথা নয, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজেব হাতে আমাদেব চেহাবায ও ভাষায বাঙালিত্বেব এমন ছাপ দিযেছেন যে, তা মালা-তিলক টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি দাডিতে ঢাকবাব জো টি নেই।" (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতিব ভাষণ, ৩১ ডিসেম্বব ১৯৪৮)[৮]।

আবদুল হক বলেছেন এস ওযাজেদ আলী-ব কথা—যিনি তাঁব মতে "সর্বপ্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদী।" তাঁব মধ্য দিযেই সেদিনকাব ভাবুক বাঙালি মুসলমানদেব দুই দিকেব টানটা বোঝা যায এবং বোঝা যায তাব উত্তবণও। একদা যিনি "ধর্মেব উপব প্রতিষ্ঠিত কালচাবে"ব সপক্ষে ওকালতি কবেছিলেন, তিনিই অনতিবিলম্বে (১৩৩৭ শ্রাবণ, ১৯৩০) বললেন, "বাংলার গৌবব, বাংলাব স্বাতন্ত্র্য, বাংলাব বিশেষত্ব হচ্ছে আমাদেব সাধনাব বিষয" এবং "এই আদর্শে বাঙালি মুসলমান যেদিন দীক্ষিত হবে সেদিন হিন্দু-মুসলমানেব বিবোধেবও সমাপ্তি ঘটবে।" ১৯৪০-এ এসে ওযাজেদ আলী 'ভবিষ্যতেব বাঙালী' গ্রন্থে আবো এগিযে এসে ব্যক্ত কবলেন এই বিশ্বাস, আবদুল হকেব ভাষায, "বাংলাভাষাব সহাযতায অখণ্ড জাতিগঠনই বাঙালিব নিযতি।"[৯]

১৯৪০-এ লাহোর-প্রস্তাবের পরই বাঙালি মুসলমান লেখকেরা অনেকেই নেমে পড়েন সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানবাদী সাহিত্য সৃষ্টিতে। ১৯৪২-এ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি', তারপর ১৯৪৩-এ 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ', ১৯৪৪-এ 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলন'—এইভাবে রাজনীতিতে তো বটেই, সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতেও পাকিস্তানবাদী দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসন, কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, মোহাম্মদ আবদুল হক—এঁরা প্রত্যেকে বাংলা ভাষার বদলে উর্দু কিংবা বড়ো জোর উর্দু-মিশ্রিত পুথিসাহিত্যের বাংলা চালু করার কথা বললেন। সেই সঙ্গে বললেন, বাংলা সাহিত্যের 'হিঁদুয়ানি' সুর পালটে 'প্রবল ইসলামি ভাব' আনতে হবে। পাকিস্তান সৃষ্টির সমস্ত পরিবেশ ছেয়ে গেল এই বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি বিমুখ চেতনায়। এ সময় আমরা বারবার গোলাম মোস্তাফা বা সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের কথা শুনেছি, 'নওবাহার' পত্রিকার কথা শুনেছি। অবশ্য, তখনও বলা বাহুল্য এমন তো কেউ ছিলেনই, যাঁরা মুসলমান-পরিচয় ও বাঙালি-পরিচয়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য রাখতে চেয়েছেন এবং ব্যক্তিগতের পরিধিতে তা হয়তো রাখতেও পেরেছেন—কিন্তু পাকিস্তানবাদী ভাবনার চাপ এতই প্রকট ছিল যে, পরবর্তীকালে যাঁরা মত পালটেছেন বা এমনকী প্রগতির শিবিরে যোগ দিয়েছেন, তাঁদেরও অনেকে এ-সময়ে হিন্দুবিরোধিতার নামে বাংলা-বিরোধিতার পথ নিয়েছেন। অনেকের কাছেই বাংলাভাষা উহ্য হয়ে গেছে, বাঙালি-পরিচয় অবাস্তর হয়ে গেছে কিংবা আড়ালে চলে গেছে। এ সময়ের অজস্র পাকিস্তানবাদী রচনায় তার সাক্ষ্য আছে।[৩]

৫

বাংলাভাষা ও বাঙালি-পরিচয় যে সত্যিই শেষপর্যন্ত আড়ালে যেতে পারে না, তার প্রমাণ পাওয়া গেল, ১৯৪৭-এর দেশভাগের মাত্র কয়েক মাস পরেই, পাকিস্তানবাদী পরিবেশের মধ্যে বাংলাভাষার অবলম্বন ও বাঙালি-আত্মপরিচয়ের অধিকার একটা প্রবল বিক্ষোভের সূত্র হয়ে দাঁড়াল। খাম-পোস্টকার্ড বা ছাপানো টাকায় বাংলা ব্যবহার না করার ব্যাপারটাই হয়ে উঠতে পারল বাঙালির আত্মসম্মানবোধ ঘা খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তারপর তো ১৯৪৮-এর ও ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলন সমস্ত পরিবেশটাকেই দিল বদলে। হিন্দু-মুসলমানেরই মিলিত এই আন্দোলন—তবু তারই মধ্যে নবজাগ্রত শিক্ষিত মুসলমানদের, ছাত্রদেরই প্রধানত, যে জঙ্গি ভূমিকা তা এর আগে কখনো দেখা যায়নি—এমনকী তা আন্দোলিত করেছে গ্রাম ও শহরের সাধারণ মুসলমানকেও। বাঙালি-পরিচয়কে যেন ফিরিয়ে এনেছে ভাষা-আন্দোলন। যা অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছিল তারই পুনরুদ্ধার। হয়তো আরো উঁচু স্তরে। বাঙালি-আত্মপরিচয় উন্মেষের পুরোনো ইতিহাস মনে পড়ে যাওয়াও সম্ভব। বঙ্গভঙ্গের সমকালীন জাগরণে মুসলমানদের যে প্রায়-অনুপস্থিতি তা নিয়েই তো যত গোলমাল—এবারের এই আত্মপরিচয় আবিষ্কারের সুবর্ণ মুহূর্তে সেই ধর্মীয় বিচ্ছেদ বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ধারাবাহিকতার এই তুলনা-প্রতিতুলনাতেই বলেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, "প্রবল একটি জাতীয়তাবাদী

আন্দোলন ঘটে গেছে ১৯০৫-এব বঙ্গবিভাগের পবে”, কিন্তু তাতে “মুসলমানদেব দূবত্ব ছিল শ্রেণীব ও সম্প্রদাযেব”, আব “বাযান্নতে যে-জাতীযতাবাদী আন্দোলনেব সূচনা তাতে ধর্ম ছিল না।”[১১]

ভাযা-আন্দোলন অবশ্য বাহান্নতেই শেয নয, তাব পবিধি বাহান্নকে ছাপিযে চলে গেছে একাত্তবে। বাংলাভাযাব প্রতিষ্ঠাব দাবি থেকে ক্রমশই অন্য দাবিদাওযাব আন্দোলনে, স্বাধিকাবেব আন্দোলনে, শেয পর্যন্ত স্বাধীনতাব আন্দোলনে। বাহান্নব একুশে ফেব্রুযাবি স্মবণীয হযেছে পবেব বছবগুলিতে পালিত বার্যিকীতে, তাকে কেন্দ্র কবে বাঙালি-আত্মপবিচযে ঋদ্ধ হওযাব সংকল্পে।

বছবেব পব বছব এই উপলক্ষে ভাযা-আন্দোলন অন্য মাত্রা পেতে থাকে—সাবা বাস্তা জুড়ে বাঙালিব আলপনায, বাঙালিব শোভাযাত্রায, বাঙালিব পুষ্পস্তবকে ও গানে। অবশ্যই ববীন্দ্রনাথেব গান, এবং বিস্মযকবভাবে তাতে প্রাধান্য পায বঙ্গভঙ্গেব সমযে বচিত সেই বিখ্যাত গানগুলি। সন্‌জীদা খাতুন স্মৃতিচাবণে লেখেন, “মনে পড়ে, উনিশ-শো তেযট্টি সালে একুশে ফেব্রুযাবিব সময বাংলা একাডেমীব বটমূলে কী অসাধাবণ সংবেদন সৃষ্টি কবেছিল ‘আমাব সোনাব বাংলা, আমি তোমায ভালোবাসি’ গান। এ গান ববীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন সেই কতদিন আগে, উনিশ-শো পাঁচ সালে। ভাযা-আন্দোলনেব পবিপ্রেক্ষিতে, মাযেব মুখেব বাণী যে সন্তানেব কানে সুধাব মতো লাগে সে-কথা নতুন তাৎপর্যে প্রাণ পেল।”[১২] তাঁব ওই লেখা থেকেই জানতে পাবি, ভাযা-আন্দোলন আব ববীন্দ্রানুসবণ কীভাবে এক হযে আছে বাংলাদেশে। আব তাই “বঙ্গভঙ্গেব প্রতিবাদজনিত আন্দোলন যুগেব লেখা” গানগুলি কীভাবে বাংলাদেশেব সে-সমযেব “বাঙালিব স্বাধিকাব প্রতিষ্ঠাব আন্দোলনকে বিশেয জোবালো কবেছে।” কীভাবে ‘ও আমাব দেশেব মাটি’ ‘নিশিদিন ভবসা বাখিস’ ‘আমি ভয কবব না, ভয কবব না’ ইত্যাদি “অনেক আগে লেখা গান আবাব ফিবে এলো।”

বাংলা ভাযা ও বাঙালিব আত্মপবিচয প্রতিষ্ঠাব এই আন্দোলনে স্বদেশি যুগেব আবো অনেক অনুযঙ্গই হযতো আসে বাংলাদেশেব হিন্দু-মুসলমানেব মিলিত উদ্যোগে। দৃষ্টান্ত হিসেবেই বলা যায, স্বদেশি আন্দোলনেব সমান্তবালে বঙ্গীয সাহিত্য পবিযৎ-এব যে কর্মকাণ্ড, যাতে মুসলমানদেব অংশগ্রহণেব অনুপস্থিতি নিযে খেদ কবা হযেছিল, তাবই তুলনীয প্রণোদনা যদি পঞ্চাশ বছব পবে পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশেব একাডেমী প্রতিষ্ঠায ও সাধনায খুঁজে পান কেউ?

১৯৪৮-এব ৩১ ডিসেম্বব ঢাকায অনুষ্ঠিত পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনেব মূল সভাপতি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছিলেন “বাংলা ভাযাব বাজনৈতিক সম্ভাবনা ও উপযোগিতা”ব কথা, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালিব বাঙালি হিসেবে সত্যপবিচযেব কথা এবং তাবই জন্য গড়তে চেযেছিলেন একটি একাডেমী বা পবিষদ্।[১৩] সেই বাংলা একাডেমী-ই তৈবি হল ভাযা-আন্দোলনেবই গৌববজনক সাফল্যেব প্রমাণ হিসেবে—১৯৫৫-এব ৩ ডিসেম্ববে, পাকিস্তানেব প্রথম সংবিধান গৃহীত হওযাব অল্প আগে। ভাযা-আন্দোলনেব ঠিক পবেই শিক্ষিতমহলে ও সংবাদপত্রে একাডেমীব দাবি উঠেছিল, কিন্তু পাকিস্তানেব বাজনীতিতে

তা অত সহজ হয়নি—অনেক রাজনৈতিক ওঠাপড়া ও সাংগঠনিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে অবশেষে তা রূপ পেল। বস্তুত যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার মধ্যেই ছিল তার দাবি এবং স্বায়ত্তশাসিত এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন আবু হোসেনের নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে। একাডেমীর লক্ষ্য ও কার্যক্রম দেখে অনেকেরই স্বভাবত মনে হয়েছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর কথা। ১৯৫৩-তে শহীদুল্লাহ্ বলেছিলেন, "এই বাংলা সাহিত্য নিকেতন বলিতে আমি বুঝি কলিকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র ন্যায় বরং তদ্-অপেক্ষা উন্নততর ও ব্যাপকতর একটি প্রতিষ্ঠান।" বলা বাহুল্য, পূর্ববঙ্গের এই বাংলা একাডেমীতে, খানিকটা যেন প্রাক্তনের ঘাটতি পূরণের জন্যই, বাঙালি মুসলমানের চাহিদা ও দায়ের ওপর বেশি জোর পড়বে তা তো খুবই সংগত এবং পড়েছেও তা-ই। ১৯৫৭ থেকে একাডেমী প্রকাশিত গ্রন্থ কিংবা 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা'র সূচিপত্র দেখলেই এই ঝোঁক এবং তার ব্যাপকতা স্পষ্ট হয়। মুসলমান লেখক ও তাঁদের রচনা, ইসলামি বা আরবি-ফারসি উপাদান, গবেষণা-সংগ্রহ অনুবাদ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাঙালি-পরিচয়ের এই অল্প-আলোচিত দিকগুলো উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে একটা বড়ো জোর পড়েছে আঞ্চলিকতার ওপর—পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা, লোকসাহিত্য ও লোকসংগীত, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদিতে। বাঙালির স্বদেশসন্ধান বা আত্মসন্ধান যে এতে পূর্ণতর রূপ পেল তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তুলনাটা বোধহয় সে-কারণেই এখানে প্রাসঙ্গিক।

শুধু বাংলা একাডেমী-ই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও এই স্বদেশসন্ধানের চেষ্টায় অনেক কাজ করেছে—তার বিবরণী আমরা পাই। ১৯৬৩-র 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' ছিল "ঢাকার একটি সাড়া জাগানো উৎসব" এবং সেখানে অবহেলিত মুসলমান লেখকদের পক্ষে বলতে গিয়ে এই মনোভাবও প্রকাশ পেয়েছে, "তাই বলে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে আমরা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার কবলে পড়তে চাই না।" কিংবা আরো যে-সব প্রতিষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল—যেমন 'সংস্কৃতি সংসদ', 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ', 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমী', 'ছায়ানট', 'নজরুল একাডেমী' ইত্যাদি—সেখানেও নানারকম কাজকর্মের মধ্য দিয়ে বাঙালির প্রতিরোধী সাংস্কৃতিক পরিচয় ঘোষিত হয়েছে। দেশভাগের পর থেকেই বেশ কয়েকটি সাহিত্য-সম্মেলন বা সাংস্কৃতিক সম্মেলনেও বাঙালির সেই একই আত্মপ্রকাশ। ১৯৪৮-এর ঢাকার 'পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে'র কথা তো আগেই হয়েছে। ১৯৫১-তে চট্টগ্রামে এবং ১৯৫২-য় কুমিল্লায় যে 'পূর্বপাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে প্রগতিশীল বামপন্থীদের ভূমিকা ছিল অনন্য। কোনো-কোনো সম্মেলনে আবার ইসলামি ভাবধারা ও পূর্ববাংলার বাঙালির স্বতন্ত্র সংস্কৃতির একটা সমন্বয়ের কথাও উঠেছিল। তবে, সবকে ছাপিয়ে গুরুত্ব পেয়েছিল ১৯৫৭-য় টাঙ্গাইলের কাগমারিতে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলন, মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে ও প্রেরণায়—"এত ব্যাপক ভিত্তিক আর কোনো সাংস্কৃতিক সম্মেলন বাংলাদেশে হয়নি"—যার সম্পর্কে আবু জাফর শামসুদ্দীন বলেছেন, "বাঙালি জাতির যৌথ উদ্যমে ও আয়োজনে শত শত বৎসর ব্যাপী গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে সৃজিত বাঙালির আলাদা জাতীয় সত্তা ও

সংস্কৃতিব প্রতি বহির্বিশ্বেব বাজনৈতিক দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ কবে কাগমাবি সাংস্কৃতিক সম্মেলন।’’[৩৭]

তবে, এই উপার্জন শুধু বিশ্ববিদ্যালয বা একাডেমীব চাব দেযালেব মধ্যেই নয—জ্ঞানবিজ্ঞান ও ভাষাসাহিত্যেব মুক্তচর্চা ও সৃজনকর্মেও। বিশেষ কবে এ-সময়ে বাঙালিব আত্মপবিচযেব সন্ধানে যে অজস্র লেখালেখি হতে থাকে পূর্বপাকিস্তানে, তা প্রায তুলনাহীন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী মোতাহাব হোসেন, আবুল ফজল, মুহম্মদ এনামুল হকেব কথা তো আমবা আগে থেকেই জানি, তাঁবা তখনও লিখছেন। এব পবেও, বিশেষত ভাষা-আন্দোলন ও পববর্তী বিভিন্ন আন্দোলনকে ঘিবে, নবীন-প্রবীণ বহু লেখক নবজাগ্রত এই বাঙালি-সত্তাব জন্ম-স্ফূর্তি, বিকাশ-বিবর্তন, সংকট-সমাধান নিযে ভাবনাচিন্তা কবেছেন, অজস্র লেখা লিখেছেন—বেশ বোঝা যায বাংলাদেশেব আত্মসচেতন বুদ্ধিজীবীবা তাকে একটা দায বলেই গ্রহণ কবেছেন। অসম্পূর্ণতাব ঝুঁকি নিযেও নাম কবা যায · আবু জাফব শামসুদ্দীন, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্, মুহম্মদ আবদুল হাই, আবদুল হক, আহমদ শবীফ, সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, জিল্লুব বহমান সিদ্দিকী, আহমদ বফিক, বদরুদ্দীন উমব, ওযাহিদুল হক, সিবাজুল ইসলাম চৌধুবী, বোবহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আনিসুজ্জামান এবং আবো অনেকে—তাঁদেব আলোচনা-পদ্ধতি বা সিদ্ধান্তে যে পার্থক্যই থাকুক। এ সবই পাকিস্তান-আমলে বাংলাদেশেব বাঙালিব আত্ম-অনুভবেব শক্ত জমি। এই অনুভব তো সঞ্চাবিত হযেছেই বাজনীতিতে ও বাজনৈতিক আন্দোলনে, পববর্তী স্বাধিকাবেব ও পূর্ণ স্বাধীনতাব স্পৃহায। বাঙালি জাগবণেব এই উন্মোচন টেব পেযে পাকিস্তানেব শাসকেবা ক্রমশই বাঙালি-পবিচযকেই ভয কবতে শুরু কবেছে, বাঙালি-পবিচযেব যা কিছু প্রকাশ তাবই বিরুদ্ধে তাই তাবা বিমুখ, কখনো-কখনো আক্রমণাত্মক—তা সে ববীন্দ্রসংগীত কিংবা বাংলা নববর্ষ কিংবা বাংলাভাষাব চর্চা যা-ই হোক। এবং, বলা বাহুল্য, তাদেব সমর্থক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানও অন্তর্ঘাতমূলক কাজ কবে চলে—কখনো ইসলামি সাংস্কৃতিক সম্মেলন বা সাহিত্য সম্মেলন ডেকে, কখনো বাংলা ভাষা বা অক্ষবেব সংস্কাব প্রস্তাবে, কখনো ববীন্দ্রসংগীতেব বা ববীন্দ্রনাথেবই বিরুদ্ধে ফতোযা প্রচাবে। তথ্য হিসেবে উল্লেখ কবা যায, সৈযদ আলী আহসান বা খাজা শাহাবুদ্দীনেব নেতৃত্বে ববীন্দ্রবিবোধিতায উদ্যত ৪০ জন বুদ্ধিজীবীব এবং তাব চেযেও বেশি মওলানা আকরম খাঁ-ব নেতৃত্বে ৩০ জন মওলানাব বিবৃতি তো এসমযেই। পাকিস্তান-শাসকেবা নিবন্তব ইন্ধন জুগিযে গেছে তাদেব। ইংবেজবা যেমন ১৯০৫-এব বঙ্গভঙ্গে ও ১৯৪৭-এব দেশভাগে চেযেছিল বাঙালি মানস যাতে খণ্ডিত হয হিন্দু-মুসলমানেব বিভাজনে—তেমনি পাকিস্তান-আমলে শাসকবা চেযেছে মুসলমানদেব মধ্যেই বাঙালি-পবিচয ও পাক-পবিচযেব একটা বিভেদ-বেখা টানতে। পাকিস্তানিবা তখন সবসময শঙ্কিত থাকত, বাঙালি মুসলমানেবা তাদেব মধ্যেকাব এই বিভেদকে কাটিযে, বাঙালি-আত্মপবিচযে বলীযান হযে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম শুরু না কবে। কিন্তু তাদেব সেই শঙ্কা ও সতর্কতা ইতিহাসেব অবশ্যম্ভাবিতাকে ঠেকাতে পাবেনি।

ভাষা-আন্দোলনে বাঙালি-সত্তা আবিষ্কাবেব যে অভিযান শুরু হযেছিল, পাকিস্তান-পর্বেব ইতিহাসে তা উনসত্তবেব গণ-অভ্যুত্থানে ও একাত্তবেব মুক্তিযুদ্ধে পৌঁছোল যেন অনিবার্যভাবেই।

ভাষা-সচেতনতা থেকে জাতিসচেতনতা ও জাতিমুক্তিব সংগ্রামে। ঠিক এরকম মাত্রায উত্তরণ আব কোথাও কখনো ঘটেছে বলে মনে হযনি অনেক ঐতিহাসিকেবই। এই যুদ্ধে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, অন্তর্কলহ আছে—কিন্তু 'বাঙালি' হিসেবেই বা 'বাঙালি' পবিচযেই এতজন মানুয একসঙ্গে যুদ্ধ কবেছে শেযপর্যন্ত। তা ছাড়া যতই ভাবতেব সশস্ত্র বাহিনীব নিযন্তাব ভূমিকা থাকুক, বাঙালি এই মাপেব যুদ্ধ কবেছে এই প্রথম, তাব সাফল্যও অভাবিত। আবদুল হক তাই তাঁব অসামান্য দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলেন .

"বহুকাল বাংলাদেশেব মাটিতে যুদ্ধ হযনি, এবং বহুকাল আগে সংঘটিত যুদ্ধে প্রধানত বাঙালিবা অস্ত্র ধবেনি। সেই বাঙালি যুদ্ধ কবেছে একাত্তর সালে। ব্যাপ্তি, তীব্রতা এবং সমগ্র জনসমাজেব অংশগ্রহণেব দিক দিযে বাঙালিব ইতিহাসে এব তুলনা নেই। আব এ-যুদ্ধ বাঙালি কবেছিল অধিকতব সশস্ত্র শিক্ষিত অভিজ্ঞ বাহিনীব বিরুদ্ধে, সবকিছু জেনে-শুনে। শিক্ষা অস্ত্র অভিজ্ঞতা সবই ছিল তাব স্বল্প, কিন্তু সংগ্রামী ঐক্য, দৃঢতা এবং তীব্রতা বাঙালিব সমগ্র ইতিহাসে অতুলনীয, এবং বুঝি তাব চেযেও বড়ো কথা—অভাবনীয। এই ছিল বাঙালিব নবজন্ম, এ-জন্ম আমবা সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ কবেছি। এই যুদ্ধেব আগে বিশ্বসমাজে বাঙালিব পবিচয ছিল না। জাতি হিসাবে এবং বিপ্লবী সংগ্রামী হিসাবে বিশ্বসমাজে বাঙালিব এই প্রথম পরিচয।"[৩৮]

৬

বঙ্গভঙ্গবিবোধী আন্দোলন/বযকট-আন্দোলন/স্বদেশি আন্দোলন বাঙালিকে পৌঁছে দিযেছিল এক নতুন আত্মসচেতনতায—কিন্তু শেয পর্যন্ত হিন্দু বাঙালিকে যেভাবে, সেভাবে মুসলমান বাঙালিকে নয। সিবাজুল ইসলাম চৌধুবী তাকেই বলেছেন মুসলমান মধ্যবিত্তেব মধ্যে "পালটা একটা আত্মসচেতনতাব সূত্রপাত"[৩৯]। আত্মসচেতনতাব এই দ্বিমুখীনতাই বাড়িযে দিল হিন্দু-মুসলমানেব ব্যবধান এবং নিযে গেল অবিবাম সাম্প্রদাযিকতায। বঙ্গ-ভঙ্গ চালু কবে এবং বদ করে বাঙালিকে জব্দ কবার যে-খেলা খেলতে চেয়েছে ইংবেজ-কর্তাবা তাতে ছিল তাবই প্রশ্রয। বঙ্গভঙ্গেব বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে হিন্দু-মুসলমান বাঙালিব যে-মনোভাব ছিল বাঙালি হিসেবে, সেই বাঙালি-মন এতই খণ্ডিত যে তা জোড়া লাগে না সহজে, অথচ তাবই প্রযোজন ছিল সবচেযে বেশি। ববং, দেখা যায, সেই মন ক্রমশই আবো খণ্ডিত হযেছে, বিকৃত হযেছে। ১৯৪৭-এব দ্বিতীয বঙ্গভঙ্গ তাবই অপ্রতিবোধ্য পবিণাম। কিন্তু দেশভাগেব পবে, পাকিস্তানেব আমলে, মুসলমান বাঙালি টেব পেযেছে বাঙালি-পবিচয ছাড়া অন্য সব পবিচযেব অসাবতা। তখনই শুরু হল নিজেদেব বিরুদ্ধে নিজেদেবই লড়াই, এক সমযেব 'পালটা আত্মসচেতনতা'ব বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গেব বাঙালিব লড়াই—বাঙালিব 'সুস্থ' আত্মপবিচযেব উন্মোচন। এর তাগিদ ও সাফল্য যতটা তাদেব ততটা বোধহয এপাবে নয। আব সেই বাঙালি-আত্মপবিচয নিযে ভাষা-আন্দোলনে, একাত্তবেব আগেব আন্দোলনগুলিতে বিভিন্ন দৃষ্টিব ও স্বার্থেব বাজনীতিবও সমন্বয সম্ভব হযেছে। মুজিবুব রহমানেব অবিসংবাদী নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধেব যে সাফল্য, তাব পেছনেও বাঙালি-আত্মপবিচয়েব আবেগই ছিল। মুজিব তাঁব ভাযণে বা বাজনৈতিক আচবণে

তারই সাক্ষ্য বেখেছেন। মওলানা ভাসানী ও মুজিবুব বহমান একসঙ্গে লড়াই কবেছেন তারই নির্ভবতায। নানা শিবিবেব জাতীযতাবাদী বা সাম্যবাদী দল এবং মানুযও তা-ই। এবই মধ্য দিযে পাকিস্তান-পর্বে বাঙালিব গণসংস্কৃতি একটা প্রতিবাদী চবিত্র পেল সৃজন ও কর্মসচলতাব নানা ক্ষেত্রে। দেশভাগেব আগে কলকাতাব যে প্রভাব এড়ানো যেত না, তা থেকে বেবিযে এসে বিভিন্ন নির্মাণ ও সংগঠনেব স্বকীযতা স্পষ্ট হযে উঠল। তাবই প্রকাশ এই বিভাগোত্তব পর্বেব বাঙালিব চিত্রভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, সংগীতে এবং অবশ্যই সাহিত্যে। পশ্চিমপাকিস্তানেব আধিপত্যে তাব বিকাশ ও বিস্তাব বাববাব ঘা খায, বাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পবাধীনতা সবকিছুকে আচ্ছন্ন কবতে চায়—তবু, বাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তা থেকে মুক্তি পাওযাব আকাঙ্ক্ষা ও সক্রিযতাও প্রকাশ পায। যে-সাম্প্রদাযিকতার চাপে পাকিস্তানেব জন্ম অনিবার্য হযেছিল, সেই সাম্প্রদাযিকতা দূব হযনি ঠিকই, কিন্তু পাকিস্তান-আমলেই ক্রমশ সাম্প্রদাযিকতামুক্ত সংস্কৃতিব একটা নিজস্ব চেহাবাও তৈবি হল। বাহান্নব ভাষা-আন্দোলন থেকে একাত্তবেব মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত লড়াইযেব প্রেক্ষাপটে এই ধর্মনিবপেক্ষ ও অনন্যপর বাঙালি-আত্মপবিচযের চেতনা হযে উঠল বাঙালিব জাগবণেবই একটা শক্ত ভিত, নতুন বাঙালি-সংস্কৃতিবই অঙ্গ। স্বাধীন বাংলাদেশেব জন্ম তাবই ওপব ভব করে।

সূত্র নির্দেশ

১ 'মধ্যযুগেব বাংলা সাহিত্যে মুসলিম', আজহাব ইসলাম। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২। পৃ ৬১, ৯৩, ১০৪, ১২৪।

২ 'বাংলাব বিদ্বৎসমাজ', বিনয ঘোষ। প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ৪র্থ সং ২০০০। পৃ ১১৯।

৩ 'বাংলাব মুসলিম সম্প্রদায', সুফিযা আহমদ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২। পৃ ১২৬-২৯।

৪ '১৯০৫ সালেব বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিযা', মুনতাসীব মামুন। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯। 'দি বেঙ্গল টাইম্‌স' ও 'ঢাকা প্রকাশ' থেকে সংকলিত সংবাদ, চিঠি, সম্পাদকীয।

৫ *Selections from the Mussalman 1906–1908* ed Bhuiyan Iqbal Papyrus Kolkata 1994

৬ 'ভাষা সংস্কাবেব নামে বাঙালী সত্তায চিব ধবানোব প্রযাস', আহমদ শবীফ। উৎস 'বাঙালি ও বাংলাদেশ', সম্পা অরুণ সেন ও আবুল হাসনাত। নযা উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৯। পৃ ৬৬।

৭ 'বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী চিন্তা ও কর্ম', ইমবান হোসেন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩। পৃ ৩৫-৪৫।

৮ 'বাঙালীব আত্মপবিচয ও অন্যান্য প্রবন্ধ', জিল্লুব বহমান সিদ্দিকী। গ্লোব লাইব্রেবি, ঢাকা, ১৯৯১। পৃ ১৫৮।

৯ *The Swadeshi Movement in Bengal* Sumit Sarkar PPH New Delhi 1973 p 440

১০ 'বাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান', মুন্‌শী লেহাজউদ্দীন আহ্‌মদ। 'নবনূব', আষাঢ় ১৩১২ (১৯০৫)। উৎস 'খিব বিজুবী', 'সমসামযিকেব চোখে বঙ্গভঙ্গ', ফেব্রুযাবি ২০০৫।

১১ *Partition of Bengal Significant Signposts 1905-1911* ed Nityapriya Ghosh & Ashoke K Mukopadhyay Sahitya Samsad Kolkata 2005 p 37

১২ সূত্র ৫। p 110–11
১৩ সূত্র ৯। p 346
১৪ 'চিন্তাব চালচিত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ (১৩০০-১৩৩০)', গৌতম ভদ্র ও দীপা দে। 'সাহিত্য-পবিষৎ পত্রিকা', শতবর্ষপূর্তি স্মাবক সংখ্যা, জানুযাবি ১৯৯৭।
১৫ সূত্র ১৪।
১৬ সূত্র ১৪।
১৭ 'বাংলা শব্দতত্ত্ব', ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব। বিশ্বভাবতী, কলকাতা, ১৩৯১ (১৯৮৪-৮৫)। পৃ ১১।
১৮ 'বাংলা একাডেমীব ইতিহাস', বশীব আল্‌হেলাল। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬। পৃ ৭।
১৯ সূত্র ৩। পৃ ১৫৩-৫৫।
২০ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয ও পূর্ববঙ্গীয সমাজ', সবদাব ফজলুল কবিম। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩। পৃ ১৩২।
২১ সূত্র ৩। পৃ ১৫৪।
২২ সূত্র ২০। পৃ ১৩৩।
২৩ 'বাংলাব বাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকবম খাঁ', এ টি এম আতিকুব বহমান। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫। পৃ ১৪।
২৪ 'শিখা সমগ্র', সম্পা মুস্তাফা নূবউল ইসলাম। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩। পৃ ছয-সাত।
২৫ 'নিবেদন', 'শাশ্বত বঙ্গ', কাজী আবদুল ওদুদ। উৎস সূত্র ২৪। পৃ সাত।
২৬ 'বাংলাব জাগবণ', কাজী আবদুল ওদুদ। বিশ্বভাবতী, কলকাতা, ১৩৬৩ (১৯৫৬-৫৭)। পৃ ১৯৬।
২৭ 'কাজী আবদুল ওদুদ এক অন্তহীন যাত্রা', মিলন দত্ত। উৎস 'বাংলাব মুসলমানেব কথা', কাজী আবদুল ওদুদ। মৃত্তিকা, কলকাতা ২০০২। পৃ ১১।
২৮ 'বাংলাদেশ, বাঙালী-স্বরূপেব সন্ধান', মুস্তাফা নূবউল ইসলাম। উৎস 'সেবা সুন্দবম্', সম্পা মুস্তাফা নূবউল ইসলাম। ইউ পি এল, ঢাকা, ২০০৪। পৃ ৩১-৩২।
২৯ 'একজন বাঙালী জাতীযতাবাদী', আবদুল হক। উৎস 'নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ'। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪। পৃ ৮২।
৩০ 'ভাষা-আন্দোলন সাহিত্যিক পটভূমি', হুমাযুন আজাদ। ইউ পি এল, ঢাকা, ১৯৯০।
৩১ 'শেখ মুজিবেব অঙ্গীকাব', সিবাজুল ইসলাম চৌধুবী। উৎস 'নির্বাচিত প্রবন্ধ'। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯। পৃ ২৪৪-৪৫।
৩২ 'স্বাধীনতাব অভিযাত্রা', সন্‌জীদা খাতুন। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪। পৃ ৩৪-৩৫।
৩৩ সূত্র ১৮। পৃ ৯।
৩৪ সূত্র ১৮। পৃ ২০।
৩৫ 'পূর্ববাংলাব সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন', বেজোযান সিদ্দিকী। বাংলা এডাকেমী, ঢাকা, ১৯৯৬। পৃ ২৮০-৮১।
৩৬ সূত্র ৩৫। পৃ ২৩৫।
৩৭ সূত্র ৩৫। পৃ ২২৭।
৩৮ 'আত্মহত্যাব আগে', আবদুল হক। উৎস 'নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ'। সূত্র ২৯। পৃ ১৩২।
৩৯ 'বাঙালীব জাতীযতাবাদ', সিবাজুল ইসলাম চৌধুবী। ইউ পি এল, ঢাকা, ২০০০। পৃ ১৭৩।

স্বদেশ-সংগীত : ফিরে দেখা

অরুণকুমার বসু

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দেব বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র কবে বাংলা দেশে যে বাজনৈতিক আন্দোলনেব সূচনা হয, বঙ্গভঙ্গ-বহিত হওযাব ঘোষণাতে তাব সমাপ্তি হযনি। তখন থেকেই দেখা দিল বিদেশি বস্ত্রবর্জন আন্দোলন। তাব আনুষঙ্গিক সন্ত্রাসবাদ ধীবে ধীবে জাতীয বাজনৈতিক ইতিহাসে প্রকাশ্যে গোপনে আপন পথ কবে নিতে শিখল। এই পর্যাযেব নামই হয 'স্বদেশী যুগ'। 'স্বদেশী গান' বঙ্গভঙ্গকালীন গানকেই বলা হয। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায সম্পাদিত 'ভাবতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী'-ব যে তৃতীয সংস্কবণটি আমাদেব দেখা, তাতে নানা শ্রেণীব গানেব মধ্যে একটি বিযযেব পরিচয

"জাতীয সঙ্গীত-উদ্দীপনা ও শোচনাসূচক, বিবিধ, মুদ্রাশাসন আইন, জন্মভূমি, বঙ্গভাষা, দিল্লি দববাব, নব্যবঙ্গেব প্রতি, ভিক্টোবিযাব প্রতি, জাতীয মহাসমিতি সম্বন্ধে—ইত্যাদি।"

পুবনো দিনেব বাংলা গানের একাধিক সংকলনেই স্বদেশ ভাবনাশ্রিত গানকে 'জাতীয় সঙ্গীত' শব্দেই চিহ্নিত করা হত। 'স্বদেশী গান' শব্দটি বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনেবই ফসল। পরবর্তী সমযে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব পূর্ববর্তী আমলেব গানকেও 'স্বদেশী গান' শীর্ষক সংকলনে ঢুকিযে 'স্বদেশী গান' ও 'দেশাত্মবোধক গান' দুই অভিধাকে সমার্থক কবে তোলা হয়েছে। এতে সাধাবণ শ্রোতা বা পাঠকেব কিছু এসে যায না, কিন্তু ইতিহাসমনস্ক গবেষক বা সমাজবিজ্ঞানেব ছাত্রের কাছে ইতিহাস চেতনার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশেব বাতাববণ তৈবি করে দেওযা হয।

বঙ্গভঙ্গ-ঘটনাব প্রতিক্রিযায মধ্যবিত্ত বাঙালিব যে বাজনৈতিক তৎপবতা দেখা দিযেছিল, দেশাত্মবোধক গান তাকে অনেকটাই উশকে দিযেছিল। তাবই জেবে তখন থেকেই শুধু স্বদেশ ভক্তিব গানেব সংকলন প্রকাশেব একটা হিড়িক পড়ে যায। যেন, গানই সেই আন্দোলনেব জপমন্ত্র, গানই সে উত্তেজনাব পাথেয। স্বাধীনতা অর্জনেব সময় পর্যন্ত এই দেশাত্মবোধক গীতি-সংকলনের বীতিটি অব্যাহত ছিল; বঙ্গভঙ্গেব উত্তেজনা যেমন ববীন্দ্রনাথ থেকে শুরু কবে অখ্যাত গীতিকাবকে গীতিবচনায় প্রবোচিত কবেছিল, পববর্তী সমযের স্বদেশি আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ভাবত ছাড়ো আন্দোলন সেই রকম গানেব ধাবাকে কল্লোলিত কবে তোলেনি। শুধু মুকুন্দদাস ও নজরুল এই দুই প্রতিভা দেশাত্মবোধনে গানেব ভূমিকাকে নতুন কবে জাগিযে দিযেছিলেন। অবশ্য বঙ্গভঙ্গ পর্বেব পব থেকে দেশচেতনার চরিত্রেরও কমবেশি পবিবর্তন ঘটেছিল। সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী বহু আঞ্চলিক আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে অজস্র আঞ্চলিক স্বদেশি গান বচিত হযেছিল, যা তেমনভাবে সংগৃহীত বা সংকলিত হযনি। দেশপ্রেম শব্দটিব সংজ্ঞা ও উপলব্ধি ধীবে ধীবে পালটে গেছে। ইংরেজ শাসকদেব চাপিযে দেওযা কোনো দণ্ডনীতি বা অন্যাযের বিরুদ্ধে গণ অসন্তোযেব স্ফুলিঙ্গ সাম্রাজ্যবাদেব বিরুদ্ধে শোষিত বঞ্চিতেব গর্জমান সংগ্রামে পবিণত হযেছে। ফলে, স্বদেশি গান উত্তীর্ণ হযেছে গণসংগীতে।

সে অন্য ইতিহাস। তবে বাংলা ‘স্বদেশী গান’, ‘দেশপ্রেমেব গান’, ‘মুক্তিব গান’ এইসব নিযে যাঁবা শৌখিন গবেষণা কবেন, বাণিজ্যমুখী সংকলন করেন, তাঁদেব কাছে এই বিযযে কোনো বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদী ধাবণা আশা কবা যায না।

বঙ্গভঙ্গ-সমকালীন ও পববর্তী কযেক দশকেব মধ্যে উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংকলিত ‘বাংলাব গান’, নব্য ভাবত সমিতি প্রকাশিত জাতীয ‘বাখী সঙ্গীত’, যোগীন্দ্রনাথ সবকাব সম্পাদিত ‘বন্দে মাতবম্’, উপেন্দ্রনাথ দাস সংকলিত ‘জাতীয সঙ্গীত’, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রকাশিত ‘স্বদেশ গাথা’, সান্যাল অ্যান্ড কোং প্রচাবিত ‘সোনাব বাংলা’, হেমচন্দ্র সেন সম্পাদিত ‘মাতৃগাথা’, নবেন্দ্রকুমাব শীল প্রকাশিত ‘স্বদেশী সঙ্গীত’, যোগেন্দ্রনাথ শর্মা প্রকাশিত ‘স্বদেশ সঙ্গীত’, বজনীকান্ত পণ্ডিত প্রকাশিত ‘স্বদেশী পল্লীসঙ্গীত’, এইচ বসু প্রকাশিত ‘মাতৃপূজা’, হীবালাল সেনগুপ্ত প্রকাশিত ‘হুঙ্কাব’, নলিনীবঞ্জন সরকাব প্রকাশিত ‘বন্দনা’, অরুণচন্দ্র গুহ প্রকাশিত ‘অর্ঘ্য’, অমবেশ কাঞ্জিলাল প্রকাশিত ‘মুক্তিবাণী’, প্রতিমা বসু ও সাধনা বসু সম্পাদিত ‘রুদ্রবীণা’, সতীশচন্দ্র সামন্ত প্রকাশিত ‘মুক্তিব গান’, অক্ষযশঙ্কব দাশগুপ্ত সম্পাদিত ‘দেশেব গান’, বসন্তকুমাব চট্টোপাধ্যায সম্পাদিত ‘স্ববাজ সঙ্গীত’, দুর্গামোহন সেন প্রকাশিত ‘সাধন সঙ্গীত’—অসংখ্য দেশাত্মবোধক গীতি সংকলনেব মধ্যে মাত্র কযেকটিব উল্লেখ কবা হল। তবে এই তালিকা আবও দীর্ঘ এবং কেবল এই সংকলনগুলি নিযেই স্বতন্ত্র গবেষণা কবা যায।[১]

২

‘প্যাট্রিযটিজম’ শব্দটি একদা ন্যাশনালিজম্-এব প্রতিশব্দ রূপে ছিল নিত্য ব্যবহার্য।[২] তখন আমবা ইংবেজ প্রভুত্বে দাস জীবন যাপন কবতাম। আব তাবই অন্যতম শর্তে পবাধীনতা থেকে মুক্তিব স্বপ্ন আমাদেব কাবও কাবও নিদ্রায জাগবণে বিবাজ কবত। জাতীয শৃঙ্খল-মোচনেব সেই আদি আকাঙ্ক্ষা থেকেই জন্ম নিয়েছিল দেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ, দেশাত্মবোধ, স্বদেশ চেতনা ইত্যাদি ভাবেব বিকল্পে ‘প্যাট্রিযটিজম’ শব্দটি। তাবই বাংলা পবিবর্ত ‘দেশপ্রেম’ শব্দটিও আমাদেব স্বাধীনতা অর্জনেব সঙ্গে সঙ্গে আবেগহীন একটি ধ্বনিতে পবিণত হযেছে। ঔপনিবেশিক দেশমাত্রেবই এই পবিণতি। পবাধীন দেশেব ক্ষেত্রে বাজা-প্রজা প্রভু-ভৃত্য সম্রাট-দাস জাতীয দ্বান্দ্বিক অভিধা বক্তে ক্ষোভ ও অপমানেব তবঙ্গ তুলত। সেই বাষ্ট্রিক বিবোধমূলক সম্পর্কেব অবসান ঘটলে তবেই সেই ক্ষোভেব অবসান ঘটবে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকবা স্বাধীনতা বা আত্মকর্তৃত্বের অধিকাব দিযে অর্থনৈতিক শাসনকে অন্যভাবে চিবস্থাযী কবে তোলে, তখনও তা আমাদেব জানা ছিল না। ববং তথাকথিত স্বাধীন দেশেব নাগবিক হযে প্রভু-ভৃত্যেব পুবনো দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পাবাব আনন্দেই আমবা অধীব হতাম। তাই সশস্ত্র বিপ্লবেব দ্বাবা মুক্তি অর্জনেব চেযে আবেদন-নিবেদনেব পথে কোনোমতে আত্মকর্তৃত্বেব অধিকাব পাওযাব নেশাতেই নেতৃত্বেব একাংশ বিভোর ছিলেন।

ঔপনিবেশিক দেশেব দেশপ্রেমেব সবচেযে সফেন আবেগ ছিল তাব স্বদেশি গান। তাকে

আমবা যতই বলি 'মুক্তিব গান', 'শৃঙ্খল মোচনেব গান', 'দেশ চেতনাব বজ্রকণ্ঠ', আসলে তা অনেকটাই নিশ্চেষ্ট অসংগঠিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদাযেব অসহাযতাব আর্তনাদ, অপাবগতাব আত্মসান্ত্বনা। সে গান বচিত হয দেশমৃত্তিকাব প্রতি সুগভীব দৃঢমূল মমতা থেকে। কিন্তু সে গান জনপ্রিয হয মধ্যবিত্তেব ভাবোচ্ছ্বাসে, সামর্থ্যহীন দুর্বলেব ক্ষুব্ধ আত্মাভিমানে, এক অপবাজেয বিবাট মহাশক্তিব বিরুদ্ধে অক্ষম যুদ্ধেব কৃত্রিম গর্জনে।

বাংলাব শতবর্ষাধিক সমযকালেব ইতিহাসে যে শত শত দেশপ্রেমাত্মক গানেব বিপুল ঐতিহ্য গডে উঠেছিল, তাব সম্পর্কে তির্যক মন্তব্য কবাব অধিকাব কাবও নেই। কিন্তু তাব পুনর্মূল্যাযনেব প্রযোজনীযতা তো ফুবিযে যাযনি। সমীক্ষা তো গানেব নয, আমাদেব দৃষ্টিভঙ্গিব। যে বাঙালি বুদ্ধিজীবী কর্মী ও নেতাবা একদিন কণ্ঠে স্বদেশি গানেব সুব নিযে ফাঁসিব মঞ্চে উঠেছিলেন, সেই কর্মী ও নেতাদেব মৃতদেহেব ভস্মাবশেষ কবে বাতাসে উডে গেছে। তাঁদেব জীর্ণ ছবিব গা পোকায কেটেছে। সাবা জীবন অন্ধকাব কাবাকক্ষে নির্বাসন জীবন যাপনকালে এই স্বদেশি গানগুলি ছিল যাঁদেব জপমন্ত্র, তাঁদেব বংশধববা দেশবিভাগেব অভিশাপ বহন কবে এপাব বাংলায উদ্‌বাস্তু জীবনযাপন কবতে কবতে একফালি জমিব হযতো পাট্টা পেযেছেন। তাঁবা তাঁদেব পিতা পিতৃব্যেব গাওযা সেই স্বদেশি গানগুলো এখন প্রায ভুলেই গেছেন। এখন তাঁদেব ঘবেব নতুন প্রজন্ম হিন্দি গানেব সিডি চালায।

৩

অথচ স্বদেশি ভাবধাবাকে অবলম্বন কবে ওজস্বী ভাষায লেখা কবিতা ও গানেব ক্রাচে ভব কবেই বাঙালিব জাতীয চেতনা একদা হাঁটতে শুরু কবেছিল। সংগঠনেব কল্পনা তখনও তেমন দানা বাঁধেনি। তখন হিন্দুমেলাব সবটাই ছিল আনন্দমেলা জাতীয, মেলা যেমন হয আব-কি। বাজনাবাযণ বসু শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণেব মধ্যে 'জাতীয গৌববেচ্ছা-সঞ্চাবিণী সভা সংস্থাপনেব প্রস্তাব' কবেছিলেন ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে। হিন্দুমেলাব সঙ্গে তিনি একটি সংগীত বিদ্যালয স্থাপনেবও প্রস্তাব কবেছিলেন। "এই সভা একটি হিন্দু তৌর্যত্রিক বিদ্যালয স্থাপন কবিযা তাহাব ছাত্রগণকে এরূপ শিক্ষা দিবেন যদ্দ্বাবা নীতিগর্ভ উপদেশ প্রদত্ত হয এবং অন্তঃকবণে দেশহিতৈষিতা ও সমবানুবাগেব সঞ্চাব হইতে পাবে।" গান দিযে ও নীতি-উপদেশ শুনিযে দেশ হিতৈষিতা জাগানোব চিন্তাব সঙ্গে 'সমবানুবাগেব সঞ্চাব' এই ইউটোপিযান ভাবনা এখন আমাদেব কাছে হযতো হাস্যকবই মনে হবে। আবাব বিশিষ্ট মাবাঠি লেখক সখাবাম গণেশ দেউস্কব তখন যে এই বাংলায থেকে জাতীয আন্দোলনেব কর্মকাণ্ডে নিজেব অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত কবেছিলেন, তাঁবও বাজনৈতিক চিন্তায গোলমাল ছিল। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণাব কিছু আগে ববীন্দ্রনাথ তাঁব সুবিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পাঠ কবে শোনান এবং সেই প্রবন্ধ শোনাব জন্যে শ্রোতাদেব মধ্যে বীতিমতো উত্তেজনা দেখা দিযেছিল। 'ভাবতেব দ্বিতীয স্বাধীনতা-সংগ্রাম' গ্রন্থ থেকে ববিজীবনীকাব প্রশান্তকুমাব পাল ভূপেন্দ্রনাথ দত্তেব এই স্মৃতিচাবণা তাঁব ববিজীবনী ৫ খণ্ডে উদ্ধাব কবেছেন (পৃ ২২৯-২৩০)

"অনুমান হয ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাবীন্দ্র প্রভৃতি অন্তরঙ্গ কর্মীদেব দ্বাবা অনুরুদ্ধ হইযা আমি ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশযকে একটি পত্র লিখি যে, আমবা ভাবতীয সভাব [কংগ্রেস] সহযোগে কর্ম কবিতে প্রস্তুত নই। তাঁহাব সহিত সংযুক্ত ভাবে কর্ম কবিতে চাই। ইহাতে তিনি দ্বাবকানাথ ঠাকুব ষ্ট্রীটস্থ বাসায আমাকে আহ্বান কবেন এবং বলেন, "আমাব ভ্রাতুষ্পুত্র সুবেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব সহিত এই বিষযে কথা কও "। ইহাতে সখাবামবাবু, দেবব্রতবাবু এবং আমি সুবেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব বালিগঞ্জেব বাড়িতে যাই। তিনি বলিলেন, ববিবাবু আমায জিজ্ঞাসা কবেন, "ইঁহাবা কাহাবা?" আমি সব কথা বলি। তিনি বলেন, তিনি বক্তৃতা ও সাহিত্য দ্বাবা কার্য কবিবেন। ইহাতে সখাবামবাবু ব্যঙ্গ কবেন—"কবিতা লিখিযা ভাবতোদ্ধাব হইবে না।" পবে, এই সহযোগিতাব তাগাদাব জন্য ব্যোমকেশ মুস্তফীব সহিত সাহিত্য-পবিষদ অফিসে আমি সাক্ষাৎ কবি।"

যে সখারাম গণেশ দেউস্কব 'কবিতা লিখিযা ভাবতোদ্ধাব হইবে না' এই বলে ব্যঙ্গ কবেছিলেন, তিনি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বাংলায শিবাজী-উৎসবেব সূচনা কবেছিলেন। দেউস্কবেব 'শিবাজীর মহত্ত্ব' পুস্তিকাটি তখন, ১৩০৯ শিবাজী উৎসবে, বিনামূল্যে বিতবিত হযেছিল। তদুপলক্ষ্যে গিবীন্দ্রমোহিনী দাসী 'আজি গাও গাও গাও খুলে মনপ্রাণ' গান বচনা কবেছিলেন। সেটি তখন সমস্ববে গাওযাও হযেছিল। সেই দেউস্কব মশায যোগীন্দ্রনাথ সবকাব সংকলিত দেশাত্মবোধক গানেব সঞ্চযন 'বন্দে মাতবম্' (১৯০৬) গ্রন্থেব ভূমিকা লিখে দিযেছিলেন। সেই ভূমিকায সখাবাম লেখেন

"সংগীতে মানবেব চিত্তবৃত্তি নিচয একতান হয ও অসীম শক্তিলাভ কবে। সংগীতেব মোহিনী শক্তি তড়িৎ প্রবাহব ন্যায মুমূর্যু সমাজ শবীবে নব প্রাণের সঞ্চাব কবে। জাতীয সংগীত ভিন্ন জাতীয চিত্তেব অবসাদ দূবীভূত হয় না, জাতীয ভাব যথোচিত বলবেগ লাভ কবে না।"

৪

কিন্তু সত্যিই কি তা কবে? আদৌ জাতীয সংগীত কি নির্জীব প্রাণে গতিসঞ্চাব কবে? পবাধীনতাব গ্লানিকে দুঃসহ কবে তোলে? বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র কবে ১৯০৫ সালে দেশে যে অভাবনীয গণচেতনা জাগল, গান তাতে স্ফুলিঙ্গ সঞ্চাব কবল। কিন্তু বাঙালি বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত মানসটি তখন কেমন ছিল? তাব কযেকটি ছিন্ন চিত্র ববীন্দ্রনাথেব বচনা থেকেই উদ্ধাব কবতে হবে। স্বদেশি গান তো স্বদেশেব জড় চিত্তে মহাশক্তিব জাগরণ ঘটায। কিন্তু ববীন্দ্রনাথ তাঁব পঁচিশ বছব বযসে একটি গান লিখেছিলেন, যেটি তাঁব গীতবিতান স্বদেশ পর্যাযে স্থান পাযনি। এটি কি জনচিত্ত-উদ্দীপক সংগীত? গানটি কড়ি ও কোমল (১২৯৩) কাব্যে প্রকাশিত হযেছিল 'বঙ্গবাসীব প্রতি' নামে

"আমায বোলো না গাহিতে বোলো না।
একি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদেব মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা?

এযে নযনেব জল হুতাশেব শ্বাস, কলঙ্কেব কল, দবিদ্রেব আশ,
এযে বুকফাটা দুখে গুমবিছে বুকে গভীর মবম-বেদনা।
একি শুধু হাসিখেলা প্রমোদেব মেলা শুধু মিছে কথা ছলনা?
এসেছি কি হেথা যশেব কাঙালি কথা গেঁথে গেঁথে নিতে কবতালি—
মিছে কথা কযে, মিছে যশ লযে, মিছে কাজে নিশি যাপনা।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ, কে ঘুচাতে চাহে জননীব লাজ—
কাতবে কাঁদিবে, মাযেব পাযে দিবে সকল প্রাণেব কামনা?
একি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদেব মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা?"

পবেব গানটি ববীন্দ্রনাথেব বিশিষ্ট কাব্য কডি ও কোমলে 'বঙ্গভূমিব প্রতি' শিবোনামে বেবিযেছিল। এ গানেও স্বদেশ চেতনাকে আচ্ছন্ন কবে দেখা দিযেছে গভীব এক কণ্ঠবোধী অভিমান। দেশবাসীব একাংশেব মাতৃভূমিব প্রতি নিষ্করুণ অবহেলা ও কর্তব্যবিমুখ ক্লীব দাসমনোভাবেব ভণ্ডামি দেখে দেখে ক্লান্ত কবিপ্রাণ, তাই অতি ক্ষীণ অশ্রুক্ষুব্ধ কণ্ঠে গেযেছেন এই গান

"কেন চেযে আছ, গো মা, মুখপানে।
এরা চাহে না তোমাবে চাহে না যে, আপন মাযেবে নাহি জানে।
এবা তোমায কিছু দেবে না, দেবে না—মিথ্যে কহে শুধু কত কী ভানে॥
তুমি তো দিতেছ, মা, যা আছে তোমাবি—স্বর্ণশস্য তব, জাহ্নবী বাবি,
জ্ঞানধর্ম কত পুণ্য কাহিনি।
এবা কী দেবে তোবে। কিছু না, কিছু না, মিথ্যে কবে শুধু হীন পবানে॥
মনেব বেদনা রাখো মা মনে, নযন বাবি নিবাবো নযনে।
মুখ লুকাও, মা, ধূলি শযনে—ভুলে থাকো যত হীন সন্তানে।
শূন্য-পানে চেযে প্রহর গনি গনি দেখো কাটে কিনা দীর্ঘ বজনি,
দুখ জানাযে কী হবে, জননী, নির্মম চেতনাহীন পাযাণে।"

যে বিপুল স্বদেশসন্তানেব মাতৃবিমুখ মূঢতা দেখে দেখে ক্ষুব্ধ কবিব সুগভীব ক্ষতবক্ষ এ গানেব জন্ম দিযেছিল, দেশেব সেই আত্মতৃপ্ত সন্তানদেব স্থূল চর্মে এ গান কোনো ক্ষীণতম আবেদনও সৃষ্টি কবতে পাবেনি।

কডি ও কোমলেব স্বল্পকাল পরে প্রকাশিত মানসী-ব অনেকগুলি কবিতাতেই 'এবা কী দেবে তোবে। কিছু না কিছু না। মিথ্যা কবে শুধু হীন পবানে'—সেই তাদেব বর্ণনা বিশদ কবেই বলে দিযেছেন। আমাদেব স্বদেশানুবাগমূলক গানেব ক্লাযেনটেলকে ভালোভাবে চিনতে হলে এসব তো জানতে আমবা বাধ্য আজ। শোনা যাক, মানসী-ব 'দেশেব উন্নতি' (বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ বযেছে বেশ কানে) কবিতাব দ্বিতীয় স্তবকটি

"উৎসাহেতে জ্বলিযা উঠি দু হাতে দাও তালি।
আমবা বডো এ যে না বলে তাহাবে দাও গালি।
কাগজ ভবে লেখো বে লেখো এমনি কবে যুদ্ধ শেখো,

হাতের কাছে রেখো রে রেখো কলম আর কালী।
চারটি করে অন্ন খেয়ো, দুপুর বেলা আপিস যেয়ো,
তাহার পরে সভায় ধেয়ো বাক্যানল জ্বালি—
কাঁদিয়া লয়ে দেশের দুখে সন্ধ্যাবেলা বাসায় ঢুকে
শালীর সাথে হাস্যমুখে করিয়ো চতুরালি।"

একে আত্মবিদ্রূপ বলতে বাধা নেই। স্বদেশি গানের রাজাধিরাজের ভূমিকায় যিনি অচিরেই উত্তীর্ণ হবেন, তাঁর দেশের প্রতি ভালোবাসা' এবং 'দেশহিতৈষিতার প্রতি বিদ্বেষ' কোনো দুঃসহ ক্ষোভকেন্দ্র থেকে উৎসারিত হয়, তাকে তো বুঝে নিতেই হবে। যে বাঙালিকে অহরহ দেখতে দেখতে কবি বড়ো হয়েছেন, তাকে কি মুহূর্তের জন্যেও তিনি বিস্মৃত হতে পারেন? কেমন সে বাঙালি?

"ভদ্র মোরা শান্ত বড়ো, পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্টগতি গৃহের প্রতি টান।
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো বাঙালি সন্তান।

দাস্যসুখে হাস্যমুখে বিনীত জোড়-কর,
প্রভুর পদে সোহাগমদে দোদুল কলেবর।
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি যেতেছ ফিরি ঘর।
ঘরেতে বসি গর্ব কর পূর্ব পুরুষের,
আর্য তেজ দর্প ভরে পৃথ্বী থরথর।"

(দুরন্ত আশা, মানসী)

যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, গান রচনা করেছিলেন মুঠো মুঠো, সে আন্দোলনে বাঙালির ভূমিকা কি আমূল বদলে গিয়েছিল কবির চোখে? হতেই পারে না। কল্পনা কাব্যের 'বঙ্গলক্ষ্মী' কাদের নিয়ে লেখা?

"এ বিশ্ব সমাজে
তোমার পুত্রের হাত নাহি কোনো কাজে,
নাহি জান সে বারতা। তুমি শুধু মা গো,
নিদ্রিত শিয়রে তার নিশিদিন জাগো
মলয় বীজন করি। রয়েছ মা, ভুলি
তোমার শ্রীঅঙ্গ হতে একে একে খুলি
সৌভাগ্যভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,

তোমাব ললাট শোভা সীমন্তবতন,
তোমাব গৌবব তাবা বাঁধা বাখিযাছে
বহুদূব বিদেশেব বণিকেব কাছে।"

কী গাঢ বিযাদেব কালিমা লেগেছে এ কবিতাব প্রতি চবণে। এই কল্পনা কাব্যেবই অন্যতম গান 'সে আমাব জননী বে'—

"কে এসে যায ফিবে ফিবে
আকুল নযনের নীবে?
কে বৃথা আশা ভবে চাহিছে মুখ পবে?
সে যে আমাব জননী বে।
কাহাব সুধামযী বাণী
মিলায অনাদব মানি?
কাহাব ভাযা হায ভুলিতে সবে চায?
সে যে আমাব জননী বে।"

স্বদেশবাসীব এই নিত্য মাতৃ অসম্মান যে কবিব তিক্ত অভিজ্ঞতা, তাঁবই কলম থেকে উৎসাবিত হযেছিল এই আত্ম-প্রাযশ্চিত্তেব নিবিড অঙ্গীকাব

যে তোমাবে দূবে বাখি নিত্য ঘৃণা করে,
হে মোব স্বদেশ,
মোবা তাবি কাছে ফিবি সম্মানেব তরে
পবি তাবি বেশ।
বিদেশী জানে না তোবে, অনাদবে তাই
কবে অপমান,
মোবা তাবি পিছে থাকি যোগ দিতে চাই
আপন সন্তান।
তোমার যা দৈন্য মাতঃ, তাই ভূযা মোব
কেন তাহা ভুলি?
পবধনে ধিক গর্ব, কবি কবজোড
ভরি ভিক্ষা ঝুলি!
পুণ্যহস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।
সেই সিংহাসন—যদি অঞ্চলটি পাত,
কর স্নেহদান।
যে তোমাবে তুচ্ছ কবে সে আমাবে মাতঃ

কী দিবে সম্মান।

(ভিক্ষাযাং নৈব নৈব চ, কল্পনা)

৫

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্যে বচিত ববীন্দ্রনাথেব গানগুলি থেকে স্পষ্টই দেখা যায, দেশবাসীব এই নঞর্থক ভূমিকাব স্মৃতি সম্পূর্ণ মুছে যাযনি দেশাত্মবোধক গানেব যে শর্ত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেব আহ্বান, সমবেত কণ্ঠের যে শপথ, তা ববীন্দ্রনাথেব গানে নিতান্তই আকস্মিক। একক কণ্ঠেব নিবিড় একনিষ্ঠ কর্তব্যপবাযণ শপথ, একক সঙ্গবঞ্চিত ব্যষ্টিব কানে প্রতিজ্ঞাব আস্থা বাণী শোনোনো, অধঃপতিত সন্তানের জননী দেশমাতৃকাব কাছে উত্তম পুরুষ একবচন প্রার্থনা, এই লক্ষণগুলি অধিকাংশ গানেবই বাদী সুব। যেমন ·

"যে তোমায ছাড়ে ছাড়ুক
আমি তোমায ছাড়ব না মা
আমি তোমাব চবণ কবব শবণ আব কাবো ধাব
ধাবব না মা।
কে বলে তোব দবিদ্র ঘর হৃদযে তোব বতনবাশি
আমি জানি গো তাব মূল্য জানি পবেব আদব কাডব না মা।"

এ গানে গৌববহীন, মিথ্যা, সম্মানেব প্রতি দৃক্‌পাতহীন সন্তানেব যে নিবিড আত্মসান্ত্বনা, তা তরুণ কবি ববীন্দ্রনাথেব একক স্বদেশচেতনা থেকে উৎসাবিত। কী তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয কবে তিনি উদাসীন মাতৃবিমুখ দেশবাসীব উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন

"যদি তোব ভাবনা থাকে ফিবে-যা-না।
তবে তুই ফিবে যা-না।
যদি তোব ঘুম জডিয়ে থাকে গাযে
ভুলবি যে পথ পাযে পাযে
যদি তোর হাত কাঁপে তো নিবিযে আলো
সবাবে করবি কানা।
যদি তোব ছাডতে না চাহে মন
কবিস ভাবি বোঝা আপন—
তবে তুই সইতে কভু পাববি নে বে
এ বিযম পথেব টানা।।
যদি তোব আপনা হতে অকাবণে
সুখ সদা না জাগে মনে
তবে তুই তর্ক কবে সকল কথা
কববি নানাখানা।।"

নিশ্চেষ্ট দেশবাসীব এই দ্বিধা জড়তাব প্রতি এমন কঠিন বিদ্রূপ ও আত্মসমালোচনাকে কি স্বদেশি গান বলা যায?

স্বদেশবাসীব একাংশেব কপট দেশপ্রেম, অভিজাত বাঙালি পবিবাবেব গোপন প্রভুভক্তি ও প্রকাশ্য দেশ-অভিমানে একদা কবি যে তীব্র আঘাত পেযেছিলেন, পঁচিশ বছব বযসে বচিত 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না' গানে তাব কালশিটে লেগে আছে। বঙ্গভঙ্গ যুগে বচিত দু-একটি গানেও মুষ্টিমেয স্বদেশ-ভক্তদেব সেই কৃত্রিম মাতৃমমতাব প্রতি কবিব বিষণ্ণ ব্যঙ্গ চিনতে অসুবিধে হয না। যেমন,

"ছি ছি চোখেব জলে ভেজাস নে আব মাটি
এবাব কঠিন হযে থাক না ওবে জোবে বক্ষ-দুযাব আঁটি।
পবানটাকে গলিযে ফেলে দিসনেবে ভাই পথে ঢেলে মিথ্যে অকাজে
ওবে নিযে তাবে চলবি পারে কতই বাধা কাটি
পথেব কতই বাধা কাটি।।
দেখলে ও তোব জলেব ধাবা ঘবে পবে হাসবে যাবা তাবা চাব দিকে
তাদেব দ্বাবেই গিযে কান্না জুড়িস যায না কিরূপ ফাটি
লাজে যায না কি বুক ফাটি।। .."

গানেব পর গানে কখনও হতাশ অভিজ্ঞতাব দীর্ঘশ্বাস, কখনও তিক্ত তিবস্কার, কখনও করুণ আর্তি ও উপদেশ। উদ্দীপক স্বদেশি গানেব লক্ষণ এগুলিকে বলা যায না। যদি সাম্রাজ্যবাদী শত্রুব বিরুদ্ধে কোটি স্বদেশপ্রাণ গর্জে উঠবে মুষ্টিবদ্ধ হাতে, কঠিন লৌহপেশীব শপথে, তবে কেন রচনা কবতে হযেছিল এই গান

"যদি তাব ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো বে।"

ভ্রূক্ষেপহীন জেদে ও মাতৃসেবাব স্থিব অকম্প প্রতিজ্ঞায কেন গাইতে হযেছিল সেদিন বিষাদখিন্ন ভাঙা গলায

"যদি সবাই ফিবে যায়, ওবে ওবে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবাব কালে কেউ ফিবে না চায—
তবে পথেব কাঁটা
ও তুই বক্তমাখা চবণতলে একলা চলো বে।।"

সুতবাং বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনেব সমকালে স্বদেশি গান ববীন্দ্রনাথেব হাতে সেই অর্থে যা বচিত হযেছিল, তাব বড়ো অংশই হল, কবিব ব্যক্তিগত দেশপ্রেমের গান। আব মাত্র কযেকটি গান জনচিত্ত-উদ্দীপনাব গান, সংঘশক্তি জাগানোব গান, সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধিতাব গান। 'এখন আব দেবি নয ধব গো তোবা হাতে হাতে ধব গো', 'বিধিব বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান', 'ওদেব বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে', 'এবাব তোব মবা গাঙে বান এসেছে' এই কযেকটি গানেব সেই লক্ষণ আছে। 'বিধিব বাঁধন কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান' গানটি প্রত্যক্ষভাবে শাসক শক্তিব উদ্দেশ্যে উচ্চাবিত। 'ওদেব বাঁধন

যতই শক্ত হবে' গানটি পবোক্ষভাবে সেই শাসক শক্তিব বিরুদ্ধে কবিব নির্ভীক ভূমিকা। এই দুটি গানেই দেশভাগে উদ্যত দাম্ভিক কার্জনেব বাজশক্তিকে এক নেটিভ কবি চ্যালেঞ্জ কবেছেন। এই ঐতিহাসিক পটভূমি অভ্রান্তভাবে উৎকীর্ণ আছে। অন্যান্য গান চিবকালেব দেশপ্রেমেব গান, শৃঙ্খলিত পবপদানত জাতিব মাতৃগবিমাব স্বপ্নপ্রযাণ

'আমাব সোনাব বাংলা আমি তোমায ভালোবাসি', 'সার্থক জনম আমাব জন্মেছি এই দেশে', 'ও আমাব দেশেব মাটি তোমাব পবে ঠেকাই মাথা', 'বাংলাব মাটি বাংলাব জল', 'আজি বাংলাদেশেব হৃদয হতে কখন আপনি' এইগুলি তাবই উদাহবণ।

৬

ববীন্দ্রনাথেব স্বদেশনীতিব পাশে সমকালীন গীতকাবদেব স্বদেশি গান প্রাযশই নিষ্প্রভ ও সমকালীনতায অবরুদ্ধ। বঙ্গ বিভাগ সাবা দেশে যে উত্তেজনাব সঞ্চাব কবেছিল, তাব সবচেযে বড়ো সুবটি ছিল বযকট আন্দোলন। স্বদেশি বস্ত্র ব্যবহাব, বিদেশি পণ্যবর্জন, স্বদেশি শিল্পেব পুনরুজ্জীবন, যা কিছু স্বাদেশিক, যা কিছু দেশীয ঐতিহ্যচিহ্নিত, যা কিছু দেশেব প্রাচীন সংস্কৃতিব সঙ্গে ধাবাবাহিত, বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন সেই বোধটিকে জাগিযে তাব প্রতি উদাসীন দেশবাসীব দৃষ্টি ফেবাতে পেবেছিল। ববীন্দ্রনাথেব অনুপম সৃষ্টি 'আমাব সোনাব বাংলা আমি তোমায ভালোবাসি' গানেব একটি মাত্র ছত্রে এই সমকালীন আন্দোলনেব আভাসমাত্র দিয়েছেন তিনি ·

"আমি পবেব ঘবে কিনব না আব ভূষণ বলে গলাব ফাঁসি।"

বজনীকান্ত সেন সেই বিদেশি বস্ত্রবর্জন এবং স্বদেশি বস্ত্র পবিধানকেই শ্লোগান কবে একটি গান সমকালেব সমবেত কণ্ঠে নিশ্চিতভাবে স্থাপন কবতে পেবেছিলেন ·

"মাযেব দেওযা মোটা কাপড মাথায তুলে নে রে ভাই
দীন দুখিনী মা যে তোদেব—তাব বেশি আব সাধ্য নাই।
ওই মোটা সুতোব সঙ্গে মাযেব অপাব স্নেহ দেখতে পাই
আমবা এমনি পাযাণ তাই ফেলে ওই পবেব দোবে ভিক্ষে চাই।
ওই দুঃখী মাযেব ঘবে তোদেব সবাব প্রচুব অন্ন নাই
তবু তাই বেচে কাঁচ সাবান মোজা কিনে কবলি ঘব বোঝাই।
আযবে আমবা মাযেব নামে এই প্রতিজ্ঞা কবব ভাই
পবের জিনিস কিনব না যদি মাযেব ঘবেব জিনিস পাই।"

এব সঙ্গে দ্বিতীয সুবটি ছিল প্রতিবোধেব, শাসকদলেব কাছ থেকে পাওযা পীডন অসম্মান সহ্য কবাব কঠিন প্রতিজ্ঞা, মাবেব মুখোমুখি হওযাব দুঃসাহস। এই পর্যাযেব জনপ্রিয একটি গান লিখেছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ

"মা গো যায যেন জীবন চলে
শুধু জগৎ মাঝে তোমাব কাজে বন্দেমাতবম্ বলে।

যখন নয়ন মুদে করব শয়ন শমনের সেই শেষ জালে
তখন সবই আমার হবে আঁধার স্থান দিও মা ওই কোলে।
আমার মান-অপমান সবই সমান দলুক না চরণতলে
যদি সইতে পারি মায়ের পীড়ন মানুষ হব কোন কালে।
লাল টুপি আর কালো কোর্তা জুজুর ভয় কি আর চলে'
আমার মায়ের সেবায় বইব রত পাশব বলে দিক জেলে।
আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে আমি কি মার সেই ছেলে
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি কে পালাবে মা ফেলে।
আমি ধন্য হব মায়ের জন্য লাঞ্ছনাদি সহিলে
ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে ফাঁসি কাঠে ঝুলিলে।
যে মার কোলে নাচি শস্যে বাঁচি তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে
বল লাঞ্ছনার ভয় কার কোথা রয় সে মায়ের নাম স্মরিলে।
বিশারদ কয় বিনা কষ্টে সুখ হবে না ভূতলে
সে তো অধম, যে হয় সইতে রাজি, উত্তমে চায় মুখ তুলে।''

'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিটি তখন রীতিমতো রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শ্লোগানে পরিণত হয়ে গেছে, স্বদেশি গানেও ব্যবহৃত হয়েছে।

বিদেশি পণ্যে দেশের বাজার আচ্ছন্ন হয়ে আছে। দেশের শিল্প সম্পদের সর্বনাশ করে ম্যাঞ্চেস্টারে বিলিতি বস্ত্রের ইন্দ্রপ্রস্থ গড়ে উঠছে—এসব নিয়ে লেখা দেশাত্মবোধক গান বঙ্গভঙ্গের ঢের আগে থেকেই হিন্দুমেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সম্পর্কে একটি দীর্ঘ গান রচনা করেছিলেন মনোমোহন বসু, সে সব গানকে তিনি গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে দিতেন তাঁর নতুন অপেরার মাধ্যমে।[৫] গানটি উদ্ধৃত করি

''দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন
অন্নভাবে শীর্ণ চিন্তাজ্বরে জীর্ণ অপমানে তনু ক্ষীণ।
সে সাহস বীর্য নাহি আর্যভূমে, পূর্ব গর্ব দর্প খর্ব হল ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে লজ্জা রাহুমুখে লীন,
অতুল্কিত ধনরত্ন দেশে ছিল জাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল এমনি কইল দৃষ্টিহীন।
তুঙ্গ দীপ হতে পঙ্গপাল এসে সার শস্য গ্রাসে যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে হায় গো রাজা কী কঠিন।
তাঁতি কর্মকার করে হাহাকার সুতা জাতা টেনে অন্ন মেলা ভার
দেশি বস্ত্র অস্ত্র কি চায় না কো আর হল দেশের কী দুর্দিন।
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গ রাজ কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ
ধরবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ বাকল টেনা ডোর কপিন।
ছুঁই সুতো পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে দিয়াশালাই কাঠি তাও আসে পোতে
প্রদীপটি জ্বালিতে খেতে শুতে যেতে কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।।[৬]

৭

বিদেশেব প্রকৃতি-সৌন্দর্য বর্ণনাব বোমান্টিক আবেগকে তিবস্কৃত কবে এই জাতীয় গানই একদা সাম্রাজ্যবাদেব শোষণ ও ঔপনিবেশিক সভ্যতাব অন্তঃসাবশূন্যতাকে অকপটে তুলে ধবেছিল। দৃষ্টান্তস্বৰূপ এব পাশে দ্বিজেন্দ্রলালেব সেই আমলেব জনপ্রিয গানটিকে কত লঘু আবেগ বাষ্পময মনে হয আমাদেব।

"ধনধান্য পুষ্পভবা আমাদেব এই বসুন্ধবা
তাহাব মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশেব সেবা
ও সে স্বপ্ন দিযে তৈবি সে যে স্মৃতি দিযে ঘেবা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশেব বানী সে যে আমাব জন্মভূমি।"

আবাব মনোমোহন বসুব বিস্মৃতপ্রায দেশাত্মবোধক গানেব দিকে নজব দিতে হচ্ছে। "ভাবতেশ্ববী করুণামযী ভিক্টোবিযা'-কে সম্বোধন কবে বাউল সুবে গান বেঁধেছিলেন মনোমোহন, যাব ভাষাকে আজ বীতিমতো দুঃসাহসী মনে হয। এ তো গান নয, উপনিবেশবাদের এক ঐতিহাসিক পবিণামেব বিববণ

"কোথায মা ভিক্টোরিযা, দেখ আসিযা, ইণ্ডিযা তোব চলছে কেমন
ছিল মা সুখের বাজ্য ধবা-পূজ্য, আর্যধাম এই ভাবত ভুবন।
বাণিজ্য ধন-ঐশ্বর্য শৌর্যবীর্য আশ্চর্য সব ছিল তখন।
তাব পবে জোব প্রভুত্ব ঘোর দৌবাত্ম্য সত্য বটে কবত যবন
কিন্তু মা এমন কবে অন্নেব তবে কাঁদত না লোক এখন যেমন।
সে দাযে ঠেকত তাবা ধনী যাবা আমিব ওমবা জমিদাবগণ,
যাবা মা সাধাবণ লোক পেত না শোক সুখে কাটত তাদেব জীবন।
মা লক্ষ্মী অবতীর্ণ চিন্তাশূন্য ধান্যপূর্ণ থাকত ভবন
কে কখন বাজত্ব পায তাদেব কী দায হলেই হল উদব পূবণ।
কবত যে লড়াই ঝগড়া বাজাবাজড়া বাজ্য নিযে হিন্দু যবন
না হলে ফসল নষ্ট চাযেব কষ্ট তাদেব তাতে দায কী এমন।
জানত না উকিল মোক্তাব জজ ব্যাবিস্টাব আইন কানুন বসুন শমন
ছিল না ছল চাতুবি জুযাচুবি পার্জুবি ফোর্জাবি এমন।
প্রবীন লোক গাযে গাযে পঞ্চাত হযে বিচারদণ্ড কবত ধাবণ
নিখবচায় ঘবে বসে অনাযাসে মিটিত বিবাদ মনেব মতন।
এখন এই পোড়া দেশে কপালদোযে হযেছে সব উলটো ঘটন
ছাবপোকাব বিযেন মতন নিত্যিনূতন আইনে দেশ হয জ্বালাতন।
জেলাতে রন ম্যাজিস্টর ইনিস্পেক্টব পুলিশেব চব সাক্ষাৎ শমন
জোবে কেউ হাইটি তুললে গানটি ধবলে ঢোলটি পিটলেও করে বন্ধন।

পেনাল কোড কথায় কথায় বেত লাগায় গায় ঘানি টানায় গোরুর মতন।
বংশমান যার মা যেমন জন্মের মতন দাস চড়ে তায় হয় না মোচন।
দেওয়ানি বিচার বিক্রি পেতে ডিক্রি খরচাতেই খায় সর্বস্ব ধন
আবার তায় বাক্স আমলা বাধলে মামলা সামলানো ভার ভিটে আপন।
তাই বলি সোনার দেশে শাসন দোষে ধনে মানে প্রজার মরণ
একে তো রোগে জরা ট্যাক্সে মরা মামলায় সারা সারা জীবন।
দেশে নাই লাঠালাঠি কাটাকাটি চোর ডাকাতি আগের মতন
শাসক জাত করেন গর্ব 'তাঁরা সভ্য' তবু পর্ব কেন এমন।
বলতে মা শঙ্কা করে পাছে ধরে জেলে পোরে চোরের মতন
কিন্তু মা তোরে ভিন্ন কারে অন্য বলব মোদের হিদের বেদন।
দিশি লুট গেছে উঠে সত্য বটে তার বদলে ইংলিশ ফ্যাশন
অসাড়ে জোঁকের মতন রক্ত শোষণ বিলিতি লুট চলছে এখন।
দিশি লুট চলত যখন ভুগত তখন বড়ো জোর তায় বাছা কজন
বিলিতি জালের কাঠি কাতলা পুঁটি সব বাঁধে নাই কারোর মোচন।
প্রধান লুট দমকা কলে যাবে বলে হোমচার্জ আর কন্ট্রিবিউশন
তাছাড়া যোজন জোড়া লম্বা তোড়া সাহেব পাড়ার পেনশন বেতন।
ম্যাঞ্চেস্টার ধরলে আবদার কাপড় সুতার ডিউটি অমনি হয় রেমিশন
তাদেরপেট পুরিয়ে তখন দেখছি এখন আয়-করের দায় মোদের মরণ।
দুঃখী লোক নীল দাদনে জোর বাঁধনে ঘোর রোদনে কাটছে জীবন
খাটছে মা চা-র বাগানে আকুল প্রাণে কুলিগণে দাসের মতন।
ফুরসত নাই হাঁফ ছাড়তে ঘাম মুছতে প্যায়দা ফেরে পেছন পেছন
আ মরি ঘড়ি ঘড়ি মারছে ছড়ি গোরু তাড়ায় রাখাল যেমন।
পাঁচ টাকা মাস মাইনা তাও পায় না জরিমানায় অর্ধহরণ
রোজের যে কাজ নিশানা অসুর বিনা কেউ পারে না মানুষে তেমন।
বলতে গা শিউরে উঠে ঘর্ম ছুটে পতির সামনেই পত্নী-হরণ
করে এই ভীষণ কাণ্ড তবু ষণ্ড পায় না দণ্ড পাপের মতন।
হাকিম তার ফ্রেণ্ড ডিয়ার, হোয়াট ফিয়ার, ডোন্ট কেয়ার ড্যাম নিগারগণ
স্বজাতি-পক্ষপাতী বিচারপতি ধর্মের প্রতি অন্ধ-নয়ন।
ডিসিশান আগেই ধার্য ফল্‌স চার্জ ডিসচার্য তাই ডিয়ার বুলজন
বার্দিনির সব ফিরিরি বেয়াদবি উলটে তাই তার বেড়ি খাটন।
ধলো পার লাথির চোটে রক্ত উঠে কালো আদমি মরে যখন
হলে মা পিলে ফাটা চুকোয় ল্যাঠা সাক্ষী স্বয়ং সিবিল সার্জন।
আবার মা কথায় কথায় ছুতোর লতায় গুলি চালায় যখন তখন
নেটিভকে পশুজ্ঞানে ট্রিগার টানে তিলেক প্রাণে হয় না বেদন।

বিচারে বহবারম্ভ অশ্বডিম্ব দণ্ড পেযে হাস্যবদন
খুনেব প্রুফ ধুনে ফেলে জুবিব কলে অ্যাকাসিডেন্ট হয নিরূপণ।
নযতো হয সাফাই জাবি টেম্পোবাবি ইনস্যানিটির ঝোঁকে তখন
ছিল সে ইনসেন্সিবল্ বেসপনসিবল আইন মতো নয়তো সে জন।
অপূর্ব এই বিচারে জামাই আদবে কবে তাবে ঘবে প্রেবণ।
সবকাবি খবচায বঙ্গে বেসপনসিবল আইন মতো নযতো সে জন।
অপূর্ব এই বিচারে জামাই আদবে কবে তাবে ঘবে প্রেবণ।
সরকাবি খরচায বঙ্গে সেবক সঙ্গে, দেশে যায সে বাজাব মতন।
দিন কতক ম্যাড হাউসে রেখে শেযে ছেড়ে দেয তায দিযে পেনশন।
এইরূপে খ্রিষ্টান ধর্ম বিচাবমর্ম দযাব কর্ম হয সমাপন।
একচোকো এমন কার্য অনিবার্য রাজ্যময মা নিত্য ঘটন
আব যে মা হয না সহ্য বয না ধৈর্য যে কদর্য হচ্ছে শাসন।
পক্ষপাত জববদস্তি লজ্জানাস্তি মত্ত হস্তীব মতন ধরন
মানীব মান খামখেযালে পাযে দলে ধবা দেখে সবাব মতন।
এমন যে অসামান্য দযাপূর্ণ তোব আটান্ন সালেব ঘোযণ
জন কত যণ্ডা মিলে খণ্ডে দিলে স্বজাত-স্বার্থ কবতে সাধন।
ভেবোনা এইসব কীর্তি করছে নিত্যি ছুটলে দলেব বিটলে কজন
দেখতে পাই তাবাই কানাই তাবাই বলাই তাবাই গোঠে চবায গোধন।
যাবা তোব প্রধান নাযেব কর্তা সাহেব কে দেখতে পায তাদেব বদন
কেবল মা বিপন ছাড়া তাদেব সাড়া কখনই মা পাইনি তেমন।
তাই বলি রাজ্যের মাথা হযে হেথা আসেন যাঁবা কবতে পালন
কইতে মা তাদেব কথা পাইগো ব্যথা মুণ্ডুমাথা যেরূপ শাসন।
কেবল মা স্বার্থপোবা সুখেব পাযবা শখেব ফযবা তাঁদেব জীবন
কলকাতাব নামে ত্যক্ত পাহাড়-ভক্ত প্রজাব দুখ আব দেখবেন কখন।
একটু যেই গর্মি ফুটে অমনি ছুটে সবাই জুটে সিমলে গমন
সঙ্গে লোক হাজাব হাজাব উর্দু বাজাব ব্যাপাব যেন বাদশার মতন।
প্রজাদের বক্ত শুযে বঙ্গবসে ঘর বিলাসে তথায মগন
এদিকে দে কর দে কব বব ভযংকব কন নিবন্তর কলেকটবগণ।
অষ্টমাস কৃষ্ণলীলায় বসের খেলায সিমলে যেন শ্রীবৃন্দাবন
সঙ্গে সব বিড়ালাক্ষ্মী ধবলমুখী বাসলীলায মন করেন হবণ।
অপূর্ব কুঞ্জকানন বিহাবভবন মর্ত্যে যেন ইন্দ্রভুবন
বঁধুযা বধূসনে মধুপানে নিধুবনে মধুব মিলন।
হর্স বেস ক্রিকেট খেলা দিনেব বেলা নাট মন্দিরে নিশি যাপন
ফুঁড়ে এই বং তামাসা আব কোযাশা উঠতে পায় না মোদের রোদন।

উঠলেই বা কী ছাই হবে কে তা শুনবে
যদি বা পান ফুবসৎ সকল হজবত
কুশ যেন কবে হোর্মত, লোকজমাযত
এইভাবে সোব সরাবত জোব জবাবত
যদ্দিন এই মহাপ্রস্থান সিমলা পযান
তদ্দিন মা কশেব জন্যে তাবা হন্যে
সেই বোগে উঠে ঝোঁকে থেকে থেকে
বৈজ্ঞানিক সীমানার ভান
তাবা নয জোব কাঙালি,
তাবা সব বীবের বাচ্চা স্বাধীন সাঁচ্চা
কিন্তু মা সেই হিড়িকে লাখে লাখে
সে কথা ভাববে বা কে ওদিকে যে
মাগো আর কত বলব কোনদিকে ধবব
বণিকদল লেলিয়ে দিলে বর্মা নিলে
ধর্ম নাই বুঝলেম ধরায নইলে কি হায
আমবা মা শান্তশিষ্ট অল্পে তুষ্ট
যারা মা দ্রোহী দুষ্ট ঘোর অশিষ্ট
কবতে তায অসন্তুষ্ট দিতে কষ্ট
তোবে মা ভোগা দিযে শুনায গিযে
বিদ্যালয কলকারখানা ব্যবসা নানা
ভাবতেব খুব উন্নতি এই ভাবতী
কিন্তু সেই কলকাবখানাব কে মালিকদাব
পঙ্গপাল শ্বেতপুকুযে হেথায এসে
পড়ে বয যে খোসা ভুষি আগড়া ঘাসি
হয কি নয সত্য কথা এসে হেথা
নযতো কেউ তোব বিশ্বাসী দেখুক আসি
কমিশন বসাস নে মা তায কাঁপে গা
আমবা তোব দুঃখী সন্তান কবো পবিত্রাণ

শোনবাবই বা ফুবসত কখন
কুশ-কেবামত দেখেন স্বপন।
হিমাবত পাব আসছে তখন
হয তবিবত ফৌজেব চালন।
সঙ্গে সৈনিক অফিসাবগণ
হাইড্রোফোবিব রোগীব মতন।
আফগানিস্থান হয আক্রমণ
কান্দাহাব চান হিবাট পক্ষেও বিবাট মনন।
ক্ষীণ বাঙালি নীচ উমির্চাঁদ কুত্তাব মতন
হয না তথায দন্ত স্ফুটন।
ধনে প্রাণে প্রজাব পতন
বিওযার্ড আব পান প্রমোশন।
যেটি তুলব সেইটিই ভীষণ
খবচা জোগায অভাগাগণ।
ভক্তের মর্ম পোড়ায এমন
অদৃষ্টে তাই কষ্ট লিখন।
স্পষ্ট দেখায কষ্ট বদন
সাহস পায না শাসকেব মন।
বেলওযে আর শান্তি স্থাপন
তাইতে ভাবত স্বর্গেব মতন
নিতি নিতি কবায শ্রবণ
তাই কেন মা কব না স্মরণ।
গ্রাসে দেশেব সকল সাব ধন
তাই খেযে বয মোদেব জীবন।
একবাব কব মা নিজে দর্শন
গুপ্তভাবে কবে ভ্রমণ
লোক ভুলাবাব ফাঁদ কমিশন
অভয দেশ ধবি চবণ।।[৯]

৮

জনপ্রিয দেশাত্মবোধক গানের যে কোনো সংকলনে হযতো এ গান দেখা যাবে না। কিন্তু তথ্যেব দিক থেকে সেকালেব বাঙালিব স্বদেশচেতনা ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনেব স্বরূপ বুঝতে এব চেযে গুরুত্বপূর্ণ দলিল বেশি পাওয়া যায না। এটিকে গান না বলে বলা যেতে পাবে। কলোনাইজেশন

অফ ইণ্ডিযা-সম্পর্কিত কমিশনেব জন্য গঠিত 'মনোমোহন বসু কমিশনেব বিপোর্ট।'

ব্রিটিশ শাসন অর্থনৈতিক দিক থেকে এদেশকে কীভাবে পঙ্গু ও সর্বস্বান্ত কবে চলেছিল, সে যুগেব আবও বহু স্বদেশি গানেই তাব বিববণ আছে। কিন্তু সে সবেব সন্ধান না নিযে শৌখিন স্বদেশি গীতি-সংকলকবা 'উঠগো ভাবতলক্ষ্মী', 'হও ধবমেতে ধীব', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' 'তব চবণ নিম্নে উৎসবমযী শ্যাম ধবনী সবসা', 'বলো বলো বলো সবে' প্রভৃতি ইউটোপীয দেশপ্রেমেব বঙকেই স্বদেশাভিমানেব পতাকায মাখাতে চেযেছেন। কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশাবদের "মা গো যায যেন জীবন চলে" গানটিই বেশি প্রচাব পেযেছে। কিন্তু মনোমোহবসুব পূর্বোক্ত গানটিব পবিপূবক ৰূপে আবও কযেকটি গানেব উল্লেখ অপবিহার্য—নতুবা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব অর্থনৈতিক দিকটিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা কবা যাবে না। কালীপ্রসন্নেব এই গানটিব শীর্ষে 'প্রসাদি সুব' লেখা

"এসো দেশেব অভাব ঘুচাও দেশে
সবাব আহার বিহাব বিলাস বেশে।
দেখো দেখি মেলে আখি যত ভিন্ন দেশী এসে
দেশেব যা ছিল ধন করছে হবণ জাহাজ ভবে এক নিমেযে।
গৃহ ধনধান্যে ভবা আমরা মজি নিজেব দোযে।
আমবা কিছু না পাই হেলায হাবাই নযন জলে বেডাই ভেসে॥
সকল কাজেই বিজ্ঞ সাজি অনভিজ্ঞ ধবলে ঠেসে
আসে ত্যাগ স্বীকাবেব নামেই বিকাব দংশে যেন আশী বিযে॥
বসনভূষণ যা প্রযোজন পান ভোজন নয আত্মবশে
যেন বাসা থাকতে বাবুই ভিজে নিজেব উপায দেখে না সে॥
ধুতি চাদব ম্যাঞ্চেস্টাবেব চেযে দেখো সব সর্বনেশে
ভবে জাহাজগুলো তোদেব তুলো তোরাই কিনিস সেই জিনিসে॥
যাদেব তুলো তাদেব দিযে লাভ নিযে যায সব বিদেশে
আমবা অলস হযে আছি চেযে বিদেশবাসীব দযাব আশে॥
লজ্জাবাবণ, শীতেব দমন, বেশম পশম পাট কাপাসে
বলো কিসেব কসুব খাবাব প্রচুব কী না ফলে খেতেব চাযে॥
মাছ মাংস ফল আছে সকল, সব পাওযা যায বিনা ক্লেশে
নদী সবোববে স্নিগ্ধ কবে মিষ্ট জলে তৃষ্ণা নাশে॥
গুড চিনি আব মধু ফেলি লোফ সুগাবেব মজি বসে
আছে গোযাল-পোবা বকনা গাভি কৌটোতে দুধ তবু আসে॥
বিশ কোটি শ্রমজীবী হেথা পশু পুষ্ট মাঠেব ঘাসে
লোকে অল্পে তুষ্ট সহে কষ্ট বাঁকায না মুখ অসন্তোযে॥
তবু কেন ভিক্ষা কবি বিদেশবাসীব দ্বাবদেশে
কেবল স্বভাবদোযে অভাব ভাবি নাহি দেখি কী হয কীসে॥

কাঞ্চন বিলাযে দিযে কাঁচ খুঁজি হায পবেব বাসে
পব নাহি দিলে মুখে তুলে দিন কেটে যায উপবাসে।।
দিযে সোনা হীরেব খনি আমদানি কাঁচ বাংতা সিসে
যত বিদেশবাসী নে যায শস্য আমবা আছি সমান বসে।।
চাবিদিকে দৃষ্টি বেখে কাজ কবে যাও আবেগ বশে
সবে কবিলে পণ অধঃপতন হবে দমন অনায়াসে।।
নিজেব বলে হও না বলী আসবে অবি কোন সাহসে
যখন ঘবেব পেলে কার্য চলে কেন যাবে পবেব পাশে।।
হযে যদি লুপ্ত শক্তি সুপ্ত থাক নিদ্রাবেশে
জেনো সবার দুঃখে অধোমুখে শিযাল কুকুব কাঁদবে শেষে।।
আশার আলো সামনে জ্বালো তুচ্ছ ভাবো ভোগ বিলাসে
আজি কয বিশাবদ যাবে বিপদ হতাশবাণী উড়াও হেসে।"[৭]

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত কিন্তু দেশবাসীব নিশ্চেষ্টতা দাস্যবৃত্তি আত্মশক্তিহীনতাও কি এই দুর্গতিব জন্যে কম দাযী? কালী প্রসন্নেব গানে সেই বাস্তব সত্যেব অনাবৃত প্রকাশ বঙ্গভঙ্গেব অন্ধকাব দিকটিকেই তুলে ধবেছে, যেমন বাউল সুবাশ্রিত এই গানে।

"ওই যে জগৎ জাগে স্বদেশ-অনুরাগে।
কে আর ব্যবচ্ছিন্ন বঙ্গ ভিন্ন নিদ্রামগ্ন দিবাভাগে
ভাঙবে না কি এ কাল নিদ্রা
বইবে এ ভাব যুগে যুগে।
খেযে পবেব প্রসাদ যায় কি বিষাদ এ অবসাদ কোন বিবাগে।।
থাকতে অঙ্গ পঙ্গু বঙ্গ দাগা বুলায় পবেব দাগে
কবে গৃহশূন্য পবেব জন্য লক্ষ্মীপুত্র ভিক্ষা মাগে।।
স্নিগ্ধ কবতে দগ্ধ উদব গোলামি চায সবার আগে
সদা গোবাব দুপায তৈল জোগায তাও বাঙালিব ভালো লাগে।
আব কী কাবণ জীবন ধাবণ প্রাণ ধরে তো কুকুব ছাগে
যদি দেশেব দশা এমনি থাকে বিলম্ব কী তনুত্যাগে।।
দেশেব শিল্পে জলাঞ্জলি ভেকেব ভোজ্য জোগায নাগে।
বলে ব্যবসা অবাধ নাইকো বিবাদ কতই দ্রব্য দেয সোহাগে।।
পবেব পদে তোযামোদে মর্মব্যথা কর্মভোগে
বলো কোন্ দেশেব আব দশা এমন জীবন ধাবণ যোগাযোগে।।
এই বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে আমবা অন্ধ নেত্রবোগে
ও তাই আশাব পথে যেতে নাবি আজ সকলে চলছে বেগে।।
সমুন্নত সর্বজাতি আমবা কেবল অধোভাগে
এবাব মন্ত্র সাধন কবেছি পণ ছাড়ব না তা প্রাণবিযোগে।।

প্রাণে যখন আবেগ আসে শত্রু ভাষে 'হুজুগ চাগে'
বিশাবদ কয়, সেই তো সময কার্য সাবো সেই সুযোগে।।[৮]

কামিনীকুমাব ভট্টাচার্যেব একটি গানে ইংবেজ কণ্ঠবোধ আইন ও দণ্ডদানেব নিষ্ঠুবতাব ছাযা পড়েছিল

শাসন-সংযত কণ্ঠে জননী গাহিতে পাবি না গান
তাই মবমবেদনা লুকাই মবমে আঁধাবে ঢাকি মা প্রাণ।
সহি প্রতিদিন কোটি অত্যাচাব কোটি পদাঘাত কোটি অবিচাব
তবু হাসিমুখে বলি বাববাব, সুখী কেবা আব মোদেব সমান।

বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনেব পববর্তীকালে আমাদেব দেশাত্মবোধক গানে সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী উচ্চাবণ তীব্র হযেছে মুকুন্দদাস ও নজরুলেব একা গানে। ১৯২১ থেকে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ এই দশ বছবে স্বদেশী গানেব এই শোষণ বিরোধী শ্রেণী সংগ্রামেব প্রেবণায উত্তেজিত গানেব পবিমাণ খুব বেশি না হলেও নিতান্ত কম নয। তবে সে সব গানেব প্রসঙ্গ আলোচনাব জন্যে চাই আবও বড়ো চত্বব, আবও গবেষণালব্ধ উপকবণেব বিপুল সমাবেশেব সুযোগ। এই মুহূর্তে তাতে অনিবার্য কিছু বাধা বযে গেছে।

১২ই জুন, ২০০৫

উল্লেখ সূত্র

১ স্বদেশি আন্দোলন ও সংগীতেব সংকলন বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যাবে এই লেখকেবই গ্রন্থেব 'বাংলা কাব্য সংগীত ও ববীন্দ্র সংগীত', দেজ সংস্কবণ, ১৯৯৪, 'উনিশ শতকেব কাব্য সংগীতে স্বদেশচেতনা' অধ্যাযে।

২ প্যাট্রিযটিজম্ ববীন্দ্রনাথেব কাছে ছিল অপছন্দেব শব্দ। সমূহ গ্রন্থেব পবিশিষ্ট-অংশে সংকলিত 'বিবোধ মূলক আদর্শ' নামক একটি প্রবন্ধে (১৩০৮) তিনি মন্তব্য কবেছিলেন,
"প্যাট্রিযটিজম্ ধর্মনীতি বিজ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি "বাঁধি বোল" আছে। যাহা লোকে মুখে উচ্চাবণ কবে এবং সে সম্বন্ধে আব চিন্তা কবিবাব প্রয়োজন বোধ কবে না। সে বিষযে প্রশ্ন উত্থাপন কবিতে গেলেই হাতাহাতি বাধিযা যায। বাঁধি বোল মুখে মুখে চলিযা যায, লোকে নিঃসংশয়ে জীবনযাপন কবে। প্যাট্রিযটিক খুনাখুনি অথবা যোদ্ধৃধর্ম এইরূপেব একটা "বাঁধি বোল।"
একই প্রতিধ্বনি শুনি শিক্ষা-গ্রন্থান্তর্গত 'আববণ' নামক একটি প্রবন্ধে (১৩১৩)
"মানুষেব অনেকগুলি মনেব ভাব উৎপন্ন হইতেছে যাহা কেবল পুঁথিব সৃষ্টি। এই সকল বাস্তববর্জিত ভাবগুলা ভূতেব মতো মানুষকে পাইযা বসে, তাহাব মনেব স্বাস্থ্য নষ্ট কবে, তাহাকে অত্যুক্তি এবং আতিশয্যেব দিকে লইযা যায, সকলে মিলিযা ক্রমাগতই একই ধুযা ধবিযা কৃত্রিম উৎসাহেব দ্বাবা সত্যেব পবিমাণ নষ্ট কবিযা তাহাকে মিথ্যা কবিযা তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পাবি, প্যাট্রিযটিজম্ নামক পদার্থ। ইহাব মধ্যে যেটুকু সত্য ছিল, প্রতিদিন সকলে পড়িযা সেটাকে তুলা ধুনিযা একান্ত মিথ্যা কবিযা তুলিযাছে, এখন এই তৈবি বুলিটাকে প্রাণপণ চেষ্টায সত্য কবিযা তুলিবাব জন্য কৃত্রিম উপায, কত অলীক উদ্দীপনা, কত অন্যায শিক্ষা, কত গড়িযা-তোলা বিদ্বেষ, কত কূট যুক্তি, কত ধর্মেব ভান সৃষ্ট হইতেছে তাহাব সীমা সংখ্যা নাই।"

সখাবাম গণেশ দেউস্কবেব 'দেশেব কথা' গ্রন্থেব দীনেশচন্দ্র সেন লিখিত সমালোচনাব উপব মন্তব্য কবতে বসেও একই চিন্তাব প্রতিধ্বনি কবে ববীন্দ্রনাথ লেখেন

স্বাদেশিকতাব ভাবখানা এই যে, স্বদেশেব উর্ধ্বে আব কিছুকেই স্বীকাব না কবা। স্বদেশেব লেশমাত্র স্বার্থে যেখানে বাধে না সেখানে ধর্ম বল, দযা বল, আপনাব দাবি উত্থাপন কবিতে পাবে—কিন্তু যেখানে স্বদেশেব স্বার্থ লইযা কথা সেখানে সত্য, দযা, মঙ্গল সমস্ত নীচে তলাইযা যায। স্বদেশীয স্বার্থপবতাকে ধর্মেব স্থান দিলে যে ব্যাপাবটা হয তাহাই প্যাট্রিযটিজ্‌ম্ শব্দেব বাচ্য হইযাছে।" (প্রশান্ত কুমাব পাল, ববিজীবনী ৫, পৃ ১৯০)

৩ উৎপল দত্তেব কথা ধাব কবে বলা যায, টিনেব তলোযাব।

৪ এই অপেবাব তৎকালীন 'গীতাভিনয'। ডক্টব সুকুমাব সেনেব 'বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস' দ্বিতীয খণ্ডে (তৃতীয সং ১৩৬২) এব সম্পর্কে লিখেছিলেন "এই গীতাভিনয নাটক-অভিনযেবই মতো, তবে কথকতাব মতো বক্তৃতা-বহুল এবং প্রাচীন যাত্রা অনুসাবে গীতিপূর্ণ। স্টেজেব প্রযোজন নাই। দৃশ্যপট প্রভৃতিব ক্ষতিপূবণ হইল দীর্ঘ স্বগত উক্তি অথবা প্রকাশ্য বক্তৃতাব দ্বাবা। ঊনবিংশ শতাব্দীব সপ্তম দশকে এই নূতন যাত্রা-পদ্ধতিব—গীতাভিনযেব-প্রবর্তন।" (পৃ ৭৭)

৫ মনোমোহন বসুব এই গান হিন্দুমেলাতে প্রথম গীত হয ও জনপ্রিযতা লাভ কবে। পববর্তী সংকলনে গানটিব পূর্ণ বা সংক্ষিপ্ত রূপ আছে।

৬ 'বাঙ্গালীব গান' দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত, বঙ্গবাসী কার্যালয, ১৯০৫ নতুন সংস্কবণ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২

৭ বাঙ্গালীব গান, তদেব

৮ বাঙ্গালীব গান। তদেব

৯ বাংলা দেশাত্মবোধক গানেব ধাবা-নীহাববিন্দু সেন , সমতট প্রকাশন, ১৯৯০

স্বদেশি আন্দোলন ও সংবাদ-মাধ্যম

গৌতম নিয়োগী

প্রস্তাবনা

বিংশ শতাব্দীব প্রথম দশকে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলনেব সময জনগণেব মধ্যে বাজনৈতিক তথা ঔপনিবেশিকতা-বিবোধী চেতনা বিস্তাবে এবং আন্দোলনেব হাতিযাব হিসেবে সংবাদপত্র ও সামযিকপত্র যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবেছিল, সে বিষযে কোনও সন্দেহ নেই। বস্তুতপক্ষে দেশাত্মবোধ ও আত্মশক্তিব বিকাশে বাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, দল ও সংগঠনগুলিব মতো সাহিত্য, নাটক, সংগীত, শিল্প ইত্যাদি সাংস্কৃতিক মাধ্যম যেমন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন কবেছিল, সংবাদ-মাধ্যমও তেমনি আন্দোলনকে শক্তি জুগিযেছিল নানাভাবে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনেব শতবর্ষে স্বদেশি আন্দোলনে সংবাদ-মাধ্যমেব ভূমিকা কিঞ্চিৎ বিস্তাবিতভাবে ফিবে দেখা, ভূমিকাব বিচাব কবা এবং মূল্যাযন প্রচেষ্টাব উদ্দেশ্যেই বর্তমান প্রবন্ধটিব অবতাবণা।

গোডাতেই কতকগুলি কথা বলে নেওযা ভালো। প্রথমত, আমাদেব আলোচনাব কাল-পরিধি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দেব মধ্যে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীযত ওই সমযেব মধ্যে বাংলা দেশে ইংরেজি ও দেশীয ভাযায অনেক সংবাদপত্র ও সামযিকপত্র প্রকাশিত হয। ইংবেজি পত্র-পত্রাদি শিক্ষিত শ্রেণীব মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাতে স্বাভাবিক কাবণে বাংলা ভাষাব পত্রপত্রিকাব গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি ব্যাপক। এই ব্যাপ্তিব কাবণে আমাদেব জোবও বাংলা সংবাদ-মাধ্যমেব উপবেই স্বাভাবিকভাবে বেশি। তৃতীযত, বাংলাই হোক আব ইংবেজিই হোক, সে-যুগে যত পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হত, তাব সব কিছুব বিববণ, এমনকি শুধু বাছাই করা অধিকতব তাৎপর্যপূর্ণ কাগজগুলিব সম্পর্কেও বিস্তাবিত আলোচনা এক প্রবন্ধেব পবিসবে কবা কঠিন। তাই এখানে কিছুটা 'সাবজেকটিভ চযেস্'-এব ঝুঁকি নিযে কিছু পত্রিকাব উপব বেশি আলোকপাত কবা হবে। চতুর্থত, শুধু কলকাতা শহব থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাব উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না বেখে প্রযোজনমতো মফস্সলেব সংবাদ-মাধ্যমের উপবে চোখ ফেবানো হবে। পঞ্চমত, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনেব সমযকাব অনেক পত্রপত্রিকা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তো একেবাবেই পাওযা যায না। বছব পাঁচেক ধবে 'অববিন্দ ঘোষ ও জাতীয বিপ্লবী আন্দোলন (১৮৯৩-১৯১০)' শীর্ষক এক গবেষণা-প্রকল্পেব সূত্র ধবে দেশ-বিদেশেব নানা গ্রন্থাগাবেব খোঁজ-খবব নিযে আমাব মনে এই ধাবণা আবও বদ্ধমূল হযেছে। স্বাভাবিকভাবেই অনেক সমযই নির্ভব কবতে হযেছে পবোক্ষ সূত্রেব উপব। এই সূত্রগুলিব অন্যতম হল ঔপনিবেশিক সরকাবেব আমলাদেব পাগানো প্রতিবেদন। মনে বাখা দবকাব তাবা Report on Native Papers in Bengal শিবোনামে সাপ্তাহিক প্রতিবেদন পাঠাতেন। তাছাড়া ছিল Report

on Native-owned Newspapers on Bengal এবং Annual Report on Indian Papers এগুলি সবই পশ্চিমবঙ্গ সবকাবেব বাজ্য লেখ্যাগাবে পাওয়া যায।

এখানে বলা দবকাব যে তখন বঙ্গভঙ্গেব আগে দুটি দেশীয মালিকানাধীন ইংবেজি পত্রিকায বাজনীতি বিযযক লেখা থাকত। সেগুলি হল শিশিবকুমাব ঘোয ও পবে মতিলাল ঘোয-সম্পাদিত 'অমৃতবাজাব পত্রিকা' এবং সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায-সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' থাকত বটে তবে জনসাধাবণেব মনে তেমন দাগ কাটেনি। স্বদেশি আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখনও 'বেঙ্গলী' কাগজ নবমপন্থী। নিযমতান্ত্রিক আন্দোলনেব সমর্থক। স্ববাজেব প্রকৃত প্রচাবক নয, তাই আমাদেব আলোচনায বেঙ্গলীকে বাখিনি। অন্যান্য দৈনিক ও সাপ্তাহিকেব মধ্যে 'ইন্ডিযান মিবব', 'দ্য মুসলমান' বা 'ইন্ডিযান নেশন' পত্রিকায বাজনীতিব খবব থাকলেও তাবাও নবমপন্থী। ববং অনেক বেশি ইংবেজ বিবোধী ছিল বিপিনচন্দ্র পালেব সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নিউ ইন্ডিযা'। তবে প্রথম স্তবে (১৯০১-১৯০৩) বিপিনচন্দ্রও যেমন চবমপন্থী হযে ওঠেননি, পত্রিকাটিও তাই। ১৯০৪ থেকে চবিত্র বদল ঘটে। যে 'হিন্দু প্যাট্রিযট' ১৮৫৭-তে হবিশচন্দ্র মুখোপাধ্যাযেব সময ছিল কড়া সমালোচক, বিশ শতকেব প্রথম দশকে তা টিকে ছিল তবে তা স্তিমিত। নগেন্দ্রনাথ ঘোযেব 'ইন্ডিযান নেশন'ও নরম। নবেন্দ্রনাথ সেনের 'ইন্ডিয়ান মিবব'ও তাই।

গোযেন্দা দফতবেব অফিসাব জি সি. ডেনহ্যামেব হিসেব অনুযাযী ১৯০৮-এব মার্চ মাসে ইংবেজি কাগজগুলিব মধ্যে 'বেঙ্গলী'ব বিক্রি সবচেযে বেশি প্রায এগাবো হাজাব, অমৃতবাজাব সাড়ে সাত হাজাব, ইন্ডিযান মিবব এক হাজাব, হিন্দু প্যাট্রিযট আটশো, ইন্ডিযান নেশন পাঁচশো, নিউ ইন্ডিযাও তাই। নিউ ইন্ডিযা বিপিনচন্দ্র পাল প্রকাশ শুরু কবেছিলেন ১৯০১-এব অগাস্ট থেকে। অধ্যাপক সুমিত সবকাব তাঁব 'দ্য স্বদেশি মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল' শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য কবেছেন যে, "Till August 1906, Bepin Chandra Pal's Weekly *New India* was the only English language medium for the expression of the ideas of the Bengal extremists ' আব একটি তথ্য এই যে দেশীয মালিকানাধীন নয, ইংবেজেব খযেব খাঁ, এমন পত্রিকাগুলিব মধ্যে ছিল 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান,' 'এম্পাযাব', 'ইংলিশম্যান' এবং 'ইন্ডিযান ডেইলি নিউজ'।

ইংবিজি সংবাদ মাধ্যমেব মধ্যে সত্যি সত্যি যে পত্রিকাটি স্বদেশি আন্দোলনেব সময সবচেযে গুরুত্বপূর্ণ, যা মুক্তি সংগ্রামে নতুন কথা শুনিযেছিল, তা ছিল 'বন্দে মাতবম্'। এই পত্রিকাটি ছিল দৈনিক। পবে সাপ্তাহিক সংস্কবণও বেরুতো। এই পত্রিকায সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন অববিন্দ ঘোয। আমাদেব আলোচনায এই পত্রিকাটিকে নিযে বিশদ অবলোকন পবে যথাস্থানে কবব।

মুখবন্ধে বাংলা পত্রপত্রিকা সম্পর্কেও কিছু সাধাবণ কথা বলা দবকাব। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন সর্বপ্রথম সেই পবিস্থিতির সৃষ্টি কবে যখন বাজনৈতিক প্রযোজনে মঞ্চ এবং সংবাদমাধ্যম সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হল, মহাবিদ্রোহেব বা নীলবিদ্রোহেব পব ধীবে ধীবে যে দেশাত্মবোধ ও জাতীযতাবাদেব বিকাশ ঘটছিল, সেই মুক্তি আন্দোলনেব

ক্রমবিকাশেব ইতিহাসে যা অভিনব। ইংবেজি-শিক্ষিত মানসেব কাছে যুক্তিগ্রাহ্য আবেদনেব যে জোর আপামব জনতার কাছে আবেগসর্বস্ব আকুতি বাঙালি মানসে স্বাভাবিক কাবণেই তাব চাইতে অনেক ব্যাপক। পবিস্থিতি যাত্রা-নাটক-কবিতা গান লোকসংস্কৃতি-মেলা-উৎসব-এমনকি ধর্মানুষ্ঠান পর্যন্ত বাজনীতিব প্রযোজনে বিশেষ যুগে কতখানি কাজে লাগানো যেতে পাবে, তা বাঙালি সেই প্রথম দেখল বিশ শতকের প্রথম দশকে। শাসকশ্রেণী উনিশ শতকেব সত্তবেব দশকে যখন নাট্যাভিনয নিযন্ত্রণ আইন বা দেশীয ভাষাব সংবাদপত্র আইন পাশ কবে এই প্রবণতাব অঙ্কুব লুপ্ত কবে দিতে চেযেছিল, তাবাও তিনদশক পবে, দেশ-ভাগেব হঠকাবী কাজেব ফলে অবস্থাব পালাবদল বুঝতে পাবেননি। এই টানা-পোড়েনে বাংলা সংবাদপত্র ও সামযিকপত্রেব ভূমিকা বড়ো কম নয়।

অবস্থাবও ক্রম-বদল ঘটছিল। বঙ্গভঙ্গেব আগে ১৯০৫-এব জুলাই মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা তথা দেশীয অন্যান্য ভাষায় সংবাদপত্র ছিল মাত্র পাঁচটি অন্তত সবকাবেব গোপন নথিতে তেমনই হিসেব পাচ্ছি। এব মধ্যে দুটি বাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলি হল 'হিতবাদী' এবং 'সন্ধ্যা'। সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল ৫৭টি, যা দেশীয় ভাষায বেরুতো—এব মধ্যে ১৮টি কলকাতা থেকে, যাব মধ্যে তিনটি হিন্দি ও একটি ফাবসি, ১৩টি বর্ধমান বিভাগ থেকে, ৮টি ঢাকা বিভাগ থেকে, ৭টি প্রেসিডেন্সি বিভাগ থেকে, ৬টি চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে এবং ৫টি বাজসাহী বিভাগ থেকে। মাসিক পত্রিকাও ছিল অসংখ্য। সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিব মধ্যে 'হিতবাদী', 'বসুমতী', 'বঙ্গবাসী' এবং 'সঞ্জীবনী' উল্লেখযোগ্য, তবে ১৯০৬-এব মার্চ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'যুগান্তব' আন্দোলনে একেবারে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। আসলে ১৯০৫ থেকে ১৯১০-এব মধ্যে নতুন সংবাদ-মাধ্যমেব আত্মপ্রকাশ যেমন ঘটে, নতুন সুবও শোনা যেতে থাকে।

প্রস্তাবনায আমবা যা বলতে চাইছি তা হল, স্বদেশি পর্বে বাংলাব সংবাদপত্র ও সামযিকপত্রেব জগতেব দিকে তাকিযে গতিপ্রকৃতি, প্রবণতা, সমাজে প্রতিক্রিযা বিশ্লেষণ কবাই আমাদের লক্ষ্য। সমস্ত কাগজেব ফর্দ কবা, কে কোন কাগজ সম্পাদনা কবতেন, কতদিন চলেছিল, কত 'সার্কুলেশন' এসব ফিবিস্তি তাই বিবেচ্য নয। গুরুত্ব বিচাব হবে শেষ পর্বে, তাব আগে, আমবা বাংলা ইংবেজি মিলিযে কতকগুলি কাগজেব দিকে বিশেষ নজব দেব। এগুলি হল ইংবিজি 'বন্দে মাতরম্' বাংলা 'সঞ্জীবনী', 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তব', 'নবশক্তি এবং 'অন্যান্য' শিবোনামে কিছু পত্রিকাব কথা একত্রে বলা হবে। লক্ষণীয যে বঙ্গভঙ্গ ও অব্যবহিত পববর্তী সমযে পত্রিকাগুলিব মধ্যে সুব, তাল, লয অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গি গত পার্থক্য ছিল, লেখা প্রকাশও সেবকমই হত, ব্রিটিশদেব প্রতি মনোভাবেও ভিন্নতা ছিল এবং ফলত স্বদেশি আন্দোলনে তাদেব ভূমিকাব মধ্যে ভিন্নতা তো স্বাভাবিক।

তিনটি শেষ প্রসঙ্গ উত্থাপন কবে এই মুখবন্ধ শেষ করব। প্রথম কথা হল, 'স্বদেশি আন্দোলন ও সংবাদ মাধ্যম' বলতে গিযে কেন 'বেঙ্গলী'ব মতন দৈনিক কাগজ, 'নিউ ইন্ডিযা'ব মতন সাপ্তাহিক বা 'হিতবাদী'ব মতন বাংলা সাপ্তাহিক নিযে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা হলো না? একথা ঠিকই যে ওই যুগ সম্পর্কে প্রভূত তথ্য সুবেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায সম্পাদিত 'বেঙ্গলী'তে পাওযা যায, বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'নিউ ইন্ডিযা' স্বদেশি যুগেব প্রভাবশালী কাগজ যদিও তাব পাঠকসংখ্যা বেঙ্গলীব তুলনায অতি নগণ্য। দুটি কাগজকে নবমপন্থী ও চবমপন্থী ধবা হলেও বাঙালি মানসে নতুন ধাবা প্রবর্তন তাবা কেউই কবেনি। তাছাড়া আগেই বলেছি সব কাগজ নিযে আলোচনা সম্ভবও নয, প্রযোজনও নেই। একই কাবণে সপ্তাহে যাব বিক্রি ছিল সেযুগেই ১৬ হাজাব (১৯০৫-এব জুলাই-এব হিসেব), কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ সম্পাদিত 'হিতবাদী', প্রভাবশালী হওযা সত্ত্বেও, আলাদা আলোচনা বাদ দিতে হযেছে।

দ্বিতীয প্রশ্ন উঠতে পাবে, হবিদাস মুখোপাধ্যায এবং উমা মুখোপাধ্যাযেব বহু গ্রন্থ বা সুমিত সবকাবেব স্বদেশি আন্দোলন বিযযক উচ্চাঙ্গেব গবেষণাব পব নতুন কথা কি বলাব থাকে? সবিনযে জানাই, হ্যাঁ থাকে। সব ছেড়ে দিযে সংবাদ-মাধ্যম বিযযেই বলি। তাঁদেব গ্রন্থাদি প্রকাশিত হওযাব পব নতুন মালমশলা আবিষ্কৃত হযেছে। মাত্র একটি উদাহবণ দিচ্ছি। বাংলায জাতীয বিপ্লবী আন্দোলনেব আদি পর্বেব বিখ্যাত বাংলা সাপ্তাহিক 'যুগান্তব' ধবেই নেওযা হযেছিল কোথাও নেই। দু'চাবটে খুচবো সংখ্যা বা ইংবিজিতে ভাযান্তবিত কিছু সংখ্যাব সবকাবি প্রতিবেদন বা 'যুগান্তব' অফিস থেকে প্রকাশিত পত্রিকাব সংকলন 'মুক্তিকোণ' ছাড়া মুখোপাধ্যায দম্পতী বা সুমিত সবকাবেব ব্যবহাব কবাব সুযোগ হযনি। এমনকি, অমলেশ ত্রিপাঠী, বিমানবিহাবী মজুমদাব, বিপান চন্দ্র, হীবেন চক্রবর্তী বা পিটাব হিজ বা অন্য কোনও গবেষকও তা দেখেননি। সৌভাগ্যবশত, 'যুগান্তব' পত্রিকাব প্রায পুবো ফাইলই সন্ধান পাওযা গেছে এবং আমি দুটি প্রবন্ধে তাব বহুল ব্যবহাবও কবেছি।

শেয কথা হল, সংবাদ-মাধ্যমেব ভূমিকা ফিবে দেখাব আগে স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে সাধাবণ দু'একটা কথা পাঠক-পাঠিকাদেব মনে বাখা দবকাব। ফলে সচবাচব 'স্বদেশি' আন্দোলন নামে যা আখ্যাযিত কবা হয, তা বস্তুত বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন, যদিও বাংলাব বাইবেও তা প্রভাব ফেলেছিল। এই আন্দোলনেব কেন্দ্রবিন্দু ছিল লর্ড কার্জনেব বাংলা-ভাগ (১৯০৫)। কার্জন মুখে শাসনতান্ত্রিক সুবিধেব কথা বললেও ব্রিটিশ শাসকেবা বাংলা ভাগ কবেছিল মূলত তিনটি উদ্দেশ্য মাথায বেখে। প্রথমত, বাংলা ও বাঙালি— যে এবং যাবা ব্রিটিশ বিবোধী বাজনৈতিক সংগ্রামেব পীঠস্থান ও পুবোভাগে তাদেব সজোবে ধাক্কা দেওযা, দ্বিতীযত, বাংলাকে বিচ্ছিন্ন কবে বাংলাব অর্থনীতিকে পঙ্গু কবে দেওযা এবং তৃতীযত, বাংলাব প্রধান দুই ধর্মসম্প্রদায হিন্দু ও মুসলমানদেব বিরুদ্ধে বিভেদ ও অনৈক্য উস্‌কে দিযে, নিজেদেব মধ্যে আভ্যন্তবীণ বিবোধ বাড়িযে দিযে শাসনকার্যেব সুবিধে নেওযা। তবে কার্জনেব এই যড়যন্ত্র সফল হযনি। বঙ্গভঙ্গেব বিরুদ্ধে যে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে অনেকটা তাব জন্য শেয পর্যন্ত ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বদ কবতে হয। কার্জন বাংলা ভাগেব জন্য দাযী থাকলেও এব পিছনে দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ১৮৭৪ খ্রি প্রথম যখন স্বতন্ত্র অসম বাজ্য সৃষ্টি কবা হয তখনই বাঙালি-সংখ্যাগবিষ্ঠ শ্রীহট্ট জেলাকে বাংলা থেকে নিযে তাব সঙ্গে জুড়ে দেওযা হযেছিল। এবপব ১৮৯২, ১৮৯৬-৯৭ এবং ১৯০১-১৯০২-তে শাসনতান্ত্রিক প্রযোজনে বাংলা প্রদেশকে ভাগ কবাব কথা উঠেছে।

১৯০৩ খ্রি বাংলাব ছোটোলাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজাব এবং আবেক আমলা হাবার্ট বিজলি ভাগেব পবিকল্পনা পর্যন্ত প্রস্তুত কবে ফেলেন। কার্জনও তা মেনে নেন। ১৯০৪ খ্রি কার্জন নিজ মতেব পক্ষে পূর্ববঙ্গবাসীকে টেনে আনাব জন্য সেখানে সফবে যান এবং ভ্রান্ত যুক্তি, ভয ও প্রলোভন দেখান। পবিকল্পনাতে নানা অদলবদল ঘটতে থাকে। ১৯০৫-এব ২ ফেব্রুযাবি চূড়ান্ত পবিকল্পনা বিলেতে ভাবত সচিবেব কাছে পাঠানো হয। ৯ জুন ভাবত-সচিব সম্মতি জানান। ১৯ জুলাই ভাবত সবকাব 'বঙ্গ বিভাগ' হবে জানিযে দেন। বঙ্গ ভঙ্গ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা কবা হয ১ সেপ্টেম্বব এবং ঠিক হয ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দেব ১৬ অক্টোবব থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকব হবে।

বিপবীত পক্ষে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে যখন বঙ্গ বিভাগেব পবিকল্পনা শোনা যেতে থাকে তখন থেকেই তাব বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ধ্বনিত হতে থাকে, যা আবও বাড়ে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে। বঙ্গীয ভূস্বামী সম্প্রদায থেকে সাধাবণ মানুয এতে শামিল হন। সংবাদ-মাধ্যম এই সময থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবতে থাকে। বাংলাব ব্যবস্থাপক সভাতেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয। স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে ১৯০৫ খ্রি। নানা সভা-সমাবেশ ঘটতে থাকে। সিমলা থেকে ভারত সবকাব বঙ্গেব অঙ্গচ্ছেদ চূড়ান্ত ঘোষণাব (১৯ জুলাই ১৯০৫) পব ১৯০৫-এব ৭ আগস্ট কলকাতাব টাউনহলেব বিশাল সভাকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব জলবিভাজিকা বলা যেতে পাবে। এবপব ১৬ অক্টোবব বঙ্গভঙ্গেব দিন ববীন্দ্রনাথেব নেতৃত্বে বাখিবন্ধন, সার্কুলাব বোডে ফেডারেশন হল প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রচেষ্টাব পাশাপাশি ক্রমে দেখা যায 'বযকট', 'স্বদেশি', 'জাতীয শিক্ষা' ও 'স্ববাজ'-এব আদর্শ।

হবিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায লিখেছেন "১৯০৫-এব স্বদেশি আন্দোলন বাংলাব জাতীয আন্দোলন। এই আন্দোলন বিশেয কোন শ্রেণী বা সম্প্রদাযেব মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বাদেশিকতাব এমন সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ভাবতীয ইতিহাসে ইতঃপূর্বে আব কখনও দৃষ্ট হযনি। ইলবার্ট বিল আন্দোলন ও সুবেন্দ্রনাথেব কাবাববণ উপলক্ষে ১৮৮৩ সনে এদেশে যে ঐক্যবদ্ধ ভাবতীয আন্দোলন পবিলক্ষিত হয, স্বদেশি আন্দোলনেব তীব্রতা ও ব্যাপকতার সামনে তাও যেন তলিযে গেল। ১৯০৫ এব আন্দোলন শুধু কলিকাতা বা এমন কি বাংলাব শহব মফস্বলেই সীমিত ছিল না, এব ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ, বিহার, উড়িয্যা ছাডাও যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বে প্রেসিডেন্সী, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী ইত্যাদি অঞ্চলেও শ্রুত হয।" সুমিত সবকাব স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে সবিস্তাব ও অনুপুঙ্খবহুল গবেযণা কবে দেখিযেছেন যে এই আন্দোলন আদৌ একমাত্রিক ছিল না, এব মধ্যে নানা ধাবা-উপধাবা ছিল। ১৯০৫-১৯০৬-১৯০৭ ভাবতীয জাতীয কংগ্রেসেব যথাক্রমে বেনাবস-কলকাতা-সুবাট অধিবেশনেও এই আন্দোলনেব প্রভাব দেখি। ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ছিল আন্দোলনেব প্রধান কাল। শেয পর্যন্ত ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বদ হলেও বাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তবিত হয। প্রতি পর্বেই সংবাদমাধ্যম বিশিষ্ট ভূমিকা পালন কবে।

'বন্দে মাতরম'

'বন্দে মাতরম' ইংরেজি দৈনিক, পরে সাপ্তাহিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা শুরু করেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, মাঝখানে দীর্ঘদিন পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সংস্রব ছিল না, শেষ দিকে আবার তিনি পত্রিকার হাল ধরেন। বন্দে মাতরম্-এর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে অরবিন্দ ঘোষের নাম। তাঁর অবিস্মরণীয় নানা লেখা এই পত্রিকায় বেরিয়েছিল। এই পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা সূত্রেই তাঁকে বন্দি করেও ধরে রাখতে পারেনি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার। অধ্যাপক হরিদাস এবং উমা মুখোপাধ্যায় তাঁদের দুটি গ্রন্থে (গ্রন্থপঞ্জি দ্রষ্টব্য) এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অনেক তথ্য পরেও জানা গেছে।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট বিপিনচন্দ্র পাল 'বন্দে মাতরম্' নামে কাগজ বের করতে চেয়েছিলেন কিন্তু শ্রীহট্টে সুরমা উপত্যকা সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি ৬ আগস্ট রওনা হন। ফলে ১৯০৬-এর ৬ আগস্ট প্রথম বের হয় বন্দে মাতরম দৈনিক। ইতোমধ্যে জুলাই মাসেই বরোদা থেকে ছুটি নিয়ে অরবিন্দ ঘোষ কলকাতা এসেছেন, বসবাস করছেন ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বসু মল্লিকদের বাড়িতে এবং আগস্টের ১৫ তারিখে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা করা 'বেঙ্গল ন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ'-এর প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। ৫ আগস্ট বিপিনচন্দ্র অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে তাকে 'বন্দে মাতরম্'-এর দায়িত্ব দেন। যে নতুন ভাব, চিন্তা, দর্শন ও আদর্শ বিপিনচন্দ্র পাল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের যুগে প্রচার করতে চেয়েছিলেন, তাকে এক বিপ্লবী নীতির দর্পণ করে তোলেন অরবিন্দ। অরবিন্দের বিখ্যাত রচনা 'The Doctrine of Passive Resistance' এখানেই বেরিয়েছিল। এই পত্রিকায় যুক্ত ছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী।

বিপিনচন্দ্র পালের জামাতা সুরেশচন্দ্র দেব 'বন্দে মাতরম পত্রিকার জন্মবৃত্তান্ত' নামক রচনায় লিখেছেন "এই সময় বিপিনচন্দ্র কাহাকেও একপ্রকার না জানাইয়া পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। কালীঘাটের শ্রীহরিদাস হালদার ও শ্রীহট্টের ক্ষেত্রমোহন সিংহ দুইজনে ৪৫০্ টাকা দিলেন, পত্রিকা ছাপাইবার ভার নিলেন তদানীন্তন 'প্রদীপ' পত্রিকার ও ক্লাসিক প্রেসের সত্ত্বাধিকারী শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্তী। প্রেসের অফিস ছিল তদানীন্তন করপোরেশন স্ট্রীটের উপর, ওয়েলেসলী স্ট্রীট ও লোয়ার সার্কুলার রোডের মধ্যস্থলে বাড়িটি অবস্থিত ছিল। বিহারীলালের সঙ্গে ব্যবস্থা হইল যে তিনি দৈনিক বিক্রয়ের আয় হইতে ছাপার ব্যয় আদায় করিবেন।" আসলে বিপিনচন্দ্র পালের 'নিউ ইন্ডিয়া' সাপ্তাহিক নব্যজাতীয়তাবাদী অর্থাৎ চরমপন্থী গোষ্ঠীর সমর্থক হয়ে উঠলেও ইংরেজি দৈনিকের অভাব মোচনে ছিল অপারগ। এমন কাগজ দরকার যারা নিরস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বরাজ লাভের আদর্শ তুলে ধরবে সর্বভারতীয় জনগণের সামনে। মনে রাখা দরকার, সেই সময় বাংলায় শুধু বঙ্গভঙ্গ নয়, সরকারি দমন-পীড়নও প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল। বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে এই নিপীড়ন চরমে ওঠে। এই প্রেক্ষিতেই 'বন্দে মাতরম্' প্রকাশ, যাকে উঁচু তারে বেঁধে দিলেন অরবিন্দ ঘোষ।

এক সময় অনেক শিক্ষিত ভারতবাসী যেমন ব্রিটিশ ন্যায়পরায়ণতা ও আইনের শাসনে বিশ্বাসী ছিলেন, তেমনি অনেক সংবাদপত্রও। যেমন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *Bengalee* পত্রিকার ৮ জুলাই, ১৯০০ সংখ্যায় 'Englands greatness and India's Gain' শীর্ষক সম্পাদকীয় বেরিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ অবস্থা বদলে দেয়, জাতীয়বাদী নেতাদের মোহভঙ্গ হয় অনেকটা, অভ্যুদয় ঘটে চরমপন্থা ও বিপ্লববাদের, পথ সুগম হয় আত্মশক্তি গঠনের। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র হয়ে ওঠে নবযুগের পত্রিকার শিরোনাম, নব জাতীয়তাবাদের প্রতীক। মনে রাখা দরকার ১৯০৫-এর ৭ আগস্ট কলকাতার টাউনহলের বিশাল সভা, যাকে স্বদেশি আন্দোলন সূচনা বললেও ধরলে অন্যায় হবে না, সেই সভাতেই 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান দেওয়া হল। শপথ নেওয়া হল স্বদেশি, বয়কট, স্বরাজ, জাতীয় শিক্ষার। শুধু চেতনা নয়, চাই তেজ-দীপ্তি-শক্তি। 'বন্দে মাতরম' পত্রিকা তাই এনে দিল।

প্রথম সংখ্যা ১৯০৬-এর ৬ আগস্ট অফিস ২/১ ক্রীক রো, কলকাতা। নভেম্বর থেকে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি। সম্পাদক হিসেবে কারও নাম ছাপা হত না। অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র ছাড়াও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিজয়চন্দ্র চ্যাটার্জী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ যুক্ত, রাজা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিকও। আগেই লিখেছি একেবারে গোড়ায় এবং একদম শেষে বিপিনচন্দ্র পাল থাকলেও, মাঝে দীর্ঘকাল অরবিন্দই সর্বেসর্বা। তার কথা লিখেছেন স্বয়ং অরবিন্দ উত্তরকালে *On Himself* বইতে। "The rule of confining political action to passive resistance was adopted as the best policy for the National Movement at that stage and not as part of a gospel of Non-Violence or Peace Sri Aurobindo has never concealed his opinion that a nation is entitled to attain its freedom by violence, if it can do so or if there is no other way. whether it should do so or not. depends on what is the best policy. **not on ethical considerations of the Gandhian kind**" (স্থূলাক্ষর বর্তমান লেখকের)।

নতুন যুগের মন্ত্র অর্থাৎ প্রয়োজনে নিরামিষ মার্কা অহিংস পথ ছেড়ে অস্ত্র ধরার কথা বললেন অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম' পত্রিকায় (দ্র 'The Realism of Indian Nationalist Policy', ২৪ এপ্রিল, ১৯০৮)। এর আগের বছর দৈনিকে বেরুলো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লেখা যেমন 'Shall India be free?' শীর্ষক (দ্র ২৭ এপ্রিল, ১৯০৭, ২৯ এপ্রিল, ১৯০৭, ৩০ এপ্রিল, ১৯০৭, ২ মে, ১৯০৭)। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল অরবিন্দ লিখেছেন নতুন পরিস্থিতি নিয়ে, শিরোনাম 'The Essence of the New Movement'। আর তার আগের বছর অর্থাৎ ১৯০৬-তে, প্রথম বছরে কংগ্রেস-নীতির তুলোধোনা। দুটি উদাহরণ, 'Congress and Democracy' ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৬, 'The Results of the Congress' ৩১ ডিসেম্বর, ১৯০৬।

উল্লেখ করা দরকার যে অরবিন্দ বা 'বন্দে মাতরম' নিজেদের চরমপন্থী মনে করত না, ভাবত জাতীয়তাবাদী। অরবিন্দের ভাষায় "There are at present not two parties in India, but three, —The loyalists, the Moderates and the Nationalists"

(দ্র *Bande Mataram* Daily, 26 April, 1907)। বন্দে মাতরম পত্রিকাব মাধ্যমে 'স্ববাজ' মন্ত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা কবলেন অরবিন্দ। (দ্র 'Ideals Face to Face', বন্দে মাতবম, সাপ্তাহিক সং, ৩ মে ১৯০৮, Indian Resurgence and Europe', বন্দে মাতবম, দৈনিক, ১৪ এপ্রিল, ১৯০৮)।

'বন্দে মাতবম' দৈনিক পত্রিকায অববিন্দেব 'The Doctrine of Passive Resistance শীর্ষক সাতটি লেখা বেবিযেছিল ১৯০৭-এব ১১ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিলেব মধ্যে। এখন সেগুলি একত্রে গ্রন্থাকাবে পাওযা যায। এব পব আবাব 'The New Thought' শিবোনামে ছ'টি লেখা লেখেন অববিন্দ 'বন্দে মাতবম' কাগজে ২৫ এপ্রিল, ১৯০৭ থেকে ২ মে ১৯০৭-এব মধ্যে। একদিকে নবমপন্থাব অসাবত্ব তিনি প্রমাণ কবলেন অন্যদিকে প্রসাব ঘটালেন 'বয়কট' ধাবণাব। এ চাব ধবনেব অসহযোগ—অর্থনৈতিক অর্থাৎ বিদেশি পণ্যেব, শিক্ষামূলক, বিচাব ব্যবস্থাব এবং প্রশাসনিক কাজ ও পদেব। ১৯০৭-এব ২২ এপ্রিল 'বেঙ্গলী' পত্রিকায এক লেখাব সূত্র ধবে অববিন্দ সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযেব কাছা খুলে দিলেন। তাঁবই ভাষায উদ্ধাব কবি, "We shall meet the *Bengalee's* position one by one here after Meanwhile we take over the liberty of offering one suggestion to Babu Surendranath Banerjee This veteran leader is a declared opportunist, who benves, as he himself said, in expediency more than in principles He seeks to lead the nation not by instructing it but by watching its moods and making use of them"। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা বিপিনচন্দ্র পালেব কাবাদণ্ডে গর্জে উঠেছে তাঁব কলম।

সরকাব চুপ কবে বসে থাকেনি। 'বন্দে মাতবম' অফিসে খানাতল্লাশি হল ১৯০৭ এব ৩০ জুলাই। তিনি গ্রেপ্তাব হতে পারেন ভেবে ২ আগস্ট অরবিন্দ বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজেব অধ্যক্ষপদে ইস্তফা দেন, ১৬ আগস্ট আবাব গোযেন্দা হানা। ওই কাগজে ২৭ জুন 'Politics for Indians' লেখার জন্য। ওই দিনেব কাগজ অনেক খুঁজেও পাইনি। অববিন্দ আত্মসমর্পণ কবলেও পবে জামিনে মুক্ত। সবকাব মামলা রুজু কবলেন সম্পাদক অববিন্দ, ম্যানেজাব হেমচন্দ্র বাগচি এবং মুদ্রাকব অপূর্বকৃষ্ণ ঘোযেব বিরুদ্ধে (২৬ অগাস্ট) মামলা এবং তাব দুদিন আগে ববেণ্য বিপ্লবীকে বিপ্লবপন্থাব পথিক না হযেও শ্রদ্ধাশীল ববীন্দ্রনাথ লিখলেন সেই অবিস্মবণীব কবিতা—

> দেবতাব দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
> সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ বাজা কবে
> পাবে শাস্তি দিতে! বন্ধন শৃঙ্খল তাব
> চবণ বন্দনা কবি কবে নমস্কাব—
> কাবাগাব কবে অভ্যর্থনা।

সবকাব অবশ্য অববিন্দকে কাবাগাবে পাঠাতে পাবেনি 'বন্দে মাতবম' মামলায। শেয পর্যন্ত আলিপুব বোমাব মামলায ১৯০৮-এব ২ মে গ্রেপ্তাব হবাব আগে অববিন্দ 'বন্দে

মারতম'-এ শেষ লেখা লিখলেন "New Condition" (২৯ এপ্রিল, ১৯০৮)। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিজয়চন্দ্র চ্যাটার্জী এবং শ্যামসুন্দব চক্রবর্তী মিলে শেষ চেষ্টা কবেও বন্দে মাতবম পত্রিকাকে বাঁচিযে রাখতে পারেননি। শেষ সংখ্যা বেবুলো ১৯০৮-এব ২৯ অক্টোবব। সাপ্তাহিক বন্দে মাতবমও উঠে যায়, যে কাগজেব লেখা 'The Coming Trial of Strength' ভাগ্যিস গ্রে স্ট্রিটেব বাড়িতে গ্রেপ্তাবেব আগেই অববিন্দ লিখে বেখেছিলেন, তা ছাপা হয ১৯০৮-এব ৬ মে। ব্যস্। শেষ সংখ্যা অবশ্য অনেকগুলিই দেখতে পাইনি।

'সঞ্জীবনী'

সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপে 'সঞ্জীবনী' যখন প্রথম প্রকাশিত হয তখন বাংলায ইলবার্ট-বিল নিযে আন্দোলন তুঙ্গে। সময ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ 'সম্পাদক কৃষ্ণকুমাব মিত্র'। আদি বাড়ি পূর্ববঙ্গেব ময়মনসিংহ জেলায। সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজেব কর্মী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীব অন্যতম প্রিয শিষ্য। উত্তবকালে ব্রাহ্মসমাজেব এক বিশিষ্ট নেতা। 'সঞ্জীবনী' দীর্ঘকাল চলেছিল। বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনেব সময এই পত্রিকায সুদৃঢভাবে বঙ্গভঙ্গেব বিরুদ্ধে সক্রিযভাবে লেখনী ধাবণ কবেছিলেন কৃষ্ণকুমার। তাঁব সম্পাদকীযগুলি মানুযকে ভীষণভাবে উদ্দীপ্ত কবেছিল। 'বযকট' প্রস্তাবেব প্রথম উদ্গাতা কৃষ্ণকুমাব ও সঞ্জীবনী।

কৃষ্ণকুমাব মিত্র চবমপন্থী ছিলেন না, চবমপন্থীবা তো তাকে নরমপন্থীই মনে কবতেন। অথচ এই নির্ভীক ও সততাব প্রতীক মানুযটি তাঁব সুদৃঢ অবস্থান কখনও বদলাননি। বিচ্যুতও হননি। কৃষ্ণকুমাব সম্পর্কে বিস্তাবিত আলোচনা কবাব অবকাশ এখানে নেই। পাঠক-পাঠিকাবা তাঁব সুলিখিত 'আত্মজীবনী' পড়ে দেখতে পাবেন। স্বদেশি যুগে তাঁব এই সুদৃঢ মানসিকতাব জন্যই, কৃষ্ণকুমাব স্মবণীয। 'সন্ধ্যা' কিংবা 'যুগান্তব' বা 'নবশক্তি'ব কথা বলাব আগে তাই 'সঞ্জীবনী' সম্পর্কে দৃষ্টি দেওয়া দবকার। কালানুক্রমেও এটি আগে। বিপ্লবপন্থাব সঙ্গে তাঁব যোগ ছিল না অবশ্য অববিন্দ ঘোষ ছিলেন তাঁব নিজেব শ্যালিকা-পুত্র। চবমপন্থীদের সাহায্যেব জন্য তাঁব জেল হয। আগ্রাতে বন্দিও ছিলেন। আব একটি কথা। কৃষ্ণকুমাবেব স্ত্রী লীলাবতী (বাজনাবাযণ বসুর কন্যা)-ও স্বদেশি আন্দোলনে অংশ নিযেছিলেন। কৃষ্ণকুমাব-লীলাবতীব পুত্র (সুকুমাব) এবং দুই কন্যা কুমুদিনি (মিত্র) ও বাসন্তী (চক্রবর্তী) বাজনীতি-সচেতন ছিলেন। যে যুগে পত্রপত্রিকায সাধাবণ গবিব মানুযদেব কথা প্রায থাকতই না, সেই আমলে কৃযক, শ্রমিক, চা-বাগানেব কুলি, মজুবদেব কথা তুলে ধবেছিল সঞ্জীবনী। সঞ্জীবনী সম্পাদক পিতাব মতন কন্যা কুমুদিনিও সম্পাদনা কবতেন একটি পত্রিকা 'সুপ্রভাত'। যার জুলাই ১৯০৭ সংখ্যায ছাপা হয ববীন্দ্রনাথ ঠাকুবেব 'সুপ্রভাত' কবিতা, সেই অবিস্মবণীয পংক্তি সহ—

> উদযেব পথে শুনি কার বাণী ভয নাই ওবে ভয নাই
> নিঃশেযে প্রাণ যে কবিবে দান ক্ষয নাই তাব ক্ষয নাই।

দুর্ভাগ্যবশত, আমবা বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী পর্বে সমস্ত 'সঞ্জীবনী'ব কপি দেখতে পাইনি। তবে বেশ কিছু সংখ্যা পাওয়াতে 'সঞ্জীবনী'ব ভূমিকা বোঝা সহজ হযেছে।

'বঙ্গেব অঙ্গচ্ছেদ' শীর্ষক এক সম্পাদকীযতে কৃষ্ণকুমাব মিত্র লিখলেন "'লর্ড কার্জন বলিযাছিলেন বঙ্গ বিভাগেব প্রস্তাবটি নতূন বলিযা আন্দোলনকাবিগণ এক্ষণে ইহাকে বিপ্লবজনক মনে কবিতেছে। সুতবাং প্রথমতঃ কিছুদিন ইহাবা খুব হৈ চৈ কবিবে, কিন্তু ক্রমে যখন সহ্য হইযা যাইবে তখন বুঝিবে এই বিভাগে তাহাদেব উপকাব কি হইযাছে। অন্যায অত্যাচাব সহ্য কবিযা আমবা পাপগ্রস্থ ও অধঃপতিত হইযাছি। পাপেব শাস্তিব স্বৰূপ এক্ষণে অতি অন্যায অত্যাচাবে আমাদেব প্রাণে তীব্র বেদনাবোধ জন্মে না। বঙ্গেব অঙ্গচ্ছেদেব আন্দোলনে আমবা কার্যেব দ্বাবা দেখাইযাছি যে আমাদেব বেদনাবোধ কেবল ওষ্ঠবাহী—অন্তর্দাহী নহে। অন্তবেব বেদনা কেহ এত শীঘ্র ভুলিতে পাবে না। অথবা আমবা বাঙালী জাতি নিতান্তই নির্ব্বোধ, নতুবা এমন বিপদ পাতে একৰূপ নিশ্চিত হইযা থাকিতে পাবিতাম না।" (১৮ কার্তিক, ১৩১১ সংখ্যা)। ১৩১১ সালেব ২৫ কার্তিক সংখ্যায 'বঙ্গেব অঙ্গচ্ছেদেব আযোজন পূর্ণ হইল' শিবোনামে সম্পাদকীযতে বলা হল "বাঙ্গালী কি এখনও নীবব থাকিবেন? ইংলণ্ড হইতে এই দুঃসংবাদ আসিযাছে যে, লর্ড কার্জ্জন বঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে ভাবত সচিবেব সম্মতি গ্রহণ কবিযাছেন—কেবল ঢাকা, মযমনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগ আমাদেব সামিল কবা হইবে না। আসাম, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা বিভাগ এবং দাবজিলিং ব্যতীত সমস্ত বাজসাহী বিভাগ লইযা উত্তব পূর্ব্ব প্রদেশ নামে এক নূতন প্রদেশ গঠন কবা হইবে—একজন লেফটেন্যান্ট গবর্ণব সে প্রদেশ শাসন কবিবে।"

একদিকে 'সঞ্জীবনী' যেমন বাংলা ভাগেব খবব জনগণকে শুনিযেছে, তেমনি অন্যদিকে বাঙালি জাতিকে এই দুর্দিনে নিজস্ব ভিৰুতা ও বেদনা ত্যাগ কবে গর্জে ওঠাব আহ্বান জানিযেছে। 'বঙ্গেব অঙ্গচ্ছেদ' শিবোনামে এক সম্পাদকীযতে (২ অগ্রহাযণ ১৩১১) কৃষ্ণকুমাব জানালেন, "গবর্ণমেন্টেব নূতন প্রস্তাবেব বিৰুদ্ধে মহা আন্দোলনেব সূচনা হইযাছে। কলিকাতায এক সপ্তাহেব মধ্যেই ঘনীভূত প্রতিবাদেব জন্য এক কমিটি স্থাপিত হইবে—সমস্ত দেশে প্রতিবাদেব আগুন জ্বলিযা উঠিবে—ইংলণ্ডে সে প্রতিবাদেব ধ্বনি পহুঁছিবে—আমবা পডিযা পদাঘাত সহিব না। সমস্ত দেশ তবে জাগ। এবাব কেবল পূর্ব্ববঙ্গ নয, এবাব পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ একত্র হইযা আন্দোলনেব গভীব তবঙ্গ উত্থিত কব।" 'বঙ্গেব অঙ্গচ্ছেদ' শিবোনামে আমবা বহু সম্পাদকীয দেখেছি, যেমন ৬ শ্রাবণ, ১৩১১; ১৮ কার্তিক ১৩১১, ২ অগ্রহাযণ, ১৩১১, ৯ অগ্রহাযণ ১৩১১, ১৬ অগ্রহাযণ, ১৩১১, ৭ পৌষ ১৩১১, ২১ পৌষ, ১৩১১, ৬ মাঘ, ১৩১১ ইত্যাদি। ভাবত সচিব বঙ্গবিভাগ মঞ্জুব কবলে 'সঞ্জীবনী'ব সম্পাদকীযব নাম 'বঙ্গেব সর্ব্বনাশ' (১৩ জুলাই ১৯০৫ সংখ্যা)। বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনেব খবব পাচ্ছি ১৯০৫-এব ২০ জুলাই, ২৭ জুলাই, ৩ আগস্ট, ১৭ আগস্ট, ৭ সেপ্টেম্বব ইত্যাদি সংখ্যায। ১৯০৫-এব ২৬ অক্টোবব সংখ্যা হিন্দু-মুসলমান মিলিত প্রতিবোধেব খবব দেখি।

কৃষ্ণকুমাব মিত্র ও তাঁব সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' বযকট আন্দোলনেব এক প্রধান প্রবক্তা। তেমনি কার্লাইল সার্কুলাবেব বিৰুদ্ধে ছাত্রসমাজ শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু (উত্তবকালে কৃষ্ণকুমাবেব

জামাতা) ও বমাকান্ত বাযেব নেতৃত্বে যে 'অ্যান্টি সার্কুলাব সোসাইটি' গড়ে তোলে (নভেম্বব ১৯০৫), তাবও বিশেষ সমর্থক ছিল 'সঞ্জীবনী'। কৃষ্ণকুমাব বার্ষিক স্বদেশি মেলাবও আযোজন কবেছিলেন যা বঙ্গভঙ্গ বদেব পবও বেশ কযেক বছব টিকে ছিল। ১৯০৫-এব ১৩ জুলাই 'সঞ্জীবনী' ব্রিটিশ পণ্য বযকটেব আহ্বান জানায। ১৯০৬-তে ভাবত সচিব মার্লিকে দবখাস্ত পাঠানোব প্রস্তাবও সঞ্জীবনীব (২৬ এপ্রিল ১৯০৬)। আবাব ১৯০৮-এব ৫ ফেব্রুযাবি আন্দোলনেব পাশাপাশি দবিদ্রদেব মধ্যে কাজ কবাব আহ্বান জানায 'পথ কি' শিবোনামে।

১৯০৪ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দেব মধ্যে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব, তাব বিরুদ্ধে নানা প্রতিবাদ ইত্যাদি যেমন জানিযেছে 'সঞ্জীবনী', তেমনি আন্দোলনকে স্তিমিত হতে দেযনি। ১৬ অক্টোবব ১৯০৫-এব বাখিবন্ধনেব দিনেব সবচেযে ভালো বিববণ পাওযা যায 'সঞ্জীবনী'তেই (২ কার্তিক ১৩১২ অর্থাৎ ১৯০৫-এব ১৯ অক্টোবব সংখ্যায)। ফবাসি বিপ্লবেব সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতাব বাণী বামমোহন বাযের শিষ্য কৃষ্ণকুমাবেব উপব পড়া স্বাভাবিক। কাকতলীয যে সঞ্জীবনী যে ছাপাখানায ছাপা হত তাব নাম সাম্য, সঞ্জীবনীতে সম্পাদকীযব উপব যে পতাকা ছাপত তাতে লেখা থাকত 'স্বাধীনতা'। শুধু কলকাতা নয, সাবা বাংলাব খবব দিত সঞ্জীবনী এবং এই সাপ্তাহিকও সাবা বাংলাতেই বিশেষ পাঠকগোষ্ঠীকে উদ্দীপ্ত কবেছিল।

'সন্ধ্যা'

সন্ধ্যা পত্রিকা ছিল দৈনিক, সান্ধ্য দৈনিক। বস্তুতপক্ষে সাযংকালে বেরুতো বলেই নাম সন্ধ্যা। সম্পাদনা কবতেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায। একে তো বাংলা ভাষায দৈনিক খববেব কাগজ, তাব উপব ভাষাও তেমনি গ্রাম্য, মেঠো, সহজ, সবল—তাই জনপ্রিযতা বৃদ্ধি পেল অচিবেই। দামও ছিল মাত্র এক পযসা। জনপ্রিযতাব এও এক কাবণ অবশ্যই। তবে সবচেযে বড়ো কথা হল সন্ধ্যাব তেজ, দীপ্তি, বলিষ্ঠতা—বাংলা ভাষা নযতো যেন আগুনেব গোলা। একমাত্র 'যুগান্তব' সাপ্তাহিক ছিল এব চেযে তেজীযান, আবও অনেক বেশি বিপ্লবাত্মক। ডাঃ সুন্দবীমোহন দাসেব পুত্র (উত্তবকালে 'শনিবাবেব চিঠি'ব প্রথম সম্পাদক, সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কর্মী) যোগানন্দ দাস আমাকে বলেছিলেন যে তাঁব বাবা ও মা হেমাঙ্গিনী দাসের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবেব যোগাযোগ ছিল, তাঁদেব সুকিযাস স্ট্রিটেব বড়িতে ১৯০৬-০৭ নাগাদ, তাঁব বযস তখন দশ/এগাবো, বোজ সন্ধেবেলা সন্ধ্যা আসতে দেখতেন। কলকাতাব শিক্ষিত ভদ্রলোক যাঁবা জাতীযতাবাদী এটি সেই শ্রেণীব জীবনযাপনেব প্রতীক ধবা যেতে পাবে।

'সন্ধ্যা' প্রকাশিত হতে শুরু কবে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দেব নভেম্বব মাস থেকে। ওই পত্রিকা প্রকাশেব অনুষ্ঠানপত্রে ব্রহ্মবান্ধব লিখেছিলেন

> বাজা ম্লেচ্ছ। উপজীবিকাব জন্য, মানসম্ভ্রমেব জন্য ম্লেচ্ছ ভাষা ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিখিতে হইবে। বাজাব সহিত সম্পর্ক বাখিতেই হইবে। বাজায প্রজায কিরূপ ব্যবহাব হওযা উচিত, সেই সম্বন্ধে রাজনৈতিক কথা সন্ধ্যা পত্রিকায বিস্তব

> থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতিব কার্যকলাপ ও দেশবিদেশেব বিবিধ সংবাদ লিখিত হইবে। বিদেশীয কলাকৌশল শিখিয়া কিব্দপে ধনধান্যেব বৃদ্ধি কবিতে হয, তাহাব মন্ত্রণা থাকিবে। কিন্তু সকল কথাব মাঝে সহজ কথায বাঙ্গালীব প্রাণেব কথা আমবা সদাই বলিব। যাহা শুন—যাহা শিখ—যাহা কব—হিন্দু থাকিও, বাঙ্গালী থাকিও। সখেব জন্য সাহেবি ঢং নকল কবিলে আসল ভেস্তে যাবে। কিন্তু বিদেশী বিদ্যা শিখিলে বা পেটেব দাযে ধর্মেব ব্যাঘাত না কবিযা বহিবঙ্গ ব্যাপাবেব অল্প স্বল্প বদল কবিলে ক্ষতি নাই। সকল অবস্থায কাযমনোবাক্যে ব্রাহ্মণেব শিষ্য হইযা জাতিমর্যাদা বক্ষা কবিলে কোন দোষ স্পর্শ কবিবে না। আমবা যতই নিজেকে ভুলি না কেন, আমাদেব হৃদযে এক পুবাতন সুব যুগযুগান্তর ধ্বিযা বাজিতেছে।

ভাষাব গুরুচণ্ডালী দোষ সত্ত্বেও ব্রহ্মবান্ধবেব স্পষ্টবাদিতা লক্ষণীয। সন্ধ্যায যে 'বাজনৈতিক কথা' থাকবে তা তিনি গোপন কবেননি। তবে এই বাজনীতি ক্রমেই চবমপন্থী ঘেঁষা হযে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে দু'জন সমসামযিক ব্যক্তিব সাক্ষ্য উদ্ধাব কবছি। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন "তাঁহাব উদ্দেশ্য—তিনি দেশেব জনসাধাবণেব মধ্যে জাতীয় ভাবেব প্রচাব কবিবেন, লোককে 'সন্ধ্যা' পডাইবেন। হইল তাহাই। ট্রামেব কণ্ডাক্টব, দোকানী, পশাবী,—সন্ধ্যাব সময সকলকেই 'সন্ধ্যা' পড়িতে হইত। উপাধ্যায যুবোপীযদিগকে 'ফিবিঙ্গী' বলিতেন। সময সময় তাঁহাব কথা সাধাবণ শিষ্টাচাব সীমা লঙ্ঘন কবিত। তাঁহাব ফিবিঙ্গী বিদ্রুপেব উদ্দেশ্য ছিল ফিবিঙ্গীকে দেখিলে ভাবতবাসীব যে বহুদিনেব প্রকৃতিগত ভয, সে ভয ভাঙা।"

উগ্র জাতীযতাবাদেব পথিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায শুধুমাত্র ফিবিঙ্গি সমাজ ও সাহেবি সভ্যতার কদর্য স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সকল শক্তি নিযোগ কবলেন এমন নয, দেশবাসীর মন থেকেও সাহেব ও অ্যাংলো-ইন্ডিযান দেখলেই ভয পাওযা, সেই বদ্ধমূল ভিরুতাও দূব কবলেন। বিবেকানন্দ যেমন বাঙালিব বাহুবলেব কথা বলতেন, অববিন্দ যেমন ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা কবতেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যাযও দেশেব ভিরুতা ও তামসিকতাকে কষাঘাতে জর্জবিত কবলেন। হবিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায সঠিক মন্তব্যই কবেছেন যে "তিনি সেই বহুদিনেব অভ্যস্ত নিবাপদ তমোভাবকে নিষ্করুণভাবে আঘাত কবলেন, নিস্তেজ জাতিব প্রাণে নববক্তধাবা সঞ্চাব কবে তাব কণ্ঠে দিলেন স্বাধীনতার অগ্নিগর্ভ মন্ত্র।"

আব এক সমসামযিক ব্যক্তি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জানিযেছেন যে সন্ধ্যা ক্রমে চবমপন্থাব দিকে যাত্রা কবে। তাঁব ভাষায . "তৎপব, ১৯০৪ সনে উপাধ্যাযজী কযেকজন অনুবাগী বন্ধুব অর্থানুকুল্যে "সন্ধ্যা" দৈনিক পত্র প্রতিষ্ঠিত কবিলেন। প্রথম দিকে এই পত্রিকাতে কোন violent political turn পবিলক্ষিত হয নাই। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আবম্ভ হইলে "সন্ধ্যা" পত্রিকা ক্রমে ক্রমে উগ্রপন্থী হইতে থাকে। তখন তিনি পুবোপুবি জাতীযতাবাদী"। বস্তুত নবমপন্থাব বিরুদ্ধে বাংলা পত্রিকাব মধ্যে সন্ধ্যাই ছিল অগ্রণী, তাবপব বেরুলো 'যুগান্তব', আবও পবে 'নবশক্তি'। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন ·

উপাধ্যাযজীব 'সন্ধ্যা' পত্রিকা স্বদেশিযুগে বিশেয কার্যকব হইযাছিল। দোকানী-পশাবী ও সাধাবণ লোকদেব পাঠোপযোগী বাংলা ভাযায প্রবন্ধ লিখিযা তিনি স্বদেশবাসীকে বিদেশী গভর্ণমেন্টেব বিরুদ্ধে উত্তেজিত কবিতে লাগিলেন। 'সন্ধ্যা' পত্রিকাব উদ্দেশ্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত নবম পন্থীয বাজনীতিক মতবাদকে খণ্ডন কবা। ফিবিঙ্গি গভর্নমেন্টেব অত্যাচাব বাড়িতে থাকিলে এই পত্রিকা ক্রমে ক্রমে ভীষণ উগ্রপন্থী হইযা উঠে। এতদ্বাবা জনসাধাবণেব পুবাতন দৃষ্টিভঙ্গি পবিবর্তিত হইতে লাগিল। বৈপ্লবিক দলেব 'যুগান্তব' পত্রিকা বাহিবে হইবাব পূর্বেই সন্ধ্যা পত্রিকা বাংলাদেশে আসব জমাইযা বসিযাছিল। 'সন্ধ্যা'ব সঙ্গে টক্কব দিতে গিযা 'যুগান্তব' পত্রিকাকে প্রথম হইতেই আবও বেশী চড়া সুরে কথা কহিতে হইল।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যাযেব ভাযার একটি উদাহরণ দিলেই তাঁব বিক্রম বোঝা যাবে · "তমোভাব আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিযাছে। বজোগুণটা স্বভাবতঃ কিছু কড়া। তাই যাঁহারা নবম প্রকৃতিব লোক, তাঁহাদের ঐ কড়া মেজাজটা ভাল লাগে না। যে আফিম খাইযা মবিতে বসিযাছে, তাহাকে না চাব্‌কাইলে তাহাব সংজ্ঞা থাকিবে না। .দেশেব বোগটা কিছু বিষম হইয়াছে, তাই মকবধ্বজেবও উপবে চটী খাওযাইতে হইবে। দেশে চাবিদিকে তমোভাব—অসাবতা। এখন হাত বুলাইলে চলিবে না..রজোগুণেব দ্বারা তমোভাব দূব হইলে সত্যেব প্রতিষ্ঠা হইবে।" এই কড়া চাবুক খেযেই বাঙালি জাতিব মোহভঙ্গ ঘটল, তাই প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোয যথার্থই লিখেছেন · "উপাধ্যাযেব কৃতকার্য আমাদেব বাজনীতিব বেলায সাগবোর্মিব আঘাতমাত্র নহে। আজ যে বাঙ্গালাপত্র হাজাবে হাজাবে দশ হাজাবে দশ হাজাবে বিকাইতেছে, উপাধ্যায ব্রহ্মবান্ধব তাহাব মূল। ব্রহ্মবান্ধব এদেশে জনসাধাবণের মনে জাতীযভাব প্রচারেব পথ প্রস্তুত কবেন।"

নবমপন্থী-চবমপন্থী ভাগাভাগিতে স্পষ্টতই উপাধ্যায শেযোক্ত মতেব সমর্থক ছিলেন। 'বন্দেমাতবম্' দৈনিক প্রকাশেও তিনি সক্রিয সাহায্য কবেছিলেন। যে প্রেসে তাঁব 'সন্ধ্যা' ছাপা হত তাব মালিক ছিলেন উত্তব কলকাতাব হেদুযাব নান পবিবাবেব কার্তিকচন্দ্র নান। সমসামযিক সমস্ত দবকাবি খবব এই সান্ধ্য দৈনিকে বেরুতো, যেমন ববিশালেব প্রাদেশিক অসমাপ্ত সম্মেলন (১৪-১৫ এপ্রিল, ১৯০৬) বা কলকাতাব পান্তিব মাঠে শিবাজী উৎসব (৪-৮ জুন ১৯০৬) বা জাতীয কংগ্রেসের দাদাভাই নওবোজীব সভাপতিত্বে কলকাতা অধিবেশন (ডিসেম্বব ১ ০৬)। ক্রমে ১৯০৭-এ জাতীযতাবাদী বা চবমপন্থীদেব হযেও প্রচাব চালায 'সন্ধ্যা'। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দেব ১০ মার্চ থেকে ব্রহ্মবান্ধব 'স্ববাজ' নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ শুরু কবেন। এটি সন্ধ্যাব পবিপূবক, নতুন বাষ্ট্রদর্শন এতে পবিস্ফুট। 'স্ববাজ', 'নিষ্ক্রিয প্রতিবোধ', 'বযকট' সব তত্ত্বই সংগ্রামী মানসিকতাব প্রতীক।

এইভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামেব অগ্রগতি মডাবেটদেবও বিচলিত কবল, সাম্রাজ্যবাদী সবকাবও যৎপবোনাস্তি রুষ্ট হল। তাঁবা 'যুগান্তব', 'বন্দে মাতবম্' প্রভৃতি পত্রিকাব বিরুদ্ধে যেমন সিডিশন বা দেশদ্রোহেব মামলা এনে পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে হেনস্থা কবে, তেমনি ১৯০৭-

এব ৩০ আগস্ট 'সন্ধ্যা' অফিসে খানাতল্লাশি হয। ম্যানেজাব সাবদাচবণ সেন, মুদ্রাকব হবিচবণ দাস এবং সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায সকলেব নামেই শমন জাবি হয। সন্ধ্যা আপিস তখন ২৩নং শিবনাবাযণ দাস লেনে। মামলা রুজু হয। কলকাতাব কুখ্যাত মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড ছিলেন বিচাবক। এব মধ্যেই উপাধ্যায 'সন্ধ্যা' পত্রিকাতে ১৩, ২০ এবং ২৩ আগস্ট 'এখন ঠেকে গেছি প্রেমেব দাযে', 'ছিদিশনেব হুড়ুম দুড়ুম্ ফিবিঙ্গিব আক্কেল গুড়ুম্' এবং 'বাচ্চা সকল নিযে যাচ্ছেন শ্রীবৃন্দাবন' নামে অসাধাবণ তিনটি লেখা বেরুলো, যা সবকাবেব মতে আপত্তিজনক। মামলাব বিস্তাবিত বিববণ নিষ্প্রযোজন। পবে ১৯০৭-এব ২৪ অক্টোবব পুনবায সন্ধ্যা অফিসে খানাতল্লাশ হয। ১১ এবং ১৩ সেপ্টেম্বব দুটি বাজদ্রাহমূলক লেখাব জন্য আবাব মামলা রুজু হয। অসুস্থ ব্রহ্মবান্ধব তখন হাসপাতালে। সেখানেই তাঁব অকাল মৃত্যু (২৭ অক্টোবব ১৯০৭), সন্ধ্যা পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল।

এই ডামাডোলেব মধ্যেও ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে অনেক স্মবণীয লেখা বেবিযেছে 'সন্ধ্যা' দৈনিকে যাব উল্লেখ কবি 'আমাদেব পোযাবাবো ফিবিঙ্গিব তেবো' (৭ আগস্ট), 'আজ কালীঘাটে জোড়া পাঠা একটা কালো একটা সাদা' (৯ আগস্ট), 'ফিবিঙ্গি পবম দযালু, ফিবিঙ্গিব কৃপায দাড়ি গজায, শীতকালে খাই শাঁকালু' (২১ আগস্ট), 'ঢেঁকী অবতাব' (৩০ অগাস্ট), 'গোদা পাব ভোঁথা লাথি' (৩ সেপ্টেম্বব), 'দুশো মজা তিলাই খাজা' (৪ সেপ্টেম্বব) ইত্যাদি। ববিশালেব 'স্বদেশ' ও 'বিকাশ' পত্রেব সম্পাদক প্রিযনাথ গুহ এবং 'বেঙ্গলী' পত্রেব সহ সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যাযেব 'সন্ধ্যা'য লিখতেন। তাঁবা মামলাব সময উপস্থিত ছিলেন। 'বন্দে মাতবম' ও 'যুগান্তব' পত্রিকাতেও সন্ধ্যাব খবব বেরুতো। ১৯০৭-এব ২৪ নভেম্বব 'বন্দে মাতবম'-এব সাপ্তাহিক সংস্কবণে প্রযাত উপাধ্যাযেব প্রতি শ্রদ্ধা জানিযে যা বলা হয তাব বাংলা তবজমা এবকম "এই নির্ভীকপ্রাণ স্বদেশপ্রেমিকেব প্রায একক চেষ্টাব ফলে বাঙালী জাতিব দৃষ্টিভঙ্গি আজ সংগ্রামসুলভ হযে উঠেছে। সকল নেতাব মধ্যে তিনিই আমাদেব স্বদেশি আন্দোলনেব মধ্যে একটা উগ্র, সংগ্রামাত্মক মনোভাব সঞ্চাব কবেছেন।"

'যুগান্তব'

'যুগান্তব' পত্রিকাব পবমাযু মার্চ ১৯০৬ থেকে জুলাই ১৯০৮, কিন্তু এই স্বল্পকালীন সমযেও এই পত্রিকা স্বদেশি আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন তথা স্বাধীনতা সংগ্রামেব ইতিহাস অবিস্মবণীয ভূমিকা পালন কবেছিল। প্রথম সংখ্যা সম্ভবত ২৫ মার্চ (১৯০৬) শেষ সংখ্যা ৮ জুলাই (১৯০৮)। যুগান্তব পত্রিকাব মূল সুবটি বেঁধে দিযেছিলেন অববিন্দ ঘোষ, যদিও তিনি তখনও পাকাপাকি কলকাতায এসে আস্তানা পাতেননি। পত্রিকা প্রকাশেব স্বল্পকালেব মধ্যেই 'আমাদেব বাজনীতিক আদর্শ' শীর্ষক বচনায ছাপা হয, যা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তেব সাক্ষ্য অনুসাবে শ্রীঅববিন্দেব বচনা। লেখা হল স্বর্ণনির্মিত শৃঙ্খলেব মোহ কাটিতে হইবে ইংবাজেব অনুকবণ ও ইংবাজেব নেতৃত্ব বর্জন কবিযা আমাদেব জাতীয-স্বভাব ও দেশেব

অবস্থা বুঝিযা অভীষ্ট সিদ্ধিব উপায আবিষ্কাব কবিতে হইবে আব নবোত্থিত ভাবতবর্ষকে মহৎ আদর্শ দেখাইযা নব্যপ্রাণ অনুপ্রাণিত কবিতে হইবে। এই পথই মুক্তিব পথ অন্যথা বন্ধনই সাব''। সোনাব শৃঙ্খল মানে মডাবেট কংগ্রেসেব নবমপন্থী নীতি, যা ছিল 'যুগান্তব'-এব ভাষায 'গোলামিব জ্যাঠামি'।

'যুগান্তব' পত্রিকাব প্রায সম্পূর্ণ ফাইল দেখাব আমাব সৌভাগ্য হযেছে যা সুমিত সবকাব বা হবিদাস উমা মুখোপাধ্যায তাঁদেব বই লেখাব সময দেখতে পাননি। কাবণ যখন ধবেই নেওযা হযেছিল যুগান্তবেব ফাইল চিবতবে হাবিযে গেছে—কলকাতায জাতীয গ্রন্থাগাব, বঙ্গীয সাহিত্য পবিষৎ, শ্রীচৈতন্য লাইব্রেবি, পুলিশ বেকর্ড, বাজ্য মহাফেজখানা, জাতীয মহাফেজখানা, ব্রিটিশ মিউজিযাম, ইন্ডিযা অফিস লাইব্রেবি কোথাও নেই—তখনই ঘটনাচক্রে আলিপুব কোর্টেব দলিল পত্রাদিব মধ্যে যা আবিষ্কৃত হয। সে ভিন্ন কাহিনি। 'যুগান্তব' প্রথম পর্ব ২৫ সংখ্যা (২ সেপ্টেম্বব ১৯০৬) স্পষ্ট ভাষায জানিযে দেয যে "পবাধীন জাতিব জাতীয উন্নতিব জন্য সর্ব্ব প্রথমতঃ আবশ্যক—স্বাধীনতা—জাতীয স্বাতন্ত্র্য।" কেননা "স্বাধীনতাই জাতীয উন্নতিব মূল"।

এখানে বলা দবকাব যে 'যুগান্তব' পত্রিকাকে ঘিবে যে গোষ্ঠী গডে ওঠে তাই কালে কালে 'যুগান্তব' নামে পবিচিত হয, এটি এমনি আলাদা দল নয, 'অনুশীলন সমিতি'ব (১৯০২) মধ্যে থেকেও উপদল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁব 'ভাবতেব দ্বিতীয স্বাধীনতাব সংগ্রাম' বইতে লিখেছেন যে যুগান্তব দলেব কাগজ ছিল, টাকা সংগ্রহ, মতামত, প্রবন্ধ লেখা সমস্তই পার্টিব অভিপ্রায অনুসাবে হত। এই গোষ্ঠীব ভাবনাযক ও প্রাণপুরুষ ছিলেন অববিন্দ। যিনি 'মিথ্যাব পূজা' শীর্ষক বচনায লিখেছিলেন "যুগান্তব-এব ভাবনা কি? মানবজীবনে 'যুগান্তব' এ জাতীয় ভাব সমষ্টিমাত্র। লোকেব প্রাণেব ভিতব দিযা যে ভাবস্রোত ছুটিযাছে তাহাব এক একটা কণা মাত্র যুগান্তবে আসিযা ধাক্কা লাগে।" (দ্বিতীয বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ৫ আগস্ট, ১৯০৭)।

এই পত্রিকাব প্রথম সম্পাদক ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যদিও কাগজে সম্পাদকেব নাম থাকত না এবং সমষ্টিই ছিল নেতৃত্বে। পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগ নিযেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ ছাডাও দেবব্রত বসু, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং বাবীন্দ্রকুমাব ঘোষ। পবে এসে যোগ দেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায। পিছনে ছিলেন সখাবাম গণেশ দেউস্কব, অন্নদা কবিবাজ অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী। কাজ কবতেন বসন্ত ভট্টাচার্য, হবিশচন্দ্র ঘোষ, স্বর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ। তবে পিছনে থেকে অবিসংবাদী নাযক অববিন্দ ঘোষ। 'যুগান্তব' নামটি দেওযা হযেছিল ব্রাহ্মনেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীব 'যুগান্তব' উপন্যাস থেকে। কাগজেব দাম এক পযসা। তিনশো টাকা সম্বল কবে বেবিযেছিল। কাগজেব অফিস ছিল প্রথমে ২৭নং কানাই ধব লেন। পবে ৪১নং চাঁপাতলা ফার্স্ট লেন এবং শেষে ২৮/১, মির্জাপুব স্ট্রিটে। ৭৫নং কর্নওযালিশ স্ট্রিটও পাচ্ছি। প্রথম ছাপা হত কুমাবটুলিতে প্রকাশচন্দ্র মজুমদাবেব প্রেসে, পবে নিজস্ব 'সাধনা প্রেসে'। অন্যান্য ছাপাখানাব সাহায্যও নেওযা হত। প্রথম প্রথম সামান্য বিক্রি হত, ১৯০৭-এব ১৬ জুন সংখ্যা 'যুগান্তব' জানাচ্ছে যে

এব বিক্রি প্রায দশ হাজাব, বাড়তে বাড়তে তা প্রায কুড়ি হাজার। ভাবা যায! পত্রিকাব মুদ্রাকব ছিলেন বসন্ত ভট্টাচার্য, বৈকুণ্ঠচন্দ্র আচার্য, বিভূতিভূষণ বায, ফণীন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ।

বলা দবকাব যে ১৯০৮-এব জুলাই মাসে 'যুগান্তব' পত্রিকা বন্ধ হযে যাবাব আগেই বাংলায বিপ্লবী দলেব কার্যকলাপ বেড়েছে, মানিকতলায (মুবাবিপুকুবে) দলেব কাজ চলছে, ক্ষুদিবাম ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফবপুবে বোমা মেবেছেন এবং কলকাতাব নানাস্থানে হানা দিযে পুলিস বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তাব কবেছে। যেদিন অববিন্দ ঘোষ ৪৮নং গ্রে স্ট্রিটেব বাড়ি থেকে ধবা পড়েন, সেই দিনও 'যুগান্তব' বেবিযেছে। ওই দিনে 'যুগান্তব-এব মর্মকথা' বচনাটি এতই হৃদযস্পর্শী যে ভোলা যায না। ওই বছবই ৯ মে এবং ৩০ মে সংখ্যায কতকগুলি বচনা—যা সবকাবের মতে আপত্তিকব—পুলিসী তৎপবতা বৃদ্ধি পায। এখন প্রশ্ন কবা যেতে পাবে 'যুগান্তব'-এব উদ্দেশ্য কী? আমি অন্যত্র বিশ্লেষণ কবে দেখিয়েছি যে, তা ছিল "ভাবতেব স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় বিপ্লবীপন্থা অর্থাৎ সমস্ত বৈপ্লবিক সংগ্রামেব পন্থাব জযগান, বিপ্লবী আদর্শ প্রচাব, জনগণকে দলে টানা, অন্যদিকে আন্দোলনেব লক্ষ্য হিসেবে 'পূর্ণ স্ববাজ'কে তুলে ধবা।"

যুগান্তবেব লেখকগোষ্ঠীব মধ্যে অনেকে ছিলেন তবে কোনও লেখাই স্বাক্ষরিত নয। অববিন্দ ছাডাও বারীন্দ্রকুমাব ঘোষ, দেবব্রত বসু, সখাবাম গণেশ দেউস্কব, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, বিপিনচন্দ্র পাল, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখেব কথা বলা যায। 'অনন্তানন্দ ব্রহ্মচাবী' ছদ্মনামে লিখতেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, 'যুদ্ধই সৃষ্টিব নিযম' বচনাগুলিব লেখক বাবীন্দ্রকুমাব, 'যোগক্ষ্যাপাব চিঠি' লিখতেন দেবব্রত বসু। 'মিথ্যাব পূজা' বা 'আমাদেব বাজনীতিক উদ্দেশ্য' স্বযং অরবিন্দেব বচনা। 'বিপ্লব তত্ত্ব' লিখেছিলেন উপেন্দ্রনাথ। 'বাজনীতিক ভিক্ষাবৃত্তি' নামে একটি বচনা—যা সম্ভবত অববিন্দেব—বেবিযেছিল প্রথম বর্ষ' ১ থেকে ২৪ সংখ্যাব মধ্যে কিন্তু আমবা তা পবীক্ষা কবে দেখাব সুযোগ পাইনি।

'যুগান্তব'-এব বহু বচনাতেই মডাবেট পন্থাকে তীব্র সমালোচনা কবা হয। যেমন ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ সংখ্যায 'উন্নতি ও স্বাধীনতা' শীর্ষক বচনায। যুগান্তব মনে কবত যে "পবাধীন জাতিব মধ্যে প্রকৃত মনুয্যত্বেব আশা না কবে আগে দেশকে স্বাধীন কবা দরকাব।" এজন্য চাই একতা। 'যুগধর্ম্মতত্ত্ব' নামে অন্তত পাঁচটি বচনা বেবিযেছিল 'যুগান্তব' পত্রিকায। প্রথম বর্ষ ৪২ সংখ্যা (১৩ জানুযাবি ১৯০৭) থেকে একটি অংশ উদ্ধাব করি "স্বাযত্তশাসনই একমাত্র উপায। স্বাযত্তশাসনই আমাদেব আশা, ভবসা, বল।" 'বিপ্লব তত্ত্ব' শিবোনামেব বচনাটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত সাতটি কিস্তিব সন্ধান আমবা পেযেছি এই বচনাব। বিপ্লবেব জন্য লোকমত গঠন, অর্থসংগ্রহ, অস্ত্র সংগ্রহ, কেন নিযমতান্ত্রিক পদ্ধতিব চেযে বিপ্লবপন্থা শ্রেয, দুই প্রকাব বিপ্লবপন্থা 'নৈতিক বলের দ্বাবা' এবং 'পশুবলেব দ্বাবা', 'প্রতিকূল রাজশক্তিব ধ্বংস' ইত্যাদিব কথা বলা হযেছে।

কতকগুলি চিত্তাকর্যক তথ্য পাওযা যায 'যুগান্তব' ফাইল দেখলে। যেমন সাধাবণত বাংলা বিপ্লবী দলগুলিব মধ্যে হিন্দু ঝোঁক স্পষ্ট থাকলেও 'যুগান্তব'-এব ছিল সেকুলাব

দৃষ্টিভঙ্গি। হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে তাদেব মনোভাব উদাব এবং নিবপেক্ষ। শ্রমজীবী শ্রেণীব ধর্মঘটেব অধিকাবকেও যুগান্তব স্বীকার কবত। আবও একটি কথা 'যুগান্তব' ভাবতবর্ষেব বহুত্ববাদে বিশ্বাস কবত। বৈচিত্র্যেব মধ্যে ঐক্য মানত যেমন প্রথম বর্ষ ৩৬ সংখ্যায (২ ডিসেম্বব ১৯০৬) 'যুগান্তব' লিখল "বহুত্বেব মধ্যে একত্বস্থাপন ভাবতবর্ষেব অদ্ভুত গুণ।" তবে সবচেযে বড়োকথা, বাজনীতিগতভাবে, কংগ্রেস ও নবমপন্থাব সমালোচনা, যা কিনা জনগণেব চিন্তা-চেতনাব মোড ঘুবিযে দেয। যেমন 'কংগ্রেস ও স্বাধীনতাব আদর্শ' শীর্ষক বচনায 'যুগান্তর' লিখেছে " জাতীয মহাসমিতিতে আমবা কি দেখিতেছি, বৎসবেব পব বৎসব যাইতেছে। ভিক্ষাব থালা মস্তকে কবে ঘুবিযা কেবল প্রত্যাখ্যানই সাব হইতেছে। সমগ্র দেশেব শক্তি কেবল অপব্যযিত হইতেছে।" মোটকথা 'যুগান্তব' সাপ্তাহিক পত্রে যে-সব লেখা প্রকাশ কবা হত তাব প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বিপ্লবাত্মক প্রচাব।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকেই 'যুগান্তব' পত্রিকা সরকাবেব বোযানলে পড়ে। ওই বছব ৪ জুলাই পত্রিকাব অফিসে খানাতল্লাশি হয। আগেই সতর্ক কবে চিঠি দেওযা হয। ১৬ জুন সংখ্যায 'নাই ভয' এবং 'লাঠ্যৌষধি' নামক দুটি বচনাব জন্য বিভিন্ন প্রেসে পুলিশ হানা দেয। যুগান্তবেব বিরুদ্ধে প্রথম মামলা শুরু হয এবং শেয পর্যন্ত সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের জেল। 'যুগান্তব' বন্ধ হল না বিক্রি ববং বেড়ে গেল। যুগান্তব লিখল (২য বর্ষ ২০ সংখ্য, ৩০ জুলাই ১৯০৭) "হায মুর্খেন্দ্র। ভয দেখাইযা সব কাজ সিদ্ধ হয না তোমবা তোমাদেব কাজ কব। আমবাও আপনাব কাজ কবিযা যাই, ব্যাপাব কোথায গিযা দাঁডায তাহা দেখিবাব জন্য হযতো, তোমাদেবও অধিক দিন বিলম্ব কবিতে হইবে না।" এইভাবে মোট ছ'বাব 'যুগান্তব' এব বিরুদ্ধে মামলা এবং তাব বিববণ আমবা পেযেছি। ১৯০৮-এব জানুযাবি মাসেই 'যুগান্তর' জানায · "যুগান্তব বাবংবাব পুলিশেব অত্যাচাবে অতিশয দুর্বল হইযা পড়িতেছে"। আমবা ১৯০৮-এব ২ মে এবং ২৩ মে সংখ্যা দেখতে পেলেও ৯ মে, ১৬ মে এবং ৩০ মে সংখ্যাগুলি পবীক্ষা কবে দেখার সুযোগ পাইনি। সরকারি গোপন নোটে দেখা যায ৯ মে এবং ৩০ মে সংখ্যায বেশ কিছু 'আপত্তিকব' এবং 'বাজদ্রোহমূলক' লেখা বেবিযেছিল বলে সবকাব মনে কবে। মনে বাখা দবকাব 'যুগান্তর' উপলক্ষ হলেও ঔপনিবেশিক সবকাবেব আসল লক্ষ্য ছিল অববিন্দ ঘোয, তাকে ফাঁসানো, যা সবকাব আদৌ কবতে পাবেনি। তবে উপর্যুপবি খানাতল্লাশি, হেনস্থা, প্রেসের মাল লুঠ এবং ছযবার মামলাব ফলে শেয পর্যন্ত ১৯০৮-এব জুলাই মাস থেকে 'যুগান্তব' প্রকাশ বন্ধ হযে যায। যুগান্তবের স্ববাজ সাধনা কিন্তু ব্যর্থ হল না।

নবশক্তি

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন

> ''যুগান্তব'' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইবাব কিছুকাল পবে মনোবঞ্জন গুহঠাকুবতা একখানি নূতন দৈনিক পত্র বাহিব কবিতে ইচ্ছুক হইলেন। একথা শুনিযা উপাধ্যাযজী আমাকে বলিলেন, "মনোবঞ্জনবাবুকে বুঝিযে বললাম যে নূতন

কাগজ বেব কববাব এখন আব দবকাব নেই। 'যুগান্তবে'ব আর্থিক অবস্থা খাবাপ। তাঁকে বললাম যেন উনি তোমাদেব যুগান্তব পত্রিকাকেই সাহায্য কবেন। কিন্তু মনোবঞ্জবাবু এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন না।" মনোবঞ্জনবাবু আমাকে বলিলেন, " 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তবেব' মাঝামাঝি একটা কাগজ দবকাব। আমাব কিছু নূতন বক্তব্য আছে।" ১৯০৭ সনেব মধ্যভাগে তাঁহাব 'নবশক্তি' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু 'নবশক্তি'ব সুব 'যুগান্তব'কে ছাপাইয়া উঠিতে পাবিল না, তাই ইহা তেমন জনপ্রিযতাও লাভ কবিতে পাবে নাই। অবশেযে 'যুগান্তব' দলই এই কাগজ সম্পাদনা ও পবিচালনা কবিত।

মনোবঞ্জন গুহঠাকুবতাব 'নবশক্তি' বেবিযেছিল ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দেব মে মাসে। এটিও চবমপন্থী এবং বৈপ্লবিক সংবাদমাধ্যম। যদিও ভাযা সর্বদা উগ্র নয, হিন্দু ঝোঁকও এতে নেই। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে এর প্রচাব সংখ্যা প্রায হাজাব পাঁচেক কিন্তু মনোবঞ্জন গুহঠাকুবতা যখন পুলিশেব হাতে ধবা পডেন (পবে নির্বাসন) তখন পত্রিকাটি উঠে যায। দুভার্গ্যবশত 'সন্ধ্যা'ব মতন 'নবশক্তি'ব ফাইলও পাওযা যায না।

মনোবঞ্জন গুহঠাকুবতা ববিশালেব লোক, থাকতেন কলকাতায। বিহাবে এদেব অভ্র খনি ছিল, গিবিডিতে স্বদেশি দলও গডেছিলেন, আবাব বিজযকৃষ্ণ গোস্বামীব শিয্য। বাজনীতিতে অববিন্দ অনুবাগী। পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে ডেলিগেট হযেছিলেন। 'বন্দে মাতবম' পত্রিকাব সঙ্গে তাঁব ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। উত্তব কলকাতাব পান্তিব মাঠে যে 'ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমী' ক্লাব ছিল তাব সদস্য ছিলেন মনোবঞ্জন। নিজেও ১৯০৫-এ 'ব্রতী সমিতি' নামে এক সংগঠন কবেন। 'নবশক্তি' সম্পর্কে সবকাব ছিল যুগান্তবেব মতনই কডা এবং সেখানেও অনেকবাব খানাতল্লাশি হয। যুগান্তবেব মতন এব ফলে 'নবশক্তি'ব অপমৃত্যু তবু তাবই মধ্যে স্বদেশি পর্বে এই কাগজ বিশেয প্রভাব ফেলেছিল চবমপন্থাব প্রসাবে।

শেযেব কথা · ফিবে দেখা

স্বদেশি পর্বে সংবাদ-মাধ্যমেব ভূমিকা কেমন ছিল তা অনেক সূত্র থেকেই বোঝা যায। যেমন সবকাবেব মনোভাব। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দেব ডিসেম্বব মাসে ভাবত সবকাব এক দমনমূলক আইন 'ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট' জাবি কবে, যাব ফলে কলকাতা ও ঢাকাব অনুশীলন সমিতি সমেত বাখবগঞ্জেব 'বান্ধব সমিতি', 'ফবিদপুবেব ব্রতী সমিতি' বা মযমনসিংহেৰ 'সুহৃদ সমিতি' ইত্যাদিকে ১৯০৯ থেকেই বেআইনি ঘোযিত কবা হয। তেমনি ১৯০৮-এব জুন মাসে ভাবত সবকাব বিস্ফোবক দ্রব্য বিযযক এবং সংবাদপত্র সম্পর্কিত দুটি আইন পাশ কবে। সংবাদপত্র বিযযক 'নিউজপেপাবস্ (ইনসাইটমেন্ট টু অফেন্সেস) অ্যাক্ট। সবকাবেব মতে যাবা বাজদ্রোহমূলক বচনা ছাপায তাবা অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হবাব উপযুক্ত। বস্তুত সবকাব জাতীযতাবাদী সংবাদপত্র ও সামযিকপত্রগুলিকে নিশ্চিহ্ন কবে দিতে চেযেছিল। যাঁবা দেশপ্রেমিক তাবাই দোযী, আব যাঁবা বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী সবকাব তাবাই আইনেব বক্ষক। এই ছিল অদৃষ্টেব পবিহাস। ১৯০৭

খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড 'যুগান্তর'-এর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলার রায়দানকালে কয়েকটি রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করেন "প্রবন্ধগুলি অতিরিক্ত মাত্রায় রাজদ্রোহমূলক এবং ব্রিটিশ ভারত আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত গভর্নমেন্টর প্রতি ঘৃণা, শত্রুতা ও বিদ্বেষের মনোভাব জাগ্রত করাই এগুলির উদ্দেশ্য।" আর এক আমলা স্যার হার্ভি অ্যাডামসন বড়লাটের আইন পরিষদে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন।

এখন প্রশ্ন হল, সরকার কি সব পত্রিকাই বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল? না, তাদের রাগ বেশি কয়েকটি কাগজের উপর—'বন্দে মাতরম', 'সন্ধ্যা', 'সঞ্জীবনী', 'যুগান্তর', 'নবশক্তি' ইত্যাদি—আমাদের রচনায় সেজন্যই এগুলির উপর জোর। 'বেঙ্গলী' নিয়ে তো এমন কথা হয়নি। সাময়িকপত্র তো কতই ছিল। স্বদেশি পর্বে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তাদের অনেক অনেক কাগজেই স্বদেশি প্রচার চলত, তবে যেহেতু স্বদেশি পর্বে ছিল নানা ঝোঁক, নানা মাত্রার দল-উপদল, রচনাগুলির মধ্যেও নানা সুর। কোথাও নরম, কোথাও চড়া। আর শুধু কি কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার দিকে তাকালেই স্বদেশি যুগে সংবাদ-মাধ্যমের ভূমিকা বোঝা যাবে? একদম নয়। বিভিন্ন জেলায় ও মফঃস্বলে ছিল বেশ কিছু ভালো কাগজ।

স্বদেশি পর্বে সংবাদ-মাধ্যম যে কতখানি কার্যকর ও শক্তিশালী ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পূর্বেও 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকাতেই অরবিন্দ ঘোষ যেমন চরমপন্থা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ব্যাখ্যাতা, তেমনি এই স্বদেশি যুগেই তিনি বাঙালিকে প্রথম বুঝিয়ে বললেন 'স্বরাজ' মানে পূর্ণ স্বাধীনতা। ১৯০৬-তেই তিনি জানিয়েছিলেন যে "Our ideal is that of Swaraj or absolute autonomy free from foreign control"। কে না জানে এর তেইশ বছর পর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। এমনকি ১৯২৮-এর কলকাতা অধিবেশনেও তাদের দৌড় 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্' পর্যন্ত। ভারত সরকারের 'হোম (পলিটিক্যাল) প্রসিডিংস' (মে, ১৯০৮) থেকে একটি নথি উদ্ধার করছি। বাংলা সরকারের হোম সেক্রেটারি গেট (E A Gait) লিখেছিলেন "Of Arabinda's connection with the secret society we have little direct evidence, the reason being that, here as in the case of the editorship of his paper, he has been careful to avoid doing anything which would enable any charge to be proved against them"। এই পত্রিকা অবশ্যই 'বন্দে মাতরম'। আবার 'যুগান্তর'-এর ভূমিকা? ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস কিংসফোর্ড পত্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলার রায়দানকালে মন্তব্য করেছিলেন যে পত্রিকাটি "অতিরিক্ত মাত্রায় রাজদ্রোহমূলক এবং ব্রিটিশ ভারতের আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেন্টের প্রতি ঘৃণা, শত্রুতা ও বিদ্বেষের মনোভাব জাগ্রত করাই" এর প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য।

অরবিন্দ যেমন শুধু 'বন্দে মাতরম্' বা 'যুগান্তর' নয় 'কর্মযোগিন' পত্রিকার সঙ্গেও

যুক্ত, তেমনি উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব শুধু 'সন্ধ্যা' নয়, 'স্বরাজ' নামে পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মোট পত্রপত্রিকার সংখ্যা বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে ৩১৫টি—সম্পাদকদের মধ্যে ৮০ জন ব্রাহ্মণ, ৬৬ জন কায়স্থ অর্থাৎ উচ্চবর্ণের আধিপত্য। আরেকটি তথ্যে প্রগতিশীল 'সঞ্জীবনী'র চেয়ে রক্ষণশীল 'হিতবাদী' বা 'বঙ্গবাসী'র বিক্রি বহু বেশি। মফঃস্বলের কাগজগুলির মধ্যে দুর্গামোহন সেন সম্পাদিত 'বরিশাল হিতৈষী' ওই জেলায় যথেষ্ট প্রভাবশালী। যেমন রঙ্গপুরে 'রঙ্গপুর বার্তাবহ', ঢাকায় 'পূর্ব বাংলা', খুলনায় 'খুলনাবাসী' ও 'পল্লীচিত্র'। হাওড়ার গীষ্পতি কাব্যতীর্থের 'হাওড়া হিতৈষী' কিংবা ময়মনসিংহের বৈকুণ্ঠনাথ সোম সম্পাদিত 'চারুমিহির' শুধু বঙ্গভঙ্গ বিরোধীই নয়, গরম লেখার জন্য খ্যাত। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের কুখ্যাত আইনের পর বন্দে মাতরম্ যুগান্তর সন্ধ্যা, নবশক্তি এমনকি নিউ ইন্ডিয়া পর্যন্ত সব বন্ধ হয়ে যায়। ছিল অনেক যেমন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন', পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের 'দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড' বা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'দ্য মর্ডান রিভিউ' (সব ইংরেজি) আর বাংলা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী', দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'নব্য ভারত', সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' ইত্যাদি। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' এবং নবপর্যায় মাসিক 'বঙ্গদর্শন'। সব কথা বলতে গেলে সাতকাহন। নানা পত্রিকাতেই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের যুগে জনমত গঠনে সাহায্য লক্ষ করি। সরকারের মতে তো দৈনিক পত্রিকার চেয়ে সাময়িক পত্রিকা কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। বিভিন্ন সংবাদ-মাধ্যমগুলির তুলনামূলক আলোচনাও চিত্তাকর্ষক, তাহলে যার যেমন চরিত্র, তার তেমন সুর বোঝা যায়। ১৯০৯-তে দেখছি ৩১৫টি পত্রিকা ও সাময়িকপত্র মিলিয়ে সম্পাদকদের মধ্যে ১৭ জন অর্থাৎ ৫.৩৯ শতাংশ মুসলমান। 'মুসলমান', 'সোলতান', 'মিহির ও সুধাকর', 'ইসলাম প্রচারক', 'নবনূর', 'কোহিনূর', 'দ্য মোসলেম ক্রনিকেল' ইত্যাদি পত্রিকার মধ্যে অনেকে বঙ্গভঙ্গের সমর্থক, অনেকে তীব্র বিরোধী। আসলে পত্রিকাগুলি শুধু সমসাময়িক ইতিহাসের প্রাথমিক আকর উপাদানই নয়, সেই যুগের চরিত্র ও মেজাজ বোঝার দর্পণ বটে। সংবাদ-মাধ্যমেই অনেকটা যেন বাঙালি মানস ধরা পড়ে।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

সুমিত সরকার, *The Swadeshi Movement in Bengal* নতুন দিল্লি, ১৯৭৩

হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, *উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ*, কলকাতা, ২য় সং ২০০২

ঐ, *ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান*, কলকাতা, ২য় সং, ১৯৯৬

ঐ, *Bande Mataram and Indian Nationalism* Cal 1957

ঐ, *Sri Aurobindo and the New thought in Indian Politics* Cal 2nd ed 1997

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *সঞ্জীবনী*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৯

গৌতম নিয়োগী, Sri Aurobindo and the Weekly Yugantar in *Rbhu* vol 2

No 1 Feb 2005, pp 58-72 (Publication Golden Horizon Sri Aurobindo Centre, Salt lake. Calcuta

ঐ, 'অগ্নিতাপস শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ', *বসুধারা*, নবপর্যায়, ২, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩, অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচার, কল-৪০

ঐ, 'শ্রীঅরবিন্দ ও 'যুগান্তর' পত্রিকা (১৯০৬-১৯০৮), *বসুধারা*, নবপর্যায়, ৫, ১৫ আগস্ট, ২০০৪

ঐ, A Stormy Petrel of Indian Nationalism A Study in the Political Ideas and Activities of Sri Aurobindo in *Sri Aurobindo Mandir* Annual Aurobindo Pathamandir Cal 15 Aug 2003. pp 97-115

ঐ 'শ্রীঅরবিন্দ, জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু মুসলিম প্রশ্ন', *বসুধারা*, নবপর্যায় ৪, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪

হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, *স্বদেশি আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ*, কলকাতা, ২য় সং, দে'জ, ২০০৪

অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায় (সন্ধ্যা), *অগ্নিযুগের অগ্নিকথা যুগান্তর*, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, ২০০১

অমলেন্দু দে, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা সাপ্তাহিক যুগান্তর পত্রিকার অবদান*, কলকাতা, ২০০২

ঐ *Raja Subodh Chandra Mallick and His Times* NCE Jadavpur, 1996

প্রবোধচন্দ্র সিনহা, *উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব*, উত্তরপাড়া, তারিখ নেই।

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *স্বদেশি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৬০

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, *কংগ্রেস*, ৩য় সং, কলকাতা, ১৯২৮

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম*, কলকাতা, নবভারত, ১৯৮৩

সি পোদ্দার, এম সরকার রব জিকার (সং) *শ্রীঅরবিন্দ অ্যান্ড দ্য ফ্রিডম অফ ইন্ডিয়া*, পণ্ডিচেরী, ১৯৯৫

অমলেশ ত্রিপাঠী, *Militant Nationalism in India*, কলকাতা, ১৯৬৬

বিমানবিহারী মজুমদার, *The Extremist challenge* কলকাতা, ১৯৬৭

শিবদাস চক্রবর্তী, *বিপিনচন্দ্র পাল*, কলকাতা, ১৯৭৩

জুলিয়াস জে লিপনার, *Brahmabandhav Upadhyay The life and thought of a Revolutionary* দিল্লি, ১৯৯৯

পিটার হীস্, *Nationalism Terrorism, Communalism*, OUP New Delhi 1998

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *A Nation in Making* London 1927

কৃষ্ণকুমার মিত্র, *আত্মজীবনী*, কলকাতা, ১৯৩৭

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, *শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশি যুগ*, কলকাতা, ১৯৫৬

হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, *Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj* কলকাতা, ১৯৫৮

গৌতম নিয়োগী, 'যুগান্তরের বিপ্লবী' দ্র শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় (সম্পা), *অরবিন্দের সন্ধানে*, কলকাতা, এম সি সরকার, ২০০৩, পৃ ১০২-১২৬

বঙ্গভঙ্গ : সমকালীন বাঙলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে

স্বপন মজুমদাব

ঐতিহাসিকেবা ইতিহাসকে যতই তথ্যনির্ভব প্রমাণসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন ব'লে প্রতিপন্ন কবাব চেষ্টা করুন, বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবোধ আন্দোলনেব মতো কোনো চিন্তাসংঘাতময ঘটনাব চবিত্র ও প্রবণতা বিবেচনা কবতে গেলে সেই বিশ্বাসকেই প্রশ্ন কবতে হয প্রথমে। অতীতকে জানাব কাজে তথ্যই প্রাথমিক উপকবণ হিশেবে ব্যবহাব কবেন ঐতিহাসিক। কিন্তু সেই অতীত-সমকালীন সব পাঠ-বযান-সাক্ষ্যই কি তথ্য? সব প্রতিবেদনই সমান গুরুত্বের? মনোভাবেব কতটুকু প্রতিফলিত হয ঘটনায, আব ঘটনাব কতটুকু আকবিক তথ্যে? সম্পূর্ণ নিঃশেষ তথ্য কি কখনো উন্মোচিত হয ভবিষ্যতেব কাছে? তেমনি, সেই অ-সম্পূর্ণ তথ্যকে—বা বহুল তথ্যেব পাবস্পবিক বিবোধকে—কোন্ মনোভঙ্গি থেকে পডবেন বা বুঝবেন ইতিহাসকাব, তাব কোনো অবিকল্প পথ যেমন জানা নেই তাঁদেব, তেমনি আমাদেব মতো পাঠকদেবও।

অথচ ঐতিহাসিক আমাদেব বুঝিযে দেন, বিশ্বাস কবতে শেখান যেমনটি তাঁবা ভাবেন ও আমাদেব ভাবাতে চান। বহু ইতিহাসকাব ও তাঁদেব মতেব বহুতব পাঠ থেকে পাঠক তৈবি ক'বে নেন তাঁব ধাবণা। বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবোধ আন্দোলন শতবর্ষেব ব্যবধানে আমাদেব কাছে উপস্থিত হয তেমনি কিছু ধাবণা বা বিশ্বাস নিযে। আমবা সবল বিশ্বাসে ভাবতে অভ্যস্ত অত্যাচাব ও প্রতিবোধেব এই নাটকে দুই পক্ষই দ্বিধাহীনভাবে সংগঠিত এবং এব একদিকে যেমন আছে খলনায়ক, অন্যদিকে তেমনি আছে দেশনাযক। প্রশাসনিক সংস্কাবেব অছিলায কার্জন-ফ্রেজাববা বাঙালিব বর্ধমান প্রতাপ খর্ব কবতেই বঙ্গভঙ্গ কবেছিলেন , আসমুদ্র-হিমাচল বঙ্গবাসী—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেযে—তাব প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছিল, সেই সমবেত শক্তিব কাছে পর্যুদস্ত হযে বাজশক্তি প্রত্যাহাব কবল বঙ্গভঙ্গ; কিন্তু ততদিনে প্রতিবোধ আন্দোলন ছড়িযে পড়েছে বযকট ও বোমাব প্রত্যাঘাতে, ভীতসন্ত্রস্ত শাসকবর্গ বাজধানী স্থানান্তবিত ক'বে পৃষ্ঠবক্ষা কবল কোনোক্রমে।

সমকালীন সংবাদ-সামযিকপত্রে প্রতিফলিত জনমত এই গৌববগাথাব সঙ্গে মেলে না অনেক ক্ষেত্রেই। যদিও মনে বাখা প্রযোজন, সেকালেব সংবাদ-সামযিকপত্রেব—বিশেষ ক'বে উপলক্ষমূলক প্রকাশনাব নিতান্ত একটি ভগ্নাংশই সংবক্ষিত হযেছে উত্তবকালেব জন্য। আব তাব ওপব নির্ভব ক'বে ভিন্নতব কোনো পাঠেব চেষ্টাও হতে পাবে একইবকম আবোপিত আখ্যানকৌশল। সমযেব স্বাভাবিক সম্মার্জন তো আছেই, তাব ওপবে শাসকবর্গেব দাহ-ধ্বংস-বাজেযাপ্ত নীতিব ফলেও লুপ্ত হযেছে অধিকাংশ উপাদান-উপকবণ। মূল পত্রপত্রিকাব অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই একালেব পাঠক-গবেষকেব অনন্য নির্ভব হযে উঠেছে 'বিপোর্ট অন্ নেটিভ্ পেপার্স'। মূল বচনাব নির্বাচন ও অনুবাদ উভয

দিক থেকেই যে-উপকরণগুলির গ্রহণযোগ্যতা তর্কাতীত নয়। দ্বিতীয়ত, বাঙলা ছাড়াও অন্যান্য ভাষায় বা প্রতিবেশী অঞ্চলের—তার অনতিপূর্বকালেও একই প্রদেশভুক্ত—অসম, ওড়িশা, বিহারের—আঞ্চলিক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনার নিদর্শন এখনও যথেষ্ট অধিগম্য নয় আমাদের। এমনই সীমাবদ্ধতার জন্য সংবাদ-সাময়িকপত্রে বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলনের যে-রেখাচিত্র রচনা সম্ভব, তা-ও অনিবার্যত দ্বিখণ্ডিত হতে বাধ্য।

২

যে-কোনো উত্তেজনার সময়ে সমকালীনদের প্রতিক্রিয়াও উত্তেজিত হয়ে উঠতে চায়। অন্য কোনো আন্দোলনের তুলনায় বঙ্গভঙ্গের ঘটনায় সেই উত্তেজনা আরও জটিল ও তীব্র হয়ে ওঠা বেশি স্বাভাবিক। কারণ বঙ্গভঙ্গ আঘাত করেছিল বাঙালির আবেগময় সত্তায়। অর্থ ভূমি শিল্প শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সংকোচননীতি ক্রমশ প্রকাশ্য হয়ে উঠছিল, বঙ্গভঙ্গ তারই বিস্ফোরণ। শাসকবর্গ একে প্রাদেশিক সীমারেখার পুনর্বিন্যাস মনে করলেও এবং এমন প্রচার বিশ্বাস করার প্রাথমিক কারণ থাকলেও, সত্তাভিমানী বাঙালির কাছে এ ছিল তার অস্তিত্ব, তার ভাষা, তার জনবিন্যাস, তার ধর্মবিশ্বাসের প্রতি এক অশালীন সন্দেহ। যুক্তি ও তথ্য দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে, অবিভক্ত বাঙলার অন্তর্ভূত ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতি শ্রদ্ধার অভাব, এমন-কি তাদের যথেষ্টভাবে জানার অনাগ্রহও অপ্রকাশ ছিল না বাঙালির ব্যবহারে। ইংরেজি শিক্ষায় আপেক্ষিকভাবে অগ্রসর থাকার ফলে এবং শাসকবর্গের সঙ্গে নৈকট্যের কারণে উপনিবেশের মধ্যে এক অনু-উপনিবেশ রচনা ক'রে তুলেছিল বাঙালি হিন্দুসমাজ। তা সত্ত্বেও ভৌগোলিকভাবে নিকট ও মানসিকভাবে দূরগত জনভূখণ্ডের বিচ্ছেদও বাঙালির অধিকারবোধের অভিমানকে পীড়িত করেছিল।

অন্তর্জাতি স্তরেও এমন বৈরিতার বীজ সর্বত্র সস্ফুট না-হ'লেও অনুপস্থিত ছিল না। শাসকদের কাছে সেই অন্তঃকলহ গোপন থাকেনি ব'লেও কি তার লজ্জিত আবেগ উচ্চকিতভাবে নিজেদের এক জাতি এক প্রাণ একতার কথা প্রচার করতে চেয়েছিল? জাতি হিশেবে যারা নিজেদের মনে করেছিল শাসকবর্গের সব থেকে নিকট, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত, কার্জন-ফ্রেজারের বিদ্বেষ সেই আস্থাকে বিপন্ন করেছিল ক্রমাগত। জাতি হিশেবে বঙ্গবৈরিতায় কার্জনের পূর্বসূরী অবশ্যই মেকলে। কিন্তু উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে শাসকদের সঙ্গে বাঙালির আদানপ্রদান ছিল সীমিত, যে ইংরেজি শিক্ষা বাঙালিকে স্বাধিকার-সচেতন করেছিল, শিখিয়েছিল জনমত-গঠন, দিয়েছিল প্রতিবাদের ভাষা, তার সূচনাপর্বে ছিলেন মেকলে। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দশকে, যখন সে-ভাষা বাঙালির অধিগত, যখন সে-শিক্ষা দিয়েছে আত্মপ্রত্যয়, সেই প্রতিস্পর্ধী পর্বে ছিলেন কার্জন। জাতিনিন্দা সহ্য করার সময় নয় তখন কৃতবিদ্য বাঙালির।

আমরা জানি, জাতিসত্তা-গঠনের অন্যতম এবং সম্ভবত গভীর ও প্রগাঢ় উপাদান আবেগ অভিন্ন এক জনসত্তায় অন্তর্ভূত হওয়ার বাসনা ও গৌরব। অন্তঃসামাজিক স্তরে যতই শরিকসুলভ বিসংবাদ থাকুক, আন্তঃসামাজিক স্তরে তাকে প্রচার না-করার সুবুদ্ধির মধ্যেও

ছিল সেই আবেগেব বন্ধন। তবে বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবোধ আন্দোলন বাঙালিব ইতিহাসে তার সুবুদ্ধি বিবেচনার জন্য কতটা স্মবণীয, তর্কেব বিযয হতে পাবে, কিন্তু বাঙালিব জাতিসত্তাব নির্মাণে প্রথম ক্রিযাত্মক অভিজ্ঞতা, ভাবেব বাষ্প সম্প্রদায, বর্ণ বা শ্রেণী বিশেযে কোনো-না-কোনো সময়ে গঠিত ক'বে থাকতে পাবে একাত্মবোধ, কিন্তু ভাবকে কর্মেব উৎসাহে অনুবাদ ক'বে তুলতে পাবেনি। ববীন্দ্রনাথ সম্পাদিত নবপর্যায 'বঙ্গদর্শনে' (৫ ৭, ১৩১২ কার্তিক) "বাখি-বন্ধনেব উৎসব" নামে এক আবাহনপত্রে ছিল তাবই অঙ্গীকাব

> আগামী ৩০শে আশ্বিন বাংলাদেশ আইনেব দ্বাবা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বব যে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন কবেন নাই তাহাই বিশেযরূপে স্মবণ ও প্রচাব কবিবাব জন্য সেই দিনকে আমবা বাঙালীব বাখি-বন্ধনেব দিন কবিযা পবস্পবেব হাতে হবিদ্রবর্ণেব সুতা বাঁধিযা দিব। বাখি-বন্ধনেব মন্ত্রটি এই —ভাই ভাই একঠাঁই। বিজযা দশমীব দিনে যেমন বাঙালী আত্মীয বন্ধুদেব বাড়ি বাড়ি গিযা প্রণাম নমস্কাব কোলাকুলি কবিযা আসে সেইরূপ প্রতি বৎসবে এই ৩০শে আশ্বিনেব তিথিতে আমবা বাংলাদেশেব সকল বিভাগেবই আত্মীয বন্ধুবর্গেব দক্ষিণ হস্তে এই মিলনেব বাখি বাঁধিযা আসিব। সে দিন বাঙালাব পূর্ব্ববিভাগেব সহিত পশ্চিমবিভাগেব, উচ্চশ্রেণীব সহিত নিম্নশ্রেণীব, খৃষ্টান মুসলমানেব সহিত হিন্দুব মিলনস্মবণেব দিন—অতএব সে দিন প্রভু ও ভৃত্য ধনী ও দবিদ্র জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেযে পবস্পরেব হস্তে বাখি বাঁধিযা দিবেন। বর্ত্তমান বৎসবে এই ৩০শে আশ্বিনে শুক্ল তৃতীযা তিথি পডিবে—এই তিথিকে আমবা বাখী তৃতীযা নাম দিযা উক্ত তিথিতে প্রতিবর্যে বাঙালিব মিলনোৎসব সম্পন্ন কবিব। উক্ত দিনে সংযমস্বরূপ আমাদেব অবন্ধন হইবে—চুল্লি না জ্বালিযা আমবা ফল দুগ্ধ প্রভৃতি আহাব কবিব। উক্ত দিনে বাঙলাব পূর্ব্ববিভাগেব লোকেবা পশ্চিমবিভাগেব নিকট ও পশ্চিমবিভাগেব লোকেবা পূর্ব্ববিভাগেব নিকট "ভাই ভাই একঠাঁই" এই লিখিত মন্ত্রসহ রাখীসূত্র পবাইযা দিবেন। বাজাব খড়্গ যে বিধাতাব বন্ধনকে ছিন্ন কবিতে পাবে না ইহাই উপলব্ধি কবিবাব জন্য আমাদেব এই বাখীবন্ধনেব উৎসব।*

বাঙালিব জাতিসত্তা গঠনেব জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে আহ্বান কবতে হযেছিল তাব ইতিহাস বচনায। আব এই অনুষ্ঠানপত্রেব সম্ভাব্য আহ্বাযক ববীন্দ্রনাথ তাঁব সমযে দাঁড়িযে, সমকালীন সমস্যাব মুখোমুখি হযে তাব নিবসনে সচেষ্ট হযেছেন। কোনো অস্ত্র নয, দিব্যজ্ঞান বা দৈবাদেশ নয, হৃদযেব মন্ত্রে, আবেগেব আলিঙ্গনে প্রতিবোধেব দুর্গ গ'ড়ে তুলতে চাওযাব এই শক্তিই বঙ্গ ভঙ্গ-প্রতিবোধ আন্দোলনেব সবথেকে বড দান বাঙালিব জীবনে।

৩

বঙ্গভঙ্গ বিযযে বাঙালিব অবস্থানেব, তাব সবলতা ও দুর্বলতাব সুবিস্তাব কিন্তু সুগভীব পবিচয

* প্রভাতকুমাব সূত্রহীনভাবে লেখাটিব থেকে উদ্ধৃতি দিলেও প্রশান্তকুমাব পাল উল্লেখও কবেননি। বিশ্বভাবতী ও সবকাবি বচনাবলিতে লেখাটি এখনও অসংগৃহীত।

আছে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের "বঙ্গ-বিভাগ" প্রবন্ধে ('প্রবাসী', ১৩১২ আশ্বিন)। 'অত্যাচারী রাজারা শাপরূপী বর' ঐতিহাসিক ফ্রিম্যানের এই পর্যবেক্ষণ অনুসরণ ক'রে রামানন্দ সিদ্ধান্ত করেছেন, 'লর্ড কার্জ্জনের মত বন্ধু আর কোথায় পাইব? তিনি বাঙ্গালিকে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই করিতে গিয়া বাঙ্গালির একতার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন।' বিভাজনের যুক্তির মধ্যে শাসকবর্গের স্ববিরোধ লক্ষ করেছেন লেখক, 'এক ভাষাভাষী লোকদিগকে একত্র করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট মধ্য-প্রদেশের ওড়িয়াদিগকে ও বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেন্ট গবর্ণরের অধীনস্থ ওড়িয়াদিগকে এক প্রদেশে আনিতেছেন, কিন্তু যাহারা বাঙ্গালা বলে ও এক শাসনকর্ত্তার অধীনে, এক প্রদেশে বাস করিতেছে, তাহাদিগকে দ্বিখণ্ড করিতেছেন। অনেক দিনের পুরাতন সম্বন্ধ ও সংশ্রব এবং তজ্জনিত মনোভাবের ও মায়ামমতার দোহাই দিয়া দার্জ্জিলিঙ্গকে বঙ্গের ছোটলাটের অধীনে রাখিতেছেন, কিন্তু পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙ্গালাকে এ সকল কারণ সত্ত্বেও পশ্চিম বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন।' এর 'গূঢ় কারণ', রামানন্দের মতে, 'বাঙ্গালীরা (অর্থাৎ কার্য্যতঃ বাঙ্গালী হিন্দুরা) রাজনৈতিক বিষয়ে সামান্য যে একটু শক্তিশালী হইয়াছে, বাঙ্গালীদের দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই শক্তি নাশ করা, তাহা বাড়িবার সম্ভাবনা লোপ করা, বঙ্গ -বিভাগের আসল উদ্দেশ্য। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু-বাঙ্গালী, মুসলমান-বাঙ্গালী অপেক্ষা অনেক কম। পশ্চিম বঙ্গ ও বেহারে বাঙ্গালী, বিহারী প্রভৃতি অপেক্ষা কম। সুতরাং উভয় প্রদেশেই হিন্দু-বাঙ্গালীর দাবী দাওয়া, মত, গবর্ণমেন্ট অগ্রাহ্য করিবার বেশ একটা কারণ পাইবেন।'

বাঙালি অর্থাৎ কার্যত বাঙালি হিন্দু রামানন্দের অসতর্ক কোনো মন্তব্য নয়। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন 'আমাদের উহা বলা উদ্দেশ্য নয় যে দেশটা কেবল হিন্দু-বাঙ্গালীর মত অনুসারে শাসিত হউক, বা কেবল তাহাদেরই ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা হউক। আমরা, হিন্দু-বাঙ্গালীর ও মুসলমান-বাঙ্গালীর স্বার্থ পৃথক, এ রকম মনে করিয়া এ কথা লিখিতেছি না। জাতীয় স্বার্থ উভয়েরই এক, ইংরাজের পদে উভয়েই দলিত, ইংরাজ মুখে মুসলমানের আদর করিলেও, হিন্দুকে যেমন নিজের কোন স্বার্থ বা একচেটিয়া চাকরী ছাড়িয়া দেন না, মুসলমানকেও তেমনি দেন না। বাঙ্গালী-হিন্দুর মুখ বন্ধ হইলে, তাহার প্রভাব কমিলে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই অমঙ্গল, এই জন্য আমরা এরূপ লিখিতেছি।'

রামানন্দের এই বিবেচনার মধ্যে একটি লক্ষণীয় যুক্তিক্রম আছে ইংরেজ মুসলমানকে মৌখিক আদর দেখায়, হিন্দুকে তাও দেখায় না। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানের জাতীয় স্বার্থ এক, ইংরেজের স্বার্থ ভিন্ন। স্বার্থের সংঘাতে ইংরেজ হিন্দু বা মুসলমানের মধ্যে কোনো ভিন্ন ব্যবহার করবে না। মুসলমানদের প্রতি তাঁর অনুক্ত বার্তা ইংরেজের কপট স্নেহে প্রতারিত হ'য়ো না। এরই সঙ্গে তাঁর চিন্তায় আছে, বাঙালির জাতিগত মঙ্গলে হিন্দুর ভূমিকা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো। শিক্ষা—আর অবশ্যই পাশ্চাত্য শিক্ষায় হিন্দুর আপেক্ষিক অগ্রতার যুক্তি টেনে রামানন্দ লেখেন 'বেহারী ও মুসলমান-বাঙ্গালীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার অপেক্ষাকৃত কম, এই জন্য তাহারা স্থানিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থে যে পরিমাণ অন্ধ, হিন্দু শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ততটা নয়। সমস্ত দেশের মঙ্গলামঙ্গল হিন্দু-বাঙ্গালী নেতারা

যতটুকু বুঝেন, চান ও দাবী কবেন, তাহা যদি সামান্য হয, তাহা হইলেও উহা মুসলমান-বাঙ্গালী ও বেহাবীবা যাহা চান, তদপেক্ষা অনেক বেশী। বাঙ্গালী মুসলমান ভ্রাতাবা অপব সকলেব সঙ্গে থাকিয়া সুশিক্ষিত হউন, সমস্ত দেশেব, সমগ্র জাতিব মঙ্গল উত্তবোত্তব অধিক পবিমাণে বুঝিতে ও দাবী কবিতে থাকুন, স্বার্থান্বেষী ইংবাজী বাজপুরুষদেব দ্বাবা তাঁহাদেব সম্মুখে ধৃত ক্ষুদ্র প্রলোভন উপেক্ষা কবিতে শিখুন, ইহাই আমাদেব অভিলায। সমস্ত বাঙ্গালীর একত্র থাকা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধাদি সকলেবই মঙ্গলেব কাবণ হইবে।' বামানন্দেব বিশ্বাস, শিক্ষাগুণে বাঙালি-মুসলমান যখন বাঙালি-হিন্দুব মতোই জাতীয অধিকাব বিষযে সচেতন হযে ইংবেজ 'বাজপুরুষেব বিবাগভাজন হইবেন, তখন ইংবাজেব ভেদনীতি হয ত ভিন্ন আকাব ধাবণ কবিবে। তখন আব স্থানবিশেষে হিন্দু ও মুসলমান বাঙ্গালীব প্রাধান্য অপ্রাধান্যেব কথা লইযা কোন জাতীয অমঙ্গলেব ভাবনা ভাবিতে হইবে না।'

বামানন্দেব যুক্তিপবম্পবা হযতো সেকালেব বাঙালি সমাজেব শিক্ষা-স্থানাঙ্কেব বিচাবে অগ্রাহ্য কবাব মতো নয। সে-চিন্তায অনুস্যূত হযে আছে ঔপনিবেশিক পবিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ও অধিকাব-সচেতনতাব সমীকবণ। ঔপনিবেশিক শক্তিব পক্ষে উপনিবেশিত মানুষেব অধিকাব মেনে নেওযাব অসম্ভাব্যতা থেকেই তৈবি হতে পাবে, হয, বিবাগ ও বৈবিতাব সম্পর্ক। অর্থাৎ শিক্ষাব অভাব যতদিন আছে, ততদিনই স্নেহ-আদব সম্ভব, শিক্ষিত হযে উঠলেই শাসক ও শাসিতেব সম্পর্ক হযে ওঠে প্রতিস্পর্ধিতাব। কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা না-কবেও বামানন্দ সেই সত্যই স্বীকাব কবেছেন তাঁব বিশ্লেষণে।

বামানন্দ লক্ষ কবেছিলেন, এই ভেদনীতি শুধু প্রদেশেব বাজনৈতিক বিভাগেই শেয হবে না, এব থেকে 'পূর্ব্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গেও ঝগডা বাধাইবাব চেষ্টা হইবে। পূর্ব্ব বঙ্গবাসী পশ্চিম বঙ্গে এবং পশ্চিম বঙ্গবাসী পূর্ব্ব বঙ্গে চাকবী পাইবে না, এরূপ নিযম নিশ্চযই হইবে, এবং তাহা হইলে একই জাতিব দুই শাখায বাজপুরুষদেব চিত্ততোযক বেশ ঈর্য্যা বিদ্বেয জন্মিবে।' বামানন্দ কিন্তু অস্বীকাব কবেননি, ববং একদিক থেকে মেনেই নিযেছেন, বাঙালিব মনে ও সমাজে আঞ্চলিক ভেদবুদ্ধি বর্তমান এবং তাবও নিবাকবণ প্রযোজন . 'কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে এখনও অনেক শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ছোটলোক আছে, যাহারা পূর্ব্ব বঙ্গেব লোকদিগকে বাঙ্গাল বলিযা হীন মনে কবে। ইহাদিগকে মনেব মযলা সাফ কবিতে হইবে।'

জাতীয আর্থিক উন্নযনেব ক্ষেত্রেও অর্থভাণ্ডাবেব বিভাজন, বিনিযোগেব ক্ষেত্রভেদ সমৃদ্ধিব অন্তবায মনে কবেছেন বামানন্দ। 'বহুসংখ্যক লোক সমবেত চেষ্টা ও শক্তি প্রযোগে সকলেব টাকা একত্র ব্যয কবিযা, মঙ্গলেব পথে যেরূপ অগ্রসব হইতে পাবে, অল্পসংখ্যক লোকে তাহা পাবে না । স্বাধীন দেশেও দেখিতে পাই, প্রজাদিগকে নিজেদেব অধিকাব ও সুবিধাগুলি বজায বাখিবাব জন্য সর্বদাই সজাগ থাকিযা চেষ্টা কবিতে হয। এই চেষ্টাব জন্য অনেক টাকা, অনেক লোকেব উৎসাহ ও পবিশ্রম, অনেক লোকেব মতেব ঐক্যেব প্রভাব, আবশ্যক হয। বাঙ্গালী জাতি দুই প্রদেশে দুই শাসনকর্ত্তাব অধীনে,

দুই বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভা কৃত বিভিন্ন আইনেব অধীনে, বাস কবিলে, এই জাতিব দুই শাখাব অভাব, অভিযোগ, ভিন্ন ভিন্ন বকমেব হইবে। সুতবাং চেষ্টাও ভিন্নমুখী হইবে। যে অর্থ, যে উৎসাহ, যে পবিশ্রম, যে একই কেন্দ্রে ঘনীভূত মতেব প্রভাব, একমাত্র চেষ্টাকে সফল কবিতে পাবিত, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হওযায ব্যর্থ হইবে।' বামানন্দেব এই অর্থনীতিচিন্তা অবশ্যই সে-যুগেব চিন্তাধাবাব প্রকাশ। প্রথমত, দেশ ও জাতি তাঁর চিন্তায অভিন্ন। জাতিগত উন্নতি, যদি দেশ বহুজাতিক হয, দেশগত উন্নতিব সমতুল্য হতে পাবে না। দ্বিতীযত, যদি প্রদেশেব ভিন্ন-ভিন্ন অঞ্চলে মানুষেব অভাব অভিযোগ প্রত্যাশা ভিন্ন-ভিন্ন হয, তাহলে তাব সমাধান আঞ্চলিক স্তবেই হওযা সঙ্গত ও কাম্য। সমগ্র দেশেব পক্ষে কেন্দ্রীয কোনো উন্নযনেব পবিকল্পনায বঞ্চিত হতে পাবে কোনো-কোনো অঞ্চল। সৃষ্টি হতে পাবে অঞ্চলগত অসমতাব ব্যবধান। শহব আব গ্রামেব অর্থনৈতিক দূরত্ব সৃষ্টি হযেছিল এমনই কেন্দ্রীয জাতীয বা দেশীয উন্নতিব ধাবণাব সূত্র ধ'বেই। ববং বলা যেতে পাবত, অঞ্চলগুলিব সমষ্টিগত উন্নতি থেকেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পাবত দেশ এবং জাতি। কিন্তু মনে বাখা ভালো, সে-যুগেব অর্থনীতিবিদেবাও 'ন্যাশনাল'—দেশ ও জাতি উভয অর্থে—উন্নতিব স্বপ্নে যতটা বিভোব ছিলেন, বিকেন্দ্রিত ও সমান্তব আঞ্চলিক উন্নযনে ততটা উৎসাহী ছিলেন না।

সাহিত্যেব ক্ষেত্রে বিভাজনেব সম্ভাব্য কুফলগুলি বিষযে বামানন্দেব আশঙ্কা, ইতিহাস বহুলাংশে সত্য প্রমাণ কবেছে। তিনি লিখেছেন, 'সাহিত্য জাতীয চরিত্রকে গডিযা তুলে। যে সাহিত্য যত বেশী লোকে পডে, যাহাব বস ও বল যত বেশী মানুষেব হৃদয হইতে আহৃত ও সঞ্চিত, তাহাব প্রভাব ও শক্তি তত বেশী। পূর্ব্ব বঙ্গেব ও পশ্চিম বঙ্গের চলিত ভাষায কিছু প্রভেদ আছে। বঙ্গদেশ বিভক্ত হইযা গেলে, গবর্ণমেন্ট আপাততঃ যে ভাষাভেদ কার্য্য হইতে বিবত আছেন, তাহা অবাধে দ্বিগুণ উৎসাহে সম্পাদন কবিতে পাবিবেন।' বামানন্দ মনে কবেছিলেন, ছাত্রপাঠ্য বইতে এই দুর্লক্ষণ যতটা প্রকাশ পাবে, 'উচ্চ সাহিত্যেব বড় বেশী ক্ষতি বোধ হয হইবে না'। বঙ্গভঙ্গ বদ হযেছিল, না-হ'লে তখন কী হতে পাবত সাহিত্যেব পবিণতি, আজ অনুমানেব বিষয। কিন্তু স্বাধীনতাব বিনিমযে মেনে নেওযা বঙ্গভঙ্গেব পব বাঙলা প্রকাশনা ও সাহিত্যে খণ্ডতাব যে-অভিজ্ঞতা হ'ল আমাদেব, তাব থেকে বামানন্দেব দুর্ভাবনাকে অমূলক মনে কবা কঠিন।

শাসকশক্তিব পক্ষে সংবাদপত্র চিবকালই বিডম্বনাব, উপনিবেশে সম্ভবত আবও বেশি। বামানন্দেব মতে, 'ইহাদের উৎকর্ষ ও ক্ষমতা কতকটা গ্রাহকসংখ্যাব উপব নির্ভব কবে। গ্রাহকেরা স্বভাবতঃ নিজেব প্রদেশেব, নিজের জেলাব, নিজেব সহর ও গ্রামেব অভাব অভিযোগেব কথা পডিতে অধিক ভালবাসেন। এই হেতু বঙ্গ-বিভাগ হইলে কলিকাতাব শক্তিশালী কাগজগুলি পূর্ব্ব বঙ্গেব কথা তত আলোচনা কবিতে না পাবায অনেক গ্রাহক হাবাইযা আযেব ন্যূনতা বশতঃ তেমন সুপবিচালিত হইবে না, সুতবাং অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন হইবে। পক্ষান্তবে ঢাকায শক্তিশালী কাগজেব আবির্ভাব হইতে অনেক বৎসব লাগিবে। এই প্রকাবে গবর্ণমেন্টের পথেব এক প্রধান কণ্টক সংবাদপত্র কিছুদিনেব জন্য

ভোঁতা হইয়া থাকিবে।' এ-সিদ্ধান্ত সম্পাদক বামানন্দেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত। সুতবাং তর্ক চলে না। তবু, আমবা অনুমান কবতে পাবি, যতদিন কলকাতা বাজধানী থাকত—এবং ১৯০৫-এ কলকাতা থেকে বাজধানী স্থানান্তব কোনো নস্ত্রাদামুসেবও অকল্পনীয ছিল—বাজধানীব কাগজ পডাব অতিবিক্ত আগ্রহও থাকতে পাবত ঢাকা বা প্রদেশেব অন্যত্র। ববং গভীবতব চিন্তাব হতে পাবত সবকাবি পৃষ্ঠপোষণায ঢাকা বা শিলং থেকে বশংবদ কোনো দেশীয সংবাদপত্র প্রকাশ, যে-সংবাদপত্রকে ক'বে তোলা হ'ত কলকাতাব দেশীয সংবাদপত্রেব শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী নয, বিকল্প। বঙ্গভঙ্গ না-হ'লেও এই ঘটনাব পব বিশেযত পূর্ববঙ্গে আঞ্চলিক পত্রিকা প্রকাশেব প্রবল উৎসাহ অবশ্য বামানন্দেব আশঙ্কাব আংশিক সমর্থন করে।

কেবলমাত্র বামানন্দ নন, বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবোধ আন্দোলনেব যুগে বাঙালি ভাবুক-চিন্তকদেব সবথেকে বড় পবীক্ষা ছিল হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গে তাঁদের অবস্থানেব ক্ষেত্রে। যে-বামানন্দ পূর্ণপ্রত্যযে লেখেন, 'বাঙ্গালা দেশে অন্যান্য কোন কোন প্রদেশেব মত হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া ও ঈর্য্যা বিদ্বেষ নাই' বা 'আমবা প্রাণে প্রাণে এক হইলে গবর্ণমেন্টেব সাধ্য কি যে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই কবেন?', একই প্রবন্ধে তাঁকে লিখতে হয · 'ভাই হিন্দু, ভাই মুসলমান, তোমাদেব মধ্যে ঈর্যা-বিদ্বেষ আছে কি? থাকিলে তাহা পবিত্যাগ কব। হিন্দু মুসলমানকে একই ভগবান্ একই দেশেব জলবাযু ও খাদ্যে পুষ্ট কবিতেছেন, তাহাদেব পৃথক্ হইযা কোন লাভ নাই। ইংরাজেব লেখা ইতিহাস পডিযা হিন্দু-লেখকেবা মুসলমানদেব উপব অনেক অবিচাব কবিযাছেন। মুসলমান তাহা ক্ষমা করুন। হিন্দু পুবাকালে মুসলমান কর্তৃক উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইযা থাকিলে তাহা ভুলিয়া যাউন। হিন্দু মুসলমানেব সাধাবণ শত্রুব বিরুদ্ধে এখন কোমব বাঁধিতে হইবে। হিন্দু মুসলমানেব যাঁহাব যে শক্তি আছে, তিনি তাহা প্রদান করুন। মুসলমানেব যে উৎসাহ, বীবত্ব ও একাগ্রতা এক দিন তাঁহাকে এশিযা হইতে ইউরোপেব শেষ সীমায লইযা গিয়াছিল, তাহা চিবদিনেব জন্য লুপ্ত হয নাই। .শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতা ও ভগিনীগণ তাঁহাদেব অমুসলমান ভ্রাতা-ভগিনীদেব হিতার্থ মুসলমান ইতিহাসেব উজ্জ্বল পৃষ্ঠা উদঘাটিত করুন, মুসলমান পুরুষ ও নাবীদিগেব মহৎকার্যেব বৃত্তান্ত লিখুন। তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানে প্রীতি ও শ্রদ্ধা বাডিবে।' যখন ক্ষমা বা ভোলাব কথা ওঠে, তখন মনে হয দুই সম্প্রদাযে ঈর্যা বিবাদ বিদ্বেষ নেই—এমন ঘোষণা নিতান্তই ইচ্ছাপূবণ। ববং বলা যায, বৈবিতা আছে জেনেই তাকে অস্বীকাব কবাব প্রবণতা কাজ কবেছে বামানন্দেব মনে। তাঁব অসাম্প্রদাযিক মনোভাবকে শ্রদ্ধা জানিযেও কেউ প্রশ্ন করতেই পাবেন, হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতিবৃদ্ধিব দাযিত্ব কি শুধুমাত্র মুসলমান সম্প্রদাযেব? হিন্দুব নমনীযতা প্রকাশেব কি কোনো অবকাশ বা প্রযোজন নেই?

বামানন্দ বিলক্ষণ জানতেন বাঙলিব দুই সম্প্রদাযে মিলন হযনি। তিনি জানতেন, 'বর্ণেব (caste) উচ্চতা নীচতাব একটা ধূযা তোলায বুদ্ধিমান্ বৈদ্য কাযস্থও ঝগডা লাগাইযা দিযাছিলেন'। তাঁব অজানা ছিল না, 'শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানেব মধ্যে যে বিদ্বেষ

দেখা যায, অশিক্ষিতদেব মধ্যে তাহা নাই।' সামাজিক সম্ভাব্য সব ব্যাধিই বর্তমান ছিল বাঙালি সমাজে। ইংবেজ শাসক যদি বাঙালি সমাজের এই বিচ্ছেদেব সুযোগ নিযে থাকেন তাঁদেব শাসন নিষ্কণ্টক কবাব উদ্দেশ্যে, তাহলে বাঙালি শিক্ষিত সমাজও কি তাঁদেব অভিন্ন শত্রুব বিরুদ্ধে সংগ্রামেব সুযোগে অন্তর্জাতিক বিভেদ নিষ্পত্তিব আযোজন কবছিলেন বঙ্গ ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে? আব তাবই জন্য প্রযোজন ছিল নতুন স্বপ্নসম্ভব বচনাব, চিত্তবিস্ফাবক কোনো কর্মপ্রবর্তনাব। বামানন্দ তাঁব ভবতবাক্য উচ্চাবণ কবেছেন এমনই প্রতিজ্ঞায 'সর্ব্বোপবি, আমাদিগকে সকল বাঙ্গালীব হিতকব কোন মহৎ কার্য্যে হাত দিতে হইবে, কাবণ, কেবল সবকাবেব বিবোধিতা রূপ যে বাহ্য চাপ, তাহাতে আমাদেব মধ্যে আশা ও প্রযোজনেব অনুরূপ একতাবন্ধন জন্মিতে পাবে না। সদনুষ্ঠান একপ্রাণতা হইতে পবস্পবেব প্রতি যে আকর্ষণ অনুভূত হয, সেই প্রাণের টানই আমাদিগকে প্রকৃত একতা দিতে পাবে। ..এক দিনে জাতি তৈযাব হয না, জাতীয আকাঙ্ক্ষা অচিবে পূর্ণ হয না। আশা, ধৈর্য্য, সাহস, একাগ্র সাধনা চাই। বাঙ্গালীকে এই মহা তপস্যায প্রবৃত্ত হইতে হইবে।'

৪

বামানন্দ চট্টোপাধ্যাযের প্রবন্ধে উল্লেখ থাকলেও, সামাজিক বর্ণভেদ বাঙালি সমাজে কতটা গূঢ় ক্ষত সৃষ্টি কবেছিল, তাব পবিচয আছে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'ভাণ্ডাব' পত্রিকায প্রকাশিত অজ্ঞাতনামা লেখকেব "জাতিভেদ ও জাতীযতা" (৩ ২-৩, ১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়) প্রবন্ধে। জাতিভেদ বক্ষা ক'বেও জাতীয একতা সম্ভব কিনা প্রশ্ন তুলে প্রবন্ধকাব লিখেছেন, 'ব্রাহ্মণ কি স্বীকাব কবিতে প্রস্তুত যে শূদ্রের সহিত তাঁহাব কোন বিষযে অধিকাব সাম্য আছে? তিনি বলিবেন, শূদ্রেব কেবল তাঁহাব চবণ সেবাব অধিকাব, স্বাধীন ভাবে চিন্তা কবিযা নিজেব জীবনেব লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য বুঝিযা তদনুরূপ কার্য্য কবার অধিকাব কি শূদ্রেব আছে? অথচ এই স্বাধীনতাই ব্যক্তিগত ও জাতীয উন্নতিব জন্য অত্যাবশ্যক।' সামাজিক সমতা না থাকলে জাতীয একতা গ'ড়ে উঠতে পাবে না, এই প্রত্যয থেকে লেখক সমসাময়িক সমাজেব বাস্তব অবস্থা তুলে ধবেছেন অনাবৃতভাবে 'তুমি মনে কবিতেছ তোমাব ব্রাহ্মণত্বটি যাহাতে বজায থাকে তাহাই তোমাব কল্যাণ, সুতবাং তুমি আব আমাব সঙ্গে ও সমস্ত ভাবতবাসীব সহিত এক হইতে পারিতেছ কৈ? তোমাব যাহা স্বার্থ তাহা আমাব অনর্থ, তোমাব ব্রাহ্মণত্ব আমাব ব্যক্তিত্বেব বিবোধী, অতএব তোমাব সঙ্গে আমাব জাতীযতা সম্ভব নহে। তাহাই যদি হইল, তবে সকলে মিলিত হইযা দেশেব কল্যাণ কবাব অর্থ কি? মিলনেব যখন ভূমি নাই, উদ্দেশ্য যখন এক নহে, তখন আব জাতীযতা কি প্রকাবে সম্ভব হয?'

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনবৃদ্ধিকেও সামাজিক সমতাব নিশ্চযতা মনে কবতে পাবেননি লেখক 'ববং ধন বল বৃদ্ধি হওযাতে পবস্পবেব অধিকতব অনিষ্ট ও বিপদেব সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণ শূদ্রেব ত কথাই নাই , ব্রাহ্মণেব ধন বৃদ্ধিতে শূদ্রেব অমঙ্গল, কাবণ বল বৃদ্ধিবশতঃ

তাহাব প্রতি অধিক নির্যাতনেব সম্ভাবনা, আবার শূদ্রেব ধন বৃদ্ধিতে ব্রাহ্মণেব প্রভুত্বলোপেব আশঙ্কা। অতএব দেশেব ধন বৃদ্ধিব সম্ভাবনা থাকিলেও হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র শিল্পবাণিজ্যেব ক্ষেত্রেই বা মিলিত হইবে কেন? মূল স্বার্থে যখন ভযানক বিবোধ তখন আব মিলনেব ভূমি কোথায?'

ধর্ম বা বর্ণেব কাবণে এই-যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ, শিক্ষাগত ব্যবধানও তেমনই ব্যবধান সৃষ্টি কবেছিল বাঙালি সমাজে। সিটি কলেজেব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানেব একদা অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকাব-সম্পাদিত 'কৃষকে' "চাষাভূষাব বাজনীতি" (৬ ১, ১৩১২ বৈশাখ) প্রবন্ধে গুপ্তনাম লেখক প্রকাশ্যেই লিখতে পেবেছিলেন 'আমাদেব দেশেব ইংবাজি পডা মাতব্বব লোকদেব এইরূপ একটু ছিট আছে। ইঁহাবা বেশ থাকেন, খান দান মজা কবেন, সম্বৎসবে দুনিযাব কথা ভুলিযা থাকেন, কিন্তু "বাজনৈতিক অধিকাব" এই বিদেশী বুলি শুনিলেই ইঁহাবা একেবাবে ক্ষেপিযা উঠেন। কত জনে ইঁহাদেব মাথা ঠাণ্ডা কবিবার চেষ্টা কবিতেছে কিন্তু জনষ্টুযার্ট মিল, এডমণ্ড বার্ক ইঁহাদেব মাথায যাহা ঢুকাইযাছেন কাব সাধ্য তাব এদিক-ওদিক কবে।. আমাদেব দেশেব চাষাভূষা লোকগুলো কি মূর্খ, তাহাবা চিবদিনই একজন না একজনেব পাযেব তলায বহিযা গেল, তাহাবা যে সকলের সঙ্গে সেই এক মাযেব খাস তালুকেব প্রজা, এ কথা তাহাবা একবাবও বুঝিল না। এত দিন তাহাবা ব্রাহ্মণেব পদাঘাত খাইল, এখন আবাব ইংবেজ বাজেব জুলুম জববদস্তি সহ্য কবিতেছে। এই চাষাভূষা না জাগিলে এ ভাবত আব জাগে না জাগে না।' কিন্তু জাগবণেব পথ, লেখকেব মতে, ইংবেজি শিক্ষা নয। ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে শিক্ষিত সম্প্রদাযকে বিদ্ধ ক'বে তিনি লেখেন, 'তোমাদেব পাযে ধবি তোমবা চাষা ভুষাকে সাম্য স্বাধীনতা বুঝাইও না। ইহাতে উল্টা উৎপত্তি হইবে। ইংবেজি শিক্ষা বিষ। . ইংবেজি শিক্ষা আমাদিগেব শিক্ষিত সম্প্রদাযকে "একলষেঁডে" কবিযাছে, আবাব চাষা ভুষাব মধ্যে ঐ ইংবেজি ভাব ঢুকাইলে আমাদেব আব কোন আশা ভবসা থাকিবে না।'

ধর্ম বর্ণ বিত্ত শিক্ষা সমাজ জীবনেব চতুবর্গেই সংকট বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবোধ আন্দোলনকে চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন ক'বে তুলেছিল। বাঙালিব আত্মমর্যাদায যে-আঘাত লেগেছিল বঙ্গভঙ্গেব প্রস্তাবে, একদিক থেকে দেখলে সেই বেদনা বাঙালিব সুপ্ত সম্বিৎ জাগিযে তুলেছিল। ইংবেজি শিক্ষার 'মাদকে' বাঙালি ভাববাজ্যে যেখানে পৌঁছেছিল, 'খাদ্যে'ব অভাবে তাব বিরুদ্ধে সর্বৈব শক্তি নিযে দাঁড়াবাব পুষ্টি সংগ্রহ কবতে পাবে নি। তা সত্ত্বেও, মানতেই হবে, আধুনিক যুগে জাতিগতভাবে কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওযাব অভিজ্ঞতা প্রথম দিল বঙ্গভঙ্গ। সেই রূঢ বাস্তবে দাঁড়িযে বাঙালি একে-একে আবিষ্কাব কবল তাব জাতিগত অপূর্ণতা। দেশেব কাছে দশেব কাছে যে-বাঙালি তাবিফ পেযেছিল, সে মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, শহববাসী। এবং সংখ্যালঘু। সমাজেব বৃহত্তব জনগোষ্ঠীব সঙ্গে তাব অপবিচযেব দূবত্ব। তাই বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবোধেব যে-প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কবেছিল বাঙালি, তাব উদ্‌যাপন সম্ভব ছিল না তাব পক্ষে। কিন্তু এই অকৃতকার্যতা করুণভাবে তাকে প্রবৃত্ত কবালো আত্মসমীক্ষায। বঙ্গভঙ্গেব ও তাব বিরুদ্ধে প্রতিবোধ গ'ডে তোলাব সংকট

বাঙালিব কাছে তাব দ্বিধা ও সীমাবদ্ধতাকে অস্পষ্ট বাখেনি। এই স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টিতে নিজেকে দেখতে পাওযাব শিক্ষা বঙ্গভঙ্গ-ঘটনাপ্রবাহেব শ্রেষ্ঠ উপার্জন বাঙালিব। সংহতিব অভাব থেকে তাব কাবণসন্ধান ও প্রতিকাবেব সদিচ্ছা বাঙালিকে তাব আত্মপবিচয বচনাব প্রেবণা দিল, ভাব থেকে উত্তীর্ণ ক'বে দিল কর্মেব জগতে।

ঘব থেকে বাইবে, অন্দব থেকে সদবে পেবিযে আসাব সবথেকে উজ্জ্বল ও বিশ্বস্ত উদাহবণ, প্রতিবোধ আন্দোলনে মহিলাদেব যোগদান। সবযুবালা দত্ত-সম্পাদিত 'ভাবত-মহিলা'য "স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গমহিলা" প্রবন্ধে (১ ৫, ১৩১২ পৌয) বা কুমুদিনী মিত্রেব "মাতৃভূমিব দুর্দ্দিনে মহিলাগণেব কর্ত্তব্য" প্রবন্ধে (১ ১, ১৩১২ ভাদ্র) এই নাবীশক্তিব উদ্ভাসেব পবিচয আছে। শুধু কলকাতায নয, ঢাকা, মযমনসিংহ, ববিশাল, বাঁকিপুব প্রভৃতি মফস্বল শহবে মহিলাসভা সংগঠনেব সফল ভূমিকাব কথা জানতে পাবি আমবা।

বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবোধ আন্দোলনেব আবেকটি সফল মাত্রা তাব গণজ্ঞাপনেব নতুন পন্থা আবিষ্কাবে। বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদীব "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা" ('বঙ্গদর্শন' [নবপর্যায], ৫ ৯, ১৩১২ পৌয) বা তাব অনুপ্রেবণায "পাঁচালী" (বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায, 'উপাসনা', ৩ . ৩, ১৩১৩ আষাঢ) দেশজ কথক-গাযেন বীতিকে প্রসাবিত ক'বে নিযেছিল সমসামযিক বাজনৈতিক প্রসঙ্গেব প্রচাবে। থিযেটাবে বাজনৈতিক প্রসঙ্গেব প্রবেশ ঘটেছিল আগেই। কিন্তু তাব দর্শক ছিলেন শহবেব মধ্যবিত্ত। আব ব্রত-পাঁচালী-যাত্রা পৌঁছে যেতে পাবত গ্রামে-গঞ্জে, কোনো বহুল আযোজন ছাডাই লক্ষ্মী বা সত্যপীবেব পাঁচালীব মতো এ-আখ্যানও তাদেব মনে হ'ত আপন সামগ্রী; ঘবেব নিত্যকর্ম, যদিও তাব বার্তা ভিন্ন, পবিচিত পবিবেশন পদ্ধতিতে সে-প্রেবণা তাদেব অন্তবে পৌঁছত। বঙ্গভঙ্গ-সমকালেব পত্র-পত্রিকায আবেকটি লক্ষণীয বৈশিষ্ট্য দেশাত্মবোধক কবিতা-গানেব প্রাচুর্য। আবও লক্ষ কববাব, এইসব পালা বা গানেব সুব উঠে আসছিল বাঙলার লোকজীবন থেকে বাউল, সাবি, ভাটিযালি, বামপ্রসাদী, কীর্তনেব সমৃদ্ধ ঐতিহ্য থেকে। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন যেমন এই সংগীত-পবম্পবাকে নতুন জীবন দিযেছিল, তেমনি এই গান বাঙালিকে নতুন প্রাণ দিযেছিল।

৫

বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবোধ আন্দোলনেব অঙ্ক থেকে অঙ্কান্তবে জন্ম নিযেছিল তিনটি আন্দোলন-পর্যায, বিজলিব প্রচাবপত্র থেকে ধবলে তাব সূচনা 03 ডিসেম্বব 1903 একে বলা যেতে পাবে সদর্থে স্বদেশি পর্যায। 07 অগস্ট 1905 টাউন হল্-এব বিদেশি দ্রব্য বর্জন প্রস্তাব থেকে শুরু বযকট আন্দোলনেব। আব 19 জানুযাবি 1908 থেকে সমগ্র আন্দোলনটিকেই ভাসিযে নিযে গেল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বা টেববিস্ট মুভমেন্ট। বযকটেব আঘাত সবথেকে বেশি বিপর্যস্ত কবেছিল দবিদ্র শ্রেণীকে এবং সেই শ্রেণীব সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদাযেব মানুযকে। আবদুল বসুলেব মতো মুক্তমতি মুসলমান যেমন ছিলেন, তেমনি

সলিমুল্লাব মতো সমাজপতিবও অভাব ছিল না। 'নবনূব' যেমন ছিল তেমনি ছিল 'ইস্‌লাম-প্রচাবক', ইব্‌নে মাআজেব পাশে মৌলভী হযেও মোহাম্মদ হেদাযতউল্লা। ফলে অর্থনৈতিকভাবে বযকটে অধিকাংশ মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও মুসলমান নির্বিশেযে সকলে বঙ্গভঙ্গেব পক্ষে ছিলেন না। সন্ত্রাসবাদে হিন্দু শক্তিদেবীব অধিষ্ঠান সত্ত্বেও মুসলমানদেব সহাযতা ও সহযোগ ছিল। বযকট বা সন্ত্রাসবাদে ইংবেজেব প্রতিদ্বন্দ্বিতা কবাব উত্তেজনা যতটা প্রকাশ পেল দেশগঠনেব প্রণোদন ততটা নয।

বঙ্গভঙ্গ প্রকল্প কিন্তু শাসকদেব কাছে কোনো বিচ্ছিন্ন প্রকল্প ছিল না। রুশ-জাপান যুদ্ধে এশীয বামনদেব কাছে ইউবোপীয মহাশক্তিব পবাজয, জাপানের সঙ্গে বাঙলাব গ'ড়ে-ওঠা যোগাযোগেব পটভূমিতে যদি আমবা মিলিযে দেখি কলকাতা পৌব আইন, নতুন বিশ্ববিদ্যালয আইন, সবকাবি গোপনীয সংবাদ বিযযক আইন, বাজকার্যে ভাবতীযেব প্রবেশাধিকাব সংকোচ, দেশীয বাজাদের ক্ষমতাহবণেব মতো বিধান, এক বৃহত্তব আশঙ্কা থেকে ঘনিযে-ওঠা এক বজ্রআটন মহাপ্রকল্পেবই অন্তর্গত মনে হবে বঙ্গভঙ্গকে। সবকাবি নীতিব অদূবদর্শিতাযই যে দেশ অর্থে বাঙলা ক্রমে বাঙালিব কাছেও হয়ে উঠল ভাবত, বাঙালির চিত্তপ্রসাবেব কাবণে নয, হযতো স্বীকাব ক'বে নিতে সংকোচ হবে না আমাদেব। ববং বলা যেতে পারে, শাসকেব বিফলতায বাঙলাব বিপ্লবেব আগুন ছড়িয়ে যাবে সমগ্র ভাবতবর্ষে।

ব্যক্তিগত জীবনেব বহু বিপর্যযেব মধ্যেও সমস্ত প্রাণমন সমর্পণ ক'বে বঙ্গভঙ্গ প্রতিহত কবতে পথে নেমেছিলেন ববীন্দ্রনাথ। আমাদেব বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবোধ ইতিহাসেব মহার্ঘ সঞ্চয এই উত্তবী ফেলি পবি বর্ম ববীন্দ্রনাথেব অধিনাযকত্ব। কিন্তু মাত্র কযেক মাসেব মধ্যেই নিজেব যোগদান প্রত্যাহাব ক'বে নিলেন তিনি আন্দোলনেব পথবিভ্রাটে। তাঁব বিশ্লেষণে ধবা আছে সেই মহান অপচযেব বেদনা

> সেদিন চাবিদিক থেকে বাংলাদেশেব হৃদযাবেগেব উপবেই কেবল তাগিদ এসেছে। কিন্তু শুধু হৃদযাবেগ আগুনেব মতো জ্বালানি বস্তুকে খবচ কবে, ছাই কবে ফেলে—সে তো সৃষ্টি কবে না। মানুযেব অন্তঃকবণ ধৈর্যেব সঙ্গে, নৈপুণ্যেব সঙ্গে, দূবদৃষ্টিব সঙ্গে এই আগুনে কঠিন উপাদানকে গলিযে আপনাব প্রযোজনেব সামগ্রীকে গড়ে তুলতে থাকে। দেশেব সেই অন্তঃকবণকে সেদিন জাগানো হল না, সেইজন্যে এতবড়ো একটা হৃদযাবেগ থেকে কোনো একটা স্থাযী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারল না। ("সত্যেব আহ্বান", 'কালান্তব'।)

কৃৎকৌশল থেকে প্রযুক্তিবিজ্ঞান

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজে প্রযুক্তিচর্চা

চিত্তব্রত পালিত

১৮৭৬ সালে যখন ইন্ডিযান এ্যাসোশিযেশন ফব দ্য কালটিভেশন অব সাযেন্স প্রতিষ্ঠিত হয, তখন বাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্রলাল সবকারেব সমর্থনে বলেন, যে দেশেব প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তিবিজ্ঞানীব অভাবে বাববাব ব্যর্থতায পর্যবসিত হযেছে। তাই এক নতুন বিজ্ঞানীব প্রজন্ম সৃষ্টি কবতে হবে যাঁরা ওই দাযিত্ব নিতে পাবেন। নচেৎ বিদেশি প্রযুক্তিবিদ্‌দেব উপবে নির্ভব কবতে হয। সেই সমযে ইন্ডিযান লীগ সবকাবি স্বীকৃতি লাভেব আশায মহেন্দ্রলালেব প্রতিষ্ঠানেব বিবোধিতা কবেন এবং বাজানুগ্রহেব জন্য অ্যালবার্ট টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট-গঠনেব প্রস্তাব কবেন। কাবণ তখন প্রিন্স্‌ অ্যালবার্ট ভাবত সফবে উপস্থিত। তাঁবা বলেন, এতে সাধাবণ কাবিগবেব রুজি-বোজগাবেব ব্যবস্থা হবে। কিন্তু IACS স্বনির্ভবতাব কথা বলে। শেষ পর্যন্ত উভয প্রতিষ্ঠানই অনুমোদিত হয। তবে IACS-এ সবাসবি প্রযুক্তিবিজ্ঞানের কোনও চর্চা ছিল না, তাবা উচ্চতব বিজ্ঞান ও জনপ্রিয বিজ্ঞানেব চর্চাই কবত। ১৯০২ সালে যখন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা কবেন, তাব অধীনে প্রযুক্তিবিজ্ঞানেব পাঠক্রম শুরু হয। সেই সঙ্গে একটি কর্মশালাও চলতে থাকে। এ-সবই হত কলকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ ভবনে। প্রথমদিকে যথাযথ শিক্ষকেব অভাবে সতীশ মুখোপাধ্যায নিজে, পবে নীলবতন সবকাব ও রামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী পডাতে শুরু কবেন। এবপব জাপান ফেবত দুজন বাঙালি ইন্‌জিনিযাব বমাকান্ত বায এবং নিকুঞ্জবিহাবী সেন যোগদান কবেন। কর্মশালাতেও নানা প্রযোজনীয দ্রব্য যেমন, তেল, বং, সাবান, গামছা, ছোটোখাটো যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বানানো হত। সেইসব ছাত্রদের তৈবি শিল্পসম্ভাব বড়বাজাবে নিকুঞ্জবিহারী সেনেব দোকানে বিক্রি কবে বিলক্ষণ অর্থলাভ হত। এইভাবে বাংলায প্রযুক্তিচর্চা শুরু হয কিন্তু তাব মান কৃৎ-কৌশলেব উপবে নয অর্থাৎ আমাদেব দেশেব কাবিগরেবা যা পাবত তাবই পুনবাবৃত্তি।

এবপবে প্রচণ্ড গর্জনে আসিল দুর্দিন। ১৯০৪-এ বিশ্ববিদ্যালয আইন জাবি কবে সবকাব স্বদেশি কলেজগুলিকে অস্বীকাব কবলেন। তাঁদেব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব বাইবে অন্য কোনও শিক্ষা পবিষদেব অনুমোদনেব প্রযোজন হল।

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো দেখা দিল। সেইসঙ্গে কার্লাইল সাবকুলাব যাতে স্কুল-কলেজে বন্দেমাতবম গাওযা নিষিদ্ধ হল। সে ব্যাপাবেও একটি জাতীয শিক্ষা পবিষদেব প্রযোজন অনুভূত হয। ১৯০৫-এবই অক্টোববে কলকাতাব পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে এক বিবাট জনসভায দেশেব মনীষীবা একত্র হযে জাতীয শিক্ষা পবিষদ

গঠনেব পবিকল্পনা কবেন। এই প্রতিষ্ঠানেব মাধ্যমে জাতীয স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠাব কর্মসূচি গ্রহণ কবা হয। ১৯০৬ সালেব ১১ মার্চ প্রতিষ্ঠিত জাতীয শিক্ষা পবিষদেব অধীনে কলকাতায দুটি কলেজ এবং মফস্সলে ২২টি স্কুল চালু কবা হয। ডন সোসাইটি জাতীয শিক্ষা পবিষদে মিশে যায এবং সতীশ মুখোপাধ্যায বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজেব কর্মাধ্যক্ষ পদে বৃত হন। অপব কলেজটি বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনস্টিটিউট নামে সহযোগী প্রতিষ্ঠান সোসাইটি ফব দ্য প্রমোশন অব টেকনিক্যাল এডুকেশন-এব অধীনে শুধুমাত্র প্রযুক্তিচর্চাব জন্য পাঠক্রম শুরু কবে। প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসু এব অধ্যক্ষ হন। স্যাব তাবকনাথ পালিতেব চাব লক্ষ টাকাব অর্থানুকূল্যে তাঁবই বাসভবন ৯২ নম্বব আপাব সাবকুলাব বোডে BTI যাত্রা শুরু কবে। তবে তাবকনাথেব শর্ত ছিল এই প্রতিষ্ঠানে শুধু প্রযুক্তিবিজ্ঞানেব প্রশিক্ষণ দেওযা হবে, ছাত্রদেব স্বদেশি বাজনীতিতে জড়ানো হবে না। এই নিযে NCE এবং SPTE-এব মধ্যে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব ছিল। ১৯১০-এ স্যাব আশুতোষ মুখোপাধ্যায কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব উপাচার্য হলে তাবকনাথ তাঁব সমস্ত অনুদান এবং বাসভবনটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব বিজ্ঞান কলেজ কবাব জন্য দিযে দেন। তখন BTI-এব চবম দুববস্থা। একবাব মানিকতলায, পবে বৌবাজাবে স্থান বদলে কোনওক্রমে এব কাজ চলতে থাকে। পবে অপব ব্যাবিস্টাব বাসবিহাবী ঘোষ সমস্ত ব্যয-ভাব গ্রহণ কবেন। BTI পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে। SPTE উঠে যায। জাতীয শিক্ষা পবিষদেব অধীনে BTI চলতে থাকে। 'Bengal National College' অববিন্দ ঘোষেব অধ্যক্ষতায ১৯০৬-এ যাত্রা শুরু কবলেও বোমাব মামলায জড়িযে তাঁব পদত্যাগ ও প্রস্থানেব পব নিভু নিভু হযে যায। ক্লাসেব বেঞ্চ ফাঁকা পড়ে থাকে। অথচ BTI-তে ছাত্রেব সমাগম বাড়তে থাকে। ১৯১৬'ব পব BTI-এব বমবমা এবং BNC-তেও ছাত্র হতে থাকে। ১৯২২-এব পব যাদবপুবেব বিস্তৃত এলাকায দুই প্রতিষ্ঠানই চলে আসে। ১৯২৮-এব পব BTI-এব নতুন নামকবণ হয College of Engineering and Technology (CET)।

এখানে আদিপর্বে এবং পববর্তীকালে বিদেশ প্রত্যাগত ইন্‌জিনিযাবিং শিক্ষকদেব মধ্যে শবৎকুমাব দত্ত, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, হীবালাল বায, বাণেশ্বব দাস, ভীমচন্দ্র চ্যাটার্জী, হেমচন্দ্র গুহ এবং ত্রিগুণা সেন প্রধান। এঁবা বহু ত্যাগ স্বীকাব কবে সামান্য বেতনে ইন্‌জিযাবিং-এব নানা শাখায অধ্যাপনা কবে ছাত্রদেব সুশিক্ষিত কবে তোলেন। CET আমাদেব দেশে কৃৎ-কৌশলকে প্রযুক্তিবিজ্ঞানে উন্নীত কবে।[1] প্রখ্যাত প্রযুক্তি ঐতিহাসিক J J Salomon যথার্থই বলেছেন, প্রযুক্তি বিজ্ঞান হল কৃৎ-কৌশলেব সঙ্গে তত্ত্বেব সংমিশ্রণ। তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছাড়া কাবিগবি বিদ্যা কখনোই প্রযুক্তিবিজ্ঞানে উন্নীত হতে পাবে না।[2] CET-এ এইভাবেই প্রযুক্তিবিজ্ঞানেব পাঠক্রম বচিত হযেছিল। শিবপুব BE কলেজে কেবল Civil এবং Electrical Engineering পড়ানো হত। PWD-ব শূন্যস্থান পূবণেব জন্য। কিন্তু CET-এ Engineering ছিল বিচিত্রগামী। উপবেব দুটি শাখা ছাড়াও Mechanical এবং Chemical Engineering-এও পাঠক্রম চালু কবা হয। এখন উত্তবসূবি যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালযে ১২টি প্রযুক্তিবিজ্ঞানেব শাখা পড়ানো হয।

CET-এব ছাত্রবা তাদেব জার্নালে প্রযুক্তিবিজ্ঞান সম্পর্কে বহু মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশ

করতে থাকে। অধুনা দুষ্প্রাপ্য সেই জার্নাল থেকে কিছু কিছু নিবন্ধের অংশবিশেষ প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে উদ্ধৃত হল।

প্রথম উদ্ধৃতিটি চতুর্থ বর্ষের Electrical Engineering -এর ছাত্র সুধাংশুশেখর সিংহ রচিত 'Wireless Telephony' (১৯৩৪)—

Wireless Telephony is not so new and almost unborn as is generally supposed to be like its companion art, wireless, telegraphy, it began its existence well back in the nineteenth century. Its inception is contemporaneous with that of wire telephony, for Alxander Graham Bell was the originator of both. It is a singular coincidence that Bell the inventor of the telephone and Morse the reputed inventor of the telegraph, should each have been among the first to accomplish their respective modes of communication wirelessly. The history of wireless telephony follows very closely that of wireless telegraphy. The extreme sensitiveness of the telephone receiver to small variation of current very naturally suggested its employment as a receiving device in connection with the induction and conductive methods of wireless telegraphy and attempts were made at an early date to accomplish the transmision of articulate speech by these same means. The results obtained however were very meagre, the inherent difficulties characterizing these methods proved to be even greater with the application of telephone principles due to the diminution of energy made necessary by the nature of the process. As in the case of wireless telegraphy, the root of the problem lay in the application of the methods of electric radiation.[3]

সিংহ তাঁর প্রবন্ধে টেলিফোনের ক্ষেত্রে হার্ডজিয়ান তরঙ্গের সাহায্যে কী উন্নতি হয়েছে সেই সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর তাঁর মন্তব্য রাখেন—

In case of an oscillation generating arrangement which does not produce a perfectly sustained train of electric waves but a series of partially damped wavetrains separated by slight breaks of continuity, the essential condition of success in connection with radiotelephonic work is that the interruption shall not take place at an audible frequency. It is highly probable that the direct-current arc method of creating oscillations does not produce an absolutely continuous train of waves, as in the case with a high-frequency alternator but on the contrary, is made up of a great number of groups of almost undamped oscillation separated by an interval of time very small even in comparison with the duration of each group.[4]

সিংহ-র এই ব্যাখ্যা চতুর্থ শ্রেণীর একজন ছাত্রের পক্ষে অভাবনীয়। এতে তাঁর বিষয় সম্পর্কে দখল শুধু নয়, তাঁর মৌলিকত্বও প্রকাশ পাচ্ছে। তত্ত্বের আভাসে তথ্যও প্রযুক্তিবিজ্ঞানে পরিণত হচ্ছে।

ওই বছবই সিংহ আব একটি প্রবন্ধ প্রকাশ কবেন, তাব নাম 'Oil from Coal'। তাব ভূমিকা এইবকম—

Because of the rapid process of mechanisation of the army of civilization in general liquid fuel has become of utmost importance in the present state of inevitable quick march of events Oil-sources are located at considerable distances from seats of power of different nation some of which are without any oil-field within their own country colony, protectorates or mandated area In peace-time one can buy oil from other countries but during war possibility of such purchases becomes a doubtful proposition So semi-industrial plants for the production of liquid fuel must be kept in running condition to be utilized in case of national emergency Col K C Appleyard at a meeting of the Midland Section of the Coke Oven Managers' Assocaition showed by facts from coal or its gaseous products yet becoming economic in true sense of the word

There are two processes in trial operation by subsidization for the synthetic manufacture of liquid fuel from coal by treating it with hydrogen under pressure at suitable temperature in the presence of suitable catalyzers and activators The latter obtains the oil from sulphur-free water

The development of these processes has been possible by the pioneering work of hydrogenation by Sabatier and Senderens and high-pressure technique achieved by Haber and Bosch '

সিংহ তত্ত্বটিব বর্ণনা কবে Fischer-Tropsch পদ্ধতিব উপবে নিজেব মন্তব্য বেখেছেন—

Attention has already been drawn to the fact that Fischer-Tropsch reaction in exothermic and one of the main problems has been the dissipation of heat generated by the reaction Many types of reaction chambers have been tested before the final design was adopted and in the apparatus finally agreed upon the catalyst is arranged between hollow space through which a steam of water flows which can be regulated to maintain constant temperatures

The fraction boiling over about 210°C providеds an excellent Diesel oil when the dissolved paraffin has been removed It is to have excellent combustion properties and gives a clear exhaust even with a considerable overload on the engine while its high hydrogen content enables it to be used with a better fuel consumption than petroleum Diesel oil Lubricating oil can be manufactured by a by-product of the Fischer-Tropsch process by polymerising the fractions containing olefixes with anhydrous aluminium chloride Alternatively, high boiling

tractions, low in olefixes can be chlorinated to produce mono or dichloro-derivative these oils being subsequently caused to polymerise and simultaneously being dechlorinated by finely divided metallic aluminium It has now become possible to produce lubricating oils possessing the most varying properties They are adjustable to such an extent that lubricating oils suitable for any purpose whatsoever can be produced synthetically "

সিংহ আবাবও একটি উত্তবাধুনিক বৈজ্ঞানিক বিষযে তাঁব মৌলিকতাব পবিচয দিযেছেন।

Mechanical Engineering-এব চূডান্ত বর্ষেব ছাত্র জ্ঞানকুমাব মুখোপাধ্যায তাঁব প্রবন্ধ 'Fuel injection system -এব শুরু কবেছেন এইভাবে—

During past sixteen years the development of automotive Diesel and Oil Engine is progressing considerably The success of this development has been due greatly to the co-operation of the Engine Designer, the metallurgist, the production engineer and the petroleum technologist In its general construction Diesel engine is almost identical with the petrol engine except the combustion system In oil engine, there are two principal combustion systems

1 Air injection or blast injection

2 Solid injection (mechanical injection, airless injection or pump injection)

Difficulty airses regarding the amount of fuel to be injected during each complete cycle For example, an engine developing 25 H P per cylinder at 1200 r p m The amount of fuel injected 007 cubic inch This amount of fuel during injection must be injected at right instant The fuel which is to be injected must be filtered well In case of Diesel and oil Engine which operate over large range of speeds it is essential to vary the point at which the injection of the fuel begins in order to compensate for the ignition lag Means are provided to allow the point of injection to be controlled, either manually or automatically The mechanism is usually incorporated in the injection pump housing Many engineers are provided with a vernier capling on the injection pump drive shaft to allow a permanent alternation of the point of injection

In order to obtain easy starting of the cool cylinders glow plugs like spark plugs are used to heat the mixture Instead of two electrodes it has resistance were filament which becomes red not when the current passes through it

There are the general equipments of the injection system of the Oil Engine Every part of this system should be in perfect state so that

perfect combusion and consequently the output of the engine will be ensured [7]

লেখক তৎকালীন মোটব কোম্পানিতে ব্যবহৃত এই পদ্ধতি সম্পর্কে শুধু অবহিতই ছিলেন না, তাব উন্নতিব পবামর্শ দিয়েছেন। তিনি ডিজেল এবং Oil Engine প্রস্তুত কবাব যোগ্য প্রযুক্তিবিদ্ ছিলেন।

এবপবে Mechanical Engineering-এব তৃতীয বর্ষের ছাত্র সত্যব্রত মজুমদাবেব 'Television' নিবন্ধে চলে আসি। তিনি প্রথমে এই উত্তবাধুনিক যন্ত্রেব অন্তর্নিহিত কৃৎ-কৌশলেব সুচারু বর্ণনা কবেছেন—

The most amazing wonder of the present times which augurs to go a long way towards the welfare of man is the recent invention of the phenomenon of television Most of us have had the direct experience of working a radio or getting a radio receiver cater songs Orchestra, speeches etc to our satisfaction The performances occur at a spot far away from the radio receiver the function of which is just to catch those things from the air and serve us the same Likewise, television helps us to see before our eyes speakers, actors etc making their respective performances which they do at a great distance It fell to the lot of an English Scientist named 'Barid' to be the inventor of this wonderful phenomenon in 1925 Let us see how we can be in a position to understand the working of television If we divide a picture into very small imaginary parts and if a strong ray of light is made to travel through all the parts within a very short time in a dark room what we really see? We see a glimpse of the whole picture as long as the ray of light continues travelling This contiguity of vision in spite of breaks however short of the successive lighting of the imaginary parts of the picture has been called the 'persistence of vision' Our eyes continue seeing a thing in front of it for a very short time after it is withdrawn from our view So when the ray of light travels through the picture quickly, our eye can see the whole picture The imaginary parts of the picture are lighted successively by a ray of light The process is called "Scanning" and the machine used for this is "the Scanner' This constitutes the most necessary elements of Television

Nowadays, war pictures are sent through radio in the same way as stated above This is called "Radio Photo" It has been found possible in recent times to transport a wholly complete newspaper by means of television May we draw from it that in a not very distant future the world will be able to read an international newspaper which will carry the message of love, unity and facilitated to a greater extent

with more and more development in the technique of "Television" [৪]

যদিও মজুমদাব Television-এব সবকিছুই জানতেন কিন্তু ভাবতে টেলিভিশন চালু হতে আরও ৫০ বছব লেগে যায। এব পিছনে বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা ছিল। কিন্তু যখন Television এল খুব দ্রুতই এল। কাবণ এব প্রযুক্তিবিজ্ঞান Engineering ছাত্রদের নখদর্পণেই ছিল। সর্বশেষ উদ্ধৃতি দিই তৃতীয বর্ষ Engineering-এব ছাত্র S Bhattacharyya-এব 'The Structure of Atom' প্রবন্ধ থেকে—

Ever since the discovery of the electron in 1895, and of the recognition of the fact that it formed a universal constitute of all matters, the older ideas regarding the atom as an ultimate constituent of matter which was not further divisible became untenable Now as the atom contains negatively charged electrons and because the atom is electrically neutral, it must contain positively electricity in some form or other But what was the nature of the positive electricity which neutralized the negativity, remained for a time a vague surmise physicists began to speculate about the way in which the atom of positive and negative electricity were combined to from the different kinds of atoms The first suggestion came from the famous physicist Lord Kelvin and was further elaborated by Sir J J Thompson They held that the positive electricity was concentrated in a sphere of about the same dimensions as the atom and the electrons were uniformly distributed throughout the sphere

But the true nature of positive electricity was investigated by the bombardment with high speed positively charged particles by Ratherford and his students C R T Wilson developed a method by which the paths of these particles are made to pass through super saturated water vapour the supersaturation of the vapour is destroyed them The molecules of the gas which are encountered by the traversing particles become ionised and these gaseous ions form the centres of condensation of water from supersaturated aquous vapour actually becomes visible when suitable illuminated as a fine line of mist It is observed that most of the particles travel in straight lines, which could not be the case if they were deflected from their course by impact with every atom they encountered a few are diverted to some extent and very frequently a complete reversal of directin of motion occurs [৭]

একজন Engineering স্নাতকেব এটা প্রযুক্তিবিজ্ঞানে চবমোৎকর্যেব উদাহবণ। বিনয সবকাব যথার্থই লিখেছেন—যাদবপুবেব ছাত্রবা দেশেব শিল্পাযন এবং আধুনিকীকবণেব ক্ষেত্রে অগ্রদূতেব ভূমিকা পালন কবেছিল। তাঁবা পাশ্চাত্যেব প্রযুক্তিবিজ্ঞানেব, সঙ্গে নিজেদেব স্বকীযতাব সংমিশ্রণ ঘটিযেছেন। এঁদেব অনেকেই পববর্তীকালে বহু স্বদেশি শিল্পেব জনক হন এবং সাবা ভাবতে ও বিশ্বে এঁবা ছডিযে পড়েন। সবকাবেব হিসেব

মতো ১৯২৮-এ যদি পাঁচজন প্রযুক্তিবিদ্ পাশ কবে থাকে ১৯৪৭ সালে তাব সংখ্যা দাঁড়ায ৫০০।[10] ১৯৫৬ সালে জাতীয শিক্ষা পবিষদেব কলেজগুলি যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালযে পবিণত হয, এখন তা মহীরুহ।

References

1 C Palit National Council of Education and National Science Kolkata 2005
2 Jean Jacques Salomon What is Technology? The Issues of its Origins and Definitions in Sabyasachi Bhattacharyya & Petro Redondi (eds) Techniques to Technology 1990 New Delhi p 242
3 Sudhangshu Shekhar Sinha Wireless Telegraphy in the Journal of College of Engineering and Technology (CE & T). Calcutta 1934 p 21
4 Ibid p 24
5 Sudhangshu Shekhar Singa, Oil from Coal in op cit p 137
6 Ibid pp 11-12
7 Jnan Kumar Mukherjee Fuel Injection System in Journal of CE & T 1935 p 137
8 Satyabrata Majumdar Television , in the Journal of CE & T. 1936 p 18-19
9 S Bhattacharyya, Structure of atom in the Journal of CE & T Vol IX No 1 December 1936 p 104
10 Benoy Kumar Sarkar. Education for Industrialization Calcutta 1946 see conclusion

ঔপনিবেশিক বাংলার স্বদেশি শিল্প ও বাঙালি পুঁজিপতি শ্রেণী

অমিত ভট্টাচার্য

ঔপনিবেশিক ভাবতবর্ষে 'স্বদেশী যুগ' বলতে সাধাবণভাবে আমবা বিংশ শতাব্দীব শুরুব দশক অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী বাজনৈতিক আন্দোলনেব সময়কাল বুঝে থাকি। কিন্তু ব্যাপক অর্থে দেখতে গেলে এই যুগেব সূত্রপাত আরও আগে—ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে—১৮৭০-এব দশকে বা তার কিছু আগে। এই যুগ ছিল আধুনিক ভাবতবর্ষেব ইতিহাসেব সবচেয়ে সৃজনশীল যুগগুলিব অন্যতম। নানা ধবনেব স্বদেশি অর্থনৈতিক চিন্তা—দেশেব দারিদ্র্য, দেশীয় অর্থনীতিব সংকট, উপনিবেশিক শোষণ, হস্তশিল্পেব পুনরুজ্জীবন, আধুনিক শিল্পস্থাপনের প্রাথমিক প্রচেষ্টা, বিদেশি দ্রব্য বয়কট, বিভিন্ন মাধ্যমে স্বদেশি প্রচাব—এসব কিছুবই শুরু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে। বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীব মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতাব্দীব মাঝামাঝি বা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যে সময়কাল তাব মধ্যে স্বদেশি ধ্যানধাবণা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাববার সামনে এসেছে। দেশীয় হস্তশিল্পেব পুনর্জাগবণ, নতুন নতুন আধুনিক শিল্পস্থাপনেব ইতিহাস পর্যালোচনা কবলে দেখা যাবে যে জাতীয় শিল্পস্থাপনের প্রচেষ্টা কখনও তীব্র রূপ নিযেছে, কখনও বা প্রতিকূল পবিস্থিতির সম্মুখীন হযে স্তিমিত হযে এসেছে, কিন্তু নিভে যাযনি। পুবো উপনিবেশিক যুগ ধবেই স্বদেশি শিল্পেব এই ধাবা কোনো-না-কোনো ভাবে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে এসেছে।

'স্বদেশী শিল্প' বলতে পবাধীন ভাবতবর্ষে কী বোঝায? সাধাবণভাবে প্রচলিত ধাবণা হল এই যে, যেসব শিল্প দেশি মালিকানাধীন, সেসবই স্বদেশি শিল্প। কিন্তু দেশি মালিকাধীন হলেই তা স্বদেশি শিল্প হিসাবে বিবেচ্য হতে পাবে না। এখানে যে প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হল আমরা এক দেশেব কথা আলোচনা কবছি যা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেব দ্বাবা প্রত্যক্ষভাবে শাসিত একটি দেশ। পবাধীন ভারতবর্ষে দেশি শিল্পকে শুধু দেশি মালিকানায থাকলেই চলবে না, একই সঙ্গে মূলধন, পরিচালনা, কারিগবি জ্ঞান, বাজার, এমনকি যন্ত্রপাতিব জন্যও যতটা সম্ভব দেশজ উপাদানের উপব নির্ভব কবা প্রযোজন। আত্মনির্ভবশীলতার সঙ্গে অন্য যে বৈশিষ্ট্য থাকা দবকার তা হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিব বিরোধিতা এবং তাব সঙ্গে প্রতিযোগিতা কবে নিজেব পাযের উপব দাঁড়াবাব মানসিকতা। উপনিবেশিক ভারতবর্ষে বিদেশি অর্থনৈতিক নাগপাশেব বিরুদ্ধে সংগ্রাম কবে স্বাধীন শিল্প হিসাবে বেড়ে ওঠাব প্রচেষ্টাই 'স্বদেশী শিল্প' হিসাবে পরিচিত হওযাব মৌলিক পূর্বশর্ত। এই স্বদেশি বুর্জোযা শ্রেণী জাতীয বুর্জোযা শ্রেণীব অন্তর্গত। বিদেশি পুঁজি ও শাসকশ্রেণীব সঙ্গে এই শ্রেণীব সম্পর্কেব ক্ষেত্রে নির্ভবশীলতা ও বিবোধিতা—এই দুটি দিকেব অস্তিত্ব থাকলেও প্রধান দিক ছিল ব্রিটিশ বিবোধিতা। এই সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী দিকই তাকেই এক স্বতন্ত্র আসনে বসিযেছিল। বিংশ শতাব্দীতে অবিভক্ত বাংলাব শিল্পক্ষেত্রে এই স্বাদেশিকতা

বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ কবে—কখনও তা বিদেশি দ্রব্য বযকটেব প্রকাশ্য আহ্বানেব মাধ্যমে, কখনও বা প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ-বিবোধিতা না কবে শুধুমাত্র দেশীয দ্রব্য ব্যবহাবেব প্রযোজনীযতা প্রচাবেব মাধ্যমে পবোক্ষভাবে। লক্ষণীয বিষয হল, বিদেশি, বিশেষত ব্রিটিশ-বিবোধিতা সবাসবি আসছে বাজনৈতিক আন্দোলন যখন তীব্র রূপ নিচ্ছে তখন, যেমন ১৯০৫-এব বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন ও তাব অব্যবহিত পবে, ১৯২০-এব দশকেব প্রথমে কিংবা ১৯৩০-এব দশকেব প্রথমে। জাতীয অর্থনীতিতে শিল্পস্থাপনেব কাজ যেমন তাব নিজস্ব গতিতে অগ্রসব হযেছে, তেমনি বাজনৈতিক আন্দোলনও সেই গতিতে বেগ এনেছে, নতুন প্রাণেব সঞ্চাব কবেছে এবং এইভাবে তাবা একে অপবেব পবিপূবক হিসাবে কাজ কবেছে।

বাংলায স্বদেশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে আলোচনা কবতে গিযে সুমিত সবকাব পাঁচটি সুস্পষ্ট ধাবাব উল্লেখ কবেছেন (১) কাবিগবি শিক্ষা এবং শিল্প-গবেষণাব প্রসাব, (২) প্রদর্শনী, স্বদেশি দোকান ও স্বেচ্ছাসেবকদেব মাধ্যমে কম দামে দেশি দ্রব্য বিক্রয এবং স্বদেশিব প্রসাব, (৩) মৃতপ্রায দেশি হস্তশিল্পেব পুনরুজ্জীবন, (৪) নতুন আধুনিক শিল্পস্থাপন, এবং (৫) স্বদেশি ব্যাংক, বিমা কোম্পানি ও জাহাজি কোম্পানি স্থাপন। এই সমস্ত উপাদানই কোনো-না-কোনো ভাবে স্বদেশি শিল্পেব প্রসাব এবং বাঙালি পুঁজিপতি শ্রেণীব উদ্ভব ও বিকাশেব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবে।

(১) কাবিগবি শিক্ষাসংস্থা স্থাপন ও কাবিগবি শিক্ষাব প্রসাব

বাংলাদেশে কাবিগবি শিক্ষাব সূত্রপাত ১৮৮৬ সালে। সেই সময ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু বিশ্ববিদ্যালযেব শিক্ষাব পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞানবিষযক শিক্ষাসূচি, পৃথক একটি বিজ্ঞান ও কাবিগবি সংস্থা আব 'ভাবতীয শিল্পবিকাশ সমিতি' গডে তোলাব প্রযোজনীযতাব কথা উল্লেখ কবেন। তাঁব মতে, 'বিজ্ঞানশিল্প' স্থাপনেব প্রাথমিক পূবশর্ত হল কাবিগবি শিক্ষাব প্রসাব। তাঁব উদ্যোগ ও প্রচাবেব ফলে ১৮৯১ সালে 'ভাবতীয শিল্প সমিতি' গডে ওঠে। এই সমিতি প্রাথমিক পর্যাযে কযলা প্রভৃতি শিল্প বিষযে সাধাবণ মানুষেব উপযোগী ভাষণেব ব্যবস্থা কবে। 'ভাবতীয শিল্প বিকাশ সমিতি'ব চেযে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকবী ছিল আইনজীবী যোগেশচন্দ্র ঘোষেব গড়া 'ভাবতীযদেব বিজ্ঞান ও শিল্প-শিক্ষা প্রসাব সমিতি'। এটি ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয। এই সমিতিব উদ্দেশ্য ছিল চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহ কবে সেই অর্থে ভাবতীয যুবছাত্রদেব বিদেশে কাবিগবি শিক্ষা অর্জনেব জন্য পাঠানো। সমিতিব সদস্য চাঁদা ছিল ৪আনা। সমিতিব কাজকর্ম প্রসাবিত হয এবং ১ বছবেব মধ্যে ৪৮ টি জেলা কমিটি গডে ওঠে।

তবে এক্ষেত্রে সবচেযে গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা যাদবপুবেব 'জাতীয শিক্ষা কাউন্সিল' যা নানা বিবর্তনেব মধ্য দিযে যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালযে পবিণত হয। ১৯১০ সালে এই কাউন্সিলেব উদ্যোগে গডে ওঠে 'বঙ্গীয কাবিগবি সংস্থা' (Bengal Technical Institute) প্রযুক্তি শাখাব বিভিন্ন বিভাগে এই সংস্থা তিন বছবেব প্রাথমিক শিক্ষা ও চাব বছরেব

মাধ্যমিক শিক্ষা চালু কবে। বলবিদ্যা, তড়িৎবিদ্যা, অংক, অর্থনৈতিক ভূবিদ্যা ইত্যাদি নানাবিধ বিষযে শিক্ষা দেওযা হয। অধ্যাপক অমিতাভ মুখোপাধ্যায তাঁব লেখা জাতীয শিক্ষা বিষযক গ্রন্থে এ বিষযে বিস্তাবিত আলোচনা কবেছেন। জাতীয শিক্ষা কাউন্সিলেব বিভিন্ন বিপোর্ট থেকে জানা যায যে, 'বঙ্গীয কাবিগবি সংস্থায' শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রবা নানা ধবনেব যন্ত্রপাতি, যেমন তড়িৎ-বিশ্লেষণ ক্রিযাব সাহায্যে তড়িৎ-প্রবাহ মাপাব যন্ত্র, হালকা বিদ্যুৎপ্রবাহ মাপাব যন্ত্র ইত্যাদি প্রস্তুত কবতেন। এই সংস্থাটি ১৯১০-২৯ সাল পর্যন্ত স্থাযী হয। ১৯২৯ সালে তাব নামকবণ হয 'যাদবপুব ইঞ্জিনিযাবিং ও কাবিগবি মহাবিদ্যালয'। ১৯৫৬ সাল এই কলেজ যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালযে রূপান্তবিত হয। উপনিবেশিক ভাবতবর্ষে জাতীয বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাব প্রসাবে BTI বা ইঞ্জিনিযাবিং কলেজেব ভূমিকা অনস্বীকার্য।

(২) প্রদর্শনী, স্বদেশি দোকান ইত্যাদিব মাধ্যমে স্বদেশি দ্রব্য বিক্রয

ঊনবিংশ শতকেব মাঝামাঝি সমযে বাংলায নবগোপাল মিত্রব 'হিন্দু মেলা'ব মাধ্যমে স্বদেশি দ্রব্য প্রচাবেব সঙ্গে আমবা কমবেশি পবিচিত। ১৮৯৩ সাল থেকে শিল্প সমিতিব উদ্যোগে সেই একই কর্মকাণ্ডেব পুনবাবির্ভাব ঘটে। প্রতি বছব ভাবতেব জাতীয কংগ্রেসেব অধিবেশনেব সময কিংবা মেলা স্তবে নানা ধরনেব স্বদেশি মেলা ও প্রদর্শনীব ব্যবস্থা হত। বর্ধমানেব কাঞ্চননগবেব ছুবি কাঁচি, কলকাতা শহবেব পি এম বাকচি কোম্পানিব সুগন্ধি দ্রব্য—কোনোকিছুই বাদ যেত না। গুণমানেব বিচাবে সোনাব মেডেল ও স্বীকৃতিসূচক সার্টিফিকেট দেওযা হত। ১৯০৫-এব বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন চলাকালীন স্বাভাবিকভাবেই দেশি শিল্প ও ব্যবসাব প্রসাব ঘটে, বিদেশি দ্রব্য বযকটেব আহ্বান আভ্যন্তবীণ বাজারকে আবও তেজী কবে তোলে। সেই সময প্রযোজন হয এইসব স্বদেশি দ্রব্য বিভিন্ন দোকানেব মাধ্যমে বিক্রি কবাব। ফলে বহু সংখ্যক স্বদেশি দ্রব্যই বিক্রি হত। তাদেব বিজ্ঞাপনে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকত। 'স্বদেশী বাজাব', 'স্বদেশী বস্ত্রালয', 'স্বদেশী ভাণ্ডার', 'ভাবত ভাণ্ডাব', 'ছাত্র ভাণ্ডাব' প্রভৃতি দোকানেব নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবকেবা বাস্তাব মোড়ে দাঁড়িযে, বাড়ি বাড়ি ঘুবে কিংবা ট্রেনেব কামবায ঘুবে ঘুবে স্বদেশি দ্রব্য ফেবি কবে বেড়াতেন। পি এম বাকচি'ব কালি, এইচ বোস অ্যান্ড কোম্পানিব 'কুন্তলীন' বা 'দেলখোশ', ঢোল কোম্পানিব মলম এবং আবও অনেক জিনিস বিক্রিব কথা বযোবৃদ্ধবা এখনও মনে বেখেছেন।

(৩) মৃতপ্রায দেশি হস্তশিল্পেব পুনরুজ্জীবন

ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন বাংলাদেশেব শিল্পজীবনে সার্বিক বিপর্যয ডেকে এনেছিল। সুতিবস্ত্র সহ হস্তশিল্পেব বিভিন্ন শাখা অবশিল্পাযনেব কবলে পড়ে। ই ডব্লিউ কলিন (E W Collin) তাঁব ১৮৯০ সালেব একটি বিপোর্টে উল্লেখ কবেন যে, কাঠ, পিতল, মাদুব আব মাটিব জিনিস ছাড়া বাংলাব অন্য সব হস্তশিল্পজাত দ্রব্যই ইউবোপীয দ্রব্য বাজাবে আসাব ফলে

ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয। বিদেশি ম্যাঞ্চেস্টাবেব কাপড় বাজাব ছেযে যাওযায বহু এলাকাব তাঁতিবা উৎপাদন বন্ধ কবে দিতে বাধ্য হন। জণগণনা বিপোর্ট থেকে জানা যায যে, ১৮৯১-১৯০১-এব দশকে বাংলা দেশে তাঁতিব সংখ্যা ৫ ভাগ কমে যায।

সুতিবস্ত্র উৎপাদনেব এই অধোগতি স্বদেশি আন্দোলন আংশিকভাবে ঠেকাতে পেবেছিল। বস্তুত সেইসময বাংলা দেশেব বিভিন্ন অঞ্চল দেশি জিনিসেব চাহিদা গডে ওঠে। সবকাবি বিপোর্ট থেকে জানা যায যে প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান ডিভিশনে তাঁতিদেব অবস্থাব উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। জি এন গুপ্ত তাঁব বিপোর্টে উল্লেখ কবেছেন যে অবশিল্পাযনেব কারণে যে বিপুল সংখ্যক তাঁতি নিজেদেব হস্তশিল্প ছেডে যেতে বাধ্য হন, ১৯০৮ সাল নাগাদ তাঁদেব অনেকেই পুবোনো জীবিকায ফিবে আসেন। জি এন গুপ্ত তাঁব বিপোর্টে লিখেছেন যে ১৯০৬-০৭ সাল পূর্ববাংলাব ঢাকা ও চট্টগ্রাম ডিভিশনে ইউবোপীয দ্রব্যেব আমদানি বিশেযভাবে হ্রাস পায এবং ১৯০২-০৭ সালে রাজশাহী ডিভিশনে দেশি সুতিবস্ত্রেব চাহিদা যথেষ্ট পবিমাণে বৃদ্ধি পায। বাজশাহী ডিভিশনেব ১৯০৬-০৭ সালেব বিপোর্ট অনুযাযী পাবনা জেলায দেশি জিনিসেব চাহিদা এত বেড়ে যায যে বাজাবেব চাহিদা মেটানো তাঁতিদেব পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। ১৯০৫-০৮ সালে নোযাখালি জেলায বিদেশি কাপডেব আমদানি যথেষ্ট পবিমাণে কমে যায এবং দেশি কাপডেব চাহিদা বাড়ে।

এ বিষযে কোনো সন্দেহ নেই যে স্বদেশি আন্দোলন স্বদেশি হস্তশিল্পেব পুনরুত্থান একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে দবকাব ছিল কাবিগবি ক্ষেত্রে প্রচলিত মাকুব (loom) উন্নতি সাধন। আমাদেব দেশে বহু প্রজন্ম ধবে যে মাকুব প্রচলন ছিল তা হল 'throw-shuttle handloom' এই মাকুব উন্নতি ঘটানোব কোনো চেষ্টা কবা হযনি। শ্রীবামপুবেব সবকাবি বস্ত্র বযন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেব অধিকর্তা ই বি হ্যাভেল পুবোনো মাকুব বদলে নতুন মাকু—'fly-shuttle loom' চালু কবেন। এই তাঁতযন্ত্রটি অষ্টাদশ শতকেব মাঝামাঝি সমযে ইংবেজ তাঁতি জন কে (John kay) আবিষ্কাব কবেন। ইংলন্ডেব শিল্পবিপ্লবেব পিছনে এই কাবিগবি আবিষ্কাবেব বড ভূমিকা ছিল। এই নতুন মাকু পুবোনো মাকুব মতো হস্তচালিত হলেও তাব থেকে উন্নত মানেব ছিল। ফলে বাংলাব বিভিন্ন অঞ্চলেব তাঁতিবা উৎপাদনেব কাজে এই মাকু ব্যবহাব কবা শুরু কবেন। বাংলা দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলেব জাতীযতাবাদী কর্মীদেব উদ্যোগে বস্ত্রবযন বিদ্যালয স্থাপিত হয। সেইসব বিদ্যালযে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'দেব বযন শিক্ষা দেওযা হত। কলকাতা ছাড়াও ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ববিশাল অঞ্চলে এই ধবনেব বিদ্যালয স্থাপিত হযেছিল।

স্বদেশি যুগে তাঁতবস্ত্র ছাডা হস্তাশিল্পেব অন্যান্য ক্ষেত্রেও পুনরুজ্জীবন দেখতে পাওযা যায। বেশম শিল্পেব দুটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল মালদা ও মুর্শিদাবাদ। কামিং (J G Comming)-এব মতে সুতিবস্ত্র শিল্পীদেব তুলনায বেশম শিল্পীদেব অবস্থা ভালো ছিল। বর্ধমানেব কাঞ্চননগব ছুবি, কাঁচি, জাঁতি প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুতেব কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন কবে। কাঞ্চননগবেব শিল্পেব ইতিহাস প্রায পাঁচশো বছবেব পুবোনো।

কাবিগব প্রেমচাঁদ মিস্ত্রি ও গৌরচাঁদ মিস্ত্রিব নাম এখনো সেখানে শ্রদ্ধাব সঙ্গে স্মবণ কবা হয়ে থাকে। কাঞ্চননগবেব দ্রব্যাদি বহু স্বদেশি দোকানে পাওযা যেত এবং বিদেশেও রপ্তানি হত। এইসব ছুবি ও কাঁচিব উন্নত গুণমানেব জন্য কাঞ্চনগবকে 'বাংলাব শেফিল্ড' নামে অভিহিত কবা হত। এছাড়া উত্তব মেদিনীপুবে কাঁসা ও পিতলেব দ্রব্যাদিব প্রসাব ঘটে। স্বদেশি কলমেব নিব সেযুগেব শিল্পোদ্যোগেব অন্যতম। ববিশালেব 'ববিশাল নিব ম্যানুফ্যাক্টবি', পুরুলিযাব 'স্বদেশী ভাণ্ডাব', কুমিল্লাব 'সেন এণ্ড কোং', কলকাতাব 'স্বদেশি শিল্প নিকেতন' এই ক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া হুগলি, হাওড়া, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে হাতে তৈবি কাগজ, ঢাকাব শাঁখাশিল্প প্রভৃতি শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রেও উদ্যোগ লক্ষণীয।

(৪) নতুন আধুনিক শিল্পস্থাপন

স্বদেশি যুগেব অর্থনৈতিক ক্রিযাকলাপেব অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক আধুনিক শিল্পস্থাপন। শিল্পেব বিভিন্ন শাখায স্বদেশি কর্মোদ্যোগের প্রতিফলন দেখতে পাওযা যায। যেমন বস্ত্র বাসাযনিক ও ঔষধ, লৌহ, দেশলাই, তামাক, সিগাবেট ও বিড়ি, সাবান, চর্ম, কাগজ, বাষ্পীয নৌচালন, সুগন্ধি দ্রব্য, কালি, টাইপ, বর্ষাতি, রবাব স্ট্যাম্প, দুগ্ধজাত দ্রব্য, লজেন্স, পেন পেন্সিল, নিব, পেনহোল্ডার, ডিস্ক বেকর্ড, সবিষাব তেল, ছাতা, কাচ, ব্যাঙ্ক, বিমা, লণ্ঠন, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। প্রতিটি শিল্পের সঙ্গে বিভিন্ন কোম্পানিব উদ্যোগ জড়িত। যেমন বস্ত্রশিল্পে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, মোহিনী মিল, বাসাযনিক ও ঔষধ শিল্পে বেঙ্গল কেমিক্যাল, বেঙ্গল ইমিউনিটি, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, ইস্ট ইন্ডিযা ফার্মাসিউটিক্যালস, মাথাব তেলে সি কে সেন অ্যান্ড কোং, মাথাব তেল ও সুগন্ধি দ্রব্যে পি এম বাকচি অ্যান্ড কোং, এইচ বোস অ্যান্ড কোং, কালি উৎপাদনে পি এম বাকচি, সুলেখা ওযার্কস, সাবান শিল্পে ক্যালকাটা সোপ কোং, ওবিযেন্টাল সোপ ফ্যাক্টবি, দেশলাই শিল্পে ভাগীবথী ম্যাচ ফ্যাক্টবি, জলপাইগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিজ, চর্মশিল্পে ন্যাশন্যাল ট্যানাবি, বহবমপুব লেদাব ওযার্কস, তামাক ও সিগাবেট শিল্পে বংপুব টোব্যাকো কোং, বেঙ্গল সিগাবেট কোং, আয়ুর্বেদীয ঔষধ শিল্পে সাধনা ঔষধালয, শক্তি ঔষধালয, যন্ত্রপাতি উৎপাদনে ও লৌহশিল্পে পাইওনিযাব আযবন ওযার্কস, মাযা ইঞ্জিনিযাবিং ওযার্কস, ইন্ডিযা মেশিনাবি কোং, বর্ষাতি, টুপি, গামবুট ও অন্যান্য ববাব নির্মিত দ্রব্য উৎপাদনে বেঙ্গল ওযাটাবপ্রুফ ওযার্কস, পেন পেন্সিল পেনহোল্ডাব ও নিবে এফ এন গুপ্ত অ্যান্ড কোং, বাষ্পীয ও নৌচালন শিল্পে ইস্টবেঙ্গল বিভাব স্টিম সার্ভিস লিমিটেড, বেঙ্গল স্টিম নেভিগেশন কোং, ব্যাংক শিল্পে বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাংক, বিমা শিল্পে হিন্দুস্থান কোঅপাবেটিভ ইন্সিওবেন্স সোসাইটি এবং নানাবিধ শিল্পে আবও বহু কোম্পানি।

স্বদেশি যুগে যেসব শিল্পোদ্যোগীব কর্মকাণ্ডেব পবিচয় আমবা পাই তাঁবা মূলত তিন ধরনের সামাজিক শ্রেণী থেকে এসেছিলেন। (১) মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাব মধ্যে আমবা ইঞ্জিনিযাব, চিকিৎসক, বসাযনবিদ, উকিল, স্কুল শিক্ষক ও অধ্যাপকদেব পাবো, (২) হস্তশিল্পীবা যাঁবা বর্ধমান, ববিশাল, হাওড়া, কলকাতা সহ আবও অনেক অঞ্চলে ছোটো

ও মাঝাবি আকাবেব কারখানা গড়ে তুলেছিলেন, (৩) জমিদারশ্রেণীব এক অংশ যাঁবা বংপুব, পাবনা, নদিয়া সহ বিভিন্ন অঞ্চলে কিছুসংখ্যক স্বদেশি কোম্পানি গড়ে তুলেছিলেন। এইসব ছোটো ও মাঝাবি পুঁজিপতিরা বহুলাংশে আত্মনির্ভবশীব ছিলেন এবং বৃহৎ পুঁজিপতিদেব মতো বিদেশি পুঁজিব উপব নির্ভবশীলতাব পবিবর্তে স্ব-উদ্যোগে, স্বাধীনভাবে জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠা কবাব প্রচেষ্টা চালান এবং বহুক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন কবেন। আমাদেব দেশে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী বলতে আমবা এই শ্রেণীকেই বুঝি। এই ছোটো ও মাঝাবি বুর্জোয়া শ্রেণীব সঙ্গে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীব কযেকটি ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য আছে। সেইসব প্রভেদেব ক্ষেত্রগুলি হল

১। সামাজিক উৎস, ২। আদিম সঞ্চযেব পদ্ধতি, ৩। উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান/মৌলিক গবেষণা, ৪। কাবখানাব স্থান নির্বাচন ও কাবখানা প্রস্তুতেব পবিকল্পনা, ৫। কোম্পানিব পবিচালক/বিশেষজ্ঞ, ৬। যন্ত্রপাতি, ৭। বাজাব, এবং ৮। বাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।

আমবা এখন এই প্রভেদগুলি নিযে আলোচনা কবব।

(১) সামাজিক উৎস ভাবতেব বৃহৎ বুর্জোযাদেব উদ্ভব হযেছিল বণিক, ব্যাংকাব, দালাল, ফাটকাবাজ ও জুযাড়ি শ্রেণী থেকে। অন্যদিকে ছোটো ও মাঝাবি বুর্জোযাদেব শ্রেণীভিত্তি ছিল স্বতন্ত্র। *বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওযার্কস* (১৮৯২)-এব প্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্লচন্দ্র বায ছিলেন বসাযনবিদ ও বসাযনেব অধ্যাপক। *সাধনা ঔষধালয* (১৯১৪)-এব প্রতিষ্ঠাতা যোগেশচন্দ্র ঘোযও ছিলেন বসাযনেব অধ্যাপক। *পি এম বাকচি এণ্ড কোম্পানী* (১৮৮৩)-এব প্রতিষ্ঠাতা কিশোবীমোহন বাকচি এসেছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। এই স্বদেশি কোম্পানিটি ভাবতবর্ষে প্রথম বাসাযনিক কালিব প্রস্তুতকাবক। তাছাড়া পঞ্জিকা, সুগন্ধি তেল, সেন্ট বাবাবস্ট্যাম্প, টাইপ ফাউন্ড্রি কবিবাজি ও অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ সহ অন্য নানা দ্রব্য কোম্পানিব কাবখানায প্রস্তুত হত। পেশায উকিল বমেশচন্দ্র সেন মযমনসিংহ জেলায গেঞ্জি ও জাঙ্গিযা প্রস্তুতেব কাবখানা স্থাপন কবেন। পাবনা জেলা সে যুগে ছিল হোসিযাবি দ্রব্য প্রস্তুতেব সবচেযে বড কেন্দ্র। এক্ষেত্রে সবচেযে উল্লেখযোগ্য কোম্পানিব নাম *পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী কোম্পানী*। এব প্রতিষ্ঠাতা তাবণগোবিন্দ চৌধুবী ছিলেন পাবনাব বড জমিদাব। *বেটজান এণ্ড কোম্পানী*-ব মালিক করুণাকিশোব কবগুপ্তও ছিলেন জমিদাব। কুমিল্লাব চিকিৎসক মহেন্দ্রনাথ নন্দী *পাইওনিযাব আযবন ওযার্কস* নামে একটি যন্ত্র তৈবিব কাবখানা স্থাপন কবেন। যেখানে দেশলাই শিল্পেব জন্য গিলোটিন যন্ত্র তৈবি হত। ডা নন্দী নিজেই সেই যন্ত্রেব আবিষ্কর্তা। *শক্তি ঔষধালয*-এব প্রতিষ্ঠাতা মথুবামোহন চক্রবর্তী পেশায ছিলেন ঢাকাব একটি বিদ্যালযেব প্রধান শিক্ষক। চব্বিশ পবগনা জেলাব নাটাগোবে বনমালী কর্মকাব নামে এক লোহাব কাবিগব যন্ত্র তৈবিব কাবখানা গড়ে তোলেন। কাঞ্চননগব, নাড়াজোল, হাওড়া বা উল্টোডাঙাব কাবিগবেবা নিজ নিজ এলাকায বিভিন্ন ধবনেব ছোটো ও মাঝাবি কাবখানা গড়ে তোলেন।

(২) আদিম সঞ্চযেব পদ্ধতি বৃহৎ বুর্জোযাদেব সামাজিক উৎসই দেখিযে দেয তাদেব

আদিম সঞ্চযেব পদ্ধতি কী ছিল। ব্যবসা, দালালি, তেজাবতি কাববাব, ফাটকাবাজি জুযাখেলা ব্যাংকিং—এসব ছিল তাদেব আদিম সঞ্চযেব পদ্ধতি। অন্যদিকে ছোটো ও মাঝাবি বুর্জোযাদেব পুঁজি সঞ্চযেব পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রফুল্লচন্দ্র বায অধ্যাপনাব মাধ্যমে সঞ্চয কবেছিলেন। সেইসঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিযে বন্ধুবান্ধব, আত্মীযস্বজনেব কাছ থেকেও তিনি অর্থ সংগ্রহ কবেন। এইসব উৎস থেকে পাওযা অর্থ দিযে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল গড়ে তোলেন। ডা নীলবতন সবকাব চিকিৎসক হিসাবে জমানো অর্থ দিযে প্রস্তুত কবেন *ন্যাশন্যাল ট্যানাবি*, *পি এম বাকচি এণ্ড কোম্পানীব* প্রতিষ্ঠাতা কিশোবীমোহন ১৮৮৩ সালে মাত্র ২ টাকা পুঁজি নিযে কালি তৈবি কবা শুরু কবেন। জলপানি আব ম্যাট্রিক পবীক্ষাব পবে অর্জিত সোনাব মেডেল বিক্রি কবে তিনি এই অর্থ সংগ্রহ কবেছিলেন বলে শোনা যায। কুমিল্লার *হাউস অব লেবাবার্স* প্রস্তুত কবেন কিছুসংখ্যক উদ্যোগী শ্রমিক বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা মানুষ। প্রাথমিক পুঁজি বাবদ ২৪০ টাকা কুমিল্লাব এক দেশি ব্যবসাযীব কাছ থেকে ধাব হিসাবে সংগ্রহ কবা হয।

(৩) উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান/মৌলিক গবেষণা বৃহৎ বুর্জোযাদেব উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান সাধাবণভাবে ছিল না বললেই চলে, অন্যদিকে ছোটো ও মাঝাবি বুর্জোযাদের প্রতিনিধিদেব অনেকেবই সে বিষযে যথেষ্ট ধাবণা ছিল এবং তাঁদেব অনেকেই মৌলিক গবেষণাব সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র বায় তাঁব আত্মজীবনীতে *(Life and experiecces of a Bengali Chemist)* বেঙ্গল কেমিক্যাল-এব শুরুব ইতিহাস ব্যাখ্যা কবেছেন, কীভাবে মিহি সোডা কার্বোনেট প্রস্তুত কবাব জন্য সাজিমাটি নিযে পবীক্ষা নিবীক্ষা কবেছেন, পশুব হাড় পুড়িযে তাব ছাই সালফিউবিক অ্যাসিডেব সঙ্গে মিশিযে এবং অন্য নানাভাবে 'Phosphate of Soda crystals' তৈবি কবেন। যে *শ্রীনাথ মিল*-এ পাকা বং-এব তাঁতবস্ত্র তৈরি হত, তাব মালিক ছিলেন উদযকুমাব দাশ। তিনি একই সঙ্গে আইনজীবী, ইঞ্জিনিযার, ম্যানেজাব ও কাবিগবি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ভাবতেব বৃহৎ পুঁজিপতিরা নিজেবা মৌলিক গবেষণা কবাব বদলে বিদেশ থেকে প্রযুক্তি আমদানি কবাব দিকে অনেক বেশি নজব দিতেন। অন্যদিকে *পি এম বাকচি এণ্ড কোং*-এব মতো মাঝাবি আকাবে স্বদেশি কোম্পানি মৌলিক গবেষণাব ভিত্তিতে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত কবাব জন্য ল্যাববেটবি বানিযেছিল, সেখানে বিধুভূষণ ভট্টচার্য নামে একজন এম ডি ডাক্তাব জওপাবি, কুদল, অপাং, কবঞ্জ, মুক্তাছাবি প্রভৃতি গাছগাছড়া নিযে পরীক্ষা নিবীক্ষা চালিযে নানা ধবনেব পেটেন্ট ওষুধ তৈবি কবেন। যন্ত্রপাতি নির্মাণ কবাব ক্ষেত্রেও দক্ষতাব পবিচয উপনিবেশিক যুগে, বিশেযত বিংশশতকেব প্রথম ভাগে দেখতে পাওযা যায।

(৪) কাবখানাব স্থান নির্বাচন ও কাবখানা বানানোব পবিকল্পনা কাবখানা কোথায স্থাপিত হবে, তাব পবিকল্পনা কাঠামো কেমন হবে, সে বিষযে বৃহৎ পুঁজিপতিবা নির্ভব কবতেন বিদেশি বিশেষজ্ঞদেব উপবে। টাটাদেব টিসকো তৈবিব ইতিহাস তা স্পষ্টভাবে দেখিযে দেয। ছোটো ও মাঝাবি বুর্জোযাবা কিন্তু নির্ভব কবতেন নিজেদেব উপবে। স্বদেশি বস্ত্র তৈবিব কাবখানা—কুষ্টিযাব *মোহিনী মিল*-এব কর্ণধাব মোহিনীমোহন চক্রবর্তী তাঁব

কাবখানাব সমস্ত পবিকল্পনা নিজে কবেছিলেন। হাবাণচন্দ্র মুখোপাধ্যাযেব হাতে গড়া *হাবাণ আযুর্বেদীয ঔষধালয* স্থাপিত হয বাঁকুডাব গ্রামাঞ্চলে কাবণ সেক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চল থেকে ঔষধ তৈবিব গাছগাছড়া সংগ্রহ কবা অনেক সহজ হয। বংপুবে *বংপুব টোব্যাকো কোং* প্রতিষ্ঠাব অন্যতম কাবণ ছিল ওই জেলায তামাকেব সহজলভ্যতা। *প্রসন্ন ম্যাচ ফ্যাক্টবি, ভাগীবথী ম্যাচ ফ্যাক্টবি* বা *জলপাইগুডি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড* যখন স্থাপিত হয, তখন সেইসব কাবখানাব কর্ণধাবেবা দেশলাইযেব কাঠ, সস্তা শ্রমেব জোগান, বিদ্যুৎ সবববাহ এবং বাজাব কাছে আছে কিনা সে দিকে লক্ষ বেখেছিলেন।

(৫) **কোম্পানিব পবিচালক/বিশেষজ্ঞ** পরিচালনা, বিশেষজ্ঞেব পরামর্শ এবং পবিচালন কমিটি গডাব জন্য বৃহৎ বুর্জোযাবা বহুলাংশে বিদেশিদেব উপব নির্ভব কবতেন। ফলে ভাবতীয শিল্পেব উপর নিযন্ত্রণ বজায বাখতে তাদেব কোনো অসুবিধা হত না। যেমন জামশেদপুবেব *টিসকো*-ব প্রথম জেনাবেল ম্যানেজাব ছিলেন ওযেল্‌স্ নামেব এক মার্কিনী। ছোটো ও মাঝাবি বুর্জোযাদেব ক্ষেত্রে পবিস্থিতি ছিল ভিন্ন। উদাহরণস্বৰূপ বি এন দাস ছিলেন *ক্যালকাটা উইভিং কোং*-এব ম্যানেজাব, সেই কোম্পানির পবিচালন সমিতিতে কোনো বিদেশি ছিলেন না। *বেঙ্গল হোসিযাবি কোং, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, মোহিনী মিল, বেঙ্গল পটাবিজ,* 'জবাকুসুম' কেশতেল প্রস্তুতকাবক *সি কে সেন এণ্ড কোং* এবং আবও অনেক স্বদেশি কোম্পানি ভাবতীযদেব হাতেই পবিচালনাব দাযিত্ব অর্পণ কবেছিল। এ বিষযে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য *ওরিযেন্টাল সোপ ফ্যাক্টরি*-ব নাম, যাবা ১৯০৯-এব একটি বিজ্ঞাপনে জানিযেছিলেন যে তাঁদেব কাবখানায কোনো বিদেশি বা জাপানি বিশেষজ্ঞ নেই।

(৬) **যন্ত্রপাতি** ভাবতবর্ষেব শিল্পাযনেব অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিদেশ থেকে ক্রমশ বেশি পবিমাণে যন্ত্রপাতি আমদানি। এর কাবণ এই নয যে, ভাবতীয কাবিগবদেব দক্ষতাব অভাব ছিল কিংবা এ দেশে দেশি প্রযুক্তিব বিকাশ ঘটেনি। এব মূল কাবণ এই যে উপনিবেশিক বাষ্ট্র দেশীয শিল্পেব সঙ্গে দেশীয প্রযুক্তিকেও ধ্বংস কবেছিল এবং তাবপব এদেশেব মাটিতে বিদেশ থেকে আমদানি কবা পুঁজিবাদী শিল্পব্যবস্থা সংস্থাপন কবেছিল। ভাবতেব বৃহৎ পুঁজিপতিবা সাধাবণভাবে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি কবে কাবখানা স্থাপন কবত। বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহাব কবত, নিজেবা যন্ত্রপাতি বানানোব দিকে বিশেষ কোনো নজব দিত না। বিদেশি প্রযুক্তিব উপব এই নির্ভবশীলতা বাংলাব ছোটো ও মাঝাবি পুঁজিপতিদেব মধ্যেও অংশত দেখতে পাওযা যায। সুতিবস্ত্র, সিগাবেট, দেশলাই প্রভৃতি শিল্পে নিযুক্ত অনেক স্বদেশি কোম্পানিই বিদেশ থেকে আমদানি কবা যন্ত্র দিযে উৎপাদন কবত। কিন্তু এব অন্য দিকও ছিল যা গবেষকদেব গবেষণায কিছুকাল আগেও প্রাধান্য পাযনি। ছোটো ও মাঝাবি বুর্জোযাদেব অনেকেই নিজেবা নিজেদেব কারখানায যন্ত্র বানাতেন আব সেই যন্ত্র উৎপাদনেব কাজে লাগাতেন। দৃষ্টান্তস্বৰূপ *শ্রীনাথ মিল*-এব কর্ণধাব উদযকুমাব দাস নিজেই ছিলেন ইঞ্জিনিযাব এবং নিজেব কাবখানাব সব যন্ত্রই তিনি নিজে প্রস্তুত কবেন।

বেঙ্গল কেমিক্যাল-এবও সব যন্ত্রপাতি তাদেব কাবখানায তৈবি হয। *শ্রীনাথ মিল* বা *বেঙ্গল কেমিক্যাল*-এব যন্ত্রপাতি তাঁবা বানাতেন নিজেদেব কাবখানায ব্যবহাবেব জন্য। স্বনির্ভবতা ছিল তাদেব অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেইসব যন্ত্রপাতি বাজাবেব পণ্য হযনি, নিজেদেব কাবখানায ব্যবহাবেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে অনেক স্বদেশি কর্মোদ্যোগীই বাজাবে বিক্রিব জন্য যন্ত্র বানিযেছিলেন। যেমন দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায নামে একজন ইঞ্জিনিযার 'দীনবন্ধু মাকু' নামে একটি নতুন ধবনেব কাপড বোনাব মাকু প্রস্তুত কবেন এবং পেটেন্ট পান। *ভবানী ইঞ্জিনিযাবিং এণ্ড ট্রেডিং কোং* দেশলাই তৈবিব উদ্দেশ্যে নানা ধবনেব মেশিন বানাত। ভাবতীয কাঠেব ধবন ও অন্যান্য আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যেব কথা মাথায বেখে তাবা জার্মান ও জাপানি যন্ত্রেব পদ্ধতিব মধ্যে ভাবতীয় কাঠ ও অন্যান্য অঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যেব কথা মাথায বেখে প্রযোজনীয পবিবর্তন এনে এখানকাব উপযোগী দেশলাই মেশিন বানাতে সক্ষম হন। হাওডাব আলামোহন দাস তৈবি কবেন *ইণ্ডিয়া মেশিনাবী কোং* যেখানে উঁচু মানেব নানাধরনেব যন্ত্র তৈবি হত।

(৭) বাজাব বাজাবেব জন্য বৃহৎ পুঁজিপতিদেব বিদেশিদেব উপব নির্ভবতাব পবিবর্তে ছোটো ও মাঝাবি বুর্জোযাবা দেশি দোকানের উপব নির্ভব কবত। উপনিবেশিক যুগে দেশের বিভিন্ন এলাকায বহুসংখ্যক ছোটো বড় দোকান গডে উঠেছিল। সে-সবেব মাধ্যমে দেশি দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি হত। এ বিষযে *লক্ষ্মীব ভাণ্ডাব, ভাবত ভাণ্ডাব, সুর এণ্ড কোং, ছাত্র ভাণ্ডাব, খাদি ভাণ্ডার, ফেক্টো* প্রভৃতিব নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৮) বাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি · বাংলাব স্বদেশি পুঁজিপতিদেব বাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বৃহৎ পুঁজিপতিদেব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূলগতভাবে আলাদা ছিল। বৃহৎ বুর্জোযাদেব সঙ্গে ব্রিটিশ পুঁজিব শুধু অর্থনৈতিক গাঁটছড়া ছিল না, উপনিবেশিক বাষ্ট্রেব সঙ্গে বাজনৈতিক গাঁটছড়াও ছিল। এ বিষযে সুনীতিকুমাব ঘোষ বিস্তাবিত আলোচনা কবেছেন। অন্যদিকে স্বদেশি বুর্জোযাদেব প্রতিনিধিদেব অনেকেই ব্রিটিশ শাসন বিবোধী বিপ্লবী আন্দোলনেব সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জডিত ছিলেন। ইষ্ট *ইণ্ডিযা ফার্মাসিউটিক্যাল্স*-এব অন্যতম স্বত্বাধিকাবী হীবেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন 'যুগান্তব'-এব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বাষ্ট্রবিবোধী সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডেব জন্য কাবাৰুদ্ধ হন। *বেঙ্গল ওযাটাবপ্রুফ ওযার্কস*-এব প্রতিষ্ঠাতা সুবেন্দ্রমোহন বসু ব্রিটিশ-বিবোধী বিপ্লবী বাজনৈতিক ক্রিযাকলাপে অংশ নেওযাব জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কাবাৰুদ্ধ হন। যাদবপুবেব *গোপাল হোসিযাবী কোং* দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধেব সমযে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে গেঞ্জি ও জাঙ্গিযা সবববাহ কবতে অস্বীকাব কবে। এই সবই ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশিক বাষ্ট্রেব প্রতি বাজনৈতিক বিবোধিতাব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভাবতেব বৃহৎ পুঁজিপতিদেব প্রতিনিধি টাটা, বিড়লা, শ্রীবাম, গোযেংকা প্রমুখদেব কাছে তা আশা কবা যায না।

বস্তুত, ঔপনিবেশিক ভাবতবর্ষে যে ভাবতীয পুঁজিপতি শ্রেণীব জন্ম, সেই শ্রেণী কোনো অবিচ্ছেদ্য শ্রেণী ছিল না। এটি বড, মাঝাবি ও ছোটো---এই তিনভাগে বিভক্ত ছিল। এদেব মধ্যেকাব বৃহৎ পুঁজিপতিদেব সঙ্গে বিদেশি পুঁজিব সম্পর্কেব মধ্যে দ্বন্দ্বেব

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও শ্রমজীবী মানুষ

নির্বাণ বসু

১৯০৫ সালে বাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সবকাব তাদেব বহুদিন লালিত বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ভাগ কবাব প্রস্তাব কার্যকবী কবতে উদ্যত হয। বাজনীতি সচেতন হিন্দু বাঙালি সম্প্রদায, প্রধানত যাবা ছিল ব্রিটিশ সবকাবেব আক্রমণেব লক্ষ্য, অচিবে গড়ে তোলে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন। অল্প কিছুদিনেব মধ্যেই বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন সাবা ভাবতে ছড়িযে পড়ে ও পবিণত হয স্বদেশি আন্দোলনে। শুধু নিছক একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বদ কবা নয, সমস্ত ব্রিটিশ শাসন ও শোষণেব বিরুদ্ধে সোচ্চাব হয়ে ওঠাই ছিল এই স্বদেশি আন্দোলনেব মূল কথা। আব ভাবতেব জাতীয় কংগ্রেস তাব প্রতিষ্ঠালগ্ন (১৮৮৫) থেকে নবমপন্থী প্রভাবিত হয়ে শুধুমাত্র প্রস্তাব গ্রহণেব আর আবেদন-নিবেদনেব যে নীতি গ্রহণ কবেছিল, তাব পবিবর্তে আন্দোলনমুখী বাজনীতিবও সূত্রপাত ঘটল এই স্বদেশি আন্দোলনেব সময থেকে। সর্বোপবি, বাংলা তথা ভাবতে জাতীযতাবাদী বাজনীতিব সামাজিক গণভিত্তিব প্রসাবও এই সময় থেকে ঘটতে শুরু কবে। শুধুমাত্র ইংবাজি শিক্ষিত মেট্রোপলিটান শহবেব উচ্চবর্গীয এলিট শ্রেণীব মধ্যে যে রাজনীতি এতদিন সীমাবদ্ধ ছিল, তা এখন পথে-ঘাটে-প্রান্তবে ছড়িযে পড়তে শুরু কবল। সাধাবণ মানুষকে বৃহত্তব বাজনীতিব আঙিনায সংযুক্ত কবাব প্রক্রিযা স্বদেশি আন্দোলনেব সময থেকেই শুরু হয।

এই প্রক্রিযাবই অংশ হল শিল্প শ্রমিকদেব বা সাধাবণভাবে শ্রমজীবী মানুষেব লডাইযেব সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব সংযোগ স্থাপন। ভাবতে জাতীযতাবাদী বাজনৈতিক চিন্তাব উন্মেষ যে সময ঘটতে শুরু কবে, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীব দ্বিতীযার্ধেই বাংলা তথা ভাবতে সামাজিক শ্রেণী হিসাবে শিল্প-শ্রমিকশ্রেণীব উদ্ভব ঘটে, পাট ও সূতাকল, কযলাখনি, বাগিচাশিল্প, লৌহ ও ইঞ্জিনিযাবিং কাবখানাব মতো বৃহৎ শিল্প এবং বেলেব মতো নতুন পবিবহন ব্যবস্থা চালু হবার ফলে। এব আগেও ভাবতে শিল্প ছিল এবং তা ছিল মূলত হস্ত ও কুটিব শিল্প এবং তাব জন্য ছিল 'কাবিগব' সম্প্রদায। কিন্তু বৃহৎ যন্ত্রনির্ভব ও পুঁজিনির্ভব শিল্প প্রতিষ্ঠাব পবই প্রযোজন হল একই ছাদেব তলায দাঁড়িযে কাজ কবাব জন্য মজুবিব ভিত্তিতে শত শত শ্রমিক নিযোগেব। মার্কসীয অর্থে প্রকৃত শ্রমিকশ্রেণী হযতো ভাবতে তখনও গড়ে ওঠেনি, কিন্তু সামাজিক শ্রেণী হিসাবে অবশ্যই সৃষ্টি হযেছিল এই নবগঠিত শ্রমিকশ্রেণী। স্বভাবতই ব্রিটিশ শাসনেব পীঠভূমি বাংলা দেশ শিল্প স্থাপনেব গোড়াব দিকে ভাবতেব মধ্যে ছিল অগ্রগণ্য স্থানে এবং এখানে গড়ে ওঠা শিল্পগুলিতে মূলত ব্রিটিশ পুঁজিব বিনিযোগ ঘটেছিল। তাব ফলে তৈবি হযেছিল বেশ বড সংখ্যক শিল্প শ্রমিকশ্রেণীব। বিশেষত উনিশ শতকেব শেষ দশকে বাংলা দেশে শিল্পাযনেব গতি ত্বরান্বিত হলে, প্রচুব সংখ্যক শ্রমিকেব প্রযোজন হয কলকাবখানায। নানা কাবণে বাঙালি শ্রমিকেব সংখ্যা কমতে থাকে এবং দলে দলে শ্রমিক

যুক্তপ্রদেশ বিহাব ও ওড়িশা থেকে বাংলায় আসতে শুরু করে। এই অবস্থায় বিংশ শতাব্দীব শুরুতে বাংলা দেশেব শ্রমিকশ্রেণীব চবিত্রটিই বদলে যায। এই শ্রমিকবা শুধু যে অস্থানীয (বা non-local) ছিল তা নয, এদেব মধ্যে একটি দ্বৈত চবিত্রও (বা dual nature) প্রকাশ পায। শহবে বোজগাবেব জন্য শ্রমিকেব জীবন ববণ কবলেও, এদেব মগ্ন চৈতন্যে কৃষকসত্তা পুবোপুবি অবস্থান কবত। এই কাবণেই বাংলার জাতীয জীবনেব মূল ধাবাব সাথে শ্রমিকশ্রেণী একাত্মবোধ হযে উঠতে পাবেনি। যদিও ১৮৭০-এব দশক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' প্রবন্ধমালায শিবনাথ শাস্ত্রী 'সমদর্শী' পত্রিকায, কেশবচন্দ্র সেন সুলভ সমাচাবে, কৃষ্ণকুমাব মিত্র 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায অর্থনৈতিক অসাম্যেব বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিযেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ মুচি মেথবেব ভাবতবর্ষ গড়ে তোলাব উদাত্ত আহ্বান জানিযেছেন, বিংশ শতকেব গোড়ায চবমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল এবং ডন পত্রিকাব সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায শ্রমিক অসন্তোষ ও আন্দোলন সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ কবেছেন। কিন্তু বাঙালি বুদ্ধিজীবীদেব চিন্তাভাবনা শ্রমিক সাধাবণেব জগৎকে কোনোভাবেই স্পর্শ কবেনি। আবাব শ্রমিকশ্রেণী তাদেব নিজস্ব অভাব অভিযোগ ও অর্থনৈতিক দাবিদাওযাকে কেন্দ্র কবে যখন বিক্ষুব্ধ হযে উঠেছে, স্বতঃস্ফূর্ত ও অসংগঠিত ভাবেই তাবা প্রতিবাদ জানিযেছে। কোনো সংগঠন বা বহিবার্গত নেতৃত্বের সঙ্গে তাদেব কোনো যোগ ছিল না।

এই অবস্থায ১৯০৫ সালেব ১ সেপ্টেম্বব বঙ্গভঙ্গেব সবকাবি ঘোষণাব প্রতিবাদে কলকাতা ও শহবতলিতে পবদিন প্রতিবাদ দিবস পালিত হয। ওই দিনই হাওড়াব বার্ন কোম্পানিব প্রায ৩০০ জন বাঙালি কবণিক হাজিবা বেকর্ড কবাব নতুন অপমানজনক নিযম চালু কবাব প্রতিবাদে কাজ থেকে বেবিযে আসেন। স্বদেশি আন্দোলনেব ভাবধাবায উদ্বুদ্ধ জাতীযতাবাদী পত্রপত্রিকা 'নবযুগেব অগ্রদূত' বলে তাঁদেব অভিনন্দিত কবলেন। এঁদেব সমর্থনে বিভিন্ন জাযগায সভাসমিতি হয। 'বেঙ্গলী' ও 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাব উদ্যোগে এঁদেব সমর্থনে তহবিল সংগ্রহ শুরু হলে ব্যাপক সাড়া পাওযা যায। 'সন্ধ্যা' পত্রিকা সমস্ত ইউবোপীয কোম্পানিব বাঙালি বাবুদেব গোলামখানা ছেড়ে বেবিযে আসাব ডাক দেয। ব্যাবিস্টাব ও শ্রমিক নেতা এ সি ব্যানার্জীব উদ্যোগে ক্লার্কস ডিফেন্স অ্যাসোসিযেশন গড়ে তোলাব প্রস্তাব নেওযা হয। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুব ফলপ্রসূ কিছু হযনি। এদিকে বার্ন কোম্পানিব ধর্মঘট ক্রমশ স্তিমিত হযে আসে। কর্তৃপক্ষ সমস্ত ধর্মঘটী কর্মীকে ববখাস্ত কবে নতুন কেবানি নিযোগ কবে। এই ধর্মঘটেব ফলে কোনো ট্রেড ইউনিযন গড়ে ওঠেনি এবং হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত কেবানি যাঁবা নিজেদেবকে স্বতন্ত্র ও উন্নত ভাবতেন, তাঁদেব ধর্মঘট ওই কাবখানায কর্মবত প্রায ৪,০০০ শ্রমিককে, যাঁদেব অধিকাংশই ছিলেন অবাঙালি, আদৌ স্পর্শ কবেনি।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে এই ধর্মঘট স্বদেশি যুগে প্রথম শ্রমিক আন্দোলন হিসাবে প্রবল উদ্দীপনাব সঞ্চাব কবেছিল এবং একে অনুসবণ কবেই গোটা সেপ্টেম্বব ও অক্টোবব মাস ধবে একেব পব এক ধর্মঘট হতে থাকে ও এই সমযটা 'ধর্মঘটেব মবশুম' বলে পবিচিতি লাভ কবে। অবশ্য, এইসব ধর্মঘটেব সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশি আন্দোলনেব কোনো যোগ ছিল না এবং এব পেছনে মূল্যবৃদ্ধিব মতো অর্থনৈতিক কাবণই প্রধানত দাযী ছিল। কেবলমাত্র

বঙ্গভঙ্গের দিন ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫-সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে শ্রমিকরাও প্রতিবাদে অংশ নেয়। বেসরকারি অফিস, কলকারখানা সব বন্ধ থাকে। শহর কলকাতা এক সর্বাত্মক বন্ধের চেহারা নেয়। সরকারি প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয় ১২টি চটকল, একটি চিনিকল ও সব মিলিয়ে প্রায় ৭০ হাজার কলকারখানা বন্ধ থাকে। গাড়োয়ানরা প্রায় ১১ হাজার গোরু ও মোষের গাড়ি বের করেননি।

অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে অসংগঠিত ধর্মঘটের তুলনায় সংগঠিত শ্রমিক ধর্মঘটগুলি ছিল অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। স্বদেশি আন্দোলন পর্বের সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে তিনি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে দেখিয়েছেন (১) সরকারি ছাপাখানার কর্মীদের ধর্মঘট (২) রেলকর্মীদের ধর্মঘট এবং (৩) কিছু সংখ্যক চটকলের ধর্মঘট।

কলকাতার ছাপাখানা কর্মীরা সংখ্যায় কম হলেও তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত ও রাজনীতি সচেতন বাঙালি হবার ফলে স্বদেশি যুগে তাদের আন্দোলন এক উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারি প্রেস ও বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেসের কর্মীরা চাকুরির প্রতিকূল শর্তাবলি ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে অনেক দিনই বিক্ষুব্ধ ছিল। ১৯০৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কলকাতার কেন্দ্রীয় সরকারি প্রেসে ধর্মঘট শুরু হয়। যেহেতু স্বদেশি আন্দোলন ঠিক শুরু হবার সময়ে এই ধর্মঘট হয়েছিল, তাই জাতীয়তাবাদীরা ও দেশীয় সংবাদপত্রগুলি ধর্মঘটীদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেসের কর্মীরা ও বেশ কিছু বেসরকারি ছাপাখানার শ্রমিকরাও সহানুভূতিসূচক ধর্মঘটে যোগ দেয়। সরকার এই আন্দোলনকে স্বদেশি ভাবধারায় প্রভাবিত 'রাজনৈতিক' আন্দোলন বলে অভিহিত করে দমন পীড়নের নীতি গ্রহণ করে ও ধর্মঘট ভাঙার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চালায়। স্বদেশি যুগের দুই বিশিষ্ট শ্রমিক সংগঠক এ সি ব্যানার্জী ও এ কে ঘোষ ছাড়াও বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মতো প্রথম শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী নেতারা এই আন্দোলনে শামিল হন। প্রিন্টার্স অ্যান্ড কম্পোজিটার্স লীগ নামে ধর্মঘটী শ্রমিকদের এক সংগঠন জন্মগ্রহণ করে। এদের উদ্যোগে ২৭ অক্টোবর এক বিশাল মিছিল উত্তর কলকাতায় পদযাত্রা করে। জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত সরকার পক্ষ কিছুটা নতিস্বীকারে বাধ্য হয়। নভেম্বর মাসে ভারত সরকারের শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের অধ্যক্ষ কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর ধর্মঘটীদের কিছু দাবিদাওয়া মেনে নিলে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। যদিও বরখাস্ত শ্রমিকদের কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি। যাই হোক, জাতীয়তাবাদীদের সক্রিয় সমর্থন থাকায় ধর্মঘট সম্পূর্ণ ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষা পায়।

ধর্মঘট প্রত্যাহারের পরেও প্রিন্টার্স ইউনিয়ন বেশ কিছুকাল সক্রিয় ছিল। ১৯০৬ সাল বরাবর বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস এবং বেশ কিছু ব্যক্তিগত ছাপাখানায় এদের সমর্থন অটুট ছিল। ১৯০৭ সালের পর থেকে অবশ্য এদের কাজকর্ম সম্বন্ধে তথ্য ক্রমশই অপ্রতুল হতে থাকে। সংগঠনের মধ্যে অন্তর্বিবাদও দেখা দেয়। ১৯০৮ সাল থেকে সাধারণ রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এই সংগঠন সম্পূর্ণত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৯১৯ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও মৃণালকান্তি বসুর উদ্যোগে প্রিন্টার্স ইউনিয়ন পুনরুজ্জীবনের সময় স্বদেশি আন্দোলনের যুগের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়।

স্বদেশি যুগে এব পবে যে শ্রমিক ক্ষেত্রেব কথা বলতে হয তাবা হল বেলওযে শ্রমিক। এই বেলওযেতেই তৎকালীন ভাবতবর্ষেব সবচেযে বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত হতেন। এই আন্দোলনেব বিভিন্ন পর্যাযে বেলশ্রমিকদেব সবচেযে এলিট অংশ অ্যাংলো ইন্ডিযান গার্ড ও ড্রাইভাব, বাঙালি কবণিক এবং বেলওযে ওযার্কশপের শ্রমিক—এই তিনটি শ্রেণী সবচেযে সক্রিয অংশগ্রহণ কবে।

১৯০৬ সালেব জুলাই থেকে সেপ্টেম্বব মাস পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিযা বেলওযেব মূলত বাঙালি হিন্দু স্টেশন মাস্টাব ও কবণিকদেব আন্দোলন চলেছিল। জাতীযতাবাদী নেতৃত্ব আন্দোলনকাবীদেব সমর্থনে এগিযে আসেন। ২৭ জুলাই বেলওযেমেনস ইউনিযন গঠিত হয। নৃত্যগোপাল ভট্টাচার্য ও সুবেন্দ্রনাথ মুখার্জীব মতো ববখাস্ত বেলকর্মীদেব পাশাপাশি বিপিন পাল ও শ্যামসুন্দব চক্রবর্তীব মতো স্বদেশি নেতাবাও এব সাথে যুক্ত হন। হাওডা থেকে আসানসোল ও বানিগঞ্জ পর্যন্ত এই আন্দোলন ছড়িযে পডে। এবপব সাহেবগঞ্জ ও জামালপুবেব বেলওযে ওযার্কশপেব কর্মীবা অর্থনৈতিক কাবণে ধর্মঘট শুরু কবে। এই দুই জাযগাব অবাঙালি কুলিবা ধর্মঘটীদেব সমর্থনে এগিযে আসে ও আন্দোলন জঙ্গি চবিত্র নেয। এই অবস্থায সুবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কৃষ্ণকুমাব মিত্র, টি এন পালিতেব মতো মডাবেট জাতীযতাবাদী নেতাবা কলকাতাব ইন্ডিযান অ্যাসোসিযেশন হলে অনুষ্ঠিত এক সভায শ্রমিকদেব কাছে শান্তি বজায বাখাব আবেদন জানান। একদিকে ধর্মঘটেব একটা সম্মানজনক নিষ্পত্তি অন্যদিকে জঙ্গি আন্দোলন বন্ধ কবা এই দুযেব মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বজায বাখাব প্রযোজন দেখা দেয। এই অবস্থায ইউনিযন নেতৃত্বেব ভিতবে চবমপন্থী ও নবমপন্থীদেব মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয। সাহেবগঞ্জ ও জামালপুব ওযার্কশপেব ধর্মঘট ভেঙে যায যদিও এই ওযার্কশপ কর্মীদেব সমর্থনে অন্যান্য বেল ওযার্কশপে আন্দোলন শুরু হয। এব মধ্যে সবচেযে উল্লেখযোগ্য ছিল বেঙ্গল-নাগপুব-বেলওযেব খড়্গপুব ওযার্কশপে ধর্মঘট (সেপ্টেম্বব, ১৯০৬)। কিন্তু ততদিনে জাতীযতাবাদী নেতৃত্ব আন্দোলন থেকে হাত গুটিযে নিতে আগ্রহী হযে পডেছিলেন। এই দোলাচলবৃত্তি বেলকর্মী ও জাতীযতাবাদী শ্রমিক সংগঠক উভযেব মনোবলই ভেঙে দেয।

এব প্রায এক বছব বাদে ১৯০৮ সালেব নভেম্বব মাসে বেতন বৃদ্ধিব দাবিতে ইস্ট ইন্ডিযা বেলেব ইউবোপীয ও অ্যাংলো ইন্ডিযান গার্ড ও ড্রাইভাববা আন্দোলন শুরু কবলে জাতীযতাবাদী পত্রপত্রিকা ও নেতৃত্ব অনেকটা উদাসীন ভূমিকা নেয। ততদিনে শ্রমিক আন্দোলন ও জাতীয আন্দোলন দুটি ধাবা অনেকটা ভিন্ন খাতে বইতে শুরু কবেছিল।

ছাপাখানা ও বেলকর্মচাবীদেব আন্দোলন মূলত কর্মচাবী ও দক্ষ শ্রমিকেব মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। স্বদেশি যুগে প্রকৃত সাধাবণ শ্রমিকেব আন্দোলন একমাত্র চটকলে দেখা গিযেছিল। এই সমযে একসঙ্গে সমস্ত চটকলে কোনো সাধাবণ ধর্মঘট না হলেও বিভিন্ন পর্বে বাজ্যেব মোট ৩৭টিব মধ্যে ১৮টি চটকলে ধর্মঘট হয। এব মধ্যে সবচেযে উল্লেখযোগ্য ছিল হাওডাব ফোর্ট গ্লস্টাব জুটমিলে, অক্টোবব জুটমিলে অক্টোবব ১৯০৫-থেকে মার্চ ১৯০৬-এব মধ্যে তিনটি ধর্মঘট হয। কাজেব ঘণ্টা সংক্রান্ত অভিযোগ ইউবোপীয ম্যানেজাবদেব অত্যাচাব ও কযেকজন কবণিক ও সর্দাবকে ববখাস্ত কবাব প্রতিবাদে এই ধর্মঘটগুলি হযেছিল। এছাড়া,

১৯০৫ সালে গার্ডেনরিচের হুগলি জুটমিলে ও রিষড়ার ওয়েলিংটন জুটমিলে, ১৯০৬ সালে দমদমের আবাটুন মিলে, গার্ডেনরিচের ক্লাইভ মিলে এবং শ্রীরামপুরের ইন্ডিয়া মিলে, ১৯০৭ সালে রিষড়ার হেস্টিংস ও ওয়েলিংটন মিলে, গার্ডেনরিচের ক্লাইভ, দমদমের আবাটুন এবং বেলেঘাটার সুরা মিলে, হাওড়ার ডেল্টা, বেলভেডিয়ার ও ন্যাশনাল মিলে এবং বরানগর ও কাঁকিনাড়া জুটমিলে ধর্মঘট হয়েছিল। অধিকাংশ ধর্মঘটই ছিল অসংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ সম্ভবত শ্রমিকদের পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করেছিল।

আন্দোলন শুরু হবার পরেই ধর্মঘটী শ্রমিকরা জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বহিরাগত নেতাদের মূলত কাজ ছিল সভাসমিতির আয়োজন করা ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে বৃহত্তর জনসাধারণকে ধর্মঘটীদের বিষয়ে সচেতন করে তোলা এবং সরকার ও মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসাবে আলাপ আলোচনা করে ধর্মঘটের নিষ্পত্তি ঘটানো, এছাড়া, এ সি ব্যানার্জীকে সভাপতি ও প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরীকে সম্পাদক করে ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে বজবজ অঞ্চলের চটকল শ্রমিকদের সংগঠন হিসাবে Indian Mill Hands Union গঠিত হয়। এটিকে চটকল শ্রমিকদের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ক্রমশই তারা কাজকর্মের পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করে এবং ১৯০৭ সালের শেষের দিকে নাম পরিবর্তন করে Indian Labour Union নাম গ্রহণ করে। ১৯০৮ সালের পরে অবশ্য এদের কার্যাবলির আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে যে আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল সে কথা যেমন সত্যি, ঠিক তেমনই এটাও সত্যি যে আন্দোলন বেশ কয়েকটি দুর্বলতায় আক্রান্ত ছিল।

প্রথমত এই আন্দোলন কেবলমাত্র কলকাতা শিল্পাঞ্চল ও রেলওয়ে শ্রমিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। খনি এবং বাগিচার মতো বৃহৎ দুটি ক্ষেত্রে এই আন্দোলন আদৌ কোনো ছাপ ফেলেনি। এমনকি কলকাতা শিল্পাঞ্চলের মধ্যেও নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রধানত কেবলমাত্র বাঙালি শ্রমিকরাই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। ফোর্ট গ্লস্টার বা বজবজের মতো যেসব জায়গায় চটকল শ্রমিক আন্দোলন হয়েছিল, সেগুলি সবই ছিল বাঙালি অধ্যুষিত।

দ্বিতীয়ত, অনেকগুলি ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী নেতারা শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিলেও, এইসব ধর্মঘট অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রমিকরা নিজেরাই অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে শুরু করেন। ১৯০৫ সালের প্রথম বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী দিবসের প্রতিবাদ আন্দোলনে শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করলেও বঙ্গভঙ্গের দ্বিতীয় কর্মসূচি থেকে নেতৃত্বের সতর্ক চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রমিকদের অংশগ্রহণের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছিল। যেটা ঘটেছিল তা হল স্বদেশি আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিবেশ শ্রমিকদের অর্থনৈতিক আন্দোলনে উদ্বোধিত করেছিল।

তৃতীয়ত, চারজন জাতীয়তাবাদী নেতা অশ্বিনীকুমার ব্যানার্জী, প্রভাতকুমার রায়চৌধুরী, প্রেমতোষ বসু এবং অপূর্বকুমার ঘোষ এই যুগের শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরা কেউই রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা ছিলেন

না। অন্যদিকে সমকালীন ববিষ্ঠ বাজনৈতিক নেতাদেব যেমন নবমপন্থী নেতা সুবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বা চবমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্যামসুন্দব চক্রবর্তীব শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ অনেকটাই ছিল ভাসাভাসা। বোম্বাই-এব মাবাঠি মিল-শ্রমিকদেব উপব লোকমান্য বাল গঙ্গাধব তিলকেব মতো চবমপন্থী নেতাব যে ধবনেব প্রভাব ছিল, যাব প্রমাণ আমবা পাই তিলককে গ্রেফ্তাবেব প্রতিবাদ বোম্বাই-এব মিল-শ্রমিকদেব ঐতিহাসিক ধর্মঘট থেকে, বাংলাব অবাঙালি প্রধান শ্রমিকশ্রেণীব মধ্যে বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাজনৈতিক নেতৃত্বেব সেই ধবনেব প্রভাব কখনও গড়ে ওঠেনি। নানা কাবণে বাংলাব 'স্বদেশী' নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীকে বাজনীতি সচেতন কবতে ব্যর্থ হয়েছিলেন অন্যদিকে তাদেব অর্থনৈতিক লডাইযেব সঙ্গেও নিজেদেব নিববচ্ছিন্নভাবে শামিল কবতেও সফল হননি।

এইসব কিছুব সম্মিলিত ফল হিসাবে স্বদেশি যুগে বাংলা দেশে এমন কোনো স্থাযী শ্রমিক সংগঠন তৈবি হযনি যা পববর্তীকালে স্থাযী হযেছিল। ১৯১৯-২০ সালে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তব কালে ভাবতীয বাজনীতিব আঙিনায মহাত্মা গান্ধীব আবির্ভাবেব পবে জাতীযতাবাদী আন্দোলনে যে গণ-জোযাব আসে তখন থেকেই জাতীযতাবাদী আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনেব মধ্যে এক ধাবাবাহিক সম্পর্কেব সৃষ্টি হয। কাজেই স্বদেশি যুগেব শ্রমিক আন্দোলন একটি বিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ ঘটনা হিসাবেই থেকে গেছে যা পববর্তীকালেব উপব কোনো স্থাযী প্রভাব ফেলতে পাবেনি। তবুও সমস্ত সীমাবদ্ধতা, বিচ্যুতি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও, বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব যুগ জাতীযতাবাদী আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনেব মধ্যেকাব প্রথম মেলবন্ধন রূপেই চিহ্নিত হযে থাকবে। শ্রমজীবী মানুযেব ভাবতে কোনো সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী আন্দোলনে এই প্রথম অংশগ্রহণ।

সহাযক বচনাবলি

Bipan Chandra—*The Rise and Growth of Economic Nationalism in India* New Delhi 1977 Pp 327-359

Sumit Sarkar—*The Swadeshi Movement in Bengal 1903-05* New Delhi 1973 Ch V

দীপিকা বসু—'ভাবতেব জাতীয আন্দোলনে শ্রমিকেব ভূমিকা প্রাবম্ভিক পর্ব' (নবহবি কবিবাজ সম্পাদিত *অসমাপ্ত বিপ্লব, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা*, কলকাতা, ১৯৯৭)

অমল দাস—'বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীব ঐতিহাসিক সংগ্রামেব স্মবণে' (*বজ্রশিখায বাংলা*, গণশক্তি, কলকাতা, ২০০৫)

নির্বাণ বসু—'স্বদেশি যুগে বাংলাব শ্রমিক আন্দোলন ও নতুন নেতৃত্ব' (*বজ্রশিখায বাংলা*, গণশক্তি, কলকাতা, ২০০৫)

বঙ্গভঙ্গ : সংস্কৃতি জগতের কিছু জানা অজানা তথ্য

সজল চট্টোপাধ্যায়

১৯০৫ সালেব ১৬ অক্টোবব থেকে বঙ্গভঙ্গ আইন বলবৎ কবাব সিদ্ধান্ত নিযেছিল ভাবত সবকাব। সাম্প্রাদাযিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনেব মধ্য দিযে ইংবেজ সবকাবেব বিভেদনীতিব প্রতিবাদ জানিযে ওই দিনটিকে চিহ্নিত কবাব জন্য এক ইস্তাহাবেব মাধ্যমে ববীন্দ্রনাথ আবেদন জানালেন 'আগামী ৩০ শে আশ্বিন বাংলাদেশ আইনেব দ্বাবা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙ্গালীকে বিচ্ছিন্ন কবেন নাই তাহাই বিশেযৰূপে স্মবণ ও প্রচাব কবিবাব জন্য সেই দিনকে আমবা বাঙ্গালীব বাখিবন্ধনেব দিন কবিযা পবস্পবেব হাতে হবিদ্রাবর্ণেব সূত্র বাঁধিযা দিব। বাখিবন্ধনেব মন্ত্রটি এই, 'ভাই ভাই এক ঠাঁই'. বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদীব আবেদনে "অবন্ধন" পালন কবাব প্রস্তাবও গ্রহণ কবা হযেছিল।

৩০ আশ্বিনের প্রতিবাদ দিবসে বাখিবন্ধন ও অবন্ধন দু'টি প্রস্তাবই সাধাবণ মানুয স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছিল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁব স্মৃতিকথায লিখেছেন · "ঠিক হল সকাল বেলা সবাই গঙ্গায় স্নান কবে সবাব হাতে বাখী পবাব। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট সেখানে যাব—ববিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়ি-ঘোড়া নয়। .. . বওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানেব উদ্দেশ্যে, বাস্তাব দুধাবে বাড়িব ছাদ থেকে আবন্ত কবে ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িযে গেছে— মেযেবা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁখ বাজাচ্ছে, মহা ধূমধাম—যেন একটা শোভাযাত্রা, দিনুও ছিল সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে বাস্তা দিযে মিছিল চলল—

বাংলাব মাটি, বাংলার জল
বাংলাব বায়ু, বাংলার ফল
পূণ্য হউক, পূণ্য হউক হে ভগবান॥

এই গানটি সে সমযেই তৈবী হযেছিল। ঘাটে সকাল থেকে লোকারণ্য, ববিকাকাকে দেখবাব জন্য আমাদের চাবদিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সাবা হল—সঙ্গে নেওযা হযেছিল একগাদা বাখী, সবাই এ ওব হাতে বাখী পবালুম। অন্যবা যাবা কাছাকাছি ছিল তাদেবও বাখী পবানো হল। হাতেব কাছে ছেলেমেযে যাকে পাওযা যাচ্ছে, কেউ বাদ পড়ছে না, সবাইকে বাখী পবানো হচ্ছে। গঙ্গাব ঘাটে সে এক ব্যাপার। পাথুরেঘাটা দিযে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকেব আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ ববিকাকাবা ধাঁ কবে বেঁকে গিযে ওদেব হাতে বাখী পবিয়ে দিলেন। ভাবলুম ববিকাকাবা কবলে কী, ওবা যে মুসলমান, মুসলমানকে রাখী পবালে—এইবাবে একটা মাবপিট হবে। মাবপিট আব হবে কী। বাখী পবিযে আবাব কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব, কাণ্ড দেখে। আসছি হঠাৎ রবিকাকাব খেযাল গেল চিৎপুবেব বড মসজিদে গিযে সবাইকে বাখী পবাবেন। হুকুম হল, চল সব। এইবারে বেগতিক—আমি ভাবলুম, গেলুম বে বাবা, মসজিদেব ভিতরে গিয়ে মুসলমানদেব

বাখী পবালে একটা বক্তাবক্তি ব্যাপাব না হযে যায না .. । যেই না আমাদেব গলিব মোড়ে মিছিল পৌছালো, আমি সট্ কবে একেবাবে নিজেব হাতাব মধ্যে প্রবেশ কবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। একঘণ্টা কি দেড়ঘণ্টা বাদে ববিকাকাবা সবাই ফিবে এলেন। আমবা সুবেনকে দৌড়ে গিযে জিজ্ঞেস কবলুম, কী কী হল সব তোমাদেব? সুবেন যেমন কেটে কেটে কথা বলে, বললে, কী আব হবে, গেলুম মসজিদেব ভিতবে, মৌলবী-টৌলবী যাদেব পেলুম হাতে বাখী পবিযে দিলুম। আমি বললুম, আব মাবামাবি! সুবেন বললে, মাবামাবি কেন হবে— ওবা একটু হাসলে মাত্র। যাক বাঁচা গেল।" (ঘবোযা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুব, পৃ ৩১)।

বিকেল সাড়ে তিনটেয পার্শিবাগানেব মাঠে (এখন যেখানে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয) 'ফেডাবেশন হল' বা 'মিলন মন্দিবে'ব ভিত্তি স্থাপন কবা হল। এ সভাব সভাপতি আনন্দমোহন বসু গুরুতব অসুস্থ থাকায তাঁকে আবামকেদাবায কবে সভাস্থলে আনা হল। এই উপলক্ষ্যে তাঁব লিখিত ভাষণ পড়ে শোনালেন সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায আব বঙ্গবিভাগেব প্রতিবাদে তাঁব ঘোষণাপত্রই ইংবাজিতে আশুতোষ চৌধুবী আব বাংলায ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব পাঠ কবে শোনালেন। ঘোষণা ছিল 'যেহেতু বাঙ্গালী জাতিব সর্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য কবিযা পার্লামেন্ট বঙ্গেব অঙ্গচ্ছেদ কবিযাছেন সেহেতু আমবা এই প্রতিজ্ঞা কবিতেছি যে, বঙ্গেব অঙ্গচ্ছেদেব কুফল নাশ কবিতে এবং বাঙ্গালী জাতিব একতা সংবক্ষণ কবিতে আমবা সমস্ত বাঙ্গালী জাতি আমাদেব শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহাব সকলই প্রযোগ কবিব। বিধাতা আমাদেব সহায হউন।'

এই সভাব শেষে বিশাল জনতা শোভাযাত্রা কবে আপাব সার্কুলাব বোড (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সবণি) ধবে বাগবাজাবে পশুপতিনাথ বসুব বাড়িব দিকে বওনা হল। শোভাযাত্রায প্রথমে 'ওদেব বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে' ও পবে 'বিধিব বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান' গান দু'টি গাওযা হযেছিল। এই মিছিলে ববীন্দ্রনাথও যোগ দিযেছিলেন। পশুপতিনাথ বসুব ভবনে বিশাল জনতাব উপস্থিতিতে স্বদেশি বস্ত্র তৈবি কববাব জন্য একটি ধনভাণ্ডাব খোলাব প্রস্তাব বাখা হল। প্রায পঞ্চাশ হাজাব টাকা সঙ্গে সঙ্গে সংগৃহীত হযেছিল।

৩০ আশ্বিনেব আব কযেকটি স্মৃতিচাবণা এখানে উল্লেখ কবা প্রযোজন।

প্রথম স্মৃতিচাবণাটি দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে তাঁব জীবনীকাব দেবকুমাব বাযচৌধুবী বর্ণিত 'সেদিন ১৬ই অক্টোবব, ৩০এ আশ্বিন,—বাঙ্গালীব সেই চিবস্মবণীয 'অবন্ধন' ও 'বাখী বন্ধনে'ব পূণ্যাহ। সেদিন সকাল বেলায—৯।।০ কি দশটা বাজিযাছ এমন সমযে "কুন্তলীনেব' হেমেন্দ্রমোহন বসু (এইচ বোস) মহাশয হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলালেব কাছে আসিযা 'ব্যস্ত-সমস্ত' ভাবে তাঁহাকে বলিলেন—'আজ সকালে গোলদীঘিতেও একটা প্রকাণ্ড সভা হবে। সেখানকাব জন্যে একটা গান লিখে দিন। এখনই চাই—ছাপতে হবে। বসু মহাশযকে বিদায দিযা, দ্বিজেন্দ্রলাল তদ্দণ্ডেই আমাব সম্মুখে বসিযা অনধিক দশ-পোনেবো মিনিটেব মধ্যে একটি আশ্চর্য বকমেব উৎকৃষ্ট অগ্নিগর্ভ গান—ঠিক যেন খেলাব ছলে বচনা কবিযা ফেলিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ইহা 'কুন্তলীন' প্রেসে পাঠাইযা দেওযা হইল।" (দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবকুমাব বাযচৌধুবী, বথীন্দ্রনাথ বায সম্পাদিত 'মন্দ্র'-এব ভূমিকাংশ থেকে উদ্ধৃত। সূত্র কাবিগবি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ, সিদ্ধার্থ ঘোষ, পৃ ১৯০)

উপেন্দ্রকিশোব বাযচৌধুবী বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ কবেন নি। কিন্তু আন্দোলনেব উন্মাদনা এমনই ছিল যে তা থেকে সবে দাঁড়ানোও সম্ভব ছিল না। লীলা মজুমদাব জানিযেছেন ‘বীণা পিসি, মানে অমল হোমেব ছোট বোন আমাকে বলেছিলেন। সে ১৯০৪/০৫ সালেব কথা। কলকাতায বাংলা ভাগ বন্ধ কবা নিয়ে খুব আন্দোলন হয। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অনেক দূব থেকে গান শোনা গেল। ক্রমে গানেব শব্দ আবো কাছে এল। এক বড শোভাযাত্রা। তাব সামনে গান গাইতে গাইতে আসছেন এক সুঠাম সুপুরুয, কালো দাড়ি। তাঁব সঙ্গে অন্যেবাও গাইছেন—“বাংলাব মাটি, বাংলাব জল ”। সামনে একজন খোল বাজাচ্ছেন। আমাদেব বাডিব সামনে যখন তাঁবা এলেন, তখন বাডি থেকে বেহালা বাজাতে বাজাতে জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোব সেই শোভাযাত্রায যোগ দিলেন। উনি (সুঠাম সুপুরুযটিই) ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব, সঙ্গে খোল বাজাচ্ছিলেন দীনু ঠাকুব।’ (প্রবীণদেব চোখে কলকাতা, পবিবর্তন, ২৫ মে, ১৯৮৩)। লীলা মজুমদাব বর্ণিত বীণা দেবীব এই স্মৃতিচাবণায কিছু বিভ্রম আছে। ‘বাংলাব মাটি বাংলাব জল’ বাখি সঙ্গীতটি সম্ভবত ১১ আশ্বিন ১৩১২ বঙ্গাব্দে (২৭ সেপ্টেম্বব, ১৯০৫) ১৮/৪ অক্রুব দত্ত লেনে সাবিত্রী লাইব্রেবিব স্বধর্ম সাধন অধিবেশনে পবে লিখিত হয। তবে বাখিবন্ধনেব প্রস্তাবও মনে হয এই দিনই প্রথম ঘোষিত হয। (ববিজীবনী, ৫ম খণ্ড, প্রশান্তকুমাব পাল, পৃ ২৬১) কাজেই ১৯০৪-০৫ নয ১৯০৫ সালেই বীণা দেবী এই গান শুনেছিলেন। এবং যেহেতু ববীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালেব ১৬ অক্টোবব সকালে গঙ্গাস্নান ও বাখিবন্ধন দিবস ছাডা অন্য কোনোদিন পদযাত্রায নিজে এই গান গেযেছিলেন বলে জানা নেই— বীণা দেবী প্রকৃতপক্ষে ওই দিনেব সকালবেলার কথাই বলেছেন।

ইউ বায এ্যান্ড সন্সেব কারিগবি বিভাগেব ললিতমোহন গুপ্তব ছেলে, ভাবত ফটোটাইপেব কর্ণধার অজিতমোহন গুপ্ত স্বসম্পাদিত ‘চিত্রাঙ্গদা’ পত্রিকায (শাবদীয ১৩৮৫) তাঁব বাবাব মুখে শোনা একটি কাহিনিব বর্ণনা দিযেছেন। এই বিবৃতি থেকে জানা যায বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনেব সময টাউনহলেব একটি সভায ববীন্দ্রনাথেব ‘বাংলাব জল’ গান শেষ হলে উপেন্দ্রকিশোবেব একক বেহালা বাদন বিশাল সভাগৃহেব প্রত্যন্ত কোণেব মানুযকেও মোহিত কবেছিল’। (কাবিগবি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ, সিদ্ধার্থ ঘোষ পৃ ১০৮)। এই বিশেষ সভাটি সম্ভবত ১৯০৫ সালেব ২৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল কাবণ টাউনহলেব এই একটি সভাতেই ববীন্দ্রনাথ নিশ্চিতভাবে উপস্থিত ছিলেন। ২২ সেপ্টেম্ববেব সভায তাঁব উপস্থিতিব কথা কোনো তথ্যে পাওযা যায না। ‘বাংলাব মাটি, বাংলাব জল’ বাখি সঙ্গীতটি ববীন্দ্রনাথ ২৭ সেপ্টেম্ববেব পবে লিখেছিলেন তা আগেই বলা হযেছে। সুতবাং ললিতমোহন বসুব স্মৃতিচাবণায কিছু বিভ্রান্তি তাই বযে গেছে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব এই প্রতিবাদমুখব ও উত্তেজনাময দিনগুলি সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও তত্ত্ব ভাবতে স্বাধীনতা সংগ্রামেব নামী দামি ইতিহাস থেকে সংগ্রহ কবা অসম্ভব ছিল না। এ নিবন্ধ যেহেতু বাংলাব বঙ্গ ও বিনোদন জগতেব উপব বঙ্গভঙ্গেব প্রভাব নিযে বচিত সেই জগতেব ব্যক্তি ও তাঁদেব বর্ণনা থেকেই বোমাঞ্চকব অধ্যায আহবণ কবাই যুক্তিযুক্ত।

সার্থক চিত্রনাট্য বচযিতা ও সংলাপকাব সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যাযেব 'উনিশ শ' পাঁচ' নামে একটি গ্রন্থ (? চিত্রনাট্য) আছে (প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেবি)। চলচ্চিত্র সংক্রান্ত কোনও রচনায় বইটিব উল্লেখ পাওযা যায না। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণেব এই রচনায বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব প্রভাবে উজ্জীবিত বাংলাব সশস্ত্র আন্দোলনেব কথাই প্রাধান্য পাওযায সাধাবণ মানুযেব প্রতিক্রিযাব কথা বেশি জানা যায না। তবে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুবীব স্মৃতিকথায বিক্ষুব্ধ এই জনমানসেব কথা আন্তবিকভাবে বর্ণিত আছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব সময অহীন্দ্রবাবু ছিলেন ইস্কুলেব ছাত্র, শিল্পী জীবনে প্রবেশ বা পবিচিতি কোনওটাই তখনও ঘটেনি। অতি সাধাবণ এক বালকেব চোখে দেখা গতিময সেই দিনগুলিব কথা বর্ণনা কবেছেন পবিণত বযসে নাট্য ও চলচ্চিত্র জগতে প্রতিষ্ঠিত এক শিল্পী। বঙ্গজগৎ সম্বন্ধে বচনায এব থেকে ভালো উপকবণ আব কোথা থেকে পাওযা যাবে? অহীন্দ্রবাবু লিখেছেন · "১৯০৫ সালেব কথা। আশ্বিন মাসে বাখীবন্ধন হল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব পবিবেশ। বাঙ্গালীব ববীন্দ্রনাথ গান লিখলেন ঃ

বাঙলাব বাযু বাঙলাব জল
বাঙালাব মাটি বাঙলাব ফল
এক হউক, এক হউক, এক হউক
হে ভগবান।

(গানেব উদ্ধৃতিটি ত্রুটিপূর্ণ। সঠিক বর্ণনা অবনীন্দ্রনাথেব বচনায আগেই উল্লেখ কবা হযেছে।—লেখক)

ছেলে বুড়ো সবাই গান করছে—দলে দলে ভাগ হযে। কখনো বা বডদেব কেউ কেউ গান করছে, বন্দেমাতবম্। গান গাইছে বডবা কিন্তু বলবাব উপায ছিল না সহজে। যদি কেউ চেঁচিযে উঠল, বন্দেমাতবম্, অমনি আবাব অনেকে সন্ত্রস্ত হযে উঠল। হিন্দুস্থানীবা ঠাট্টা কবে বলত—'বাঙ্গালীব মাথা গবম'।

সভা টভা হ'লে যাবাব হুকুম ছিল না। কিন্তু হেঁটে হেঁটে গিযে যে দু'একবাব না শুনেছি এমনও নয।

১৩১২ বঙ্গাব্দ, সোমবাব আশ্বিন মাসে (৩০ শে আশ্বিন, ১৬ই অক্টোবব, ১৯০৫ সাল। —লেখক) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব চিহ্নিত দিবসে স্কুলে গেলুম শুধু পাযে, জুতো না পবে, আব গাযে চাদব জডিযে। আমাদেব মধ্যেকার প্রথম ছেলেটিকে মাষ্টাবমশাই জিজ্ঞাসা কবলেন, কী হযেছে?

—মাতৃবিযোগ হযেছে।

উত্তরেব তাৎপর্য প্রথমটায তিনি বুঝতে পারেন নি। পবে আমাদেব প্রশ্নটশ্ন কবে তবে বুঝলেন। অবশ্য কিছু বলেন নি।

টিফিনে বেবিযে পডলাম সভায যাবাব জন্য সদলবলে। তখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' কাগজ বেরুত প্রতি সন্ধ্যায। সেই কাগজ ক'জনে মিলে পডতুম অসাধাবণ আগ্রহে। বাখীবন্ধনেব দিনে কী কী কবতে হবে, 'সন্ধ্যা'তেই তাব নির্দেশ ছিল। সেই নির্দেশ

এইরকম ঃ স্কুলে খালি পায়ে যেতে হবে শুধু চাদর মাত্র গায়ে দিয়ে, জিজ্ঞাসিত হ'লে বলতে হবে 'মাতৃবিয়োগ' হয়েছে। একথা অন্য কেউ শেখায়নি। শিখিয়েছে 'সন্ধ্যা'। বিলাতী কাপড় তখন বর্জনের পালা। পার্কের কোণে কোণে কোথাও বা গলির ধারে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, বিলাতী কাপড় পোড়ানোর ধুম পড়ে গেছে।

. স্বদেশী যুগের সে এক অদ্ভুত উন্মাদনার দিনই গেছে বটে। বড় রাস্তা দিয়ে মাঝে-মাঝে হেঁটে চলেছে গানের দল। কখনো তারা গান গাইছে অতুলপ্রসাদের গান। কখনো বা রবীন্দ্রনাথের গান। হঠাৎ বা কোথাও ধ্বনি উঠেছে 'বন্দেমাতরম্' অমনি পুলিশের দল যেন ক্ষেপে উঠত।

. তারপর ক্রমশঃ দেখা গেল ঐ স্বদেশী ভাবধারা দেশে একটা রীতিমত প্লাবন এনে দিলো। দু-তিন বছরের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া যা হয়ে দাঁড়ালো, তা-ও আমাদের জাতীয় জীবনে কম আলোড়ন আনেনি।

রাজনৈতিক আন্দোলন আর তার ফলাফলের কথা ঐতিহাসিকরা বলবেন। আমি শুধু আমার শৈশবকালীন যুগের আবহাওয়ার ইঙ্গিত দিতে প্রয়াস করেছি মাত্র।' (নিজের হারায়ে খুঁজি, ১ম পর্ব, পৃ ৩০-৩৭)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাব রঙ্গজগৎকে কীভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তার আর এক অসামান্য বর্ণনা পাওয়া যায় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে "খ্রীষ্টাব্দ ১৯০৪-০৫। বাঙ্গালা জাগিয়াছে। কোন দিন এই অন্নগত প্রাণ বাঙ্গালীর বাহুতে বাহুতে যে বল ছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া বাঙ্গালী তাহার নিদর্শন খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছে। অক্ষয়চন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', নিখিলনাথের 'মুরশিদাবাদ কাহিনী' বাঙ্গলায় একটা নূতন হাওয়া বহাইয়া দিয়াছে। বাঙ্গালীর পূর্বপুরুষ, তাহার পিতৃপিতামহ যে, একদিন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আপনার অপহৃত স্বাধীনতাকে শক্তিধর সম্রাটের হাত হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছিল, শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক কুস্তীর আখড়ায় মাটী মাখিতে মাখিতে এখন সে কথারই আলোচনা করে, বাঙ্গালার বারো ভুঁইয়া যে, আমাদেরই মত বাঙ্গালীর জাতভাই, সেই কথা স্মরণ করিয়া বাঙ্গালী যুবক তাহার পৈতৃক বাঁশঝাড় হইতে বাঁশ কাটিয়া বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয়স্বরূপ লাঠী খেলিয়া মাতিয়া উঠে, পল্লীতে পল্লীতে সমিতি, পল্লীতে পল্লীতে সঙ্ঘবদ্ধ বাঙ্গলার যুবকের দল। এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সুদূর মার্হাট্টায়, মার্হাট্টা যুবক, মহারাজ ছত্রপতি শিবাজীর মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে, বাঙ্গালী বাঙ্গালার শ্যামবনানীর অন্তরালে উৎসুক নেত্রে খুঁজিয়া দেখে—কোথায় বাঙ্গালার শিবাজী কোথায় বাঙ্গালার তানোজী। ইতিহাসের অন্ধকার যবনিকা ভেদ করিয়া, যশোহরের শার্দ্দূল-নিষেবিত বনপ্রান্তে, যশোরেশ্বরীর ভগ্ন-মন্দির প্রাঙ্গণে ছায়ামূর্ত্তি লইয়া এমনি দিনে তাহার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল, বঙ্গজ-কায়স্থ-কুলতিলক, মোগল-গর্ব বিধ্বংসী-বীর প্রতাপাদিত্য রায়, যাঁহার সঙ্গে ফিরে বাযান্ন হাজার বাঙ্গালী ঢালী, যুদ্ধকালে সেনাপতি যাঁর কালী, যাঁর মন্ত্রসিদ্ধ সচিব বাঙ্গালী বীর শঙ্কর—আর যাঁর উগ্রতপস্যার ঐকান্তিকী ফল—বাঙ্গালার স্বাধীনতা। বাঙ্গালা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল কে তাহাকে বলে প্রতাপাদিত্য অত্যাচারী? কে তাহাকে বলে প্রতাপাদিত্য দস্যু?

বিষব্রণেব মত সে 'বঙ্গাধিপ পবাজযেব'ব পঙ্কিল গ্লানি সুন্দববন হইতে টানিযা ছিঁডিযা বঙ্গোপসাগবে ভাসাইয়া দিল। তাহাব চক্ষে বাঙ্গালাব নাযক প্রতাপাদিত্য, বাঙ্গালাব বলবীর্য্যেব মূর্ত্ত বিগ্রহ প্রতাপাদিত্য। বাঙ্গালা তাঁহাকে পূজা কবিতে আবম্ভ কবিল, ভক্তিভবে তাঁহাব উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাব অর্ঘ্য নিবেদন কবিল। কলিকাতায পান্তীব মাঠে (এখন যেখানে বিদ্যাসাগব কলেজেব হোস্টেল।—লেখক) শিবাজী উৎসবেব ন্যায প্রতাপাদিত্যেব উৎসব হইল। এই শুভ অবসবে বাঙ্গালাব বঙ্গমঞ্চে পণ্ডিত ক্ষীবোদপ্রসাদেব 'প্রতাপাদিত্য' বীবকণ্ঠে-সহস্র সহস্র দর্শকেব সম্মুখে উদাত্তস্ববে গাহিত— 'হয যশোব নয মৃত্যু।' 'প্রতাপাদিত্য' নাটক দেশেব কী কবিযাছে, বাঙ্গলাব উত্তবপুরুষগণ তাহাব বিচাব কবিবেন। এই সময হইতেই বাঙ্গালাব বঙ্গমঞ্চে ইতিহাসেব যুগ আসিল।" (বঙ্গালযে ত্রিশ বৎসব, অপবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায, পৃ ৭২-৭৩)

একটা কথা সব ঐতিহাসিকই স্বীকাব কবেন বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন পববর্তী প্রজন্মেব কাছে দেশাত্মবোধক বচনা ও শিল্প সৃষ্টিব জন্য চিবস্মণীয হয়ে থাকবেই। ভাবতবর্ষেব মুক্তি আন্দোলনেব আব কোনও পর্যাযেব প্রভাব অন্য কোনও প্রদেশেব গান, কবিতা, নাটক, সাহিত্য, আলোকচিত্র, বেকর্ড ও চলচ্চিত্র জগৎকে এমনভাবে প্রভাবিত কবেনি।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব শুরুতেই ববীন্দ্রনাথ এই বিক্ষোভে শামিল হননি বটে, কিন্তু অচিবেই এই প্রথম ও শেযবারেব জন্য তিনি প্রত্যক্ষভাবে বাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ কবেছিলেন। ১৩১২ সালেব ভাদ্র মাস থেকে আশ্বিন মাসেব ১২ তাবিখের মধ্যে তিনি ২৪টি স্বদেশি সঙ্গীত বচনা কবেছিলেন। এই পর্যাযেব প্রথম গানটি ছিল 'ও আমাব দেশেব মাটি' ও শেয গানটি তাঁব বিখ্যাত বাখিসঙ্গীত 'বাংলাব মাটি বাংলার জল'। 'স্বদেশ' গ্রন্থ প্রকাশেব তিন দিন পবে ৩০ সেপ্টেম্বর (শনিবাব, ১৪ আশ্বিন, ১৩১২ বঙ্গাব্দে) ৩২ পৃষ্ঠাব 'বাউল' পুস্তিকা প্রকাশিত হয। মূল্য ✓ আনা। আখ্যাপত্র বাউল।/ শ্রীববীন্দ্রনাথ ঠাকুব প্রণীত।/ কলিকাতা, ২০ কর্ণওযালিস্ ষ্ট্রীট্/ মজুমদাব লাইব্রেবী হইতে / বি বায় কর্তৃক প্রকাশিত। /মূল্য ✓আনা। পবপৃষ্ঠায কলিকাতা, /২০ কর্ণওযালিস ষ্ট্রীট্, "দিনমযী প্রেসে"/ শ্রীহবিচবণ মান্না দ্বাবা মুদ্রিত।/ পৃষ্ঠাসংখ্যা ২+২+২+২৬ (৭-৩২) মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০। এই পুস্তিকায ববীন্দ্রনাথেব সদ্যোবচিত কুডিটি গান সংকলিত হয। গানগুলি তিন দিন আগে প্রকাশিত "স্বদেশ" গ্রন্থেও মুদ্রিত হযেছিল। (ববিজীবনী, প্রশান্তকুমাব পাল, (পৃ ২৬২)। বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী লিখেছেন . 'স্বদেশীব আগুন যখন জ্বলিযা উঠিযাছিল তখন ববীন্দ্রনাথেব লেখনী জগতে বাতাস দিতে ত্রুটি কবে নাই। বেশ মনে আছে ৩০ শে আশ্বিনেব পূর্ব হইতে হপ্তায হপ্তায তাঁহাব এক একটা গান বা কবিতা বাহিব হইত, আব আমাদেব স্নাযুতন্ত্র কাঁপিযা আব নাচিযা উঠিত।' (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১৪)।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনে মুদ্রিত স্মাবকপত্র (কার্ড), আলোকচিত্র ও পুস্তিকাও এক বিশেষ স্থান কবে নিয়েছিল। উপেন্দ্রকিশোবেব কাছে থেকে যাঁবা হাফটোন ব্লক তৈবিব কাজ শিখেছিলেন ললিতমোহন গুপ্ত ছিলেন তাঁদেব মধ্যে অন্যতম। ১০০ নং গডপাব বোডে ইউ বায এ্যান্ড সন্স প্রতিষ্ঠিত হওযাব আগে থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানেব সঙ্গে শেযাবধি যুক্ত

ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠানেব কাবিগবি বিভাগেব ম্যানেজাব। ললিতবাবুব মৃত্যুব পব প্রকাশিত 'স্মৃতিতর্পণ' পুস্তিকা থেকে জানা যায যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব সময তিনি 'বাখীবন্ধন কার্ড', ছেপে বিতবণ কবতেন। (কারিগবি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ, সিদ্ধার্থ ঘোষ, পৃ ১০৮)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব সমযকাব স্মৃতিচাবণায প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যেব ভাই উপেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন 'একদিন কলকাতায বাজাব কবিতে আসিযা দেখিলাম বিপিন পাল মহাশয স্বগ্রাম নিবাসী বমেশচন্দ্র চৌধুবী নামে একজন যুবক বিখ্যাত ইউ বাযেব প্রেস হইতে হাফটোন ব্লক তৈযাবী কবাইযা ছবি ছাপাইযা বিক্রয কবিতেছেন। প্রত্যেকখানি ছবিব দাম ছিল এক আনা, এক ডজন একত্রে কিনিলে শতকবা ২৫ টাকা হাবে কমিশন পাওযা যাইত।' (আমাব এলোমেলো জীবনেব কযেকটি অধ্যায, উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ ১৭৩)

বাংলা দেশ তথা ভাবতবর্ষে ফটোগ্রাফিক নির্ভব সাংবাদিকতা শুরু হযেছিল এই বঙ্গভঙ্গেব সমযেই। সংবাদপত্রে তখন ফটোগ্রাফ ছাপাব ব্যবস্থাই ছিল না। এই পবিস্থিতিতে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হযেছিল ৫"× ৪" মাপেব আটটি আলোকচিত্রেব একটি অ্যালবাম। অ্যালবাম বা সচিত্র পুস্তিকাটিব শিবোনাম ছিল 'চিত্র বাখি-সংক্রান্তি', ৩০ শে আশ্বিন, সোমবাব, ১৩১২ সাল। প্রথম পাতাতেই 'বন্দেমাতবম্' লেখাব নীচে 'বাখি সঙ্গীত' এবং এই উপলক্ষ্যেই বচিত ববীন্দ্রনাথেব 'বাংলাব মাটি বাংলাব জল' গানেব বাণী। পুস্তিকাব শেষেও ছিল ববীন্দ্রনাথেবই আবেকটি স্বদেশি গান—'বাণ' (সাবি গানেব সুব) শিবোনামে 'এবাব তোব মবা গাঙ্গে বাণ এসেছে'। গান দু'টিব বচযিতা হিসাবে ববীন্দ্রনাথেব নাম লেখা ছিল না। পুস্তিকাব শেষ প্রচ্ছদে মুদ্রিত ছিল 'শ্রীযামিনী গাঙ্গুলী প্রণীত'। সম্ভবত পুলিশি হাঙ্গামাব ভযেই এই সতর্কতা অবলম্বন কবতে হযেছিল। মহিলা প্রেসে মুদ্রিত ছ'পযসা দামেব পুস্তিকাটি বিক্রি কবতেন ৫৮ কর্নওযালিস স্ট্রিটেব ভাণ্ডাব অফিসেব সি কে দত্ত এবং ২৯/২ কর্নওযালিস স্ট্রিটেব বন্দেমাতবম্ এজেন্সি।

জি এন মুখার্জি অ্যান্ড ব্রাদার্সেব তৈবি ব্লক থেকে ছাপা ফটোগুলি পবপব ছাপা ছিল এইভাবে—বন্দেমাতবম সম্প্রদাযেব 'বাখি স্নানযাত্রা' (২টি ফটো), গঙ্গাতীবে বাখি স্নান (২টি ফটো), স্নানান্তে বাখিবন্ধন উৎসব, মাতৃমন্দিব প্রতিষ্ঠাব স্থানে যাত্রা। মাতৃমন্দিব প্রতিষ্ঠাব স্থানে জনসমাগম, মাতৃমন্দিব প্রতিষ্ঠান্তে জাতীয ধন ভাণ্ডাবে দানার্থে যাত্রা। ফটোগ্রাফাবেব কোনো নাম ছিল না তবু অনুমান কবা যায এগুলি হেমেন্দ্রমোহন বসু গৃহীত। এই অনুমানেব কাবণ, অনেক বিপর্যযেব পবেও হেমেন্দ্রমোহনেব তোলা বেশ কিছু গ্লাস নেগেটিভ, বিশেষ কবে স্টিরিও নেগেটিভ এখনও বাঁচিযে বেখেছেন তাঁব পৌত্র ডাক্তাব সুগত বসু। এবই মধ্যে বযেছে ১৯০৫-এব অ্যান্টিপার্টিশান মিটিঙেব ও গঙ্গায বাখি-স্নান উপলক্ষ্যে তোলা বেশ কিছু স্টিবিওস্কোপিক নেগেটিভ ও স্লাইড। ছোট্ট একটা টেবিলেব পবে দাঁডিযে বক্তৃতা দিচ্ছেন সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায। গাছেব ডালে বা ভাঙা পাঁচিলেব উপবেও লোক উঠে বসে দাঁডিযে আছে। দু'টি ফেস্টুনেব একটিতে লেখা 'দেবী আমাব সাধনা আমাব স্বর্গ আমাব, আমাব

দেশ', অন্যটিতে ইংবেজিতে লেখা 'Bengal shall never be reconciled to partition'। বিভিন্ন কোণ থেকে এই দৃশ্যেব বহু ফটোগ্রাফ। ব্রাহ্ম স্কুলেব মেবি কার্পেন্টাব হলেব সামনে ও গঙ্গাব ঘাটে তোলা জনসমাগমেব ছবি। 'বাখি সংক্রান্তি' অ্যালবামে ছাপা ফটোগ্রাফেব সঙ্গে মিলে যায এমন নেগেটিভও আছে। (ছবি তোলা, সিদ্ধার্থ ঘোষ, এক্ষণ শাবদীয ১৩৯২, পৃ ১৭০-৭২)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব সময ববীন্দ্রনাথেব স্বকণ্ঠে গাওযা দেশাত্মবোধক গান ঘবে ঘবে পৌঁছে গিযেছিল হেমেন্দ্রমোহন বসুব মোমেব তৈবি চোঙা বেকর্ড (ফোনোগ্রামেব সিলিন্ড্রিকাল বেকর্ড)। স্বদেশি গান প্রচাবেব জন্য হেমেন্দ্রমোহনকে শিল্পী খুঁজে বাব কবতে হযনি। ববীন্দ্রনাথকে দিযেই তিনি গানগুলি গাইযেছিলেন। এইচ বোস বেকর্ডসেব ক্যাটালগেব দ্বিতীয খণ্ডটি প্রকাশিত হয ১৯০৬ সালেব মার্চ মাসে। এই ক্যাটালগে দ্বিজেন্দ্রলালেব কোনো স্বদেশি গানেব তালিকা নেই। ক্যাটালগেব প্রথম খণ্ডেব সন্ধান অদ্যাবধি পাওযা যাযনি। মোটা অ্যান্টিক কাগজে সতেবো পাতাব এই ক্যাটালগটি কুন্তলীন প্রেস থেকে ছাপা হযেছিল। ক্যাটালগ পবিচিতি/প্রচ্ছদ/ March 1906/ H Bose's Records/ Part II/ The Talking Machine Hall/Marble House/ Calcutta/Kuntaline Press/ পবেব পাতায ববীন্দ্রনাথেব ফটোগ্রাফ/তাবপবে পবেব পাতা থেকে—এইচ বসুব বেকর্ড/সুপ্রসিদ্ধ কবিবব/শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব/কর্তৃক গীত ৩৫১—সার্থক জন্ম (সার্থক জনম আমাব .), ৩৫২—পথেব গান (আমবা পথে পথে যাব..) ৩৫৩—দেশেব মাটী (ও আমার দেশেব মাটী .), ৩৫৪—দ্বিধা (বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি), ৩৫৫—হবেই হবে (নিশিদিন ভবসা বাখিস্), ৩৫৬—বাণ (এবাব তোব মবা গাঙে বাণ এসেছে), ৩৫৭—একা (যদি তোব ডাক শুনে কেউ না আসে), ৩৫৮ মাতৃমূর্ত্তি (আজি বাঙলা দেশেব হৃদয হতে), ৩৫৯—যে তোমায ছাড়ে ছাড়ুক, ৩৬০—যদি তোব ভাবনা থাকে, ৩৬১ (৪)—আপনি অবশ হলি . , ৩৬৩ (৫)—প্রযাস (তোব আপন জনে ছাডবে তোবে .) ও ৩৬৫—বাউল (ঘবে মুখ মলিন দেখে ...)। 'স্বদেশী আন্দোলনেব সময় লেখা ববীন্দ্রনাথেব 'বাউল' নামে একটি গানেব সংকলন ১৩১২ সালেব শেষদিকে প্রকাশিত হয। এইচ বোসের বেকর্ডেব তালিকায শুধু শিবোনামই নয, ক্রমিক পর্যাযও প্রায এক ছিল।' (স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায, পৃ ২৯৫), লক্ষণীয এই ক্যাটালগে দ্বিজেন্দ্রলাল বাযেব ৩৮১-৩৯২ সংখ্যক গানেব সবকটি গানই ছিল হাস্যবসাত্মক। যদিও বঙ্গভঙ্গেব অব্যবহিতপবেব বিনোদন জগতেব কার্যকলাপ ছাড়া এ প্রবন্ধে পববর্তীকালেব কথা লিপিবদ্ধ কবাব ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ববীন্দ্রনাথ গীত একটি বিশেষ বেকর্ডেব কথা উল্লেখ না কবে পাবছি না। হেমেন্দ্রমোহন তখন ফ্রান্সেব প্যাথে কোম্পানিব সঙ্গে চুক্তি কবে ডিস্ক বেকর্ড তৈবি শুরু করেছেন। ১৯০৮ সালে ১৫ মার্চ, 'বেঙ্গলী' পত্রিকাব বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হল "H Bose's Records on Pathe Disce" এই বিজ্ঞাপনেব তালিকায দেখা গেল ববীন্দ্রনাথ গীত একটি বেকর্ড SJ RABINDRANTH TAGORE/3511-350—বন্দেমাতবম্, 366—অযি ভুবনমনমোহিনী।" ববীন্দ্রনাথের সিলিন্ডাব বেকর্ডেব ক্যাটালগে এই গান দুটিব উল্লেখ নেই বটে, কিন্তু ক্রমিক

সংখ্যা ৩৫০ ও ৩৬৬ থেকে বোঝা যায গান দুটি সিলিন্ডাব বেকর্ডে গৃহীত হয়েছিল। দেবেন্দ্রমোহন বসুব একটি পাণ্ডুলিপিতে লেখা "মনে আছে স্বদেশীব সময়ে ববীন্দ্রনাথ সপ্তাহে কযেকখানা গান বচনা কবিযা মামাব নিকট 93 U C Road-এ আসিযা গান কবিযা শুনাইতেন। আমবা জ্যাঠতুতো দাদা ˇহেমেন্দ্রমোহন বসু সেই সময়ে বিশেষ দক্ষতাব সঙ্গে Phonograph-এ মোমেব Cylinder record কবেন। তখনকাব record-এব মধ্যে ছিল বঙ্কিমচন্দ্রেব 'বন্দেমাতবম্' গান, ববীন্দ্রনাথেব আবৃত্তি 'সোনাব তবী' ও গান 'অযি ভুবন মনমোহিনী,' সার্থক জনম মম', তোব ডাক শুনে যদি কেউ নাই আসে' ইত্যাদি। সব সেই সময়েব বচিত গান। (ববীন্দ্রনাথেব ও জগদীশচন্দ্রেব উত্তবসূবী, দিবাকব সেন, ভাবত ও সমাজতান্ত্রিক জি ডি আব মে জুন, ১৯৮৩, পৃ ১৬) প্যাথে ডিস্কে কিন্তু 'সোনাব তবী' আবৃত্তি ও 'বন্দেমাতবম্' record কবা হয়েছিল। মনে হয 'বেঙ্গলি' পত্রিকাব বিজ্ঞাপন বেকর্ডগুলি তৈবি হয়ে আসাব আগেই ছাপা হয়েছিল। প্যাথে কোম্পানিব ক্যাটলগে লেখা আছে ৩৬৩৬৯ 'সোনাব তবী' স্ববচিত কবিতা আবৃত্তি/ ও ৩৬৩৫০ · 'বন্দেমাতবম্'। (কবিকণ্ঠ, সন্তোষকুমাব দে, পৃ ১৬) হেমেন্দ্রকুমাব গৃহীত অসংখ্য বেকর্ডেব মধ্যে সম্ভবত এই প্যাথে ডিস্কটিই বক্ষা পেযেছে। ববীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে বসু পবিবাব এই বেকর্ডটি অল ইন্ডিযা বেডিওকে উপহাব দেন। এই বেকর্ডেব একটি টেপ (নং ৬৭) ববীন্দ্রভবনেও সুবক্ষিত আছে। (কাবিগবি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ, সিদ্ধার্থ ঘোষ, পৃ ২৬৫)। ক্রীক রো-ব 'বীনাপাণি বেকর্ডস্' দাবি কবেন ১৯০৮ সালে তাঁবাই প্রথম 'বন্দেমাতবম্' গানটিব ডিস্ক বেকর্ড তৈবি কবেছিলেন। এই কোম্পানিব এজেন্ট ছিলেন বিনোদবিহাবী মুখার্জী, প্রযত্নে এফ ডি ইউনিযান স্টোর্স, ২১৭ কর্নওযালিস্ স্ট্রিট। (The Bengalee, 9 February, 1908, সূত্র কলেব শহব কলকাতা, সিদ্ধার্থ ঘোষ, পৃ ১৪৬)

হেমেন্দ্রমোহন বোসেব ক্যাটালগে পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ নামে এক গীতিকাবেব পাঁচটি গানেব আছে (১) দণ্ডমুণ্ড দিতে চণ্ড মুণ্ড এস চণ্ডি যুগান্তবে (২) ভাই সব দেখ চেযে বাজাব ছেযে (৩) নবীন এ অনুবাগ বেখ বেখ মনে কবে (৪) আমবা স্বদেশবাসী যতই দোষী (৫) আমাব যায যাবে জীবন চলে And many others। 'মা গো যায যেন জীবন চলে / শুধু জগৎ মাঝে তোমাব কাজে / বন্দেমাতরম বলে / আমাব যায যদি জীবন চলে'—গানটি স্বদেশি কর্মীদেব মাতিযে তুলেছিল। স্বদেশি ভাবধাবা প্রচাবেব জন্য তিনি 'ভবানীপুব স্বদেশ সেবক সম্প্রদায' নামে এক সঙ্গীত শিল্পী-গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা কবেন। সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযেব সঙ্গে তিনি স্বদেশি প্রচাবেব জন্য মফস্সলেও যেতেন।

বঙ্গজগতেব উপব প্রথম সবকাবি নিষেধাজ্ঞা জাবি হয ১৮৭৬ সালেব ২৯ ফেব্রুযাবি। ভাবতেব তদানীন্তন গভর্নব জেনাবেল লর্ড নর্থব্রুক ওইদিন 'Dramatic Performanences Control' অর্ডিন্যান্স ঘোষণা কবেন। এবপবে দীর্ঘদিন বঙ্গজগৎকে প্রত্যক্ষভাবে সবকাবি বাধানিষেধেব বলি আব হতে হযনি। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব সময জনসাধাবণেব অন্যতম প্রেরণা হয়ে দাঁড়াল দেশাত্মবোধক গান ও নাটক।

১) 'In fact at the time of Swadeshi Movement what hundred lectures

could not do was accomplished by one single performance of Serajuddoula or Mirkasem' (Indian Stage, Vol IV H N Dasgupta, p 58)

২) 'The national song composed during the period by Dwijendralal Roy, Rabindranath Tagore, Saralabala Debichowdhurani, Mr A P Sen and the late Rajani Kanto Sen, smote on the heart of the people as on a giant's harp, awakening out of it a storm and tumult such had never been knwon through long centuries of her political freedom (Life and Times of C R Das, Prithwis Chandra Roy, p 39, সূত্র বাংলা নাটকে স্বাদেশীকতাব প্রভাব, প্রভাত-কুমাব ভট্টাচার্য, পৃ ৩৮৬)।

দেশাত্মবোধক গান, নাটক ও বক্তৃতাব বেকর্ডেব অসামান্য জনপ্রিযতাব জন্য গ্রামোফোন বা টকিং মেশিনেব উপব সবকাবি বিধি-নিষেধ আবোপ হতে দেবি হল না। ১৯০৮ সালেব ৭ ডিসেম্বব, The Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত হল

"SEDITION IN TALKING MACHINES"

It is reported that the Government of India have decided to take action in the matter of alleged seditious songs and speeches which are being circulated through the medium of talking machine, records, and that warnings are issued to dealers not to trade in certain records of which the names are given The further warning is added that if, after the receipt of the notice any persons are detected selling the records, they will be prosecuted

One of the prescribed records is the Bengali song Amar Desh' (My country) said to have been reproduced before Sir Lancelot Hare Lieutenant Governor of Eastern Bengal, Assam recently Another series of records and selections from 'Seraj-ud-Dowlah', and some speeches delivered in connection with the Partition of Bengal It has been reported to the Government that some of the songs and selections reproduced on records are highly seditious and that they have been frequently used at functions at which Eureopean officials, not ignorant of the vernaculars, have been present" (The Statesman, December 7, 1908, সূত্র ঐ, পৃ ৩৬৫)।

১১ ডিসেম্বব Amrita Bazar পত্রিকায আবেকটি আদেশনামা বেবল 'The Commissioner of Police has just prohibited Gramophone Companies from reproducing 'Amar Desh', 'Bandematram' and such other songs and ordered all records to be destroyed. Conductors of theatres, too, are said to have been ordered to remove such songs from all pieces staged by them Two songs in 'Jiban Sandha', the new play at the Star, have been taken exception to and stopped Moreover, pieces like Siraj-ud-Dowlah', 'Mirkasim', 'Chatrapati , Durgadas', 'Dada-o-Didi', 'Nanda Kumar', Jiban Sandha' are about to be reexamined by the Police and objectionable passages from them be taken out (Amrita Bazar Patrika, December 11, 1908 সূত্র ঐ, পৃ ৩৬৫)

নাট্য নিযন্ত্রণ বিলেব মতো, টকিং মেশিন ও বেকর্ড নিযন্ত্রণ বিলও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই নতুন শিল্প, শিক্ষা ও প্রচাবমাধ্যমটিব অবমাননা পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকদেব দৃষ্টি সেবকম আকর্ষণ কবতে পাবেনি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ্যে কলকাতায অনুষ্ঠিত সভাসমিতিতে প্রদত্ত প্রথম সাবিব নেতৃবৃন্দেব জ্বালামযী বক্তৃতা যে যন্ত্রেব মাধ্যমে অনাযাসে সুদূব পল্লিগ্রামে ধ্বনিত হয সে যন্ত্র ও বেকর্ডকে শাসনেব শৃঙ্খলে বাঁধা ছাড়া আব কোনও উপায ছিল না ইংবেজ শাসকদেব।

নট ও নাট্যকাব অমবেন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাসিকে স্বত্বাধিকাবী হিসাবে শেষ অভিনয কবেছিলেন ১৯০৫ সালেব ২ এপ্রিল। এবপব তিনি ৯১ নং হ্যাবিসন বোডেব (বর্তমান মহাত্মা গান্ধি বোড) কার্জন বঙ্গমঞ্চে (বর্তমান গ্রেস সিনেমা) গ্রান্ড থিযেটাব প্রতিষ্ঠা কবেন। ৬ মে তাবিখে মনোমোহন গোস্বামীব 'পৃথ্বীবাজ' নাটক মঞ্চস্থ কবে নতুন থিযেটাবেব উদ্বোধন হল। গ্রান্ড থিযেটাব কিন্তু ভালো কবে চললই না।

এই যে সমূহ সংকট তাব মধ্যেও সমসামযিক ঘটনা-প্রবাহ সম্বন্ধে অমবেন্দ্রনাথেব সজাগ দৃষ্টি ছিল অক্ষুণ্ণ। বমাপতি দত্ত লিখেছেন "ইতিমধ্যে কলিকাতায বঙ্গভঙ্গ লইযা খুব আন্দোলন হইতেছিল। সমযোপযোগী নাট্য বচনায অমবেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন. তাহা আমবা পূর্বেই দেখিযাছি, তিনি এই উপলক্ষ্যে 'বঙ্গেব অঙ্গচ্ছেদ' নামে এক ৰূপক বচনা করিয়া, ১৬ই অক্টোবব—যেদিন লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভক্ত হইল বলিযা ঘোষণা কবিলেন, সেই দিনই তাহা গ্রাণ্ডে অভিনীত কবাইলেন। বইখানি মুদ্রিত হইযা দর্শকগণেব মধ্যে বিনামূল্যে বিতবিত হইল।" (বঙ্গালযে অমবেন্দ্রনাথ, পৃ ৩৯১)। 'বঙ্গেব অঙ্গচ্ছেদ'-ই বঙ্গভঙ্গ আইনেব বিরুদ্ধে বচিত ও অভিনীত প্রথম প্রতিবাদী ৰূপক নাট্য। (১৬ অক্টোবব স্টাব থিযেটাব বঙ্গভঙ্গ আইন বলবৎ কবাব প্রতিবাদে বন্ধ বাখা হযেছিল। সরকাবি আইনেব প্রতিবাদে এই প্রথম কোনও সাধাবণ বঙ্গমঞ্চ বন্ধ বাখা হল।—লেখক)

বঙ্গভঙ্গ নিযে ইংবেজ সবকাবেব স্বেচ্ছাচাবে বাঙালিব মনে সেদিন কী ঝড উঠেছিল তা না জানলে বঙ্গজগতে এই আন্দোলনেব প্রভাব ও প্রতিফলনেব তাৎপর্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই প্রথম বাঙালি ও ভাবতবাসী প্রত্যক্ষভাবে অনুভব কবল যে তাবা পবাধীন, বিদেশি শাসকদেব ইচ্ছা-অনিচ্ছাতেই তাদেব চলতে হবে। প্রতিবাদ ও প্রতিবোধেব ঝড উঠল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। স্বাদেশিকতাব বন্যা বযে গেল দেশেব উপব দিযে। ১৯০৫ সালেব বঙ্গভঙ্গ -বিবোধী আন্দোলন শুধু ভাবতেব বাজনৈতিক ইতিহাসই নয, চলচ্চিত্রেব ইতিহাসও একসূত্রে গাঁথা পডল। হীবালাল সেনেব ক্যামেবায ধবা পড়ল ভাবতেব প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামেব তথ্য বা সংবাদচিত্র। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তখন তুঙ্গে উঠেছে। ঐতিহাসিক বমেশচন্দ্র মজুমদাব লিখেছেন "কলিকাতাব টাউন হলে পাঁচটি বিশাল সভাব অধিবেশন হয।" (বাংলাদেশেব ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, পৃ ২৪)

প্রথম চাবটি সভাব ছবি হীবালাল সেন তোলেননি। সম্ভবত বিচক্ষণতাব অভাবেই। অর্থসংকটও ছবি না তোলাব কাবণ হতে পাবে। যে কাবণেই হোক এই সামযিক নির্লিপ্ততা কাটিযে ২২ সেপ্টেম্ববেব প্রতিবাদ সভাব ও সমাবেশেব ছবি তুললেন তিনি। প্রিন্টিং,

ডেভেলপিং ইত্যাদি শেষ কবতে আবও কিছু সময গেল। কোথায় ছবি প্রদর্শন কববেন বলে ভাবছেন, এমন সময নাট্যজগতে এক পবিবর্তন ঘটে গেল। গ্রান্ড থিযেটাব ছেড়ে ম্যানেজাবেব পদ নিযে ক্লাসিকে ফিবে এলেন অমবেন্দ্রনাথ। ২১ অক্টোবব তাবিখে 'পৃথ্বীবাজ' নাটকে নামভূমিকায অবতীর্ণ হলেন তিনি। এইদিন হীবালাল সেনেব বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব ছবিটিও ক্লাসিক থিযেটাবেই সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হল। কালীশ মুখোপাধ্যায 'বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পেব ইতিহাস' গ্রন্থে (২য সংস্কবণ, পৃ ৩৮৮), লিখেছেন "ক্লাসিকে সদলবলে অমব দত্ত পুনবায আত্মপ্রকাশ কবেন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দেব ২১শে অক্টোবব, শনিবাব, বাত ৯টায। এদিন পৃথ্বিবাজ নাটক অভিনীত হয—তাছাড়া প্রদর্শিত হলো হীবালাল সেন কর্তৃক গৃহীত চিত্রাবলী যাব মধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব দৃশ্য সর্বপ্রথম দেখানো হয।" (অনুচ্ছেদটি একটু সাজিযে লেখা হল।—লেখক)

কালীশবাবু জানাননি এই বিজ্ঞাপন তিনি কোন পত্রিকা থেকে সংগ্রহ কবেছেন। তবু এই উদ্ধৃতিব মূল্য অপবিসীম, কাবণ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব এই সংবাদচিত্রেব উল্লেখ রজত বায তাঁর Filmography of Sixty Eminent Indian Movie Makers গ্রন্থে কবেনই নি। আবাব সৌমেন্দু ঘোষ জানিযেছেন '১৯০৫ সালে জ্যোতিষচন্দ্র সবকাব বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব ছবি তোলেন এবং কবিন্থিযান থিযেটাবে সেই ছোট ছবি দেখানোব ব্যবস্থা হযেছিল।' (চলচ্চিত্র, চিন্তা ও চেতনা, পৃ ৭১)। সৌমেন্দুবাবুব গ্রন্থেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব চলচ্চিত্রকাব হিসাবে হীরালাল সেনেব নামোল্লেখ নেই। শ্রীজগন্নাথ চট্টোপাধ্যায লিখেছেন "হীবালাল সেনেব সাথে সাথেই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পেব গোড়াপত্তনে আব একজনেব নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন জ্যোতিষচন্দ্র সবকাব। ১৯০৫ সালে সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযেব নেতৃত্বে যে দেশবিভাগ বিবোধী আন্দোলন হয তা তিনি চলচ্চিত্রাযিত কবেন। এই The Great Anti-Partition Movement-ই বাংলা ভাষায নির্মিত প্রথম তথ্য চিত্র।" (চলচ্চিত্রেব আবির্ভাব, পৃ ১৪৪)। এই ঐতিহাসিকবা কিন্তু কোনও তথ্যসূত্র উল্লেখ কবতে পাবেন নি।" (আব বেখো না আঁধাবে, সজল চট্টোপাধ্যায, পৃ ২০০)

হীবালাল সেনেব এই সংবাদচিত্র নির্মাণ সম্বন্ধে সব সন্দেহ নিবসন কবেছেন সিদ্ধার্থ ঘোষ 'এক্ষণ' পত্রিকায প্রকাশিত এক নিবন্ধে। সিদ্ধার্থ ঘোষ জানিযেছেন 'তিনি (হীবালাল সেন) প্রথম ঐতিহাসিক মূল্যেব তথ্যচিত্র, স্বদেশী আন্দোলনেব গৌববময একটি ঘটনাব চলচ্চিত্র গ্রহণ কবেন। ১৯০৫-এব ২২শে সেপ্টেম্বব বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব সময কলেজ স্কোযাবে জমাযেতেব ফেস্টুন হাতে শোভাযাত্রাব ও টাউনহলেব জনসভাব দৃশ্য সংবলিত এ চলচ্চিত্রেব কথা জানা যায এ বছবেবই 'দা বেঙ্গলী' কাগজে ১৯শে অক্টোবব প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপন থেকে ঃ

"JUST READY
Geuine Swadeshi film of our own make
THE
ROYAL BIOSCOPE CO

Props H L Sen & Bros
Pioneers and speicialists in the field of animatography,
Exhibitors before H E The Viceroy and Lieutanant
Governors of Bengal Patronised by the nobility and
aristocracy of the country,
Awarded 4 Gold Medals Sensation of the day
GRAND PATRIOTIC FILM
Anti partition Demonstration
and
SWADESHI MOVEMENT
At the Twon Hall, Calcutta on the 22nd Sept 1905,
The great International gathering at the College Square, the
mammoth procession of students, carrying black flags with
partiotic mottos, the magnificient view of the TOWN HALL,
the vast concourse of people on the stairs of the great
Historic Hall, closing with some of the leaders of the
memorable crusade against the dismemberment of Bengal
and a series of current appeals to Indians to
Support the SWADESHI movement
BANDE-MATARAM
Faithfully animatographed by H L Sen & Bros
The only Makers of Bioscope Film Subjects in India
H L Sen & Bros
Masjid Baree St Calcutta
off 151, Cornwallis Street"

(ছবি তোলা, সিদ্ধার্থ ঘোষ, এক্ষণ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯২, পৃ ১৬৬-১৬৭)

সিদ্ধার্থ ঘোষের উদ্ধৃত এই তথ্য নিঃসন্দেহে হীরালাল সেনকে বিশ্বের গণ-আন্দোলনের প্রথম চলচ্চিত্রকার ও ভারতের প্রথম স্বদেশি আন্দোলনের প্রথম চলচ্চিত্রস্রষ্টা হিসাবে অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

অনতিকাল পরেই শংকর ভট্টাচার্য প্রথম প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন ও সূত্রের সঠিক উদ্ধৃতি উল্লেখ করে জানিয়েছেন 'স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় ১৯০৫, ২১ অক্টোবর সংখ্যায় ক্লাসিক থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তা তুলে দিচ্ছি The Old Bird in his own Nest / BABU AMARENDRANATH DUTT / Again on the board of / THE CLASSIC THEATE / 68, BEADON STREET / Saturday, the 21st October, at 9 p m / PRITHWIRAJ Followed by / BAHUT ACCHHA / To wind up with an exhibition of / THE ROYAL BIOSCOPE / including the "Partition of Bengal" Scene at / the great Town Hall meeting for the first time / on the Bengali Stage / Next day, Sunday, at Candle-light / THE ROYAL BIOSCOPE / including the "Partition" Scene / To be followed by

/ HARIRAJ AND ALI BABA / Babus A N Dutt. and Nripendra C Bose, and / Miss Kusum Kumari and others in their wanted / characters in the plays put up / It is earnestly to be hoped that old patrons and / friends of my humbleself will continue their / favor on me at this my old place / A C Ray Receiver A N Dutt Manager (বাংলা বঙ্গালযেব ইতিহাসেব উপাদান, শংকব ভট্টাচার্য, পৃ ৩৩৩-৩৩৪)

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব সময চলচ্চিত্র ইতিহাসেব এতবড়ো একটি ঘটনা বাস্তবে কিন্তু অবহেলিতই বযে গেছে।

তথ্যসূচি

(১) ঘবোযা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুব
(২) কাবিগবি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ, সিদ্ধার্থ ঘোষ
(৩) প্রবীণদেব চোখে কলকাতা, লীলা মজুমদাব, পবিবর্তন, ২৫ মে, ১৯৮৩
(৪) ববিজীবনী (পঞ্চম খণ্ড), প্রশান্তকুমাব পাল
(৫) নিজেবে হাবাযে খুঁজি (প্রথম পর্ব), অহীন্দ্র চৌধুবী
(৬) বঙ্গালযে ত্রিশ বৎসব, দে'জ সংস্কবণ, অপবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায
(৭) প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১৪
(৮) আমাব এলোমেলো জীবনেব কযেকটি অধ্যায, উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
(৯) ছবি তোলা, সিদ্ধার্থ ঘোষ, এক্ষণ, শাবদীযা ১৩৯২
(১০) স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায
(১১) ববীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রেব উত্তবসূবী, দিবাকব সেন, ভাবত ও সমাজতান্ত্রিক জি ডি আব, মে-জুন, ১৯৮৩
(১২) কবিকণ্ঠ, সন্তোষকুমাব দে
(১৩) কলেব শহব কলকাতা, সিদ্ধার্থ ঘোষ
(১৪) Indian Stage Vol IV H N Dasgupta
(১৫) বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতাব প্রভাব (১৮০০-১৯১৪) ড প্রভাতকুমাব ভট্টাচার্য
(১৬) বঙ্গালযে অমবেন্দ্রনাথ, বমাপতি দত্ত
(১৭) বাংলাদেশেব ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড) বমেশচন্দ্র মজুমদাব
(১৮) বাংলা চলচ্চিত্রে শিল্পেব ইতিহাস, (১৮৯৭-১৯৪৭), দ্বিতীয় সংস্কবণ, কালীশ মুখোপাধ্যায
(১৯) আব বেখো না আঁধাবে, সজল চট্টোপাধ্যায

স্বদেশি আন্দোলন : শিল্পকলার চর্চা
(নব্য-ভারতীয় ঘরানা)
মৃণাল ঘোষ

নব্য-বঙ্গীয বা নব্য-ভাবতীয চিত্রধাবা যে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব প্রত্যক্ষ ফসল, তা নয। তবে সাধাবণভাবে স্বদেশি আন্দোলনেব সঙ্গে এব নিবিড সম্পর্ক বযেছে। এ বিযযে কোনও সংশয থাকাব কথা নয। আমাদেব চিত্রকলাব আধুনিকতায স্বদেশচেতনা সঞ্জাত ৰূপভাবনাব সূচনা, বলা যেতে পাবে, ১৮৯৫ সালে অবনীন্দ্রনাথেব 'বাধাকৃষ্ণ' চিত্রমালাব মধ্য দিযে। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন শুরু হওযাব অন্তত দশ বছব আগে। আবাব অবনীন্দ্রনাথেব এই যে দেশীয ঐতিহ্যেব দিকে চোখ ফেবানোব চেষ্টা, ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতাব বীতিতে তাঁব প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাকে অতিক্রম কবে, ই বি হ্যাভেলেব প্রেবণা বা উদ্যোগই যে এব প্রধান কাবণ, এ কথাও ঠিক নয। হ্যাভেল (১৮৬১-১৯৩৪) কলকাতায এসেছিলেন ১৮৯৬-এব ৫ জুলাই। পবেব দিন অর্থাৎ ৬ জুলাই তিনি গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলেব সুপাবিনটেনডেন্ট পদে যোগ দেন। তাঁব সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথেব পবিচয হয ১৮৯৭ সালে। তবে অবনীন্দ্রনাথেব পববর্তী বিবর্তনে বা আমাদেব আধুনিকতায দেশজ আঙ্গিকেব বিস্তাবে হ্যাভেল-অবনীন্দ্রনাথেব যৌথ উদ্যোগেব যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, এ সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই।

'ৰূপ'-এব ক্ষেত্রে বা শিল্প-আঙ্গিকেব ক্ষেত্রে এই যে দেশীয ঐতিহ্যেব সঙ্গে যুক্ত হওযাব চেষ্টা, যেটা অবনীন্দ্রনাথ শুরু কবলেন, সেটা বৃহত্তব এক স্বদেশচেতনাব উদ্বোধনেব বা ক্রমান্বিত বিকাশেবই পবিণতি। যদিও দৃশ্যকলাব ক্ষেত্রে এই সচেতনতা আসতে দেবি হযেছে অনেকটাই। আমবা আমাদেব সংস্কৃতিব অন্যান্য কযেকটি ক্ষেত্রেব দিকে তাকালে এটা বুঝতে পাবি। দীনবন্ধু মিত্রেব নাটক 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয ১৮৬০ সালে। মাইকেল মধুসূদন দত্তেব 'মেঘনাদ বধ' কাব্য প্রকাশিত হয ১৮৬১ সালে। ১৮৬৫-তে প্রকাশিত হয বঙ্কিমচন্দ্রেব 'দুর্গেশনন্দিনী'। ভাবতীয শিল্পকলাব গভীবতব বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিবীক্ষণ কবে বাংলাভাষায প্রথম বই লেখেন শ্যামাচবণ শ্রীমানী 'সূক্ষ্ম শিল্পেব উৎপত্তি ও আর্যজাতিব শিল্পচাতুবি'। প্রকাশিত হয ১৮৭৪-এ। ১৮৭৫-এ প্রকাশিত হয বাজেন্দ্রলাল মিত্রেব বড মাপেব কাজ 'অ্যান্টিকুইটিজ অব ওডিযা'। হিন্দু মেলা শুরু হযেছিল ১৮৬৭ সালে। ১৮৭৭-এ প্রথম বেবিযেছিল 'ভাবতী' ও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা। নব জাগবণেব এইসব ঘটনাপ্রবাহেব মধ্যে চিত্রকলাব আঙ্গিকে স্বদেশচেতনাব অন্বেষণেব কোনও ইঙ্গিত নেই।

হিন্দুমেলাব প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক নবগোপাল মিত্রকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব একবাব জিজ্ঞাসা কবেছিলেন, এই মেলায যে সব দেশীয কাবশিল্প দেখানো হয, সেগুলি তো সকলেবই সুপবিচিত, স্বদেশি চিত্রেব কোনও নিদর্শন কি এখানে দেখানো যায? নবগোপাল তখন এক্‌জন

শিল্পীকে এবকম একটি ছবির অজুবা দিযেছিলেন। সেই শিল্পী এঁকে এনেছিলেন যে ছবি, তাতে দেখা যাচ্ছিল ভাবতীয কিছু মানুষ দেবী ব্রিটানিকার পদপ্রান্তে প্রার্থনাবত। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁব আত্মস্মৃতিতে জানিযেছেন, তিনি এই ছবি দেখামাত্র নির্দেশ দেন, সেটা যেন সেই মুহূর্তে সেখান থেকে সবিযে নিযে যাওযা হয। তখনকাব শিল্পেব স্বদেশচেতনাব এই ছিল একটি নমুনা। ওই মেলাতেই ১৮৭২ সালে দেখানো হযেছিল তিনকড়ি মুখার্জি নামে একজন অপেশাদাব শিল্পীব কালিদাসেব কোনও কাহিনি অবলম্বনে আঁকা একটি ছবি। কিন্তু সে তো ব্রিটিশ স্বাভাবিকতাব আঙ্গিকে। তখন দেশীয ছবি বলতে এই বোঝাত। এব মধ্যেই স্বদেশচেতনাব প্রসাব ঘটছিল ছবিব বিষযে। বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যাযেব (১৮৫১-১৯৩২) মতো আর্ট স্কুলে শিক্ষিত শিল্পীবা বা ববি বর্মা-ব (১৮৪৬-১৯০৬) মতো স্বশিক্ষিত শিল্পীবা ব্রিটিশ আঙ্গিকে দেশীয পৌবাণিক বিষয নিযে ছবি কবতেন। বহু অনামা শিল্পীব এবকম তেলবঙেব ছবি পববর্তীকালে আবিষ্কৃত হযেছে, যাঁদেব প্রতিভাব কোনও অভাব ছিল না। সে সমযেই অবশ্য, ঊনবিংশ শতকেব দ্বিতীযার্ধে কলকাতায এক উজ্জ্বল দেশীয আঙ্গিকেব বিস্তাব ঘটছিল, কালীঘাটেব পট নামে যা আজ সুপবিচিত। কিন্তু তখনকাব মানুয এব বৈভব চিনতে পাবেনি। বা আধুনিকতাব দৃষ্টিকোণ থেকে একে অনুধাবনের যোগ্য বলেও মনে কবেনি।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন সমস্ত বাংলাকে বিপুলভাবে আলোড়িত কবেছিল। প্রতিবাদী কবে তুলেছিল। বাজনীতি ভাবনা, সমাজ সংগঠন, সাহিত্য ও সংগীতেব সৃজন প্রবাহে প্রাণেব বন্যা এনেছিল। ববীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, বজনীকান্তেব এই সমযে লেখা গানগুলি বাঙালিব মনন ও আবেগেব শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। সাহিত্যেব অন্যান্য ধাবাযও এই সৃজনশীলতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হযেছিল। দেশেব এই হৃদয জেগে ওঠাব স্বৰূপ বুঝতে পাবি আমবা ববীন্দ্রনাথেব একটি চিঠি থেকে। ১৯০৫-এব বঙ্গভঙ্গেব নির্ধাবিত তাবিখেব কযেক দিন আগে গিবিডি থেকে ৭ অক্টোবব ব্রজেন্দ্রকিশোব দেববর্মাকে একটি চিঠিতে লিখছেন ববীন্দ্রনাথ, "এবাবকাব যে আন্দোলনে দেশেব হৃদয় জাগ্রত হইযাছে তাহাকে যাহাবা ছলনা বলিযা বিদ্রূপ কবিতে পাবে, তাহাবা শযতানেব চেলা। তোমাব কাছে আমাব অনুবোধ এই যে তুমি যথাসম্ভব বিলাতী দ্রব্য পবিহাব কবিযা দেশী জিনিস ব্যবহাব কবিযো—এজন্য যদি তোমাকে বিদ্রূপ সহিতে হয, তাহাব জন্য প্রস্তুত হইও। কেবল দেশী জিনিস ব্যবহাব কবা নহে, যতটা সম্ভব, দেশী ভাবে দেশী আচাব পালন কবা চাই। সময বিশেযে লোকেব কাছে উপহাসাস্পদ হইবাব গৌবব আছে, এ কথা মনে বাখিও।"

আবেগেব এই তুঙ্গ অবস্থা থেকে নেমে আসতে অবশ্য খুব বেশি সময নেননি ববীন্দ্রনাথ। এব অল্প কিছু দিন পবে দীনেশচন্দ্র সেনকে 'স্বদেশি আন্দোলনেব ইতিহাসেব গুটিকযেক সূত্র' বিবৃত কবতে গিযে লেখেন, "দেশ অন্তবে অন্তবে স্বদেশিভাবে দীক্ষিত হইযা আসিতেছিল। এমন সময পার্টিশন ব্যাপাব একটা উপলক্ষ মাত্র হইযা এই স্বদেশি আন্দোলনকে স্পষ্টৰূপে বিকশিত কবিযা তুলিল। বস্তুত বযকট কবাব ছেলেমানুযী ইহাব প্রাণ নহে।" বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে এই অবস্থানকেই ববীন্দ্রনাথেব সত্য অবস্থান বলে গণ্য কবা যায। এবই পবিচয পাই তাঁব পববর্তী প্রবন্ধাবলিতে, 'ঘবে বাইবে' বা 'গোবা'-ব মতো উপন্যাসে।

বঙ্গভঙ্গেব এই প্রাথমিক আবেগেব বন্যা চিত্রকলাকে তেমন কবে ভাসাযনি। চিত্রকলাব জগৎ তখনও সেভাবে প্রস্তুত হযে উঠতে পারেনি। ১৯০৫ সালে শিল্পেব স্বদেশ নিযে অবনীন্দ্রনাথের ভাবনা অবশ্য অনেকটা এগিযেছে। তখন পর্যন্ত বলা যায এই স্বদেশি চেতনাব উদ্বোধনে তিনিই একমাত্র প্রতিনিধি। তাঁকেই বলা যায নব্য-ভাবতীয ঘবানাব প্রথম প্রজন্ম। এব দ্বিতীয প্রজন্মেব শিল্পী যাঁবা, তাদেব যাত্রা শুরু এই ১৯০৫ থেকে বা এব দু-এক বছব পব থেকে। ১৯০৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ যখন কলকাতাব গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে উপাধ্যক্ষ, সে বছবই সেখানে ভর্তি হন নন্দলাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬)। পববর্তী কালে চিত্রকলায স্বদেশ-ভাবনাব শ্রেষ্ঠ স্ফুবণ ঘটে তাঁব হাতেই। নব্য-ভাবতীয ঘবানাব অন্যান্য প্রতিনিধিবাও এই সমযেব পব থেকেই অবনীন্দ্রনাথেব ছত্রছাযায সমবেত হতে থাকেন। সুবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায (১৮৮৫-১৯০৯) ভর্তি হন ১৯০৫-এই। ১৯০৬-এ ভর্তি হন অসিতকুমাব হালদাব (১৮৯০-১৯৬৪)। ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদাব (১৮৯১-১৯৭৫) ১৯০৭-এ। ইত্যাদি ইত্যাদি

তবে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিযা যে একেবাবে আসেনি চিত্রকলায, তা নয। সেটা এসেছে অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতাব আঙ্গিকে। ১৯০৭ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায প্রকাশিত একটি ছবির কথা স্মবণ কবা যায (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪)। ছবিটিব শিবোনাম 'নির্যাতিতে আশীর্বাদ'। শিল্পী অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায। স্বাভাবিকতাব আঙ্গিকে আঁকা এই ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে কোমব অব্দি জলে দাঁড়িযে আছে একজন তরুণ বিপ্লবী। সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশ তাব উপব নির্যাতন কবছে। উপবে শূন্যে ভাসমান সিংহবাহিনী দেবী দুর্গা। বিপ্লবীব চোখ উপবে সেই দেবীব দিকে নিবদ্ধ। শিল্প হিসেবে খুব উচ্চমানেব না হলেও এই ছবিটি সেই সমযেব সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী রাজনীতিব অনেক তথ্য ও সত্যকে উদ্ভাসিত কবে। এবকম ছবি হযতো আবও আঁকা হযেছে সেই সময। কিন্তু 'রূপ'-এব দিক থেকে বা আঙ্গিকেব দিক থেকে স্বদেশি চেতনার কোনও প্রকাশ নেই এতে।

যে ছবিটিকে সবাসবি বঙ্গভঙ্গেব সঙ্গে যুক্ত কবে ভাবা হয, সেটি হল অবনীন্দ্রনাথেব 'ভাবতমাতা'। কিন্তু এই ছবিটি অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন ১৯০২ সালে। তখন নাম ছিল 'বঙ্গমাতা'। আর্ট স্কুলে বসেই আঁকা হয়েছিল। ড পঞ্চানন মণ্ডলেব 'ভাবতশিল্পী নন্দলাল' গ্রন্থে উদ্ধৃত নন্দলালেব উক্তি থেকে জানি, "ওখানে (আর্ট স্কুলে) অবনীবাবুব ফিনিশ-কবা প্রথম বিখ্যাত ছবি 'বঙ্গমাতা' (১৯০২)। এই 'বঙ্গমাতা'-ই 'ভাবতমাতা' হলেন ১৯০৫ সালে। নাম দিলেন সিস্টাব নিবেদিতা। সে স্বদেশিযুগেব 'বঙ্গভঙ্গ'-আন্দোলনেব সমযে। 'ভাবতমাতা' নাম দিযে সেই ছবি তখন স্বদেশি পতাকাতে ব্যবহাব কবা হতো।" (প্রথম খণ্ড। পৃ ৬৫)

'ভাবতমাতা'-কে প্রথম পতাকায ব্যবহাব কবেছিলেন জাপানি শিল্পী তাইকান। তিনি তখন জোড়াসাঁকোতেই থাকতেন। ১৯০২ সালে প্রথমবাব কলকাতায এসেছিলেন জাপানি মনীষী ওকাকুবা তেনশিন (১৮৬৩-১৯১৩)। ১৯০৩-এ প্রকাশিত হয তাঁব বিখ্যাত গ্রন্থ 'আইডিযালস অব দ্য ইস্ট।' নিবেদিতা এব ভূমিকা লেখেন। সেবাব দেশে ফিবে গিযে ওকাকুবা কলকাতায পাঠিযেছিলেন দুজন জাপানি শিল্পীকে ইয়োকোইয়ামা তাইকান (১৮৬৮-১৯৫৮) ও হিশিদাব শুনসো (১৮৭৪-১৯২১)। তাঁবা আসেন ১৯০৩ সালে। তাঁদেব কাছ

থেকেই অবনীন্দ্রনাথ জাপানি ওয়াশ পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। জাপানের সঙ্গে ভারতের এই আদান-প্রদান আধুনিকতায় প্রাচ্য শিল্পচেতনার বোধকে প্রগাঢ় করেছিল। ১৯১২ সালে ওকাকুরা দ্বিতীয়বার কলকাতায় আসেন। তখন তিনি বলেছিলেন, প্রথমবার এসে এখানে তিনি স্বদেশি শিল্পের সূচনা দেখেছিলেন, আর দ্বিতীয়বার এসে দেখলেন, তা অনেকটা সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের 'বঙ্গমাতা' গৈরিক বস্ত্র পরিহিতা এক বাঙালি নারীরই রূপায়ণ। এই রূপায়ণ অনেকটা স্বাভাবিকতা আশ্রিত। প্রেক্ষাপটে জাপানি ওয়াশ পদ্ধতির বর্ণ প্রলেপ খানিকটা বায়বীয় অলৌকিকের পরিমণ্ডল তৈরি করেছে। মাথার পিছনের অলোকবৃত্ত এবং মানবী শরীরে চার হাতের আরোপের সাহায্যে এই মানবীকে দেবীতে উত্তীর্ণ করার চেষ্টা হয়েছে। দেবীর চার হাতে রয়েছে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও ধর্ম—বাঙালির আশু প্রয়োজনীয় এই চারটি জিনিসের প্রতীক। অবনীন্দ্রনাথ পরে 'ঘরোয়া'র স্মৃতিচারণায় বলেছেন, যে দেবদেবীর মূর্তি আঁকার দিকে তাঁর খুব একটা প্রবণতা ছিল না। স্বদেশির হাওয়ায় তখন তিনি নন্দলালকেই উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এইসব মূর্তি রচনার দিকে। তা সত্ত্বেও 'বঙ্গমাতা' তিনি এঁকেছেন। এ কি সেই সময়ের স্বদেশি আবহমণ্ডলেরই ফলশ্রুতি? এই 'বঙ্গমাতা' বা 'ভারতমাতা'-র মূর্তি কল্পনার উৎস কি স্বদেশি? এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ। শোভন সোম তাঁর 'গেরুয়ার গৈরিকীকরণ' নামে এক প্রবন্ধে ('সানন্দা', জুলাই ২০০৩) বলেছেন, এর উৎস ইউজিন দ্যলাক্রোয়ার ১৮৩০-এ আঁকা একটি ছবি 'স্বাধীনতার দেবী জনগণকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।' কিন্তু 'লিবার্টি'-র মূর্তি-কল্পনার সঙ্গে 'ভারতমাতা'র মিল কোথায়? এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনও তথ্য সেখানে আমরা পাইনি।

'ভারতমাতা'-র এই মূর্তি কল্পনা আমাদের জাতীয়চেতনা বা স্বদেশ ভাবনায় আর এক সমস্যার প্রতীক হয়ে উঠেছে। 'ভারতমাতা' কেন হবেন একজন হিন্দু দেবী? বহু ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কোনও সংযোগ বা ঐক্য স্থাপিত হতে পারেনি, আমাদের নবজাগরণের এই মূলগত সংকট আমাদের স্বদেশি আন্দোলনকে বিপর্যস্ত করেছে। সেই বিপর্যয় থেকে আজও আমরা নিস্তার পাইনি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শনি ছিদ্রপথেই প্রবেশ করে। সাম্প্রদায়িকতার সেই ছিদ্রকে আমরা কেবল বাড়িয়েই চলেছি। স্বদেশি যুগে আমাদের শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনও এই সংকটে সমস্যাগ্রস্ত হয়েছে।

১৯০৫ বা তার পরের কয়েক বছরে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের উত্তালতা শিল্পকলায় সে অর্থে কোনও প্রতিবাদী আবহ আনেনি। অবনীন্দ্রনাথ একটু সাবধানি স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর রাখিবন্ধনের দিন রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিশাল জনতা যখন সকালে গঙ্গায় স্নান করে চারপাশের সমস্ত মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন অবনীন্দ্রনাথও ছিলেন সেই দলে। সকলে যখন মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন রাখি পরাতে, অবনীন্দ্রনাথ তখন বিপদের আশঙ্কায় গলিপথে পালিয়ে এসেছিলেন। পরে অবশ্য মারামারি কিছু হয়নি শুনে আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

ব্রিটিশ সরকার যা প্রতিষ্ঠান বঙ্গভঙ্গকে নির্মমভাবে দমন করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

কিন্তু স্বদেশি শিল্পের প্রতি তাঁদেব পৃষ্ঠপোষকতাই ছিল। ১৯০৭ সালে গঠিত হল 'ইণ্ডিযান সোসাইটি অব ওবিযেন্টাল আর্ট'। নব্য-ভাবতীয ঘবানাব সংগঠিত পাদপীঠ। এব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ লর্ড কিচেনাব, কলকাতা হাইকোর্টেব প্রধান বিচাবক স্যাব জন উডবোফ, বাংলাব দুজন গ্ভর্নব লর্ড কাবমাইকেল ও লর্ড বোনাল্ডসে প্রমুখ আবও অনেক ব্রিটিশ বাজপুকষ। ব্রিটিশ সবকাব স্বদেশি শিল্পেব এই ক্ষেত্রটিকে অনেক নিবাপদ মনে কবতেন। 'বন্দে মাতবম' ধ্বনিকে তাঁবা ভয পেতেন। ভয পেতেন হযতো স্বদেশি সংগীতকেও। সাহিত্য বা লেখালেখিব উপব তাঁদেব বিধিনিষেধ ছিল। কিন্তু কলাশিল্প সম্পর্কে তাঁদেব কোনও ভয ছিল না। সেই সমযেব স্বদেশি শিল্পেব সে অর্থে কোনও প্রতিবাদী চবিত্র ছিল না।

শিল্পেব এই স্বদেশ সন্ধানেব শুক প্রত্যক্ষত বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন নয। ববং অনেক আগে থেকেই যে স্বদেশেব জাগবণ ঘটছিল, ববীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, দেশ অন্তবে অন্তবে স্বদেশিভাবে দীক্ষিত হইযা আসিতেছিল', সেটাবই একটু বিলম্বিত ক্রমবিস্তাব ঘটেছিল চিত্রকলায। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন তাতে যে প্রেবণা জুগিযেছিল, তা গভীবতব ফলপ্রসূ হযেছে আবও একটু পববর্তী কালে। এই স্বদেশচেতনাই অবনীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ কবেছিল। তাই 'ঘবোযা'-ব স্মৃতিচাবণায তিনি বলেছিলেন

"কিন্তু এই যে স্বদেশী যুগে ভাবতে শিখেছিলুম, দেশেব জন্য নিজস্ব কিছু দিতে হবে, সেই ভাবটিই ফুটে বের হল আমাব ছবিব জগতে। . ছবি দেশীমতে ভাবতে হবে, দেশীমতে দেখতে হবে। ববি বর্মাও তো দেশীমতে ছবি এঁকেছিলেন, কিন্তু বিদেশীভাব কাটাতে পাবেন নি, সীতা দাঁড়িযে আছে ভিনাসেব ভঙ্গীতে। সেইখানে হল আমাব পালা। বিলিতি পোবট্রেট আঁকতুম, ছেড়ে ছুড়ে দিযে পট পটুযা জোগাড করলুম। যে দেশে যা-কিছু নিজেব শিল্প আছে, সব জোগাড কবলুম।" (অবনীন্দ্র বচনাবলী। প্রকাশভবন। ১ম খণ্ড। পৃ ৭৪)

শিল্পেব এই যে স্বদেশ সন্ধান, এব কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। আছে আজও। সে কথায পবে আসছি। অবনীন্দ্রনাথ এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম কবতে পেবেছিলেন। তাঁব ছবি কেবল অতীত চেতনায আবদ্ধ ছিল না। কেবল হিন্দু পুনকজ্জীবনবাদে সীমিত ছিল না। এই যে হিন্দু পুনকজ্জীবনবাদেব দিকে গড়িযে যাওযা, এটা আমাদেব নবজাগ্বণেব বা স্বদেশি আন্দোলনেব অথবা সমগ্র স্বাধীনতা সংগ্রামেব একটা দুরূহ সমস্যা। বিফর্মেশন থেকে আন্দোলনটা বিভাইভালিজমেব দিকে কেন চলে গেল, এ নিযে বহু জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত বহু গবেষণা কবেছেন। এব মূল বযেছে আমাদেব বাজনৈতিক, সামাজিক ও বৃহত্তব জনসাধাবণেব মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাসেব এমন গভীবে যে এব কোনও আশু সমাধান ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রও মুসলিম যুগকে অন্ধকাবেব যুগ ভেবেছেন। সেই তুলনায ব্রিটিশ আধিপত্যকে প্রগতিশীল মনে হযেছে। দেশেব ভিতবেব ভ্রাতৃসম দুই সম্প্রদাযেব মধ্যে বিবোধকে দীর্ঘদিন ধবে প্রকট কবে তুলেছেন সমাজেব উচ্চকোটিব ক্ষমতাব কেন্দ্রেব কাছাকাছি মানুষ। বিংশ শতকেব গোড়ায এসে তখন আব কিছু কবাব ছিল না। ববীন্দ্রনাথ বা মহাত্মা গান্ধিব অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও দেশভাগেব চবম বিপর্যযকে শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যাযনি। সেই সংকট আজও আমাদেব

তাড়া করে ফিবছে। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, ববীন্দ্রনাথ সত্ত্বেও আমাদেব শিল্পকলাকে হিন্দু জাগবণের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত কবা যাযনি।

তা সত্ত্বেও শিল্পকলায এই যে স্বদেশি ভাবনার উজ্জীবন, এব একটা সুদূবপ্রসাবী সদর্থক দিক বযেছে। আমাদেব আধুনিকতায নতুন এবং জাতিগত আত্মপবিচযে দীপ্ত এক রূপচেতনা জেগেছিল এব মধ্য দিযে। নব্য-ভাবতীয ঘবানাব আন্দোলন এ দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। আত্মপবিচয আবিষ্কাবেব এই যে প্রত্যয়, এব একটা বিশ্বগত প্রেক্ষাপটও ছিল।

শিল্প বিপ্লবেব সাফল্যেব ফলে ইউবোপে গড়ে উঠেছিল বস্তুগত বৈভব ও সমৃদ্ধি। ঔপনিবেশিকতাব বিস্তাব ও সাফল্য এবই পবিণতি। শিল্পবিপ্লবেব ফলেই বিস্তৃত হচ্ছিল উপযোগবাদী দর্শন। কিন্তু শিল্প-বিপ্লব অবমূল্যায়ন ঘটাচ্ছিল মানবতাব। বিচ্ছিন্নতা আনছিল মানুষ ও প্রকৃতিব সম্পর্কেব মধ্যে। এই বি-মানবিকতাব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগছিল শিল্পী, সাহিত্যিক ও দার্শনিক মনীষীদেব মনে। রোমান্টিকতাব আন্দোলনেব সূচনা এই প্রতিবাদ থেকেই। প্রকৃতিব সাবল্যেব কাছে ফিবতে চাইলেন কবিবা। মধ্যযুগীয আধ্যাত্মিক মননকে ফিরিযে আনতে চাইলেন শিল্পী ও দার্শনিক। বিষযেব সন্ধানে মধ্যযুগে ফিবে গেলেন ঔপন্যাসিক। উইলিযাম ওযার্ডসওযার্থ (১৭৭০-১৮৫০) টমাস কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১), ওযালটাব স্কট (১৭৭১-১৮৩২) প্রমুখ কবি, দার্শনিক ও ঔপন্যাসিকেব কাজ এব দৃষ্টান্ত। উইলিয়ম মবিসেব (১৮৩৪-৯৬) নামটিও স্মরণীয এ প্রসঙ্গে। শিল্পে ও সমাজ ভাবনায মধ্যযুগীয় আদর্শকে ফিবিযে আনতে তাঁব বিশেষ অবদান আছে। ঔপনিবেশিকতাব অভিঘাতে ভাবতীয ও প্রাচ্যেব আধুনিকতা নিযে যাঁবা ভাবছিলেন, তাঁবাও যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাবল্য ও সুষমাকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ কবতে চাইছিলেন।

কুমাবস্বামী ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে ঔপনিবেশিকতা ভাবাক্রান্ত যান্ত্রিক আধুনিকতাব বিরুদ্ধে এবকমই একটা আদর্শকে গ্রহণ কবেছিলেন। মধ্যযুগীয মিস্টিসিজমেব মধ্যে তিনি আধুনিকতাব আদর্শ খুঁজে পান। ইতালির নিওপ্লেটোনিক দার্শনিক সেইন্ট টমাস অ্যাকুইনাস (১২২৫-৭৪)-এব দর্শন তাঁকে প্রভাবিত করে। জার্মানিব মধ্যযুগীয় নন্দনতাত্ত্বিক তথা দার্শনিক মেইস্টাব একহার্টকে (আ ১২৬০-১৩২৮) তিনি গ্রহণ কবেন নন্দন ভাবনাব আদর্শ হিসেবে। শিল্প ও জীবনেব বিচ্ছিন্নতাকে দূব কবে শিল্পেব মধ্যে মবমী আধ্যাত্মিকতাবই প্রকাশ দেখতে চান তিনি। জাপানি মনীষী ওকাকুবা (১৮৬২-১৯১৩) উদ্বুদ্ধ হযেছিলেন আমেবিকান দার্শনিক আর্নস্ট ফেনোল্লোসা-ব (১৮৫৩-১৯০৮) দ্বাবা। ফেনোল্লোসা অনুপ্রাণিত ছিলেন কার্লাইল ও বাসকিন-এর দর্শনে। এভাবে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যেব প্রতিবাদী চেতনাযও একটা সমন্বয ঘটছিল। সংযোগ ঘটছিল। নব্য-ভাবতীয চিত্রবীতি সেই সমন্বযেরই একটা প্রকাশ।

এই যে স্বদেশ চেতনা বা প্রাচ্য চেতনা, এটা পাশ্চাত্যেবই অবদান। এতে আমাদেব স্বকীযতা কিছু নেই। এই বলে একে ছোটো কবে দেখাব চেষ্টা হয। এটা ঠিকই যেমন বলেছিলেন এডওযার্ড সঈদ, এই ওবিযেন্টালিজম হচ্ছে একটা 'Western Style for dominating, restructuring and having authority over the orient'। আব এই আধিপত্যেব বিরুদ্ধে প্রতিবোধটাই তো জেগে উঠেছিল প্রাচ্যেব স্বদেশচেতনাব ভিতব থেকে।

এব সবটাই যে পাশ্চাত্য থেকে পাওযা, পাশ্চাত্যের নকল এবকম ভাবাব কোনও কাবণ নেই। অমলেশ ত্রিপাঠীব কথায, "প্রাচীন ভাবতীয সভ্যতাব ও হিন্দুধর্মেব মহিমা সম্বন্ধে বামমোহন থেকে অববিন্দ ভালোভাবেই সচেতন ছিলেন। পশ্চিমেব প্রাচ্যবাদী (orientalist) পণ্ডিতদেব প্রাচ্য বিযযক ধাবণা বা প্রাচ্য-প্রতীচ্যেব দ্বন্দ্বেব তত্ত্ব তাঁবা সম্পূর্ণ মেনে নিযেছিলেন এবং নিজেদেব ভাবনা সেই ছকে গড়ে তুলেছিলেন এডওযার্ড সেডেব (Said) এহেন উক্তি মানা যায না।" এর কাবণ হিসেবে অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন, ভাবতীয সংস্কৃতিকে বুঝতে আমাদেব মনীষীদেব পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেব শবণাপন্ন হতে হয নি। সংস্কৃত পঠন পাঠনেব ঐতিহ্য ইংবেজ আসাব আগে আমাদেব দেশে অব্যাহত ছিল অনেকগুলি কেন্দ্রে। বামমোহন কাশীতে গিযে বেদান্ত ও সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যযন কবেছিলেন। বিবেকানন্দকে কোনও ইউবোপীয় সাহেবেব কাছে উপনিষদ শিখতে হযনি। "সংস্কৃতে প্রায স্বযং শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র সাহেব প্রাচ্যবিদদেব বহু গবেষণা নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করেছেন কৃষ্ণচরিত্র, লোকবহস্য, কমলাকান্তেব দপ্তবে।" (স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাবতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭), আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৪৯)

কাজেই এ কথাটা আমাদেব পরিষ্কাবভাবে বুঝে নিতে হয যে আমাদের এই যে নবজাগবণ বা আত্মআবিষ্কাবেব প্রয়াস, এর ভিতব স্বদেশ-বিশ্বেব একটা সংযোগ ঘটেছিল। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এব একটা প্রতিবাদী চবিত্র ছিল। এই প্রতিবাদেব বিভিন্ন ধরন আমবা দেখেছি মাইকেল মধুসূদন বা ববীন্দ্রনাথেব সাহিত্যে, বঙ্কিমচন্দ্র বা ববীন্দ্রনাথের সমাজ ভাবনায, মহাত্মা গান্ধিব রাজনীতিতে। শিল্পকলায এটা জাগিযেছিল বিশিষ্ট এক রূপচেতনা। ফর্ম বা রূপেব ভিতব দিযে আত্ম-আবিষ্কাবেব প্রেবণা। শিল্পকলাতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আধিপত্যেব বিরুদ্ধে এক প্রতিবোধ। বিভাইভালিজম, হিন্দু সাম্প্রদাযিকতাব উচ্ছ্বাস বা গতানুগতিকতা এই রূপচেতনাকে অবরুদ্ধ কবেছে। আজও কবছে। কিন্তু সেগুলি তো মাঝারিমাপেব শিল্পীর দূবদর্শিতাব অভাবেব ক্ষেত্র। স্বদেশচেতনাব শ্রেষ্ঠ দিক যেটা, সেটা তো এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম কবেই এগিযেছে। সেই চলাব মধ্য দিযেই আমাদেব শিল্পকলা আজকেব জাযগায় এসে পৌঁছেছে। আমবা শিল্পেব স্বদেশচেতনা বলতে সেই গুরুত্বপূর্ণ পর্যাযগুলোকেই বুঝব। এবং সেই সম্পর্কেই কিছু আলোকপাতেব চেষ্টা কবব।

ভারতীয় চিত্রকলাব আধুনিকতায পথিকৃৎ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুব। ১৮৯৫ সালে 'বাধাকৃষ্ণ' চিত্রমালার মধ্য দিযে তাঁব চিত্রকলায স্বদেশ সন্ধানেব শুরু। কিন্তু অল্প কিছুদিনেব মধ্যেই তিনি যেখানে পৌঁছেছিলেন, সেটা কিন্তু হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ নয। তিনি সেদিক দিযে প্রায যানই নি। তিনি ক্রমান্বযে প্রবেশ কবেছেন লোকজীবনেব গভীবে। তাঁব সাহিত্য থেকে ভালোভাবে বোঝা যায় সমাজেব নিম্নবর্গীয জীবনেব প্রতি তাঁর আকর্ষণ। তিনি দেশেব শিকড় খুঁজেছেন সাধাবণ মানুষেব এই লোকাচাবেব মধ্যে। লৌকিক জীবনে। ব্রত পার্বণ রূপকথাব জগতে। এজন্যই কবি বিষ্ণু দে তাঁব সম্পর্কে বলেছিলেন, 'অবনীন্দ্রনাথেব সত্তাব শিকড এই বাংলাব আদিম গভীবে'।

চিত্রকলায বাস্তবতাব বা স্বাভাবিকতাব যে প্রকট রূপ দেখতে দেখতে বড হযেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, সেটাই হযতো তাঁকে এই রূপবীতিব বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কবে তুলেছিল। রূপাযণে

স্বাভাবিকতাতেই লগ্ন থেকেছেন তিনি. কিন্তু সেই স্বাভাবিকতাব ভিতব আনতে চেয়েছেন অন্তর্লোকেব আলোছাযাব মাযাব স্পন্দন। উপবেব বাস্তবতা নয, ভাবেব গভীবতাই তাঁব অন্বিষ্ট ছিল। আমাদেব আধুনিক সংস্কৃতিতে আব একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি কবেছেন। তা হল, ঐস্লামিক, বিশেয মোগল ৰূপচেতনাকে তাঁব ছবিব আঙ্গিকে মিলিযে নিযেছেন। হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদেব এক প্রতিবোধ তাঁব কাছ থেকেই প্রথম এসেছে। অনেক সময এ কথা মনে কবা হযে থাকে যে অবনীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে ছিলেন একজন অবাজনৈতিক ব্যক্তি। 'ভাবতমাতা' সত্ত্বেও সবাসবি বাজনীতি বা সমকালীন সমস্যা তাঁব ছবিতে আসেনি। এ কথা যে ঠিক নয, স্বদেশচেতনাই যে ক্রমান্বযে তাঁব মধ্যে এনেছে গভীবতব বাজনৈতিক চেতনা, সমকালীন বাস্তবতাব গভীবতব বিশ্লেষণও যে এসেছে তাঁব ছবিতে, এটা বোঝা যায তাঁব ১৯৩০-এব 'আবব্য বজনী' চিত্রমালাব ছবিগুলিব দিকে তাকালে। এখানে আমবা সেবকম একটিই মাত্র ছবি নিবিডভাবে দেখাব চেষ্টা কবব।

ছবিটিব ইংবেজিতে নামকবণ হযেছে পবে 'The Hunchback of Fish-bone'। ছবিটিব 'ফর্ম' বা ৰূপাবযবে আমবা কতগুলো স্তব নীচ থেকে উপব দিকে বিভিন্ন তলে সংস্থাপিত হতে দেখি। এই পবিপ্রেক্ষিত বিন্যাস সর্বতোভাবে প্রাচ্য আঙ্গিকেব অনুসাবী। একেবাবে নীচে একটি কক্ষ দেখা যাচ্ছে, আযতাকাব। একটি আযতাকাব গবাক্ষ বযেছে তাতে। সেই গবাক্ষেব গবাদেব ভিতব দিযে দেখা যাচ্ছে একটি মুখ। দাডি ও পাগডিতে এক মুসলিম শ্রমিক বা কাবিগবেব মুখ। শুধু তাব মুখ দেখলেও আমবা বুঝতে পাবি সে কোনও কাজে নিমগ্ন আছে। একটু ডানদিকে তাকালে এব ঠিক উপবেব স্তবে আমবা আব একটি কক্ষ দেখতে পাই। দোচালা সেই ঘবটিব পঞ্চভুজাকৃতি জ্যামিতিকতা লক্ষণীয। সেখানে বসে আছে গান্ধিটুপি পবা এক বণিক। তাব মাথাটি শুধু দৃশ্যমান। এই বণিক তাকিযে আছে উপবেব দিকে। সেখানে ঘবেব চালায বযেছে একটি বিডাল। সূক্ষ্ম এক কৌতুকবোধ অবনীন্দ্রনাথেব ছবিব বৈশিষ্ট্য। এবও উপবে বাঁ-দিকেব বড প্রকোষ্ঠে যে দৃশ্য সন্নিবিষ্ট, তাতে বযেছে সবাসবি 'আবব্য বজনী'-ব গল্প। এক দবজি ও তাব সুন্দবী যুবতী স্ত্রী শুশ্রূষা কবছে কুব্জ একটি মানুষকে। তাদেবই একটি কৌতুকেব পবিণতিতে মানুষটি মৃতপ্রায। মজা কবাব জন্য এই লোকটিব ভাতেব সঙ্গে তাবা মিশিযে দিযেছিল মাছেব কাঁটা। সেই ভাত খেতে গিযে গলায কাঁটা ফুটে লোকটি সংজ্ঞা হাবিযেছে। এই দম্পতি তাব শুশ্রূষা কবছে।

ছবিব এই স্তবটি পুবাণকল্পেব স্তব। অতীতেব একটি কাহিনি ৰূপাযিত হযেছে এখানে। এব উপবেব স্তবে আমবা দেখছি আব একটি কাহিনিব বিন্যাস। আখ্যানেব এই অংশটি শিল্পীব সাম্প্রতিকেব সঙ্গে যুক্ত। এবং এই অংশটিই সবচেযে আলোকিত। শিল্পী নিজে বসে আছেন একটি আবাম কেদাবায। আপ্যাযন কবছেন ইংবেজ অতিথিদেব। তাবা পান ও ভোজনে নিমগ্ন। পাশেব টেবিলে বাখা বযেছে একটি ঘডি। তাতে দুটো বাজে। বাত দুটো। পানেব আসব তখনও জমজমাট। সাহেবদেব হাতে মদেব পাত্র। পিছনেব দেযালে দেখা যাচ্ছে একটি ছবি। জাহাজেব। এই পানেব আসবেব নীচে বাবান্দাব বেলিং-এব গাযে বযেছে বড সাইনবোর্ড। তাতে ইংবেজিতে লেখা 'কাব টেগোব অ্যাণ্ড কোং'। দ্বাবকানাথ ঠাকুবেব

ব্যবসাব উদ্যোগেব কথা মনে পড়ে আমাদেব। দ্বাবকানাথেব প্রত্যাশা ছিল ব্রিটিশদেব সহযোগিতায বাণিজ্য কবা, ব্যবসাব ক্ষেত্রে তাঁব নিজেব উদ্যোগেব পবিচিতি প্রতিষ্ঠা কবা, এবং ভাবতবর্ষেবও অর্থনৈতিক পবিস্থিতিব প্রতিষ্ঠা কবা, এবং ভাবতবর্ষেবও অর্থনৈতিক পবিস্থিতিব উন্নতি বিধান কবে ব্যবসা ক্ষেত্রে তাকে স্বাবলম্বী কবে তোলা। কিন্তু একটা সময়ে এসে তাঁব মোহভঙ্গ হযেছিল। বুঝেছিলেন, ব্রিটিশবা শোযণ কবতেই এসেছে, ভাবতবর্ষেব উন্নতিবিধান তাঁদেব উদ্দেশ্য নয। কৃষ্ণ কৃপালনী তাঁব দ্বাবকানাথেব জীবনীগ্রন্থে এ সম্পর্কে তাঁব উক্তি উদ্ধৃত কবেছেন "(British had) taken all which the natives possessed their lives, liberty and property and all were held at the mercy of the government"

এই ছবিতে 'আবব্য বজনী' ও ঠাকুববাড়িব দুটি দৃশ্যেব পাবস্পবিক কৌণিক উপস্থাপনাব মধ্য দিযে অবনীন্দ্রনাথ এই দুটি আখ্যানেব মধ্যে প্রতিসাম্য স্থাপনের চেষ্টা কবেছেন। পবোক্ষভাবে ঔপনিবেশিকতাব সমালোচনাই তাঁব এই ছবিব উদ্দেশ্য। আব শিবকুমাব অবনীন্দ্রনাথেব 'আবব্যবজনী'-ব উপব এক আলোচনায (নন্দন, সংখ্যা ১৯, ১৯৯৯। এই অংশটিতে তাঁব সেই আলোচনাকেই অনুসবণ কবা হল) এই ছবিব বিস্তৃত বিশ্লেষণ কবে মন্তব্য কবেছেন, "The Colonial visitors like the hunchback of the Arabian Nights who changed the vicissitudes of the tailor and his wife are shown governing the destiny of their native host The two images then function like a Baroque Concerto or mutual counterpoints"

এই একটি ছবি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা কবা হল, ১৯০৫-এব সেই স্বদেশি আবহমণ্ডল ১৯৩০-এ এসে নান্দনিকতা ও প্রতিবাদী চেতনাব কোন গভীব স্তবকে স্পর্শ কবেছে অবনীন্দ্রনাথেব ক্ষেত্রে, এটা বোঝাতে। স্বদেশচেতনাব এও এক বিশ্বগত উত্তবণ।

অবনীন্দ্রনাথের পব দ্বিতীয যে শিল্পী আবও গভীবভাবে স্বদেশিচেতনায উদ্বুদ্ধ ছিলেন তিনি নন্দলাল বসু। নন্দলালেব মধ্যে স্বদেশচেতনা সম্পর্কে কোনও আপস ছিল না। এ কথা ঠিকই তাঁব প্রথম পর্যাযেব কিছু ছবি পুনরুজ্জীবনবাদ ও হিন্দু সাম্প্রদাযিক মানসিকতায ক্লিষ্ট। ১৯০৭-এব 'সতী' ছবিটি এব অন্যতম দৃষ্টান্ত। কিন্তু ববীন্দ্রনাথেব সংস্পর্শে এসে ১৯১৬-ব পব থেকে, বিশেযত তাঁব শান্তিনিকেতন পর্বে, তিনি সংকীর্ণ স্বদেশকে অতিক্রম কবে বৃহত্তব এক বিশ্বগত মূল্যবোধকে তুলে ধবতে পেবেছিলেন। ১৯২১ থেকে ১৯২৫-এব মধ্যে কবা তাঁব ছবিগুলি যদি আমবা লক্ষ কবি, তাহলে দেখা যায পুবাণকল্পমূলক বিযযেব পাশাপাশি প্রাধান্য পাচ্ছে নিসর্গ বচনা, যে নিসর্গে তাঁব দেখাশোনা চাবপাশেব পবিমণ্ডলই গুরুত্ব পাচ্ছে বেশি। ১৯২৪ সালে ববীন্দ্রনাথেব সঙ্গে তিনি বার্মা, মালয, চিন ও জাপান ভ্রমণ কবেন। জাপানেব সঙ্গে আমাদেব চিত্রকলাব আধুনিকতায একটা আদানপ্রদানেব সম্পর্ক ছিল অবনীন্দ্রনাথেব প্রথম পর্বেব সময থেকেই। নন্দলালও এই সংযোগেব সাক্ষী ছিলেন। তবু ১৯২৪-এ চিন ও জাপানেব প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে তাঁব অভিজ্ঞতা অনেক সমৃদ্ধ হয। এখানকাব চিত্রভাবনাব অন্তর্গত যে আধ্যাত্মিকতাব বোধ, সীমাব মধ্যে অসীমেব অনুবণন উপলব্ধি আহ্বান তাঁকে গভীবভাবে অনুপ্রাণিত কবে। পববর্তীকালে জীবনেব শেষ সময পর্যন্ত অঙ্কিত নিসর্গমালায এই

প্রেবণার স্পর্শ আছে। স্বদেশেব সত্তাবই শ্রেষ্ঠ এক পবিচয ধবা আছে ১৯৩৭-১৯৩৮-এ কবা হবিপুবা পোস্টাব নামে অভিহিত ছবিগুলিতে। মহাত্মা গান্ধিব সঙ্গে নন্দলালেব সংযোগ ভাবতীয বাজনীতি শিল্পেব মধ্যে এক আদান প্রদানেব সম্পর্ক তৈবি কবেছিল। গান্ধিব আহ্বানে কবা হবিপুবা পোস্টাবেব ছবিগুলিতে নন্দলাল শিল্পেব স্বদেশকে লৌকিক জীবনেব গভীব থেকে উৎসাবিত কবলেন।

নব্য-ভাবতীয বীতিব দ্বিতীয প্রজন্মেব শিল্পীদেব মধ্যে নন্দলাল বসুব পবেই উল্লেখযোগ্য অসিতকুমাব হালদাব, সুবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদাব, মহিশূবেব কে ভেঙ্কটাপ্পা, শৈলেন্দ্রনাথ দে, সমবেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আবদুব বহমান চুঘতাই (১৮৯৭-১৯৭৫) প্রমুখ শিল্পী। নব্য-ভাবতীয আঙ্গিক নানা শাখা-প্রশাখায বিস্তৃত হয তাঁদেব কাজেব মধ্য দিযে। এই লেখাব সীমিত পবিসবে তাঁদেব কাজেব বিস্তৃত আলোচনায় যাওযা সম্ভব নয। ১৯২৬ সালে কলকাতাব গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে পার্সি ব্রাউনের অধ্যক্ষতাকালে চিত্রকলা শিক্ষায দুটি ভাগ হযে যায . ফাইন আর্ট ও ইন্ডিযান পেইন্টিং। ফাইন আর্ট বিভাগে পাশ্চাত্য বীতিতে শিক্ষা চলতে থাকে। এব দাযিত্বে থাকেন সেই সমযেব উপাধ্যক্ষ যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায। আব 'ইণ্ডিযান পেইন্টিং' বিভাগে চলতে থাকে শুধুই ভাবতীয় বীতিব শিক্ষা। এই বিভাগটি এখনও সক্রিয। কলকাতাব গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ ছাড়া অন্য কোনও শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলাদা কবে ভাবতীয বীতি শেখানো হয না। এটা ভালো কি খারাপ, এ নিযে অনেক বিতর্ক আছে। একটি বিশেষ আঙ্গিকের চর্চাকে যে সজীব বাখা হচ্ছে, এতে তো ক্ষতি কিছু নেই। অনেক শিল্পীই ভারতীয বীতিব এই ভিত্তি থেকে আধুনিকতাব নতুন দিক উন্মীলিত কবেছেন।

১৯১৫ সালে জোড়াসাঁকোব ঠাকুববাড়িতে ববীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ও আর্থিক সহাযতায় গড়ে উঠেছিল 'বিচিত্রা সভা'। নব্য-ভাবতীয বীতিব ভিন্ন এক প্রসাবেব সূচনা এখান থেকে। ববীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই শিল্পেব এই স্বদেশ চেতনাকে উৎসাহিত কবেছেন। তাঁবই প্রেবণা ছিল অবনীন্দ্রনাথেব স্বদেশি আঙ্গিকেব সূচনাব পিছনে। হ্যাভেল যখন আর্ট স্কুল থেকে বিদেশি শিল্পসম্ভাব সবিযে নিচ্ছিলেন, তাঁকেও সমর্থন কবেছেন তিনি। তাবপব ১৯১৪-১৫ নাগাদ তাঁব মনে হতে থাকে জীবনবিচ্ছিন্ন গতানুগতিকতায পর্যবসিত হচ্ছে নব্য-ভাবতীয ধাবাব আঙ্গিক। তখন এতে নতুন জীবন সঞ্চাবেব উদ্দেশ্যেই 'বিচিত্রা'-র আযোজন। 'বিচিত্রা'-য শুধু ছবি নয, শিল্পেব নানা দিক নিযেই পবীক্ষা-নিবীক্ষাব উদ্যোগ ছিল। কিন্তু সে উদ্যোগও বেশি দূর এগোল না। ১৯১৭ সাল নাগাদ বন্ধ কবে দিতে হল 'বিচিত্রা'। এবপব শান্তিনিকেতনে তিনি শুরু কবলেন নতুন উদ্যোগ। ১৯১৯ সালে 'বিশ্বভাবতী' প্রতিষ্ঠাব সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল 'কলাভবন'-ও। প্রথমে অসিতকুমাব হালদাব, তাবপব ১৯২০ সাল থেকে নন্দলালকে দেওযা হল কলাভবনে শিক্ষাব পবিপূর্ণ দাযিত্ব। নব্য-ভাবতীয ধাবাব পববর্তী বিবর্তনে 'কলাভবনে'ব ভূমিকা অবিস্মবণীয।

'কলাভবনে'ব প্রথম পর্যাযেব ছাত্রদেব মধ্যে পববর্তীকালে বিশেষ অবদান বাখেন হীবাচাঁদ দুগাব, অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায (১৯০২-৬৪), কৃষ্ণপদ আব ওযাবিযাব, ধীবেনকৃষ্ণ দেববর্মা (১৯০৩), বমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯০২-৫৫), বিনোদবিহাবী মুখোপাধ্যায (১৯০৪-৮০),

মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (১৮৯৮-১৯৬৮), সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায (১৮৯৬-১৯৭৭), গুজবাটেব কনু দেশাই (১৯০৭-৮০) প্রমুখ। কিন্তু স্বদেশ ও বিশ্বেব সমন্বযেব মধ্য দিযে শিল্পের আত্মপবিচযেব যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন কবতে চেযেছিলেন ববীন্দ্রনাথ, তাঁব নিজেব ছবি যে প্রযাসের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত, সেটা ঘটতে পেবেছিল নন্দলালেব পব বিনোদবিহাবী মুখোপাধ্যাযেব ছবিতে। বিনোদবিহাবীকে সবাসবি নব্য-ভাবতীয ঘবানাব শিল্পী বলা যায না। কিন্তু নব্য-ভাবতীয ঘবানা যে আদর্শ সৃষ্টি কবতে চেযেছিল, অর্থাৎ শিল্পেব বিশ্ব উন্মীলিত হবে স্বদেশেব প্রবহমান ঐতিহ্যেব শিকড় থেকে, সেই আদর্শেব শ্রেষ্ঠ স্ফুবণ ঘটেছিল ১৯৪০-এব দশকেব শিল্পীদেব ক্ষেত্রে বিনোদবিহাবী মুখোপাধ্যাযেব মধ্যে। ভাবতীয লৌকিক, মধ্যযুগীয অণুচিত্রেব জগৎ এবং দূবপ্রাচ্যেব সমৃদ্ধ উত্তবাধিকারকে বিনোদবিহাবী আত্মস্থ কবেছিলেন তাঁব গভীব মনন ও পাণ্ডিত্য দিযে। পাশ্চাত্য আধুনিকতার সূক্ষ্ম সারাৎসাবকেও মিশিযেছিলেন তাব সঙ্গে। এই সমন্বযেব ভিতব দিযে গড়ে তুলেছিলেন নিজস্ব এক আধুনিকতাব আঙ্গিক। শিল্পেব সামাজিক দাযবদ্ধতা ও বাজনৈতিক চেতনারও দীপ্ত এক পবিচয বেখেছিলেন তিনি। শান্তিনিকেতনেব হিন্দি ভবনে কবা তাঁব ম্যুবাল 'মধ্যযুগেব সন্তবা' এবই অনবদ্য দৃষ্টান্ত।

নব্য-ভাবতীয ঘবানার আদর্শেব ভিন্নমুখী প্রকাশ আমবা দেখি অপব তিনজন শিল্পীব মধ্যে। তাঁবা হলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮), সুনয়নী দেবী (চট্টোপাধ্যায) (১৮৭৫-১৯৬২) ও যামিনী বায় (১৮৮৯-১৯৭২)। গগনেন্দ্রনাথ নব্য-ভাবতীয ঘরানাব সংগঠনেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু শিল্প আঙ্গিকেব দিক থেকে তিনি ছিলেন একেবাবেই স্বতন্ত্র। এই ঘবানাব গতানুগতিকতা ও সীমাবদ্ধতাগুলি তাঁব চিত্রচর্চায কখনোই প্রশ্রয পাযনি। একদিকে যেমন তিনি জাপানি বীতিকে আত্মস্থ কবেন, তেমনি পাশ্চাত্য আধুনিকতাব আঙ্গিককে তিনিই প্রথম আমাদের আধুনিকতায সমন্বিত কবতে চেষ্টা কবেন। তাঁর নিজের বাড়িব স্থাপত্যে আলো-ছাযাব সংঘাতেব জ্যামিতিকে তিনি কিউবিজমেব বিশ্লেষণাত্মক বিন্যাসেব অনুষঙ্গে যেভাবে রূপাযিত কবেন, সেটাও স্বদেশ-বিশ্ব সমন্বযেব এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত। পাবিপার্শ্বিক বাস্তবতাকে ছবিব বিষয কবে তোলেন তিনিই প্রথম। সমাজ সমালোচনামূলক প্রতিবাদী আবহ নব্য-ভাবতীয ধাবায প্রায ছিল না বললেই চলে। গগনেন্দ্রনাথ তাঁব ব্যঙ্গচিত্রেব মধ্য দিযে এই ধাবাব প্রবর্তন কবেন। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনে যে তীব্র প্রতিবাদী চেতনা জেগে উঠেছিল, নব্য-ভাবতীয ধাবায তাব প্রকাশ একান্ত বিবল। গগনেন্দ্রনাথই এটা শুরু কবেছিলেন। ১৯৪০-এব দশকে এই প্রতিবাদীচেতনা আরও পবিব্যাপ্ত হযেছে।

সুনযনী দেবী ঠাকুববাড়িব পাবিবাবিক পবিবেশ থেকেই চিত্রকলায উদ্বুদ্ধ হযেছেন। তাঁব নাবী চেতনাব গভীব থেকে উৎসাবিত প্রবহমান লৌকিক পবম্পবাব ভিত্তিতে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁব ছবি। লৌকিকেব উৎসাবণে তাঁব অবদান তাই অবিস্মবণীয।

যামিনী বায প্রথম জীবনে পাশ্চাত্য স্বাভাবিকতাব বীতিতে দক্ষ শিল্পী ছিলেন। কিন্তু আত্মপবিচয অর্জনে এই আঙ্গিককে অপ্রতুল মনে হযেছে তাঁব। নব্য-ভাবতীয বীতিতেও তিনি সমাধান খুঁজে পাননি। ঐতিহ্যগত লৌকিকেব সঙ্গে পাশ্চাত্য আধুনিকতাব সাবাৎসারকে

মিলিযে তিনি গডে তুললেন নিজস্ব আঙ্গিক। স্বদেশ-চেতনাব বিস্তাবে তা গভীবভাবে তাৎপর্যময হযে উঠেছে।

নব্য-ভাবতীয চিত্রধাবাব প্রভাব বাংলা থেকে সাবা ভাবতে ছডিযে পডেছিল প্রথমত ইণ্ডিযান সোসাইটি অব ওবিযেন্টাল আর্ট-এব প্রদর্শনীব মধ্য দিযে, দ্বিতীযত অবনীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনে নন্দলালেব শিষ্যপবম্পবাব ভিতব দিযে। অসিতকুমাব হালদাব লখনৌ আর্ট স্কুলেব অধ্যক্ষ হযেছিলেন। সমবেন্দ্রনাথ গুপ্ত নিযেছিলেন লাহোবেব সবকাবি আর্ট স্কুলেব অধ্যক্ষেব দাযিত্বভাব ১৯১৪ সালে। এছাড়া ভেঙ্কটাপ্পা, ববিশঙ্কব বাভাল (১৮৯২-১৯৭৭), মনীষী দে (১৯০৬-৬৬), ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদাব, সাবদা উকিল (১৮৯০-১৯৪০), দেবীপ্রসাদ বাযচৌধুবী (১৮৯৯-১৯৭৫) প্রমুখ শিল্পীও ভাবতেব বিভিন্ন অঞ্চলে এই চিত্রবীতি প্রসাবিত কবেন। ১৯৫০ সালে ববোদাব মহাবাজ সযাজিবাও বিশ্ববিদ্যালযে শুরু হয শিল্পশিক্ষাব নতুন ধাবা। শান্তিনিকেতনেব কযেকজন প্রাক্তন ছাত্র যেমন শঙ্খ চৌধুবী, কে জি সুব্রামনিযন, সেখানে শিক্ষক হিসেবে যুক্ত হন। এন এস বেন্দ্রেও শান্তিনিকেতনেব আদর্শেব প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁদেব মাধ্যমে ঐতিহ্যগত স্বদেশচেতনা সেখানেও প্রসাবিত হয আধুনিকতাব বিশেষ এক মাত্রা হিসেবে। শিল্পেব স্বদেশচেতনা এভাবেই বাংলা থেকে সাবা ভাবতে প্রসাবিত হযেছিল। এজন্যই নব্য-বঙ্গীয ধাবাকে নব্য-ভাবতীয ধাবা নামে অভিহিত কবাকেই অনেকে যুক্তিসঙ্গত মনে কবেন।

ভাস্কর্যে এই ধাবাব প্রকাশ তত ব্যাপক নয। আমাদেব ভাস্কর্যে আধুনিকতাব সূচনা হতে পেবেছিল ১৯৩০-এব দশকেব মাঝামাঝি সময থেকে বামকিঙ্কবেব (১৯০৬-১৯৮০) হাতে। শান্তিনিকেতন ও ববীন্দ্রনাথেব আদর্শ বামকিঙ্কবকে উদ্বুদ্ধ কবেছিল। দেশেব চৈতন্যেব গভীবে যে লৌকিক ও আদিমতাব ঐতিহ্য জন্মসূত্রেই তাব সঙ্গে সংযোগ ছিল বামকিঙ্কবেব আব শান্তিনিকেতনে শিক্ষাসূত্রে তিনি আত্মস্থ কবেছিলেন পাশ্চাত্যেব উত্তবাধিকাব। এই দুইযেব সমন্বযে তিনি গডে তুলেছিলেন আধুনিক ভাবতীয ভাস্কর্যেব বিশিষ্ট রূপচেতনা।

ভাস্কর্যে স্বদেশচেতনাব দ্বিতীয এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রূপকাব মীবা মুখোপাধ্যায। ইন্ডিযান সোসাইটি অব ওবিযেন্টাল আর্টেই তাঁব প্রাথমিক শিল্পশিক্ষা। কিন্তু সেখান থেকে তিনি বিশেষ কিছু পাননি। জার্মানিতে গিযেছিলেন ভাস্কর্য শিখতে। পবে দেশে ফিবে এসে আদিম উপজাতীয শিল্পী কাবিগবদেব নিজস্ব ভাস্কর্যেব প্রকবণ দ্বাবা উদ্বুদ্ধ হন। সেই প্রকবণ আযত্ত কবে নিজেব ভাস্কর্যেব আঙ্গিক তৈবি কবেন। ধ্রুপদী সংগীত ও লৌকিক জীবনেব স্পন্দনকে মিলিযে গডে তোলেন ভাস্কর্যেব আধুনিক রূপ, যেখানে স্বদেশেব রূপচেতনা আন্তর্জাতিক বিস্তাব পেযেছে। আমাদেব স্বদেশচেতনাব যে নান্দনিকতা, তা এই বিস্তাবেই পৌঁছাতে চেযেছিল।

নব্য-ভাবতীয ধাবাব সীমাবদ্ধতাগুলি সম্পর্কে সচেতন হযেছিল ১৯৪০-এব দশকে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত শিল্পীবা। এবই প্রতিবোধে তাঁবা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ কবেছিলেন ববীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সুনযনী দেবী, যামিনী বায ও অমৃতা শেব গিলেব নান্দনিক আদর্শ। দেশ-কাল বিধৃত বাস্তবতাকে রূপ দিতে তাঁবা আত্মস্থ কবতে চেযেছেন পাশ্চাত্য আধুনিকতাব অর্জনকে।

কিন্তু লৌকিককে তাঁবা যেভাবে গ্রহণ করেছেন, তাতে নব্য-ভাবতীয় ধাবাব স্বদেশ-চেতনাব এক পবোক্ষ প্রতিফলন এসে গেছে তাঁদেব মধ্যেও। এম এফ হুসেন, হেব্বাব, শ্রীনিবাসুলু বা সুনীলমাধব সেন প্রমুখ শিল্পী যেভাবে দেশীয ঐতিহ্যেব দিকে তাকিযেছেন ঐতিহ্যেব নির্মাণে, তাতে নব্য-ভাবতীয় ধাবাব সদর্থক দিকেব প্রভাবকে অস্বীকাব কবা যায না।

১৯৫০ ও ১৯৬০ দশকেব শিল্পীবা আবাব নতুন মাত্রায আবিষ্কাব কবেছেন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বা নব্যভাবতীয় ঘবানাব শিল্পীদেব স্বদেশচেতনাব তাৎপর্য। সেই ভিত্তিব উপবই তাঁবা মিলিযেছেন পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে। গণেশ পাইন, শ্যামল দত্ত বায, সনৎ কব বা লালুপ্রসাদ সাউ প্রমুখ শিল্পী যে ৰূপ নির্মাণ কবেছেন, তা প্রবহমান ঐতিহ্য ও আবিশ্ব আধুনিকতাব সমন্বযেই গড়া। তাঁদেব সমন্বিত ৰূপকল্পেব মধ্যে আমাদেব স্বদেশ-সঞ্জাত আধুনিকতাব যে আত্মপবিচয, তাতে নব্য-ভাবতীয় আদর্শেব কিছু সাবাৎসাব বযেই গেছে। আমাদেব শিল্পেব স্বদেশ চেতনা আজ পর্যন্ত এভাবেই বিস্তৃত হযেছে।

তথ্য-সূত্র ও সহাযক উৎস

১ প্রশান্তকুমাব পাল। ববিজীবনী। পঞ্চম খণ্ড। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৯০

২ পার্টিশন অব বেঙ্গল। সিগনিফিক্যাট সাইনপোস্টস, ১৯০৫-১৯১১। নিত্যপ্রিয ঘোষ ও অশোক কুমাব মুখোপাধ্যায সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ। ২০০৫

৩ স্মবণকুমাব আচার্য। ভাঙা বাংলাব পাঁচালি। শিশু সাহিত্য সংসদ। ২০০৫

৪ সুমিত সবকাব। মর্ডান ইন্ডিযা। ১৮৮৫-১৯৪৭। ম্যাকমিলান ইন্ডিযা লিমিটেড। ১৯৮৩/১৯৮৫।

৫ অমলেশ ত্রিপাঠী। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাবতেব জাতীয কংগ্রেস, (১৮৮৫-১৯৪৭)। আনন্দ পাবলিশার্স।

৬ পার্থ মিত্র। আর্ট অ্যান্ড ন্যাশনালিজম ইন কলোনিযাল ইন্ডিযা। ১৮৫০-১৯২২। কেমব্রিজ।

৭ তপতি গুহ ঠাকুবতা। দ্য মেকিং অব আ নিউ 'ইন্ডিযান' আর্ট। ১৮৫০-১৯২০। কেমব্রিজ।

৮ শোভন সোম। গেরুযাব গৈবিকীকবণ। সানন্দা। জুলাই, ২০০৩।

৯ আব শিবকুমাব। অবনীন্দ্রনাথস অ্যাবাবিযান নাইটস নেটিভ ফ্ল্যানাবি অ্যান্ড অ্যান্টি কলোনিযাল ন্যাবেশন। নন্দন। সংখ্যা ১৯, ১৯৯৯।

১০ মৃণাল ঘোষ। বিংশ শতকে ভাবতেব চিত্রকলা আধুনিকতাব বিবর্তন। প্রতিক্ষণ। ২০০৫।

বাংলার লোকসংস্কৃতিতে জাতীয়তাবোধ

দিব্যজ্যোতি মজুমদাব

ইতিহাসেব এক বিশেয সন্ধিক্ষণে একটি দেশেব কিংবা দেশেব খণ্ডিত ভৌগোলিক অংশেব মানুষেব জীবনে ভাব-তবঙ্গেব অভিঘাত এমন উদ্দীপনাময পবিবেশ সৃষ্টি কবে যাতে সেই দেশেব সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংহতি ভাবনার ক্ষেত্রে নবজীবনেব সূত্রপাত ঘটে। জাতীযতাবোধ ও আত্মানুসন্ধান এসবেব প্রেক্ষাপটে সক্রিয থাকে অবশ্যই, কিন্তু সেই জাতীযতাবোধ ক্ষুদ্রতায আচ্ছন্ন নয, নিজেদেব সংস্কৃতিব নবজীবন ঘটিযেও সে বিপুলা পৃথিবীব বর্ণময সংস্কৃতিকেও আত্মীয কবে তুলতে পাবে।

পবাধীন পববশ উপনিবেশ ভাবতবর্ষেব পূর্বাঞ্চলে বাংলায প্রথম ব্যাপকভাবে জাতীয চেতনা ও জাতীযতাবোধেব উন্মেষ ঘটে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব সুবাদে। যদিও উনিশ শতকেব মধ্যভাগে সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহি বিদ্রোহ এবং শতকেব একেবাবে শেযাংশে জাতীয কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সমযকাল থেকে ব্রিটিশ শাসনেব বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশিত হতে থাকে, কিন্তু দুটি সশস্ত্র বিদ্রোহ অল্পকালেব মধ্যে নিভে যাওযাব পরবর্তী সমযে সেসব ক্ষোভ সীমাবদ্ধ ছিল বক্তৃতায,—সেসব ভাযণ যাঁরা দিতেন তাঁবা ছিলেন ইংবেজি শিক্ষিত কিছু নাগরিক উচ্চবিত্ত, শ্রোতাও সেই শ্রেণিবই প্রতিভূ। এঁরা প্রতিবাদও জানাতেন বিদেশি ভাষায। আপামব হাটবাটেব মানুষেব মধ্যে জাতীয চেতনা, দেশভাবনা কিংবা স্বাদেশিকতাব কোনো প্রভাব ছিল না। গ্রামীণ মানুষজন উপনিবেশবাদীদেব অর্থনৈতিক জাঁতাকলে শুধুই আর্তনাদ কবত। সেসব যন্ত্রণাব শব্দ নাগবিক মানুষকে খুব যে বিচলিত কবত এমন তথ্য অপ্রতুল।

বিশ শতকেব প্রথমেই লর্ড কার্জনেব একটি সিদ্ধান্তেব ফলেই বাংলার গ্রামীণ লোকসমাজেব মধ্যে জাতীযতাবোধ সঞ্চাবিত হল। বাঙালিব সামাজিক জীবনে বঙ্গভঙ্গেব প্রস্তাব গোটা জাতিকে ইতিহাসেব সন্ধিক্ষণে মুখোমুখি দাঁড় কবিযে দিল। কযেক শত বৎসব পবে বাংলায সত্যিকাব ভাবাবেগেব বন্যা বযে গেল।

শ্রীচৈতন্যদেব-নিত্যানন্দেব সমন্বযী ধর্মপ্রচাবেব অনেক কাল পবে সপ্তদশ শতকেব শেয দিক থেকে বৈষ্ণব ভাবাবেগ গ্রামীণ বাংলাকে আন্দোলিত কবেছিল যে সমযকালে সামন্ত বাজন্যবর্গ ও বণিক সম্প্রদায বৈষ্ণবধর্মকে গ্রহণ কবলেন। এই দুই শ্রেণী বিশেয ধর্মকে গ্রহণ না কবলে কোনো ধর্মই সাধাবণ মানুষেব মধ্যে প্রচাবিত হতে পাবে না। হিন্দু জৈন-বৌদ্ধ-ইহুদি-খ্রিস্ট-ইসলাম সব ধর্ম সম্পর্কেই এ কথা সত্য। বাংলাব মানুয আবাব উদ্দীপিত হল সার্বিকভাবে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে ধর্মীয ভাবনা নয, বাজনৈতিক চেতনা থেকে উদ্ভূত জাতীযতাবোধ থেকে উৎসাবিত এই সংহতিবোধ। বাঙালিব তাই লর্ড কার্জনেব কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। প্রতিবোধেব ভাযা খুঁজে পেল বাঙালি, প্রথম সম্মিলিত অহিংস প্রতিবাদ।

বঙ্গভঙ্গ বাঙালিব 'অন্নবস্ত্রে হাত দেয নাই, আমাদেব হৃদযে আঘাত কবিযাছিল,'—

বলেছেন ববীন্দ্রনাথ। এই আঘাত হৃদয়ের বলেই জাতীয়তাবোধ উজ্জীবিত হতে পেবেছিল।

সুষ্ঠু 'প্রশাসনেব স্বার্থে' বিস্তৃত এলাকা বিভক্ত কবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন লর্ড কার্জন। তাঁর সিদ্ধান্তে যুক্তি ছিল। স্বাধীন ভারতেও বিশাল রাজ্যকে বিভক্ত কবা হযেছে, বিশাল জেলাকেও ভেঙে অনেক জেলা হযেছে। কিন্তু বিশাল ভৌগোলিক এলাকাব সেদিনেব বাংলাকে বিচ্ছেদ কবার পেছনে কার্জনেব অন্য উপনিবেশবাদী অজুহাত ছিল, তা প্রকাশ পেযেছে ভাবত সবকাবেব স্বরাষ্ট্রসচিব স্যাব হার্বার্ট বিজলেব অভিমতে,—সংযুক্ত বাংলা শক্তিশালী। বিভক্ত বাংলা বিভিন্ন দিকে আকর্ষিত হবে। আমাদেব প্রধান উদ্দেশ্য ব্রিটিশ শাসনের বিবোধী এক সুসংহত শক্তিকে টুক্‌রো করে দুর্বল কবে দেওয়া।

আনন্দেব কথা, সেদিনেব বাঙালি ব্রিটিশেব এই কুৎসিত চক্রান্তকে ধবে ফেলেছিল। জাতীযতাবোধক সচেতনতা ছাড়া এই অনুভব সম্ভব ছিল না।

ইতিহাসেব এসব তথ্য অতি সুপবিচিত।

বাংলায সেদিন জাতীয চেতনা প্রসাবে যে আঙ্গিকটিকে প্রথম ব্যবহাব কবা হযেছিল তা ছিল লোকসংস্কৃতির একটি অতি-পরিচিত আঙ্গিক। কলকাতাব সীমানা অতিক্রম করে গ্রাম-বাংলায যখন বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন দূর-দূবান্তবে ছড়িযে পড়ল তখন সেই ব্যাপকতা সম্ভব হযেছিল লোকসংস্কৃতিকে বাহন কববাব ফলেই। গ্রামীণ লোকসমাজেব প্রাণেব সম্পদকে ঘিবেই সেদিন প্রতিবাদ ধ্বনিত হযেছিল। দ্বিতীয় বিশেষত্ব হল, নাগবিক মুসলমানেরা নানাবিধ কারণে সেদিন এই আন্দোলনে আশানুরূপ সাড়া দেননি। রবীন্দ্রনাথ তীব্র ক্ষোভে সেদিন মন্তব্য কবেছিলেন,—'বাংলাব মুসলমান যে এই বেদনায আমাদেব সঙ্গে এক হয নাই তাহাব কাবণ তাহাদেব সঙ্গে আমবা কোনদিন হৃদযকে এক হইতে দিই নাই।' এ চিত্র গাঁযেব নয।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন যে প্রতিবাদেব মধ্যে শুরু হযেছিল অল্পদিনেই তা নিভে গেল। যে উৎসাহে অবন্ধন, বাখিবন্ধন, গঙ্গাস্নান, হবতাল, নগ্নপদে মিছিল,—শুরু হযেছিল উদ্দীপনা নিয়ে, অল্পদিনেই তাতে ভাটা পড়ল। কিন্তু বাংলাব গ্রামীণ এলাকায যতদিন এই আন্দোলন সক্রিয় ছিল ততদিন গ্রামীণ হিন্দু-মুসলমান সমবেত হযে প্রতিবাদ জানিযেছেন। এ এক ইতিবাচক জাতীয় চেতনাব দৃষ্টান্ত। নগব-মানসিকতা নিযে আমবা বেশি আলোচনা কবি, গাঁযের দিকে দৃষ্টি সরে না। আব এই জাতীয সংহতি সম্ভব হযেছিল প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে লৌকিক সংস্কৃতিকে অগ্রাধিকাব দেওযাব ফলেই।

বঙ্গভঙ্গেব ক্ষত সেদিন আচার্য বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদীকে বিহ্বল কবেছিল, কেননা তিনি প্রাগ্রত পাশ্চাত্য শিক্ষাব আলোকে সঞ্জীবিত হযেও সুস্থ জাতীযতাবোধে উদ্দীপিত ছিলেন। স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর মঙ্গলকামনা এবং দেশপ্রেম সেদিন আচার্যকে অ্যাকাডেমিক জগতেব বাইবে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ কবাব প্রেবণা জুগিযেছিল। আব আজীবন মাটি ও মানুযেব সঙ্গে নিষ্ঠতাব মেলবন্ধনেব সুবাদে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে বেছে নিলেন বাংলাব আবহমান নাবীদেব ব্রতকথা। লিখলেন 'বঙ্গলক্ষ্মীব ব্রতকথা।'

তিনি শুধু 'ব্রতকথা' লিখলেন না, সেটা প্রচাবেব ব্যবস্থা কবলেন নিজেব পবিবাবেব

মধ্যে। বুদ্ধিজীবীবা অনেক সদর্থক কথা প্রচাব কবেন, কিন্তু সে-সব অনুশীলন যেমন তাঁবা কবেন না, পবিবাবেব কাউকেও সে-সব 'মৌখিক আদর্শে' উদ্বুদ্ধ কবেন না। উনিশ-বিশ শতকেব অধিকাংশ বাঙালি বুদ্ধিজীবী এই দর্শনেব স্পর্ধিত ব্যতিক্রম ছিলেন।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদেব দিনে ৩০ আশ্বিন, ১৬ অক্টোবব অপবাহ্নে মুর্শিদাবাদ জেলাব 'জেমো-কান্দি গ্রামেব অর্ধসহস্রাধিক পুবনাবী আমাব মাতৃদেবীব আহ্বানে বাডীব বিষ্ণুমন্দিবেব উঠানে সমবেত হইযাছিলেন, অনুষ্ঠানেব পব আমাব কন্যা শ্রীমতী গিবিজা কর্তৃক এই ব্রতকথা পঠিত হয'।

যে সুস্থ জাতীযতাবোধ ও সাম্প্রদাযিক সংহতি এই ব্রতকথায লোকসাংস্কৃতিক আঙ্গিকে সেদিন প্রকাশ কবা হযেছিল তা বাংলাব লোকসংস্কৃতিতে জাতীযতাবোধেব অঙ্কুব বোপণ কবেছিল।

ব্রতকথাব প্রস্তাবনায বলা হল,—'লক্ষ্মী চঞ্চলা, চঞ্চল হযে বাঙলাব লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে চললেন। আঁধাব বাতে কালপেঁচা ডেকে উঠল। তখন সাত কোটি বাঙালী কেঁদে উঠল। বাজাব দোযে লক্ষ্মী আমাদেব ছেডে চললেন বলে বাজাব দোয দিযে সকলে কেঁদে উঠল। ইংবেজ বাজা সেই কাঁদন শুনে বিবক্ত হলেন। ইংবেজ বাজাব তখন একটা ছোকরা নাযেব ছিল, সে আপন দেশে ছিল কেবাণী, হযে এসেছিল নাযেব। নাযেবী পেযে সে ধবাকে সবা জ্ঞান কবত। আলমগির বাদশাব তক্তে বসে সে আপনাকে আলমগিবেব নাতি ঠাওবাত। সে বললে, এবা বড় ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করছে, যাক্, এদেব দু-দল করে দিচ্ছি, এক দিকে যাক মোছলমান, এক দিকে থাক হিঁদু। এবা ভাই-ভাই একঠাঁই থেকে বড় বিবক্ত কবছে, এদেব ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই কবে দাও, এদেব জোট ভেঙ্গে দাও। এই বলে তিনি বাঙালীকে দু-দল কবে দিলেন। লক্ষ্মী দেখলেন, আমি বাঙলাব লক্ষ্মী,—আব আমাব নিতান্তই বাঙলায থাকা চলল না। আমাব হিঁদু যেমন, মোছলমান তেমনি। হিঁদু-মোছলমান যখন ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হল, তখন আব আমাব বাঙলায থাকা চলল না।

১৩১২ সাল, আশ্বিন মাসেব তিবিশে, সোমবাব, কৃষ্ণপক্ষেব তৃতীযা, সে-দিন বড দুর্দিন সেই দিন বাজাব হুকুমে বাঙলা দু-ভাগ হবে।'

সেদিন বাংলাব পুবনাবীবা ব্রত পালন কবলেন। প্রতিজ্ঞা কবলেন, আমবা এখন থেকে মানুযেব মতো হব। আমবা হিন্দু-মুসলমান এক-ঠাঁই হব,—আমবা আন্তবিকভাবে বলছি,—

ভাই-ভাই একঠাঁই।
ভেদ নাই ভেদ নাই।

এ দিন অবন্ধন। বঙ্গেব গৃহিণীগণ দেবসেবা-বোগীসেবা ও শিশুব সেবা ছাডা অন্য উপলক্ষে ঘবে উনুন জ্বালাবেন্ না। প্রতি বছব আশ্বিনে বঙ্গবিভাগেব দিনে এই ব্রত পালন কবতে হবে, যতদিন না ইংবেজ সবকাব বঙ্গবিভাগ বাতিল কবে।

সেই পবাধীন ভাবতে বাংলায এই জাতীয চেতনা ছডিযে পডেছিল গ্রামীণ এলাকায। বোধহয জাতীয চেতনাব প্রথম উজ্জীবনী মানসিকতা।

জাতীয চেতনা ও জাতীযতাবোধ বিযযটি আলোচনার সময মনে বাখতে হবে, এ

শ্রেণির মানুষ এই জাতীয়তাবোধকে কী কুৎসিত তাৎপর্যে ব্যবহার করেছে। এই বোধকে তারা বিপর্যয়কর অমানবিকতায় নামিয়ে এনেছিল, এবং তা ঘটেছিল এই বিশ শতকের প্রথমার্ধেই। সেই ঢেউ ভারতীয় জনজীবনকেও কলুষিত করেছিল,—বিদ্বেষ আর সংকীর্ণতা এই জাতীয়তাবোধের উৎসে ছিল বলেই সাম্প্রদায়িক হানাহানির ইন্ধন জুগিয়েছিল। আর নাগরিক মানুষকে প্রভাবিত করলেও লোকসংস্কৃতির সুস্থ পরিবেশে যাঁরা ছিলেন সেই গ্রামীণ মানুষ কিন্তু ঐতিহ্যলালিত সংস্কৃতির বর্মে সে-সব প্রতিহত করেছিলেন। সে দৃষ্টান্ত রয়ে গিয়েছে বাংলার গ্রামীণ এলাকায়।

বিশ শতকের আগে জাতীয়তাবোধ ছিল দেশপ্রেমের অন্য নাম। কিন্তু বিশেষ এক দর্শন তাকে কীভাবে কলুষিত করেছিল তার সুলুক সন্ধান নিলে আতঙ্কিত হতে হয়। জাতীয়তাবোধের সুস্থ দর্শনকে প্রথম বিকৃত করে ইতালির মুসোলিনি ও জার্মানির হিটলার, আর তাদের পরম সুহৃদ ছিল জাপানের তোজো। এই তিন দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা লোকসংস্কৃতির মহান ঐতিহ্যকেও ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা ও অমানবিকতার পাঁকে নিমজ্জিত করেছিলেন। তবে সাময়িকভাবে, কয়েক বছর।

এই তিন দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা জানতেন কিংবা তাঁদের উপদেষ্টারা পরামর্শ দিয়েছিলেন,—লোকসংস্কৃতি এমনই এক সজীব মাধ্যম, যে মাধ্যমের সাহায্যে গ্রামীণ মানুষের কাছে পৌঁছনো যায়। অমানবিক বীভৎস দর্শনকে সাধারণ হাটবাটের মানুষের মধ্যে প্রচারিত করতে হলেও লোকসংস্কৃতিকে ব্যবহার করতে হবে। ইতিহাসের কী বিচিত্র গতি। জাতিদম্ভে যারা সমগ্র বিশ্বকে পদানত করতে চায়, নিজের দেশের মানুষ ছাড়া যারা বিশ্বের জাতিসমূহকে আধা-মানুষ জ্ঞান করে, তারাই বিশ শতকের তিরিশের দশকে সমগ্র ইতালি-জার্মানি-জাপানের বিদ্যালয়-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসংস্কৃতি অধ্যয়নের ব্যাপক ব্যবস্থা করে। কিন্তু সেসব প্রভাব ছিল অল্প কিছুদিনের, লোকসমাজ সঠিক সময়ে সেসব আরোপিত দর্শনকে পরিত্যাগ করে স্বমহিমায় উজ্জীবিত হয়েছে, ঐতিহ্যের পরম্পরাকে বহমান রেখেছে। সুখের বিষয়, ভারতে উপনিবেশবাদী ব্রিটিশ শাসক কিন্তু ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে এই বিষাক্ত মানসিকতার আমদানি করেনি, বোধহয় সর্বাধিক শোষণ-যন্ত্র কায়েম করেও ব্রিটিশ ঐতিহ্য-অনুসরণে লোকসংস্কৃতিকে রেহাই দিয়েছিল। আমরা কৃতজ্ঞ।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ব্যাপক আন্দোলনের জন্যই হোক, কিংবা অন্যবিধ কারণেই হোক, অল্প কিছুকাল পরে এ বিষয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য করেনি ব্রিটিশ শাসক। আমরাও আমাদের জাতীয় স্বভাব অনুযায়ী নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলাম,—জীবন আবার বয়ে চলল আগের মতোই। তারপরে ছয় বছর পরে রাজধানী উত্তরভারতে চলে গেলে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল। যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটেছিল, ছড়িয়ে পড়েছিল তা আবার স্তিমিত হতে হতে নিস্পন্দ হয়ে গেল।

বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ঘোষিত হওয়ার দশ বছর পরে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এলেন গান্ধিজি। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করা গেল। তিনিই প্রথম ভারতীয় রাজনীতিবিদ যিনি রাজনৈতিক দেশাত্মবোধক-জাতীয়তা বোধক

চেতনাকে নাগবিক পরিমণ্ডল ছাড়িযে সমস্ত দেশেব গ্রামীণ এলাকায ছড়িযে দিতে পেবেছিলেন। আব বাজনৈতিক প্রচাবেব পাশাপাশি মাদকদ্রব্য বর্জন, খদ্দব প্রচাব ও হরিজন আন্দোলন প্রভৃতি সমাজ-হিতকব কর্মকাণ্ডেব সুবাদে দবিদ্র লোকসমাজেব মধ্যেও নতুন উৎসাহ সৃষ্টি কবলেন।

গান্ধিজিব সামাজিক আন্দোলনেব প্রভাবে আমাদেব গ্রামীণ শিল্পীসমাজও উদ্বুদ্ধ হযে অন্যাযেব বিরুদ্ধে যেমন প্রতিবাদমুখব হওযাব মানবিক সাহস অর্জন কবল, তেমনি দেশ ও স্বশক্তিব প্রতি কর্তব্যপবাযণ হযে জাতীয চেতনায সমৃদ্ধ হল।

চাবণকবি মুকুন্দ দাস প্রথাগত লোকসংস্কৃতিব শিল্পী ছিলেন না, কিন্তু লোকসংগীত-কবিগান-তবজা প্রভৃতিব আঙ্গিককে ব্যবহাব কবে নগব-গ্রামেব লক্ষ লক্ষ মানুষকে কীভাবে জাতীয চেতনায উজ্জীবিত কবেছিলেন তাব ইতিহাস আজ সুবিদিত।

বিশ শতকেব বাংলা বঙ্গমঞ্চে প্রখ্যাত নাট্যকাব-গীতিকাব বাংলাব বাউল, ঝুমুব, গম্ভীবা, গাজন, টুসু, ভাদু, ব্রত-পার্বণ, পাঁচালি, পিব, কবি, প্রভাতী, টহলদাবি, দববেশি, ফকিবি, গাজি, ভাওযাইযা, চটকা, ভাটিযালি, সাবি প্রভৃতি লোকসংগীতেব সুবে নতুন কথা যুক্ত কবে জাতীয চেতনায জোযাব এনেছিলেন।

নাটকেব এসব গানে লৌকিক সুব আজও অমব হযে আছে।

১ বাউল সুব

আমি মাবেব সাগব পড়ি দেব (মুক্তধাবা, ১৯২২) ববীন্দ্রনাথ
লক্ষ্মী যখন আসবে তখন (যোগাযোগ, ১৯৩৬) ববীন্দ্রনাথ
আমি ভাই খ্যাপা বাউল (চবিত্রহীন, ১৯৩৬) নজরুল ইসলাম
মিছে মন মাযায ভুলে (কেদাব বায ১৯৩৬) রমেশ গোস্বামী।

২ ঝুমুব সুব

কে দিল খোঁপাতে ধুতুবা ফুল লো (মহুযা, ১৯২৯) নজরুল ইসলাম
মহুল গাছে ফুল ফুটেছে (মহুযা, ১৯২৯) নজরুল ইসলাম
মহুযা মদ খেযে যেন বুনো মেযে (দেবী দুর্গা, ১৯২৯) নজরুল ইসলাম
চৈতি বাতেব চাঁদ যেও না (সর্বহাবা, ১৯৩৬) নজরুল ইসলাম।

৩ গাজনেব গান

বড় প্যাঁচে পড়েছে এবাব ভোলা দিগম্বব (যোড়শী, ১৯২৭) যোগেশচন্দ্র চৌধুবী
বৌ নিতে এসেছে এবাব আপনি মহেশ্বব (যোড়শী, ১৯২৭) যোগেশচন্দ্র চৌধুবী

৪ পিবেব গান

আপনি বাঁচলে তো বাপেব নাম (নবান্ন, ১৯৪৪) বিজন ভট্টাচার্য

৫ চটকা গান

ওমা প্যাঁচা যদি খ্যাঁচ খ্যাঁচায (ব্লাক আউট, ১৯৪১) নজরুল ইসলাম

৬ ভাটিযালি গান

ভালবাসি—ও কন্যা (প্লাবন, ১৯৪১) মনোজ বসু

৭ সাবি গান

কোন অজানা দেশেব লাগি (জাতিচ্যুত, ১৯২৮) শবৎচন্দ্র ঘোষ।

গত শতকের চাবেব ও পাঁচেব দশকে ভাবতেব কমিউনিস্ট পার্টিব প্রত্যক্ষ অনুপ্রেবণায ভাবতীয গণনাট্য সংঘ লোকসংস্কৃতিব সুস্থ ঐতিহ্যকে শুধুমাত্র গণসংগীত ও নাটকে ব্যবহাব কবেনি, গ্রামীণ শিল্পীদেব গণনাট্যেব সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিযে লোকশিল্পীদেব দেশপ্রেম, সাম্রাজ্যবাদ বিবোধিতা, জাতীয চেতনা, সাম্প্রদাযিক সম্প্রীতি-সংহতিব মহান ব্রতেও শামিল কবেছিল।

তুলসীদাস লাহিড়ী (দুঃখীব ইমান ১৯৪৬, ছেঁড়া তাব, ১৯৫০,) বিজন ভট্টাচার্য (নবান্ন ১৯৪৪, জীযনকন্যা ১৯৪৭) প্রমুখেব লোকসংগীতেব সুবেব নাট্যগান আমাদেব সাংস্কৃতিক উত্তবাধিকাবেব বিশিষ্ট অঙ্গ হ্যে বযেছে।

এই সমযকালেই নাগবিক সংস্কৃতিব সঙ্গে গ্রামীণ লোকসমাজেব সংস্কৃতিব মেলবন্ধন ঘটাবাব প্রচেষ্টা শুরু হয। একদিকে যেমন জাতীয কংগ্রেসেব বাৎসবিক সম্মেলনে গ্রামীণ সংস্কৃতি ও কুটিব শিল্পেব প্রদর্শনী হত, তেমনি আবাব হবেন ঘোষেব মতো ইম্‌প্রেসাবিও পুরুলিযাব ছৌ নাচকে সম্মানিত কবেন নাগবিক বলযে প্রদর্শনেব মাধ্যমে। ভাবতীয গণনাট্য সংঘ তাঁদেব সম্মেলনে কবিযাল গুমানি দেওযান, লম্বোদব চক্রবর্তী, গুরুদাস পাল প্রমুখকে পবিচিত কবান। বাউল ভাটিযালি সাবি ঝুমুব গানেব শিল্পীদেবও ব্যাপক ক্ষেত্রে উপস্থিত কবান। এসবই জাগ্রত জাতীয চেতনাব সোনালি ফসল।

ইতিহাসেব নজিব বযেছে, জাতীয চেতনা ও জাতীযতাবোধ সাধাবণ হাটবাটেব মানুষকেও প্রতিবাদী কবে তোলে। এই প্রতিবাদ সবসময হযতো প্রতিবোধে রূপ পাযনি, কিন্তু শোষণ ও যন্ত্রণাকে লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে প্রকাশ কবেছেন।

লোকসংস্কৃতিব মধ্যেও আবহমানকাল ধবে প্রতিবাদেব কথা বযেছে, কিন্তু সবই রূপক কিংবা প্রতীকেব মাধ্যমে। শোষকশ্রেণিব বিরুদ্ধে লোককথায এব সবচেযে বেশি দৃষ্টান্ত আছে। টুনটুনি পাখি দুর্বলেব প্রতিনিধি, সে বাববাব বাজাকে পর্যুদস্ত কবছে। বাস্তব অবস্থায এইসব মহাশক্তিধব সমাজ-প্রভুদেব বিরুদ্ধে যখন কিছু কবাব উপায নেই, তখন লোককথাব মাধ্যমে তাদেব শাস্তি দিযে ইচ্ছাপূবণেব তাগিদ অনুভব কবেছে। সিংহ ও খবগোশ আব একটি অনন্য উদাহবণ।

কিন্তু জাতীয চেতনাব প্রভাবে অত্যাচাবিতেব বিরুদ্ধে সবাসবি প্রতিবাদ জানানো শুরু হল,—দেশপ্রেমেব ছোঁযায মানসিক সাহস ও সংঘবদ্ধতাব মনোভাব প্রকাশ্য প্রতিবাদে অনুপ্রাণিত কবল লৌকিক সমাজকে।

মালদহেব গম্ভীবা পালাগান এই ক্ষেত্রে সবচেযে সাহসিক ভূমিকা পালন। সমাজেব ভ্রষ্টাচাবী খ্যাতিমান মানুষদেব বিরুদ্ধে গম্ভীবা যেমন সোচ্চাব হযেছে, তেমনি ব্রিটিশ শাসনেব মানবতাবিবোধ কার্যকলাপেবও বিরুদ্ধে দাঁড়িযে প্রশাসনিক শাস্তি ভোগ কবেছে। গত শতকেব তিবিশেব দশকে সংগ্রামী জিতু সাঁওতালেব মহান আত্মত্যাগেব কথা স্মবণ কবে ব্রিটিশ বিবোধী গম্ভীবা গান বচিত হযেছে।

সাম্প্রদাযিক ভিত্তিতে ভাবতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত কবাব চক্রান্ত চলছে। শেষ মুহূর্তে স্বাধীনতা লাভেব সমযকালে গম্ভীবা শিল্পীদেব কাছেও বিষযটি সুস্পষ্ট হযে ওঠে এবং তাঁদেব স্বভাবসিদ্ধ লঘু ভঙ্গিতে যন্ত্রণাব কথাও প্রকাশ পেযেছে,—

বাপ্‌বে বাপ্‌ জান বাঁচান হল দায,
শেযানে শেযানে কোলাকুলি
নলখাগড়াব প্রাণ যায
জান বাঁচান হল দায।

ধন্য ব্রিটিশ বাজেব চাল
ও যে কবলে নাজেহাল
শ্যাযে মাথাব ঘাযে
পাগল হয্যা
উডা জাহাজে হাওযা যায
বাপ্‌বে বাপ্‌ জান বাঁচান হল দায।

চার্চিল ছদ্মেবই বেশে
(ও সে) অট্টালিকাতে বসে
চপ্‌ কাট্‌লেট্‌ চুযে
এটালিকে ফেব কেটলি বানাযা
সেই জলেতে চাহা খায, বাপ্‌বে।

মানভূমেব বাংলাভাষী মানুষজন বিহাবে অন্তর্ভুক্ত থাকাব সমযে মাতৃভাষাব স্বপক্ষে, বাংলাভাষী এলাকাব সঙ্গে যুক্ত থাকাব দাবিতে টুসু গান বেঁধেছে, এসব গানে জাতীয চেতনাব স্পষ্ট ইঙ্গিত বযেছে।

দেশেব মানুষ ছাড়িস যদি
ভাষাব চিব অধিকাব,
দেশেব শাসন অচল হবে
ঘটবে দেশে অনাচাব।

উনিশ শতকে সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সিপাহি বিদ্রোহেব পব থেকেই ব্রিটিশ প্রশাসকেবা ভাবত বাজ্য শাসনে যেমন তৎপব হল, তেমনিভাবে বিশাল অবণ্য এলাকাব অধিকাবও কাযেম কবল। অবণ্য-সম্পদকে নিজেদেব অধিকাবে আনতে তৎপব হওযাব পেছনে গভীব অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল। আদিবাসীদেব আবহমানকালেব অবণ্যেব অধিকাব চলে গেল। বীবভূম, মানভূম, ঝাড়গ্রাম এলাকা, বিহাব সংলগ্ন বনাঞ্চল প্রভৃতিব আদিবাসী মানুষ বঞ্চনাব শিকাব হলেন। তাঁবা প্রতিবাদ কবলেন তাঁদেব লোককথা ও সংগীতে। বিদেশি ব্যবসাযী ও প্রশাসকেবা তাদেব ভাষায লোভী শকুন, ধূর্ত দাঁডকাক ও উদ্ধত মযূব। একদিকে ভয,

অন্যদিকে সীমাহীন ঘৃণা। বেদনার্ত কান্না ছাড়া গতি নেই,—এবাই তাদেব মাটি-ফসল-বনভূমির দখল নিযেছে—ওদের লোভে আজ তাবা ভিটেছাডা, বনছাডা,—আজ তাবা নিঃস্ব।

মুণ্ডাদেব সেই বেদনা ক্ষোভ হযে ঝবে পডেছে একটি গানে

যে কাঁটা রুযেছি এখানে ক্ষেতে ও মাঠে,
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে বিদ্ধ করিছে তাহা,
মোদেব প্রোথিত কন্টক গাছগুলো,
বক্ত ঝবায দ্যাখ কি যাতনা আহা!

উচিত ছিল গো এই কথা আগে জানা,
যে গাছ বোপেছি তাব এই ফল হবে,
বক্ত ঝবিছে রক্ত ঝবিছে দ্যাখো,
এ যাতনা থেকে মুক্তি হবে গো কবে?

একদিকে বিদেশি প্রভু জঙ্গলেব অধিকার কেড়ে নিযেছে, অন্যদিকে জমি থেকে দেশীয জমিদাব মহাজন উচ্ছেদ কবেছে আদিবাসী সাঁওতাল কৃযককে। অনুর্বব ক্ষেতে ক্ষেতমজুবেব কাজও জোটে না, জিনিসেব দাম আগুন, পোডা আকাল দেশকে ছেয়ে ফেলল। তবু জন্মভূমি ছেডে মাটি কাটাব কাজে, বেললাইন পাতাব কাজে, খনি-চা বাগিচায যেতে মন চায না। তবু এবাব বোধহয যেতেই হবে। পুরুলিযাব জঙ্গলমহলেব আদিবাসী মানুয গান বাঁধে—

পোড়া আকাল এল দেশে,
জীবন বাখা হল ভার,
টাকায মেলে তিন পোয়া চাল,
হাট-বাজাবে হাহাকাব।

পেটেব জ্বালা বড় জ্বালা
কেমন করে থাকবে মান,
ঝবিযাতেই চলে যাব
নিতে হবে খাদেব কাম।

আবও দূবে যেতে পাবি
ভিন্ কাজেব সন্ধানে,
বর্ধমানে নামাল কাজে
কিংবা চাযের বাগানে।

শাড়ি দামি গযনা দামি
চডবে তোমাব অঙ্গে,

পিবিত কিন্তু কবতে হবে
হিন্দু ছেলেব সঙ্গে।

এই যন্ত্রণাব চিত্র বিশ শতকেব দ্বিতীয় দশকের।

বাংলার লোকসংস্কৃতিতে সামন্ত সমাজেব শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙালি গ্রামীণ মানুয তাঁদেব লোকসংস্কৃতিব মধ্যে দাবিদ্র্য বঞ্চনা শোযণ উৎপীড়ন ও জীবনযুদ্ধেব জ্বালা প্রকাশ কবেছে, কিন্তু সবই ৰূপকেব আডালে। ৰূপকেব আড়ালে জীবনেব কথা। কিন্তু বিশ শতকেব প্রথম দশক থেকে জাতীযতাবোধেব সঞ্চাবে এইসব ভাবনা প্রকাশেব ক্ষেত্রে অন্য মাত্রা পেল। লোকসমাজেব বেদনাময় সংগ্রামশীল ৰূঢ বাস্তবেব প্রকাশ ঘটল প্রত্যক্ষভাবে। যে গ্রাম ছিল দূরেব, যে গ্রামীণ মানুযেব সঙ্গে সংযোগ ছিল বিবিক্ত,—ইংরেজ শাসনে সেসব দূবত্ব সংকুচিত হযে এল, একাত্মতাবোধ প্রবল হল। আব তখনই জাতীয চেতনায লোকসংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশ অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও মানবিক হযে উঠল। এখানেই বাংলাব লোকসংস্কৃতি ও জাতীযতাবোধেব অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। এবং নিঃসন্দেহে সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক,—এই সম্পর্কই আমাদেব অভিপ্রেত।

'স্বদেশী' প্রচারের ভাষা আর হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বদেশি আন্দোলনের যুগে বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ হল, আবার ওই আন্দোলনের সূত্রেই বাঙালি সমাজে হিন্দু-মুসলমান ভেদ শুধু প্রকট নয়, হিংসাত্মক হয়ে উঠল। যা ছিল বিবাদ-বিরোধ বা ঝগড়া-কাজিযা, তা-ই এবার পুরো-দস্তুর দাঙ্গার চেহারা পেয়ে গেল। বস্তুত বাঙলায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সূচনা হয় স্বদেশি যুগেই। আন্দোলনের পরিণতি কেন এমন দাঁড়াল, সে-বিষয়ে একটি সুপ্রচলিত মত হল স্বদেশি প্রচারের ভাষা হিন্দু ধর্মচেতনায় পরিপৃক্ত হয়ে গিয়েছিল। হিন্দুধর্মের নানা প্রতীক, রূপক আর বাক্‌প্রতিমায় চিত্রিত এই ভাষা মুসলমানদের আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। স্বদেশি আন্দোলন কার্যত হয়ে দাঁড়ায় বাঙালি হিন্দুর আন্দোলন।

সুমিত সরকার এবং রফিউদ্দিন আহমেদের অনবদ্য গ্রন্থদুটি[১] খুঁটিয়ে পড়লে অবশ্য বোঝা যায়, এই ব্যাখ্যানে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দ্বন্দ্ব-জটিলতা পুরো ধরা পড়ে না। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম পর্বে নেতাদের মধ্যেও বেশ কয়েকজন ছিলেন মুসলমান। গজনভী, আবদুর রসুল, আবুল হুসেন, লিয়াকত হুসেন প্রমুখ নামগুলির সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। স্বদেশি আন্দোলনের পরও লিয়াকত হুসেন 'বন্দে মাতরম' গান গেয়ে বেড়াতেন। দুই সম্প্রদায়ের মিলনের জন্য স্বদেশি নেতারা নানা ধরনের প্রযাস চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সুমিত সরকারের গ্রন্থে (পৃ ৪১২-৪২৩) তার বিশদ আলোচনা আছে। আমরাও অন্তত দুটি পুলিশ ফাইল দেখেছি, যেখানে বলা হচ্ছে হিন্দু-নেতারা মুসলমানদের সঙ্গে পাওয়ার জন্য 'বিশেষ প্রযাস' করেছেন, কোনও-কোনও নেতা মুসলমানদের 'প্রশস্তি' পর্যন্ত করছেন।[২]

অন্যদিকে রফিউদ্দিন আহমেদের গ্রন্থ (পৃ ১৭১-৭৮) থেকে জানতে পারি, উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই গ্রামাঞ্চলের বাতাবরণ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। গো-রক্ষাবাহিনীর জঙ্গি অভিযানের পাশাপাশি ছিল আঞ্জুমান সংগঠনগুলির হিন্দু-বিরোধী প্রচার। আজকের ভাষায় আমরা যাকে 'সাম্প্রদায়িকতা' বলি, তার বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করে এইভাবে। স্বদেশি যুগে (১৯০৬) মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এবং তার পরের বছর পূর্ববঙ্গে কয়েকটি দাঙ্গাহাঙ্গামার পর, সেই বীজ বিকশিত হবার উর্বর ক্ষেত্র পেয়ে যায়।

এর কারণ হিসাবে একটি ব্যাখ্যানে বলা হয়ে থাকে, সে-আমলে বাঙলায় জমিদাররা ছিলেন প্রধানত হিন্দু, আর মুসলমানদের অধিকাংশই দরিদ্র কৃষক। হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গার ভেতর দিয়ে কৃষকের এক ধরনের শ্রেণিবিদ্বেষের বিস্ফোরণ ঘটছিল। মার্কসবাদীরা এই ব্যাখ্যানটি পছন্দ করেন, কারণ তাহলে শ্রেণির দৃষ্টিকোণ থেকেই সমস্যাটাকে বিচার করে ফেলা যায়। বিশ শতকের প্রথম দিকে সংকলিত জেলা গেজেটিযারগুলি থেকে অবশ্য দেখা যায়, বগুড়া-

যশোহব-বাজশাহী-দিনাজপুবেব মতো জেলায জমিদাবদেব মধ্যে মুসলমানও কম ছিলেন না। আবাব জমিদাব মুসলমানবাই যে কেবল বঙ্গভঙ্গ সমর্থন কবেছিলেন, তা-ও বলা যাবে না। ২৩ জুলাই, ১৯০৫ বগুডায বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত একটি সমাবেশে সভাপতিত্ব কবেছিলেন জমিদাব হাফিজুল বহমান চৌধুবী। পবেব দিন 'দ্য স্টেট্সম্যান' পত্রিকায সংবাদটি প্রকাশিত হয। অন্যদিকে অন্তত একজন হিন্দু—বাঙলায কোবানেব অনুবাদক গিবীশচন্দ্র সেন—বঙ্গভঙ্গ সমর্থন কবেছিলেন। তাঁব মনে হযেছিল, 'এতদ্দ্বাবা পশ্চাৎপদ, অনুন্নত ও নানাভাবে অভাবগ্রস্ত পূর্ব্ববঙ্গেব বিশেষ কল্যাণ ও উন্নতি হইবে।'[৮]

জমিদাব-কৃষক শ্রেণিসম্পর্ক দিযে স্বদেশি যুগেব বাঙলায হিন্দু-মুসলমানেব বিবোধকে পুবো ব্যাখ্যা কবা যায বলে মনে হয না। বাঙলাব কৃষকসমাজ বলতে তখন কেবল মুসলমানদেবই বোঝাত না। তাঁদেব পাশাপাশি ছিলেন মধ্য এবং নিম্নবর্ণেব হিন্দুবাও। তাঁদেব প্রতিক্রিযা কেমন ছিল, আমবা খুব বেশি জানাব সুযোগ পাই না, কাবণ স্বদেশি আন্দোলন কৃষকদেব স্তব পর্যন্ত পৌঁছযনি। নেতাদেব দিক থেকে তেমন চেষ্টাও হযতো ছিল না। তবে শহিদ স্মবণে বচিত একাধিক লোকগীতিব সাক্ষ্য থেকে মনে হয, গ্রামেব সাধাবণ মানুযও এই আন্দোলনেব অনুভাবে আলোডিত হযেছিলেন। উচ্চবর্ণ হিন্দু-সমাজ যাদেব কোনও মর্যাদাই দেযনি, সেই বেদে-বাজিকবদেব মুখেও পবে তাবাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায শুনতে পান 'একবাব বিদায দে মা' গানটি। তবে নমশূদ্রবা বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনে যোগ দেননি, এটা ঘটনা।

সুমিত সবকাবেব গ্রন্থে পডি, মুসলমান জমিদাববা তাঁদেব নিজেদেব স্বার্থেই মুসলমান চাযিদেব তাতিযে তুলছিলেন (পৃ ৪৪৩-৪৪), আবাব দাঙ্গাহাঙ্গামাব সুযোগ নিযে হিন্দু চাযিবা লুঠ কবেছিল হিন্দু জমিদাব মহাজনেব সম্পত্তিও (পৃ ৪৫৯)। এবই পাশাপাশি ছিল মোল্লা-মৌলবিদেব প্রচাব এবাব ঢাকাব নবাবেব বাজত্ব কাযেম হতে চলেছে। মুসলমানবা এখন হিন্দু-বিধবাদেব নিকা, এমনকী ধর্ষণ পর্যন্ত কবতে পাবে (পৃ ৪৪৬, ৪৫৩-৫৬)। দাঙ্গাব সময হিন্দু-নাবীদেব ধর্ষণেব চেষ্টাও হযেছিল (পৃ ৪৪৮)। পুলিন দাসও তাঁব আত্মজীবনীতে এ-বকম একটি ঘটনাব কথা উল্লেখ কবেছেন। বাঙালি মুসলমান পত্রিকা 'ইসলাম প্রচাবক'ও ওই জাতীয প্রচাবেব তীব্র নিন্দা কবে লেখে ` একদল 'ভণ্ড মৌলবী. এই বলিযা (মুসলমানদেব) উত্তেজিত কবিতেছে যে, তোমবা হিন্দুব গৃহ লুণ্ঠন কব, হিন্দু বিধবাদিগকে নিকা কব, হিন্দু বমণীব সতীত্ব নাশ কব।'

সাম্প্রদাযিকতাব সংক্রাম থেকে হিন্দু স্বদেশিবাও মুক্ত ছিলেন না। কুমিল্লা এবং মযমনসিংহেব দাঙ্গায অনুশীলন সমিতিব কিছু সদস্য যোগ দেয; এব ফলে হিন্দুদেব কাছে সমিতিব জনপ্রিযতা খুব বেডে যায। লিখেছেন প্রখ্যাত অনুশীলন নেতা প্রতুল গাঙ্গুলি।' কুমিল্লা দাঙ্গাব পব ব্রাহ্মণবাডিযাব কবি কামিনী ভট্টাচার্য লেখেন এই গানটি 'আপনাব মান বাখিতে জননী, আপনি কৃপাণ ধব গো'। জননীব কৃপাণেব লক্ষ্য এখানে বিদেশি শাসক নয, অপব সম্প্রদায। পবে অবশ্য এই প্রাসঙ্গিকতা অতিক্রম কবে ওই গান একটি জনপ্রিয দেশাত্মবোধক সংগীতে পবিণত হযেছিল।

স্বদেশি যুগেব সময থেকেই হিন্দু-মুসলমান বিবোধ কেন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষেব দিকে চলে গেল—তার বহুবিধ কাবণ আছে। কোনও-একটা সহজ সমীকবণ দিযে প্রশ্নটাব নিষ্পত্তি কবা যায না। সুমিত সবকাব এবং বফিউদ্দিন আহমেদেব গ্রন্থে বিষযটি নিযে গভীব বিশ্লেষণী আলোচনা আছে। আমবা এখানে একটা প্রশ্নই একটু পুনবির্বেচনা কবে দেখতে পাবি স্বদেশি প্রচাবে হিন্দুভাবেব প্রাধান্য কেমন এবং কতখানি ছিল? ধর্মাশ্রযী স্বদেশচেতনা কি কেবল হিন্দুদেবই চবিত্রলক্ষণ?

প্রচাবেব ভাষা বিচাব কবতে হলে সভাসমিতিতে নেতাদেব ভাষণ, প্রচাবপত্র এবং পুস্তিকা, গান-কবিতা-সবই ধবতে হয়। তবে ভাষণের মুদ্রিত বযান সব পাওযা যায না। আমাদেব তাই নির্ভব কবতে হবে প্রচাবপত্র এবং গান-কবিতাব মতো মুদ্রিত সাক্ষ্যের ওপব।

এটা অনস্বীকার্য যে, স্বদেশি প্রচাবেব ভাষা অনেকটাই ছিল হিন্দু ধর্মাশ্রিত। দেশকে জননী এবং দেবীরূপে কল্পনা কবা হযেছিল। কবিতা-গানে চণ্ডী, অসুব, মঙ্গলঘট, যজ্ঞ, ভবানী, মুণ্ডমালা ইত্যাদি শব্দেব ব্যবহাবেও হিন্দু ধর্মানুষঙ্গ জড়িত হযে ছিল; কযেকটি উদাহবণ।[৬]

গান বা কবিতা

> 'দণ্ড দিতে চণ্ডমুণ্ডে, এসো চণ্ডী যুগান্তবে।'
> 'না হইতে বোধন মাগো, ভাঙ্গিল বাক্ষস মঙ্গলঘট।',
> 'আজি মাগো খুলে বাখ মণিময হাব, গলে পব নবমুণ্ডমালা।',
> 'শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোবা, অভযাচবণে নত্রশিব,
> শত্রুবক্তে মাযের তর্পণ জবাব বদলে ছিন্নশিব।'

'যুগান্তব' পত্রিকাব বচনাংশ

"একবাব চোখেব ঠুলি খুলিযা মাযেব অভযপদ দেখ দেখি, বুঝিতে পাবিবে এ ইংবেজ বাজত্ব একটা প্রকাণ্ড মাযাপুবী।

হে অর্জুন, ক্লীবেব মত আচবণ কবিও না। হৃদযেব তুচ্ছ কাতবভাব পবিত্যাগ কবিযা শত্রুনিপীডকরূপে যুদ্ধার্থে উত্থান কব।"

অববিন্দ ঘোষেব 'ভবানী মন্দিব' পুস্তিকা

"জাতি বলিতে কী বুঝায? . লক্ষ দেবতাব সমবাযে ও সম্মিলনে যেমন ভবানী মহিষমর্দ্দিনী সৃষ্টি হইযাছিলেন, ইহাও সেইরূপ শক্তি। আমবা এই শক্তিকে বলি 'ভবানী ভাবতী'।"

'সোনার বাঙ্গলা' গোপন ইস্তেহাব

'মৃত্যুববণেব জন্য তৈবি হও। . অসুবেব বক্ত দিযে মাযেব পূজা কবে অক্ষয স্বর্গলাভ কব।'

এবকম উদাহবণ আবও অনেক দেওযা যায। মুসলমানদেব অভিযোগ ছিল, দেশকে জননীরূপে কল্পনা কবতে তাঁবা অভ্যস্ত নন, দেবীরূপে গ্রহণ কবাও তাঁদেব পক্ষে সম্ভব

নয়, কারণ ওই মানসরচনে পৌত্তলিকতার বীজ রয়ে গেছে। সাম্প্রতিক একটি গ্রন্থে[৭] রেজাউল করিমের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে অবশ্য দেখানো হয়েছে, দেশকে জননীরূপে কল্পনা সম্পূর্ণ অনৈস্লামিক নয়, আরবি ভাষায় এরকম নমুনা পাওয়া যায়। দেবী-ভাবনায় অবশ্য মুসলমান সমাজের আপত্তি থাকতেই পারে। 'বন্দে মাতরম' গানটি নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় শুধু আনন্দমঠ উপন্যাসের যবনবিদ্বেষের জন্যই নয়, পৌত্তলিকতার কারণেও। স্বদেশি যুগের অনেক পরে মুজফ্‌ফর আহমদের মতো অগ্রণী মার্কসবাদীও প্রশ্নটিকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন। 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গ্রন্থে (পৃ ৯) মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছেন, তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হননি, কারণ 'কোন মুসলিম ছেলের পক্ষে' বাহুতে তুমি মা শক্তি ইত্যাদি গান গাওয়া সম্ভব নয়।

মুসলমানদের দিক থেকে এই বক্তব্য অসংগত বলা যায় না। অন্যদিকে স্বদেশি প্রচারের ভাষায় হিন্দু-ধর্মানুষঙ্গ এসে যাওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। আমরা জানি, উনিশ শতকের শেষ দিকে যে-জাতীয়তাবাদের জন্ম হল, তার সঙ্গে হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ববাদ বা হিন্দু পুনরুজ্জীবন-প্রয়াস নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল। ঠিক তেমনি মুসলিম স্বাতন্ত্র্যচেতনার ভেতরেও মিশে গিয়েছিল বিশ্ব ইসলামবাদের আদর্শ। স্বদেশি যুগের কিছু আগেই মুসলমানরা তুরস্কের সাহায্যের জন্য চাঁদা তুলেছিলেন এবং তুর্কি সম্রাটকে নন্দিত করেছিলেন 'মোস্লেমকুলের ভূষণ' বলে।[৮] ১৯২০-র দশকে মওলানা আকরম খান সম্পাদিত 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকার কিছু সংখ্যা আমরা দেখেছি। সেখানে তুরস্ক, পারস্য ইত্যাদি দেশের ইতিহাস-পুরাণ নিয়ে নিয়মিত লেখা থাকত।

একদিক থেকে সেটাই স্বাভাবিক। সংস্কৃতি গড়ে ওঠে কিছু ঐতিহাসিক-পৌরাণিক ভাবানুষঙ্গ, ধর্মীয় প্রতীক-রূপকল্প আর সামাজিক প্রথা-প্রচলকে অবলম্বন করে। রাজনীতির ভাবাদর্শেও এই ধর্মাশ্রিত সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটবে, ধরে নেওয়া যায়। সে আমলে রাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিযুক্ত করে ভাবা হত না। আজ আমরা যাকে সেকুলার রাজনীতি বলি—সেই ধারণা স্বদেশি যুগের পটভূমিতে আরোপ করতে গেলে একটা কালানৌচিত্য দোষ ঘটে যাবে মনে হয়।

জাতীয়তাবাদী চেতনায় হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ কেন মিশে গেল, তার উত্তরও এখান থেকে পাওয়া যেতে পারে। একটা পরাধীন দেশে জাতীয়তাবাদের আদর্শ গঠন করতে গেলে অতীত ইতিহাস, অতীত মহিমার ঐতিহ্যকে অবলম্বন করতেই হয়। ১৮৬০/৭০-র দশক থেকে এই চেতনানির্মাণের কাজটা শুরু হয়েছিল—প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের ভেতর দিয়ে। স্বদেশকে তখন আমরা নতুন করে আবিষ্কার করছিলাম এবং রোমাঞ্চিত হয়ে গেয়ে উঠছিলাম 'ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে।' স্বদেশ তখন আমাদের কাছে একটি নির্মিত মূর্তিরূপেই দেখা দিচ্ছে এবং এই মূর্তিনির্মাণের ভেতর দিয়ে গড়ে উঠছে জাতীয়তার ধারণা। শুধু আমাদের দেশে নয়, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশেও এই প্রক্রিয়াটা দেখা গেছে।[৯]

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য বলতে হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ববাদের প্রবক্তারা বুঝতেন হিন্দু-ধর্ম-

সংস্কৃতি। তাঁদেব এই ধাবণা ছিল নিঃসন্দেহে একপেশে। তবে অন্য সম্প্রদাযেব কথাও তাঁবা একেবাবে বিস্মৃত হযে যাননি বা প্রতিটি ক্ষেত্রে অপব সম্প্রদাযেব প্রতি কোনও বিদ্বেষও প্রকাশ কবেননি। যে-হিন্দু সমাজের কথা বলা হচ্ছে, তা যে বহু সম্প্রদাযে বিভক্ত, এই জ্ঞানও তাঁদেব ছিল। উনিশ শতকে 'সোমপ্রকাশ'-এব মতো পত্রিকা তাই বাববাব স্মবণ কবিযে দেয হিন্দু-সমাজেব অন্তর্গত অনৈক্য এবং বৈষম্যেব কথা। অন্যদিকে 'হিন্দুধর্মেব শ্রেষ্ঠতা' প্রতিপন্ন কবতে গিযে বাজনাবাযণ বসু মনে বাখেন 'মুসলমান ও ভাবতবাসী অন্যান্য জাতিব কথা', যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ চান, হিন্দুমেলাব নাম দেওযা হোক জাতীয মেলা, সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায সচেতনভাবে তাঁব সমিতিব নাম বাখেন 'ইন্ডিযান অ্যাসোসিযেশন' বা ভাবতসভা, যাতে তা সর্বভাবতীয় সংগঠন হিসাবে গণ্য হতে পাবে। অন্যদিকে আমীব আলিও 'মহামেডান অ্যাসোসিযেশন' গঠনেব সময 'অমুসলিম সহযাত্রীদেব' কথা ভুলে যাননি, আবদুল লতিফ 'মহামেডান লিটাবেবি সোসাইটি'-ব প্রস্তাবনায হিন্দু-সংস্কৃতির বিভিন্ন 'উৎকৃষ্ট' উপাদানেব কথা উল্লেখ কবেন।[১০] হিন্দু জাতীযতাবাদ বা মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদেব পবিসব সংকীর্ণ হলেও তাকে ঠিক সাম্প্রদাযিক বলা যায না, অন্তত আজ আমবা সাম্প্রদাযিকতা বলতে যা বুঝি, সেই অর্থে নয। দুই সম্প্রদাযেব কাছেই এটা ছিল এক ধবনেব আত্ম-আবিষ্কাবেব প্রযাস। এই প্রযাস অপবাপব সম্প্রদাযেব অস্তিত্বকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা কবেনি।

উনিশ শতকেব এই বহু-আলোচিত অধ্যাযটি ছেড়ে আমবা আবাব স্বদেশি যুগেই ফিবে যাই। হিন্দু ধর্মীয প্রতীক-ৰূপকল্পে সম্পৃক্ত যে-স্বদেশি প্রচাবেব বিষযটি আমবা পুনর্বিবেচনা কবতে চাইছি, সেখানে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদেব প্রভাবে অতীত 'হিন্দুযুগেব' মহিমাকীর্তন, হিন্দু ধর্মানুষঙ্গ, দেশকে দেবীৰূপে কল্পনা—সবই ছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে মুসলমান বিবোধিতাব কোনও পবিচয বিশেষ পাই না। মুসলমানদেব কাছে টানাব আহ্বানই ববং বেশি শুনতে পাই। ১৯০৪ সালে ববিশালেব 'শিবাজী উৎসব' অনুষ্ঠানে অশ্বিনীকুমাব দত্ত বলেন 'মুসলমান ভাইগণ, আজ তোমবা না আসিযা প্রাণে বড কষ্ট দিযাছ।' 'সোনাব বাঙ্গলা' ইস্তেহাবেব একটি সংস্কবণ আব 'বাজা কে'? পুস্তিকাব অনুবাদ আমবা পুলিশ ফাইলে[১১] পেযেছি। 'সোনাব বাঙ্গলা' ইস্তেহাবে বলা হচ্ছে

'ব্রাহ্মণ কাযস্থ শূদ্র চণ্ডাল মুসলমান—যে নিজেকে বঙ্গসন্তান বলে পবিচয দিতে গর্ববোধ কব, সে এগিযে এস। . মুসলমানগণ, মাতা তোমাদেব শক্তিতে অনেক আশা বাখেন। বলবান তোমবা, প্রশস্ত বক্ষ তোমাদেব, সবল বাহুদ্বয, মবণে ভয পেযো না।' (এই আহ্বানে যেন ববীন্দ্রনাথেব 'ভাবততীর্থ' কবিতাবই অনুবণন শুনতে পাই।)

'বাজা কে?' পুস্তিকাব একটি বচনাংশ

'হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃগণ, সাতসমুদ্র তেবোনদী পেবিযে অসুবেব জাত এসে আমাদেব বঙ্গমাতাব অবমাননা কবে যাচ্ছে, আব তোম্‌বা চুপ কবে দেখছ? মাযেব মান বাখতে কেন তোমবা গদা তুলে নিচ্ছ না হাতে?'

মিলন বাগিণীতে বাঁধা এই বকম আবও আহ্বান বা আবেদনেব কথা উল্লেখ কবা

যায। স্বদেশি যুগে প্রকাশিত কযেকটি গীতি-সংকলন আমবা দেখেছি। সেখানে হিন্দু ধর্মাশ্রিত গান কিন্তু তুলনায কমই আছে। যোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা ছদ্মনামে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ 'স্বদেশ সঙ্গীত' নামে যে-সংকলনটি প্রকাশ কবেন (আশ্বিন, ১৩১২ ব), সেখানে তিনি মুসলমানদেব আকৃষ্ট কবাব জন্যে 'মুসলমানি' বাঙলায লেখা তাঁব একটি গান অন্তর্ভুক্ত কবেছিলেন 'এখন মুসলমানেব ইমান কোথা নাছাবাব বাহাব।' সবলা দেবী চৌধুবানী তাঁব 'অতীত গৌববববাহিনী মম বাণী' গানেব ধুযায 'বন্দেমাতবম'-এব সঙ্গে 'আল্লা হো আকবব আব 'সৎশ্রী আকাল'-ও জুড়ে দিযেছিলেন পবে। শিবাজী উৎসব নিযে অ্যান্টি-সার্কুলাব সোসাইটিব মনে দ্বিধা ছিল। সোসাইটি ওই অনুষ্ঠানে যোগদান কবেনি। সুমিত সবকাবেব গ্রন্থে পাই, কোনও-কোনও স্বদেশি নেতা শিবাজী উৎসব-প্রত্যাপাদিত্য উৎসবেব পাশাপাশি আকবব উৎসব পালনেব কথাও ভেবেছিলেন। (পৃ ৩০৪, ৪২২)

হিন্দু ধর্মানুযঙ্গ যে স্বদেশি প্রচাবেব পবিসবকে কিছুটা সংকীর্ণ কবে দিযেছিল, তা অস্বীকাব কবা যায না। ১৯০৭-এব দাঙ্গাব পব দুই পক্ষেবই প্রচাবেব ভাষায সাম্প্রদাযিক বিদ্বেষ আব গোপন থাকেনি, তাও সত্য। আবাব এটাও ঠিক যে, ওই পর্বেই 'প্রবাসী' পত্রিকায (ফাল্গুন ১৩১৩ ব) প্রকাশিত হয বামলাল সবকাবেব একটি প্রবন্ধ 'মুসলমানেব গুণ আব হিন্দুব দোষ'। লেখক মোটামুটি নিবপেক্ষভাবে দুই সম্প্রদাযেবই দোষগুণ নিযে আলোচনা কবেন। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ সংখ্যায কুমিল্লা দাঙ্গা বিষযে উদ্বেগ প্রকাশ কবে একটি প্রবন্ধ লেখেন আবদুল হামিদ খান। অতীত গবিমাব মহিমাকীর্তন বিষযে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁব 'স্বদেশী ধূযা' (প্রবাসী, আষাঢ, ১৩১২ ব) বচনায সতর্ক কবে দেন অতীতেব প্রতি শ্রদ্ধা থাকা ভালো, কিন্তু 'অতীতপূজা ভালো নহে।'

ভালো না হলেও অতীত পূজা কেন একটা পর্বে আমাদেব জাতীযতাবাদী চেতনাকে আচ্ছন্ন কবে ফেলেছিল, স্বদেশি প্রচাবেব ভাষা কেন ধর্মাশ্রিত হযে উঠেছিল তাব কাবণটা আমবা আগেই উল্লেখ কবেছি। বিষযটি বহু আলোচিত। এখানে শুধু এইটুকু লক্ষ কবা যেতে পাবে, ধর্মানুযঙ্গ কেবল হিন্দুদেব বচনাতেই ছিল না, আব ধর্মকে অপব সম্প্রদাযেব প্রতি বিদ্বেষ প্রচাবেব কাজেই কেবল ব্যবহাব কবা হচ্ছিল না। সুমিত সবকাব (পৃ ৪৩৬) দেখিযেছেন, লিযাকত হুসেনেব বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী পুস্তিকাব ভাষাও ছিল ধর্মাশ্রিত। 'সোনাব বাঙ্গলা' ইস্তেহাবেব যে-সংস্কবণটিব কথা আমবা আগে উল্লেখ কবেছি, সেখানেও মুসলমানদেব উদ্বোধিত কবতে চাওযা হযেছিল ইসলামেব অনুযঙ্গ এনে 'একবাব বলো-দ্বীন। দ্বীন। আল্লা হো আকবব।'

দেশপ্রেমেব আবেদনে বা স্বদেশি প্রচাবেব ভাষায ধর্মানুযঙ্গ এসে যাওযাটা খুব বহস্যজনক মনে হয না। সে-আমলে এবং আজও বেশিব ভাগ মানুযই ধর্মে বিশ্বাস কবতেন এবং কবেন। 'সেকুলাবিজম' ভাবতবাষ্ট্রেব ঘোষিত আদর্শ, কিন্তু সাধাবণ মানুষেব অন্তবেব যে-ভাষা, ধর্ম সেখানে ওতপ্রোত হযে আছে। সিডিশন কমিটিব বিপোর্টে পডি (১৯১৮, পৃ ২০), উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায বলছেন 'আমি বুঝেছিলাম, ধর্মেব আবেদন ছাড়া

অন্য কোনভাবে মানুষকে দিয়ে কিছু করানো যাবে না।' —এই উপলব্ধি তাঁর মতো অন্যদের ছিল। তাই গীতা স্পর্শ করে, বুকের রক্ত নিবেদন করে, মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়ে অনুশীলন সমিতির সদস্য হতে হত। এইসব আচার আজ আমাদের অনেকেরই ভালো লাগে না। সে-আমলেও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, হেমচন্দ্র কানুনগো এগুলি পছন্দ করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই জাতীয় প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছিল, কারণ ধর্মকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন একটা রণকৌশল হিসাবে।

এই প্রয়াস কিন্তু পরেও লক্ষ করা গেছে। ১৯২১ সালে 'সাধনা' পত্রিকার (ভাদ্র ১৩২৮ ব) একটি রচনায় কাজি নজরুল ইসলাম মুসলমানদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে চান এই ভাষায়, 'ইসলাম জাগো। মুসলিম জাগো। আল্লাহ্ তোমাদের একমাত্র উপাস্য, কোরআন তোমাদের সেই ধর্মের উপাসনার মহা বাণী—সত্য তোমার ভূষণ। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা তোমার লক্ষ্য—তুমি জাগো।'

পরের বছর তাঁর নিজের পত্রিকা 'ধূমকেতু'-তে (১৬ ভাদ্র ১৩২৯ ব) নজরুল আবার লেখেন

'তোমার কোরআন পদদলিত। তোমার গর্দ্দানে গোলামীর জিঞ্জির। যে শির আল্লার আরশ ছাড়া আর কোথাও নত হয় না, সেই শিরকে জোর করে সেজ্‌দা করাচ্ছে অত্যাচারী শক্তি ... আফসোস মুসলিম, আফসোস।'[১১]

প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত করে নিলে মনে হতে পারে, যেন কোনও সাম্প্রদায়িক প্রচারের ইস্‌তেহার পড়ছি। কিন্তু নজরুল এখানে মুসলমানের ধর্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত করছেন আরও বড়ো একটা ধর্মভাব—দেশপ্রেমকে—উদ্রিক্ত করার জন্য। বারবার আল্লাহ্ বা কোরানের দোহাই দিচ্ছেন, কারণ মুসলমানের চিত্তবিশ্বে এগুলো শুধু এক-একটি শব্দ নয়, প্রতিটি শব্দের ভেতর সংগুপ্ত হয়ে আছে এক গভীর ধর্মবোধ। শব্দ এখানে শুধু ভাবের চিহ্ন নয়, তা আরও গভীরতর এক বোধের রূপক।

মহিষমর্দিনী, অসুরদলনী, শক্তিরূপিনী—এইসব শব্দ বা শব্দবন্ধও শাস্ত্রপুরাণের অনুষঙ্গ জড়িত হয়ে হিন্দুর মনে এক বিশেষ রূপকল্প সৃষ্টি করে এবং তার ধর্মচেতনা আলোড়িত হয়। বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের ভাষা এক হলেও ধর্ম এবং পুরাণের পরম্পরা পৃথক। সেই পার্থক্য ভাষার ভেতরেও প্রতিফলিত হতে বাধ্য। ১৯২৯ সালে একটি সাহিত্য সম্মিলনে এই কথাটাই স্পষ্ট করে বলেছিলেন অধ্যাপক মুহম্মদ শহিদুল্লাহ 'হিন্দুর সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত, গীতা, হিন্দু-ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে। আমাদের (মুসলমানদের) সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন, হাদীস, মুসলিম জীবনী ও মুসলিম ইতিহাস থেকে।'[১২]

যা স্বাভাবিক, তার কথাই নিঃসংকোচে বলছেন অধ্যাপক শহিদুল্লাহ্। এর ভেতর কোনও সাম্প্রদায়িকতা নেই। যে-স্বাতন্ত্র্যের একটা ঐতিহাসিক বা বস্তুগত ভিত্তি আছে, তাকেই শুধু চিহ্নিত করে দিচ্ছেন তিনি। এই উক্তির মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারলে স্বদেশি প্রচারের ভাষাকে আমাদের আর সংকীর্ণ, সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট বা শুধুই হিন্দু ধর্মাশ্রিত বলে

মনে হবে না। 'বন্দে মাতবম' গানটিকেও তখন হযতো আমবা পুনর্বিবেচনা কবে দেখতে পাবব। ওই গানের সঙ্গে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের আপত্তিকব অনুযঙ্গ যেমন আছে, তেমনি আবাব মিশে আছে বহু শহিদেব আত্মবিসর্জনেব স্মৃতিও।

ভাযাকে কখনোই সংস্কৃতি থেকে বিযুক্ত কবে নিযে বিচাব কবা যায না। আব বেশিব ভাগ মানুযেব সংস্কৃতিবোধেই ধর্মচেতনা আজও অন্তর্নিবিষ্ট হযে আছে। এই সংস্কৃতিকে আশ্রয কবে যে ভাযা গড়ে ওঠে, ধর্মীয প্রতীক-ৰূপকল্প এসে যাওযাটা সেখানে প্রায অনিবার্য হযে পড়ে। এই ভাযাকে সংকীর্ণ অর্থে সাম্প্রদাযিক বলা যায না, কাবণ ব্যবহাবেব ভেতব দিযে এবং বিভিন্ন প্রতিবেশেব অনুযঙ্গ যুক্ত হযে এই ভাযা ক্রমে তাব প্রাথমিক ধর্মীয ভাবানুযঙ্গ অতিক্রম কবে পৌঁছে যায এক ভাযাতিবিক্ত (মেটালিংগুইস্টিক) বোধেব স্তবে। শব্দ তখন হযে ওঠে, ভাযাবিজ্ঞানী বয হ্যাবিস যেমন বলেছেন 'কালচাবাল ফ্যাক্ট'।[১৫]

ধর্মনিবপেক্ষ বা নিরীশ্ববাদী ভাবাদর্শে যাঁবা বিশ্বাস কবেন, তাঁদেব বচনাতেও তাই এসে, যায ওইসব প্রতীক, ৰূপক আর চিত্রকল্প—যেমন তা এসেছে বিজন ভট্টাচার্যব নাট্কে, ঋত্বিক ঘটকেব চলচ্চিত্রে, জ্যোতিবিন্দ্র মৈত্রেব গানে। নকশাল আন্দোলনেব যুগেও গাওযা হযেছে 'বলো, কৃষ্ণকে কি আব কংস-কাবায বেঁধে বাখা যায?'

সব শেযে 'আমাব কৈফিয়ত' হিসাবে দু-একটি কথা বলাব আছে। হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনেব মুখে দাঁড়িযে বামপন্থী এবং ধর্মনিবপেক্ষতাবাদীবা এখন নিজেদেব সেকুলাব ভাবমূর্তিটিকে আবও শক্তিশালী কবে তোলাব জন্য বড়োই ব্যগ্র। এই কবতে গিযে এমনসব যুক্তিব অবতাবণা কবা হচ্ছে, যাতে সাম্প্রদাযিক এবং মৌলবাদী শক্তিব হাতেই প্রতি-আক্রমণেব অস্ত্র তুলে দেওযা হচ্ছে বলে আশঙ্কা হয। ভাবতে বিভিন্ন সবকাবি অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালিযে উদ্বোধন কবাব বীতিটিকে সমালোচনা কবা হচ্ছে। আমবা ভুলে যাচ্ছি, ১৪০০ বঙ্গাব্দেব প্রথম দিনে বাংলাদেশে শেখ হাসিনাও প্রদীপ জ্বালিযে নতুন বর্যকে আবাহন কবেছিলেন এবং তাব জন্য তাঁকে সেদেশেব মৌলবাদীবা তীব্র ভাযায আক্রমণ কবে।[১৫]

স্বদেশি প্রচাবেব ভাযাকেই আমরা আলোচনাব বিযয হিসাবে গ্রহণ কবেছি, কাবণ বিযযটি আজও প্রাসঙ্গিক। এই নিযে বিবাদ-বিতর্ক চলছেই। স্বদেশি গানে 'চণ্ডী' বা দুর্গাকে বাববাবই আবাহন কবা হযেছে। দুর্গা এখানে শুধু হিন্দু ধর্মেব প্রতীক নন, তিনি শক্তিৰূপিনী মাতা, অনাচাবনাশিনী শক্তি। মাতৃভূমিকে মাতাৰূপে কল্পনা কবাব প্রবণতা ধর্মীয নয, একটি সাংস্কৃতিক প্রচল। বাঙলায মুসলমানবা এক সময কালী, শীতলাব কাছে মানত কবতেন। এখনও কোনও-কোনও অঞ্চলে বক্ষাকালী ইত্যাদি পুজোয মুসলমানবা যোগদান কবেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেযে মৎস্যজীবীবা বনবিবিব পুজো কবেন এবং নৌকা ছাড়াব সময আল্লা এবং পাঁচপিবেব দোহাই দিযে থাকেন। ববীন্দ্রনাথ দশভুজাব ৰূপকল্প নিযে গান লিখতে বাজি হননি। কিন্তু স্বদেশি যুগে এবং তাব পবেও লেখা তাঁব বিভিন্ন গানে দেশকে বাববাবই জননীৰূপে কল্পনা কবা হযেছে। এইসব গানকে নিশ্চযই আমবা হিন্দু ধর্মাশ্রিত বলব না। জননী এখানে কোনও ধর্মেব দেবী নন, তিনি

জীবপালযিত্রী মাতা। দ্বিজেন্দ্রলালেব গানে 'বঙ্গ আমাব, জননী আমাব' আহ্বানেব পবই আছে 'ধাত্রী আমাব'।

হিন্দুধর্ম কেন, কোনও ধর্মেই বর্তমান লেখকেব কোনও আসক্তি নেই। এই প্রসঙ্গগুলি তুলছি এই কাবণে যে, আজকেব সেকুলাব প্রতর্কে একদিকে যেমন মৌলবাদেব সঙ্গে সাম্প্রদাযিকতাবাদকে মিশিযে দেওযা হচ্ছে, অন্যদিকে নানা আবোপিত ধাবণাব ওপব নির্ভব কবে সেকুলাব প্রচাবও ক্রমশ একপেশে এবং বিভ্রান্তিকব হযে উঠছে।

ভাষা মানুষই গডে তোলে তাব সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক প্রচলেব ভেতব দিযে। কোনও হিন্দু যখন 'বিসমিল্লায গলদ' লেখেন, তিনি ইসলামেব কথা মনে বাখেন না। আবাব একজন মুসলমানও অবলীলায লিখে দিতে পাবেন 'শনিব দৃষ্টি' বা 'যমেব বাডি'। [১৯০৭ সালেব সুবাট অধিবেশনে কংগ্রেস বিভক্ত হযে যাবাব পব উল্লসিত ইসলাম প্রচাবক' (৮ম সংখ্যা, ১৩১৪) লিখেছিল, বাইশ বছবেব কংগ্রেস 'যমেব বাডী গিযাছে'।] এইসব শব্দ সহজেই কলমে এসে যায, কাবণ তাদেব আদি ধর্মীয বা পৌবাণিক অনুষঙ্গ ছেডে শব্দগুলি মুখেব ভাষাব বাগ্‌ধাবা বা ইডিযমে পবিণত হযেছে। বাষ্ট্রীয অনুশাসন বা অন্য কোনও প্রচাবেব দ্বাবা এই ভাষাকে নিযন্ত্রণ কবতে চাইলে ভাষাব স্বভাবধর্মটাকেই অস্বীকাব কবা হয।

প্রবীণদেব মুখে শুনেছি, ১৯৪০-এব দশকে বাঙলায যখন মুসলিম লীগেব বাজত্ব— নজরুলেব একটি সুপবিচিত গানেব একটি লাইন বদলে গাওযা হত 'সজীব কবিব গোরস্থান'। এব দ্বাবা শুধু ওই গানটিব প্রতি অবিচাব নয, কাজী নজরুলকেও অপমানিত কবা হযেছিল বলে মনে কবি, বিশেষত সেই নজরুল, যিনি একদিকে প্রাণস্পর্শী শ্যামাসংগীত লিখেছেন, অন্যদিকে খঞ্জব, জিঞ্জিব ইত্যাদি আববি ফাবসি শব্দকে সুন্দবভাবে প্রযোগ কবে বাঙলাভাষাকে সমৃদ্ধ কবেছেন।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সবকাব সিদ্ধান্ত নিযেছেন, প্রাথমিক স্তবেব একটি পাঠ্যবই থেকে ছো বা ছৌ নাচ বিষযে একটি বচনা প্রত্যাহাব কবে নেওযা হবে, কাবণ ছো-নাচেব প্রাবম্ভে গণেশবন্দনাব অনুষ্ঠান থাকে। ধর্মনিবপেক্ষতা প্রমাণেব উগ্র প্রযাসে আমবা প্রায মৌলবাদীদেব কাছাকাছি চলে যাচ্ছি এবং আমাদেব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংকীর্ণ কবে ফেলছি বলে আশঙ্কা হয।

উল্লেখপঞ্জি

১ সুমিত সবকাব, 'স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল', পিপলস্ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৭। বফিউদ্দিন আহমেদ, 'দ্য বেঙ্গলি মুসলিমস্ এ কোযস্ট ফব আইডেন্টিটি', অক্সফোর্ড ১৯৮১।

২ হোম (পল) কনফিডেন্সিযাল ২৫/ ১৯০৬, ২৬৬/১৯০৮।

৩ নবেশচন্দ্র জানা সম্পাদিত 'আত্মকথা' (৪র্থ) গ্রন্থে গিবীশচন্দ্র সেনেব বচনা। অনন্য প্রকাশ, পৃ ১৩৩-৩৪।

৪ মুস্তাফা নূবউল ইসলাম সম্পাদিত 'সামযিকপত্রে জীবন ও জনমত' ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ ২০৩।

৫ প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলি, 'বিপ্লবীব জীবনদর্শন' ববীন্দ্র লাইব্রেবি ১৯৭৬, পৃ ১১৪।

৬ তথ্যসূত্র সহ বিশদ আলোচনা কবেছি আমাব 'অগ্নিযুগেব বাঙলায বিপ্লবীমানস' গ্রন্থেব দ্বিতীয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম অধ্যাযে। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।

৭ অনুবাধা বায, 'ন্যাশনালিজম অ্যাজ পোয়েটিক ডিসকোর্স ইন নাইনটিস্থ সেঞ্চুবি বেঙ্গল,' প্যাপিবাস, ২০০৩, পৃ ১৫।

৮ নূবউল ইসলাম, পৃ ৬, ১৬৭-৬৯।

৯ বিষযটি নিয়ে গভীব বিশ্লেষণী আলোচনা আছে ফ্রান্‌জ ফ্যাননেব 'দ্য বেচেড অফ দি আর্থ' গ্রন্থেব (১৯৬৩) 'অন ন্যাশনাল কালচাব' অধ্যাযে।

১০ তথ্যসূত্রসহ বিশদ আলোচনা পাওযা যাবে স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত সম্পাদিত 'বিশ শতকেব বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি' সংকলনে আমাব বচনায। পুস্তক বিপণি, ২০০০।

১১ হোম (পল) ২৫/১৯০৬, অ্যাপেনডিক্স -সি। [ইংবেজি অনুবাদ থেকে আবাব বাঙলায অনুবাদ কবে নিয়েছি।]

১২ নূবউল ইসলাম, পৃ ১৫৪-৫৬।

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ ৪১৪।

১৪ বয হ্যাবিস, 'ল্যাংগুযেজ, সোস্যুব অ্যান্ড হুিটগেনস্টাইন, ১৯৮৮, পৃ ১২৬।

১৫ দ্য স্টেট্‌সম্যান ৫ মে, ১৯৯৩।

স্বদেশি আন্দোলন ও জমিদার শ্রেণী—দ্বন্দ্বের উৎস ও বিকাশের পর্যালোচনা

অজেযা সরকাব

ইতিহাসেব এক বিশেষ কালপর্বে অর্থনৈতিক সমাজে কোনো আলোড়ন বাজনৈতিক সমাজে বহুস্তবীয় এমনই কোনো প্রতিক্রিযাব জন্ম দিতে পাবে যাব প্রভাবে একটি জাতিগোষ্ঠীব সামগ্রিক জীবনচর্চা ও চর্যায—বাজনৈতিক সক্রিযতায ও সাংস্কৃতিক মননে—গভীব ও দিগ্‌নির্দেশক এক সংকট ও তজ্জনিত দ্বন্দ্বেব আভাস ক্রমশ উন্মোচিত হযে উঠতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে বিশেষত একটি পুবোনো ধাঁচেব ঔপনিবেশিক বাষ্ট্রকাঠামোয সদ্যোজাত জাতীযতাবাদী চেতনা এবং তাব বৃত্তের বাইবে থাকা গোষ্ঠী ও শক্তিব, বিদেশি শাসকেব সঙ্গে সংঘর্ষ ও সমঝোতার জটিলতায পববর্তী কযেক দশকেব ক্রমপবিণতিপ্রাপ্ত জাতীয মুক্তি আন্দোলনেব রূপবেখাও তৈবি হযে যায তাব যাবতীয দ্বন্দ্বেব এই ঐতিহাসিক আবহে। এই সমস্ত উপাদান ও বৈশিষ্ট্যে ভবপুব ১৯০৫-এব বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা ও তাব প্রতিক্রিযায গড়ে ওঠা স্বদেশি আন্দোলন যাকে ভাবতবর্ষেব জাতীয মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায প্রথম সচেতন সংগঠিত বাজনৈতিক সক্রিযতা হিসাবে গণ্য করা যেতে পাবে।

১

রক্ষণশীল কিংবা জাতীযতাবাদী ইতিহাস ভাবনায স্বদেশি আন্দোলনকে বাঙালি জাতির আত্মপবিচয অন্বেষণেব প্রথম পাঠ/ধাপ হিসেবে চিহ্নিত কবে জাতীযতাবাদী বাজনীতির সাফল্য ও ব্যর্থতাব খতিযান এমনই তবতব কবে এগিযে চলে যে সেখানে এই আন্দোলনের অন্দবে সমকালীন বাজনৈতিক শক্তিগুলিব বিন্যাস ও সক্রিযতাব বিশ্লেষণ প্রাযশই অবহেলিত হয। অথচ পূর্ববর্তী একশো বছবে ঔপনিবেশিক ভাবতে বিদেশি শাসকবর্গের সবাসবি হস্তক্ষেপে অর্থনীতিব বিবর্তন বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীগুলিব অবস্থান-ভাবসাম্যে যে আলোড়ন তুলেছিল, প্রশাসনিক নানা পদক্ষেপে সেই আর্থ-সামাজিক ভাবসাম্য সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হওযাব আশঙ্কা দেখা দেওয়ায এক বিশেষ বাজনৈতিক সচলতাব প্রযোজন তখন অনুভূত হয। অবিভক্ত বঙ্গদেশে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক বিন্যাসে যে গোষ্ঠীগুলি এই বাজনৈতিক সচলতার মধ্য দিয়ে চাহিদা পূবণেব বাস্তা খুঁজছিল, নব উন্মেষিত জাতীযতাবাদ তাব আধাব হযে দাঁড়ায।

স্বদেশি আন্দোলনে জডিযে পডা বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও বাজনৈতিক সংগঠন, আন্দোলন অভিমুখেব সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থানকাবী শক্তিসমূহ এবং স্বদেশি আন্দোলনেব বৃত্তেব বাইবে থাকা এক বিশাল অসংগঠিত জনসমাজেব পাবস্পবিক সম্পর্ক ও তাদেব সঙ্গে ব্রিটিশ সবকাবেব আদানপ্রদান লক্ষ কবলে বোঝা যাবে বিংশ শতাব্দীব এই প্রারম্ভিক পর্বে

নব উন্মেষিত জাতীযতাবাদী চেতনাব বিস্তার ও প্রভাব সর্বত্র মোটেই একমাত্রিক ছিল না। অনেকটাই বিক্ষিপ্ত, বহুলাংশে তাৎক্ষণিক এবং একান্তভাবে গোষ্ঠী-স্বার্থনির্ভব এক বাজনৈতিক সচেতনতাব এই আবহে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলন সংগঠিত কবার মধ্য দিযেই এ-দেশে জাতীযতাবাদী বাজনীতিব বযসন্ধিব দোলাচলতা কাটিযে প্রাপ্তবযস্কতায পা বাখা।

স্বদেশি আন্দোলনেব ইতিবৃত্ত বুঝতে একথা মনে রাখা তাই জরুবি যে বঙ্গভঙ্গ বিষযে যাবতীয সবকাবি উদ্যোগ ও তাকে কার্যকবী কবাব ঘোষণা প্রসঙ্গেও বাঙালি জনসমাজেব প্রতিক্রিয়া এক ছিল না। বিদেশি শাসকেব স্বার্থবাহী একটি সবকাবি সিদ্ধান্ত বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীব অর্থনৈতিক ভিত্তিতে কী প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পাবে মূলত তাব হিসেবনিকেশই ছিল স্বদেশি আন্দোলনেব জন্ম, বিস্তাব এবং স্তিমিত হয়ে পড়াব কালগত উপাদান।

ভাবতবর্ষেব কৃষি-অর্থনীতিতে চিবস্থাযী বন্দোবস্ত চালু হওযাব পব থেকেই ব্রিটিশ শাসনেব একটি মজবুত স্তম্ভ হিসাবে বঙ্গদেশে ভূস্বামী সম্প্রদাযেব উত্থান। কিন্তু ঊনবিংশ শতকেব দ্বিতীযার্ধে বিশেষ কবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সবকাবেব কৃষিক্ষেত্রে কিছু অর্থনৈতিক পদক্ষেপে জমিব মালিকানা ও কব-আদায সংক্রান্ত বিষযে ভূস্বামী সম্প্রদাযের একচেটিযা অনর্গল আধিপত্যে কিছুটা বাধা আসে। পাশাপাশি ইংবেজি শিক্ষাব বিস্তাব, ঔপনিবেশিক বাষ্ট্রযন্ত্রে পেশাগ্রহণেব সুযোগ এবং অধীনস্থ পুঁজিবাদেব (dependent capitalism) সংকীর্ণ বিকাশ এদেশে এমনই এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীব জন্ম দেয যাবা কৃষিব উপব পুবোপুবি নির্ভবশীল ছিল না। মূলত নগবকেন্দ্রিক এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ছিল নব উন্মেষিত জাতীযতাবাদী চেতনাব ধাবক। তবে চিবস্থাযী বন্দোবস্ত দ্বাবা সৃষ্ট এই ভূস্বামী সম্প্রদায এবং উদীযমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী সামাজিক বিচাবে ছিল প্রবল সংখ্যাগবিষ্ঠতায হিন্দু। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলনে এই দুই শ্রেণীব ভূমিকাব তাৎপর্য অনুসন্ধানই এই নিবন্ধেব আলোচ্য।

সবকাবি নথিপত্র অনুযায়ী বঙ্গভঙ্গেব প্রযোজনীযতা সম্পর্কে ব্রিটিশ শাসককুলেব প্রাথমিক ভাবনাচিন্তা গড়ে উঠছিল প্রধানত বঙ্গদেশ ও কেন্দ্রীয প্রদেশের (Central Province) সীমানা সংস্কাব এবং অসমেব প্রশাসনিক সুব্যবস্থা কবাব প্রসঙ্গে। কিন্তু প্রশাসনিক সুবিধাব জন্য বঙ্গদেশকে তিনটি ভাগে বিভক্ত কবে অসম ও কেন্দ্রীয প্রদেশেব সঙ্গে জুড়ে দেওযাব এই ধাবাবাহিক ব্রিটিশ আমলাতান্ত্রিক বক্তব্যেব পিছনে ঔপনিবেশিক বাজনৈতিক স্বার্থচিন্তাব চোবাস্রোত যে ববাববই ছিল, তাব প্রমাণ আছে। আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গেব সবকাবি সিদ্ধান্ত কার্যকবী কবাব অনেক আগেই চট্টগ্রাম ডিভিসনেব কমিশনাব ডব্লু বি ওল্ডহ্যাম ১৮৯৬ সালে বেঙ্গল গভর্নমেন্টেব মুখ্যসচিবকে লিখে জানিযেছিলেন যে বঙ্গদেশ ও অসমেব মধ্যে সীমানাব পুনর্বিন্যাস ঘটালে সেটি "unite the most important part of the Mohammedan population of Eastern India" এবং এই ব্যবস্থায "politically threatening position of Hindu minority in undivided Bengal" দুর্বল হযে পড়বে। সেই সময ওল্ডহ্যামেব বক্তব্য সবকাবি স্তবে তেমন গুরুত্ব দিযে বিবেচিত না হলেও পববর্তী মাত্র নয বছবেব মধ্যেই বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তেব অন্যতম রূপকাব বিসলে মনে কবেছেন এই বক্তব্য "very instructive"। বঙ্গভঙ্গেব বাজনৈতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য, সবকাব ও এই

সিদ্ধান্তের বিবোধী সামাজিক-বাজনৈতিক শক্তিগুলি বিশেযত জাতীযতাবাদী গোষ্ঠী, উভযেব কাছেই স্পষ্ট ছিল। ঢাকা ও মযমনসিংহ ডিভিশনকে অসমেব সঙ্গে যুক্ত কবার বাজনৈতিক সুবিধা সরকাবকে বোঝাতে গিযে বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তেব 'মূল যডযন্ত্রকাবী' ফ্রেজাব একটি সবকাবি নোটে মার্চ ২৮, ১৯০৩-এ লিখেছিলেন যে "Dacca and Mymensingh would give far less trouble if they were under Assam I also believe that East Bengal would not be so painfully prominent a factor in Bengal administration if this transter were made"। ঊনবিংশ শতাব্দীব শেযপাদ থেকে বিংশ শতাব্দীব প্রাবম্ভ, এই স্বল্প সমযেই ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রেব কাছে বঙ্গভঙ্গেব বাজনৈতিক সুবিধা স্পষ্ট হযে যায। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসনিক কাঠামোয শীর্যস্থানীয তিন ব্যক্তি—কার্জন, ফ্রেজাব ও বিসলেব পাবস্পবিক লিখিত আদানপ্রদানেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে বঙ্গভঙ্গেব মাধ্যমে উদীযমান জাতীযতাবাদী সম্ভাব্য বাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দুর্বল কবে দিতে চাওযার প্রসঙ্গটি বাবংবাব উল্লেখিত হযেছে। এই ধারাবাহিকতা মেনেই, অবিভক্ত বঙ্গদেশেব কোন কোন অঞ্চল অসমের সঙ্গে যুক্ত করলে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তিকে ছত্রভঙ্গ কবা যাবে, সে বিযযেও তথ্য ও যুক্তি সাজিয়ে বঙ্গভঙ্গেব সবকাবি সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিযাকে ত্বরান্বিত কবাব চেষ্টা হযেছে।

এই পর্বেব বিভিন্ন সবকাবি নথি এবং কার্জন-ফ্রেজাব-রিসলে'ব চিঠিপত্রেব আদানপ্রদান থেকে একথা স্পষ্ট যে ব্রিটিশ শাসককুল বাঙালি জাতিকে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই সচেতনভাবে দুটি ধর্মীয সম্প্রদাযে বিভক্ত করে বঙ্গভঙ্গেব পবিকল্পনা তৈবি করেছিল। শুধু তাই নয, তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গদেশেব রাজনৈতিক পবিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকাবের মূল্যাযন স্পষ্ট হয়ে যায ১৯০৩ সালের পযলা জুনে কার্জনেব মন্তব্য থেকে—" these eastern districts of Bengal, which are a hotbed of the purely *Bengali movement*, unfriendly if not senditious in character and dominating the whole tone of Bengal administration, will immeasurably outweigh any possible drawbacks"। এই প্রসঙ্গে কার্জন পুলিস কমিশনেব উপবে ফ্রেজাবেব আলোচনাকেও উল্লেখ কবেছেন যেখানে ফ্রেজাব লিখছেন—" nowhere in India are the officers of the government more ignorant of, or more divorced from, *the people*" (গুরুত্ব লেখকেব)। যদিও একথা সত্য যে, বঙ্গভঙ্গেব সিদ্ধান্ত কার্যকবী কবার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রেব একটি ছোটো অংশেব আপত্তিও ছিল। এই আপত্তি অগ্রাহ্য কবে বঙ্গ ভঙ্গের সবকারি সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকব কবতে সবকাবকে চাপ দেওযাব জন্য ফ্রেজাব ১৯০৪ সালেব ৭ ফেব্রুযাবি এবং ৬ ডিসেম্বব দুটি নোটে জানাচ্ছেন যে, "Bengal united is a power, Bengal divided will pull in several different ways That is perfectly true and is one of the merits of the scheme"। বঙ্গদেশকে ভাগ কবাব মধ্য দিযে একটি বিস্তৃত ভূখণ্ডেব উপবে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রেব প্রশাসনিক নিযন্ত্রণ সুদৃঢ় করতে পাবলে তা যে সাম্রাজ্যবাদী আর্থ-বাজনৈতিক স্বার্থকেই সুবক্ষিত কববে এ বিযযে ফ্রেজাবেব মতামত সুস্পষ্ট—" Eastern Bengal is the most densely populated portion, that it needs room for expansion and that it can only

expand towards the East So far from hindering national development, we are really giving it greater scope, and enabling Bengal to absorb Assam one of our main objects is to split up and thereby weaken *a solid body of opponents* to our rule" (গুরুত্ব লেখকেব)।

এখানে উল্লেখ্য, সাধাবণ গ্রাহ্য ধাবণা হল যে বাঙালি জাতি বঙ্গভঙ্গেব বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন কবেছিল। কিন্তু ঢাকা অঞ্চলেব জাতীযতাবাদী হিন্দু সম্প্রদাযেব একটি অংশ ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনকে একটি খোলা চিঠি দিযে (An Open Letter to Curzon) এবং ১৯০৫ সালেব জুলাই মাসে East Bengal Memorial to the Secretary of State-এব মাধ্যমে জানিযেছিল যে প্রশাসনিক সুবিধাব জন্য প্রযোজনে বিহাব ও উডিয্যাকে বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কবা হোক অথবা ওই দুটি অঞ্চলেব জন্য আলাদা Executive Council তৈবি কবা হোক। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাব উপেক্ষিত হয। এব বিরুদ্ধে বিসলে সাবধান বাণী শুনিযেছিলেন যে " the Bengalis with their genius for intrigue would find their own advantage and indulge their ruling instinct in stirring up strife and paralysing the executive"।

বঙ্গভঙ্গেব পবিকল্পনা-সিদ্ধান্ত গ্রহণ-তা বলবৎকবণ, এই ক্রমপর্যাযে ঔপনিবেশিক বাষ্ট্রশক্তিব চিন্তামণ্ডলে একটি বাজনৈতিক যুক্তিব ক্রমপরিণতিও লক্ষ কবা যায—বাঙালি সমাজেব একটি অংশকে আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যেব স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত কবা এবং একটি অংশকে অপবটিব বিরুদ্ধে আর্থ-বাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসাবে প্রতিস্থাপিত কবা। অর্থাৎ, জাতীযতাবাদী চেতনায পুষ্ট বাঙালি জনগোষ্ঠীব প্রতিবাদী আন্দোলনকে একান্তভাবেই হিন্দু বাঙালিব বাজনৈতিক সক্রিযতা হিসেবে চিহ্নিত কবে বাঙালি জনসংখ্যাব অবশিষ্ট বিবাট একটি অংশকে 'জনগণ' বা 'people' হিসাবে গণ্য কবা যাব মধ্যে আবাব সংখ্যাগবিষ্ঠ মানুষ ধর্মে মুসলমান। ঔপনিবেশিক বাষ্ট্রেব এই যুক্তিবিন্যাসে 'solid body of opponent' হযে দাঁডায কেবলমাত্র জাতীযতাবাদী হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণী।

১৯০৫-এব ১৯ জুলাই ব্রিটিশ সবকাব 'পূর্ববঙ্গ ও অসম' নামে নতুন একটি প্রদেশ গঠন কবাব সিদ্ধান্ত ঘোষণা কবে। এই নতুন প্রদেশটি সমগ্র অসম ছাডাও অবিভক্ত বঙ্গদেশেব চট্টগ্রাম, ঢাকা, বাজশাহী, হিল টিপেবা এবং মালদা ডিভিসনকে নিযে গঠিত হয। এব জন্য স্বতন্ত্র একটি আইন পবিষদ (Legislative Council) এবং বাজস্ব বোর্ড (Board of Rvenue) গঠিত হওযাব ঘোষণায সব থেকে বেশি তুষ্ট হয মুসলমান সম্প্রদাযেব অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ যাবা ইংবেজি-শিক্ষিত এবং ভূস্বামী সম্প্রদায। এই নতুন প্রদেশটি গঠনেব আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয পযলা সেপ্টেম্বব ১৯০৫ এবং ১৬ অক্টোবব ১৯০৫ থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকবী হয।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলনেব ভাবগত মর্মবস্তুব (at the level of thematic) বিকাশ, বিস্তাব-প্রক্রিযা ও পবিণতি লক্ষ কবলে অনুধাবন কবা যায যে এটি ছিল তৎকালীন বঙ্গদেশে মূলত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আর্থ-বাজনৈতিক শক্তিব-পাবস্পবিক স্বার্থ-দ্বন্দ্বেব উন্মোচন।

এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আর্থ-বাজনৈতিক শক্তি তিনটি পৃথক চিন্তাকাঠামোকে (paradigm) উপস্থাপিত কবে। তাব একটি, বলাবাহুল্য, ঔপনিবেশিক বাষ্ট্রের—যে বাষ্ট্রশক্তিব যুক্তিবিন্যাসে এক আবোপিত একবৈখিক সংশ্লিষ্টতায় *বাঙালি-হিন্দু জাতীযতাবাদী* হযে ওঠে মূল প্রতিপক্ষ। পাশাপাশি, এখানে জনগণ বা 'people' যেন একটি অবিভাজিত একমাত্রিক অস্তিত্ব যেখানে আর্থ-সামাজিক স্বার্থ-সংঘাতকে উপেক্ষা কবে বিবাট সংখ্যক মুসলমান বাযত ও নিম্ন-বাযত (under-raiyot), হিন্দু সম্প্রদাযেব নিম্নবর্গেব মানুষ (যেমন—নমঃশূদ্র) এবং সংখ্যাব বিচাবে অতি নগণ্য মুসলমান ভূস্বামী গোষ্ঠী (যেমন—ঢাকাব নবাব), এক কাল্পনিক অখণ্ড অবস্থানে দাঁড়িযে জাতীযতাবাদী শক্তিব বিবোধিতায ঔপনিবেশিক বাষ্ট্রশক্তিব হস্তক্ষেপ প্রত্যাশা কবে। ঔপনিবেশিক বাষ্ট্রেব এ এক অভিনব চিন্তাকাঠামো যেখানে স্বৈবাচাবী আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পদানত একটি জনজাতিব বাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে আর্থ-বাজনৈতিক দ্বন্দ্বেব নিবসন ঘটিযে সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনেব নিবঙ্কুশ কর্তৃত্ব কাযেম কবা হয।

দ্বিতীয চিন্তাকাঠামোটি (paradigm) জাতীযতাবাদী শক্তিব। কিন্তু এই চিন্তাকাঠামোয ঔপনিবেশিক বাষ্ট্রেব আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাব পবিবর্তনকামিতাব কোনো উল্লেখ নেই। সংঘাত এখানে শুধু ঔপনিবেশিক প্রশাসনেব সঙ্গে। তা-ও আবাব বাষ্ট্রেবই গড়ে তোলা ঔপনিবেশিক কৃষি-অর্থনীতিতে বিশেষ সুবিধাভোগী অবস্থান হাবানোব সম্ভাবনায কিংবা ইংবেজি-শিক্ষাব দৌলতে গড়ে ওঠা সামাজিক অগ্রাধিকাবের আসন নড়বড়ে হযে পড়াব আশঙ্কায়। অর্থনৈতিক বা বাজনৈতিক কোনো বিকল্প প্রক্রিযাব আভাস এখানে নেই। ঔপনিবেশিক বাষ্ট্রশক্তিব বিপরীতে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠাব মধ্য দিযে বাজনৈতিক ক্ষমতাব অংশভাগী হতে জাতীযতাবাদী শক্তিকে তাই নির্ভব কবতে হয ইতিহাসেব কিছু বিশেষ বিশেষ ঘটনাক্রম ও ব্যক্তিচবিত্রের উপরে সামাজিক নিবিখে যেগুলি হিন্দু উচ্চবর্গেব স্বজাতি-আধিপত্য প্রতিষ্ঠাব ইতিহাস। ধর্ম ও বর্ণেব স্বাভিমান মাখামাখি জাতীযতাবাদী এই ইতিহাস-উপস্থাপনায নিম্নবর্গের মানুষেব ভূমিকা অনুপস্থিত। বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি ও বহু জনজাতিব আদানপ্রদানে গড়ে ওঠা ভাবত ইতিহাসেব বহুমাত্রিক চেতনাও এখানে অধবা হযে থাকে। বিকল্প অর্থনৈতিক ও বাজনৈতিক মতাদর্শ ও নীতিব অভাবে তখন সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনেব অঙ্গীকাবই জাতীযতাবাদী শক্তিব হাতে হযে ওঠে আর্থ-সামাজিক স্বার্থবক্ষাব তাগিদে প্রযোজনীয বাজনৈতিক সচলতা গড়ে তোলাব অস্ত্র। অথচ ধর্ম ও বর্ণেব চোঁযা ঢেকুব তোলা ইতিহাস-গন্ধী কিছু কাহিনীমালাই এই সাংস্কৃতিক উজ্জীবনক্রিযাব পটভূমি বচনা কবে।

কম-বেশি জাতীযতাবাদী চেতনায উজ্জীবিত সব গোষ্ঠীই এই দ্বিতীয চিন্তাকাঠামোটিব অংশীদাব। এব মধ্যে জাতীয কংগ্রেসেব মঞ্চে সমবেত সব দল-উপদল যেমন ছিল, তেমনই ছিল ইংবেজি-শিক্ষিত বাঙালি-হিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায এবং বাঙালি-হিন্দু জমিদাব শ্রেণী। আবাব বুদ্ধিজীবী সম্প্রদাযেব মধ্যে একটি বড অংশ ছিল কৃষিজমিব আযেব উপবে পবোক্ষে নির্ভবশীল শহুবে পেশাদাব গোষ্ঠী এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতিব উপবে একান্ত নির্ভবশীল অধীনস্থ পুঁজিবাদী বিকাশেব ধাবক ছোটো একটি পুঁজিপতি শ্রেণী। ভাবগত অর্থেও জাতীযতাবাদ এই পর্বে এমন কোনো বিষযকে চিহ্নিত কবেনি যা জাতীযতাবাদী বাজনৈতিক

সচলতায এইসব গোষ্ঠীর কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পাবে। আব প্রক্রিযাগত অর্থেও এই পর্বে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী জাতীযতাবাদী চেতনায পুষ্ট স্বদেশি আন্দোলনেব বিবোধিতা ছিল মূলত ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক চক্রান্তেব বিরুদ্ধে, কোনোভাবেই ঔপনিবেশিক অর্থনীতিব বিরুদ্ধে বা কোনো রাজনৈতিক পবিবর্তনকামী আদর্শেব লক্ষ্যে নয। এই প্রেক্ষিতে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলন চালিত কবাব প্রকৌশল নিযে কংগ্রেস সংগঠনেব অভ্যন্তবে নবমপন্থী-চবমপন্থী বিবাদ তুলনায অপ্রাসঙ্গিক হযে পড়ে। কেননা আবেদন-নিবেদনেব রাজনীতি কিংবা নিষ্ক্রিয প্রতিবোধেব তত্ত্ব, উভযেই শেযপর্যন্ত প্রশাসনকে চাপ দিযে জাতীযতাবাদী শক্তিব স্বপক্ষে একটি বাজনৈতিক বিচবণক্ষেত্র (political space) তৈবি কবতে চেযেছিল মাত্র। বাজনীতিহীনতাব এই জাতীযতাবাদী বাজনীতিতে বৃহত্তব অর্থনীতিব ভূমিকা খুবই সামান্য, শুধুই সবাসবি গোষ্ঠীস্বার্থ সম্পর্কিত ক্ষেত্রটুকু ছাড়া। যেন ঔপনিবেশিক বাষ্ট্রকাঠামোব বিপবীতে নয, এর আর্থ-বাজনৈতিক পবিমণ্ডলকে স্বীকাব কবেই জাতীযতাবাদেব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। আব এই স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত কবতে তাই সাংস্কৃতিক উপাদান ছাড়া এই পর্বে জাতীযতাবাদেব হাতে কোনোই ভাবগত অস্ত্র নেই।

তৃতীয চিন্তাকাঠামোটি হল, আমাদেব নির্মাণে, ঔপনিবেশিক বাষ্ট্রকাঠামোয অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল এবং সামাজিক নিবিখে পিছিযে থাকা নিম্নবর্গেব মানুযেব যাবা বাজনৈতিক অর্থেও তুলনায নিষ্ক্রিয। সংখ্যাব বিচাবে সুবিশাল এই জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ ধর্মে মুসলমান এবং নিম্নবর্ণেব হিন্দু। ঔপনিবেশিক কৃষি-অর্থনীতিব উপবে একান্ত নির্ভবশীল এই রাযত, নিম্ন-বাযত, ভূমিহীন চাষি ও ক্ষেতমজুব অধ্যুষিত এই বিশাল জনগোষ্ঠীব চিন্তাকাঠামো ভাবগত মর্মবস্তুব অর্থে একাধাবে ঔপনিবেশিক বাষ্ট্র ও জাতীযতাবাদী চিন্তাকাঠামোব থেকে স্বতন্ত্র হলেও প্রক্রিযাগত (problematic) অর্থে অন্য দুটি চিন্তাকাঠামোব দ্বাবাই পর্যুদস্ত ছিল। বঙ্গ ভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলনেব প্রেক্ষিতেই প্রথম নিম্নবর্গেব এই 'অপব' (alien) চিন্তাকাঠামো একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক বাষ্ট্র ও জাতীযতাবাদী শক্তিব কাছে প্রাসঙ্গিক হযে ওঠে। বস্তুত জাতীযতাবাদী চিন্তাকাঠামোব সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন ব্রত কিংবা অর্থনৈতিক তাগিদ—কোনোটিই নিম্নবর্গেব চিন্তাকাঠামোয সহজ গ্রাহ্যতা পেতে পারেনি। ফলত দেখা যায ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক চাপে বিপন্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীস্বার্থকে সুবক্ষিত কবতে জাতীযতাবাদী শক্তি স্বদেশি আন্দোলনকে গণভিত্তি দেওযাব উদ্যোগে এই প্রথম নিম্নবর্গেব চিন্তাকাঠামোকে প্রভাবিত কবাব লক্ষ্যে 'গণসংযোগ পবিকল্পনা' নিচ্ছে।

পাশাপাশি এ-ও সত্যি যে, কোনো চিন্তাকাঠামোব যুক্তিবিন্যাসই ইতিহাস-নিবপেক্ষ ভাবে স্থাণু নয। সমকালীন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় প্রক্রিযাগত স্তবে (at the level of problematic) কোনো চাপ অনুভূত হলে রাজনৈতিক সচলতা (political mobilisation) আলোড়িত হয-ই। এমনকি বাজনৈতিক নিষ্ক্রিতায চিহ্নিত কোনো চিন্তাকাঠামোও সম্পূর্ণত তাব বাইবে থাকতে পাবে না। ঠিক সেভাবেই ঔপনিবেশিক বাষ্ট্র ও জাতীযতাবাদী শক্তিব প্রক্রিযাগত স্তবেব দ্বন্দ্ব একদিকে যেমন জাতীযবাদী শক্তিব ভাবগত মর্মবস্তুকে কিছুটা প্রভাবিত কবে, তেমনই নিম্নবর্গেব চিন্তাকাঠামোও প্রক্রিযাগত স্তবে বাজনৈতিক নিষ্ক্রিযতা কিছুটা ঝেড়ে

ফেলে বাজনৈতিক সচলতায প্রবিষ্ট হয। এই প্রেক্ষিতে জাতীযতাবাদী শক্তিব গণসংযোগ পবিকল্পনাব পাশাপাশি সংখ্যাতত্ত্বেব বিচারে অতি ক্ষুদ্র কিন্তু ধর্মীয সংস্কৃতিব পবিমণ্ডলে অত্যন্ত প্রভাবশালী মুসলমান ভূস্বামী ও বুদ্ধিজীবীদেব অতি ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী (যাব নেতা ছিলেন ঢাকাব নবাব সলিমুল্লা) নিজস্ব আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীস্বার্থে নিম্নবর্গেব চিন্তাকাঠামোকে প্রভাবিত কবাব চেষ্টা চালাতে থাকেন। এই টানাপোড়েনেই ঔপনিবেশিক কৃষি-অর্থনীতিব উপব একান্ত নির্ভবশীল অবিভক্ত বঙ্গদেশেব নিম্নবর্গেব মানুয স্বদেশি আন্দোলনেব বাজনীতিব অংশীদাব হযে যায।

২

স্বদেশি আন্দোলনে জমিদাবশ্রেণীব (হিন্দু ও মুসলমান উভযেই) ভূমিকাব আলোচনায বঙ্গভঙ্গেব পূর্ববর্তী প্রায একশো বছব ধবে ঔপনিবেশিক বাষ্ট্র ও জমিদাবশ্রেণীব পাবস্পবিক সম্পর্কেব একটি মূল্যায়ন জরুরি। ১৭৯৩ সালে চিবস্থাযী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা চালু কবাব মধ্য দিযে ব্রিটিশবা ভাবতবর্ষেব কৃষি-অর্থনীতিকে ঔপনিবেশিক শোষণের স্থাযী ক্ষেত্রে হিসাবে যেভাবে পবিবর্তিত কবে, তাব ফলেই এদেশে ব্রিটিশ শাসনেব সুদৃঢ় সহযোগী হিসাবে জমিদাব শ্রেণীব উত্থান। পাশাপাশি এক লহমায যেন অন্তর্হিত হল ভাবতীয কৃষি-ব্যবস্থাব স্বযংসম্পূর্ণ ৰূপ। বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব ধাক্কায হাবাল কৃষিজমিব উপবে স্থাযী স্বত্ব। জমিব মালিকানা হাবিযে তারা পবিণত হল জমিদাবেব ইচ্ছানুযাযী বাজস্ব প্রদানে বাধ্য বাযত। আর বাৎসবিক একটি নির্দিষ্ট পবিমাণ অর্থ বাজকোযাগাবে প্রদানেব অঙ্গীকাব কবে জমিদাবশ্রেণী লাভ কবল বিশাল বিশাল কৃষি ভূখণ্ডের উপবে একচেটিযা অধিকাব। এভাবেই ভাবতবর্ষেব কৃষিব্যবস্থা ঔপনিবেশিক শাসক ও তাব প্রতিনিধি জমিদাবশ্রেণীব অবাধ শোযণেব উর্বর ক্ষেত্র হযে ওঠে।

কৃষিক্ষেত্রকে অবাধ শোযণেব এই সুযোগ জমিদাবশ্রেণী পূর্ণমাত্রায সদ্ব্যবহাব কবেছিল। একদিকে ব্রিটিশ তোষণ, অন্যদিকে আবো অর্থনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত কবাব আশায তাবা ব্রিটিশ সরকারেব উপবে মৃদু চাপ সৃষ্টিব অভিপ্রাযে উনবিংশ শতাব্দীব তৃতীয দশক থেকে নিজস্ব কিছু সংগঠন তৈবির চেষ্টা শুরু কবে। ১৮৩৮ সালে জমিদাবশ্রেণীব প্রথম সংগঠন The Zamındar Asociatıon of Calcutta তৈবি হয যাব লক্ষ্য ছিল বাজস্ব-মুক্ত আবো বেশি পবিমাণ কৃষিজমি ভোগ কবার অধিকাব আদায—"to agıtate agaınst the resumptıon of rent-free land"। পবেব বছরেই প্রিন্স দ্বাবকানাথ ঠাকুবেব উদ্যোগে Brıtısh Indıa Socıety নামে আবো একটি জমিদাব সংগঠন তৈবি হয যাব লক্ষ ছিল জমিদাব শ্রেণীব অনুকূলে আবো ভূমিবাজস্ব আইন প্রণযনেব জন্য সবকাবেব কাছে তদ্‌বিব কবা। এবপবে ১৮৫১ সালে আবো পবিণত সাংগঠনিক চবিত্র নিযে বাজা বাধাকান্ত দেবেব সভাপতিত্বে তৈবি হয The Brıtısh Indıan Organısatıon যাব সদস্যবা সবাই ছিলেন হিন্দু জমিদাব শ্রেণীভুক্ত।

দার্জিলিং জেলায চা-চাযেব উদাহরণটি বাদ দিলে, নীলচায বন্ধেব সবকাবি সিদ্ধান্ত গৃহীত

হওয়ার পরেই মোটামুটি ১৮৬০-এর মধ্যেই বঙ্গদেশের কৃষিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শোষণের পদ্ধতি বন্ধ হয়। ১৭৯৯ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত কোম্পানির সরকার জমিদারশ্রেণীর অনুকূলে একাধিক ভূমি-রাজস্ব আইন প্রণয়ন করেছে। কিন্তু ১৮৫৮ সালে প্রণীত ভূমি-রাজস্ব আইনের ১০নং ধারায় সরকার সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট রাজস্বের বিনিময়ে ১৭৯৩ সাল থেকে বংশানুক্রমে স্বত্ব ভোগ করা জমির রায়তদের এবং একটানা ১২ বছর ধরে একই জমি নির্দিষ্ট রাজস্বের বিনিময়ে চাষ করা রায়তদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে কিছু ব্যবস্থা নেয়। এদের কৃষিজমির উপরে এক ধরনের রায়তী স্বত্ব (occupancy right) সুনিশ্চিত করার জন্য আইনে ঘোষণা করা হয় যে বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া এই রায়তদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়ে জমিচ্যুত করা যাবে না। তখনও যদিও বঙ্গদেশের অধিকাংশ কৃষক এই আইনি সুরক্ষার আওতার বাইরেই থাকতে বাধ্য হয়। ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় কিছুটা বড় আকারের পরিবর্তন নিয়ে এরপরে হাজির হয় ১৮৮৫ সালের আইন যা *Bengal Tenancy Act, 1885* নামেই পরিচিত। এই আইনের অষ্টম ধারায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয়। প্রথমত, একই গ্রামের সীমানার মধ্যে যে সব রায়ত বারো বছর বা তার বেশি সময় ধরে একই জমি চাষ করছেন তাদের রায়তী-স্বত্ব একটি নির্দিষ্ট সময়ের আগে কোনভাবে কেড়ে নেওয়া যাবে না (fixity of tenure)। দ্বিতীয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয় যে, নির্দিষ্ট রাজস্বের বিনিময়ে রায়তী-স্বত্ব (occupancy right) ভোগ করা জমিতে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য জমিদার আদালতের দ্বারস্থ হতে পারলেও, কোনোভাবেই সেই জমি থেকে রায়তকে উচ্ছেদ করা যাবে না।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা রায়তী-স্বত্ব বৃদ্ধি করার এই সরকারি উদ্যোগ বিষয়ে তাদের বিরূপতা ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভায় গোপন করেন নি। একথাও এখানে প্রাসঙ্গিক যে, জমিদারদের সংগঠনের পাশাপাশি ইংরেজি-শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, কৃষিজমির আয়ের উপর অংশত নির্ভরশীল বা অর্থ-লগ্নী ব্যবসায়ে স্বার্থযুক্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনও এই ১৮৮৫ সালের টেনান্সি বিলের বিরোধিতা করেছিল। যদিও জমিদারদের সংগঠন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের টেনান্সি বিল বিরোধিতা একই পর্যায়ের ছিল না। দুটি সংগঠনের দুটি পৃথক আর্থ-সামাজিক ভিত্তি তাদের বিরোধিতার চরিত্রকেও প্রভাবিত করেছিল। এই টেনান্সি বিলে রায়তদের কিছুটা আর্থিক স্বাধীনতা দেওয়ার লক্ষ্যে রায়তী-স্বত্বকে যেভাবে বিক্রয়যোগ্যতা দেওয়া হয়েছিল, জমিদারশ্রেণীর আপত্তি ছিল সেইখানেই। কারণ এই বিক্রয়যোগ্যতা জমিকে হস্তান্তরযোগ্য সামগ্রীতে পরিণত করলে জমি ও রায়তদের উপর জমিদারের নিয়ন্ত্রণ আরো শিথিল হয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। অন্যদিকে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন জমিকে বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীতে পরিণত করার সরকারি সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলেও এই বিক্রয়যোগ্যতার উপরে কোনোরকম বিধিনিষেধ আরোপ করার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিল কারণ সেক্ষেত্রে জমিতে অর্থ লগ্নীকারীর অনাদায়ী ঋণের উপরে আদালতের জারি করা ডিক্রির সাহায্যে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে গিয়েছিল। জমির

উপবে জমিদাবশ্রেণীব একাধিপত্য ভাঙতে আগ্রহী ছিল অর্থ-লগ্নী ব্যবসাযে যুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীব যে অংশ, ইন্ডিযান অ্যাসোসিযেশন তাদেব স্বার্থেব প্রতিধ্বনি কবেছিল। সবকাবেব উদ্দেশে লেখা সেই সমযেব এক চিঠিতে ইন্ডিযান অ্যাসোসিযেশনেব সম্পাদক জানাচ্ছেন—"The greater the facilities created by the Legislature for the realisation of money lent to the ryots, the less will be the difficulties capitalists will feel in helping them with loans" ইন্ডিযান অ্যাসোসিযেশনেব এই ভূমিকাকে বলাই যেতে পাবে, একটি ঔপনিবেশিক অর্থনীতিব পবিমণ্ডলে সামন্ততান্ত্রিক জমিদাবশ্রেণীব জমিব উপবে একচেটিযা আধিপত্য খর্ব কবে লগ্নী-পুঁজিকে অগ্রাধিকাব দিতে অধীনস্থ পুঁজিবাদেব (dependent capitalism) আর্জি।

ঔপনিবেশিক বাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক এই বিবোধাভাসের স্বৰূপ বুঝতে দেবি কবেনি। ঔপনিবেশিক অর্থনীতিব নিজস্ব বিকাশেব তাগিদেই বাষ্ট্রেব কাছে কৃষি-অর্থনীতিব কাঠামোগত কিছু পবিবর্তন জরুবি ছিল। এই কাজে নতুন সহযোগী শ্রেণীব সৃষ্টি ও বিকাশেব পথ কিছুটা মসৃণ কবাব প্রযোজন যেমন অনুভূত হযেছিল বাষ্ট্রেব কাছে ঠিক তেমনি পুবোনো সহযোগী সামন্ততান্ত্রিক জমিদাবশ্রেণীর কৃষিতে একচেটিযা আধিপত্য কিছুটা খর্ব কবে কৃষি-অর্থনীতিতে লগ্নী-পুঁজিব পথ প্রশস্ত কবাব প্রযোজনও ছিল। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ঔপনিবেশিক বাষ্ট্র খুব ধীরে সহযোগী সামন্তশক্তিকে বড় ধাক্কা না দিযে বাযতেব অধিকাব সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনি ব্যবস্থা গডে তোলাব মাধ্যমে কৃষি-অর্থনীতিতে লগ্নী-পুঁজিব পথ পবিষ্কাব কবেছে।

১৮৮৫ সালেব বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট কৃষিজমিতে ইচ্ছেমতো বাজস্ব ধার্য কবে উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ কবাব জমিদাবি পথ বন্ধ কবে এভাবেই জমিদাবশ্রেণীব একচেটিযা আধিপত্যকে খর্ব করতে চেযেছিল। যদিও অবিভক্ত বঙ্গদেশেব পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম ভাগে কৃষি-অর্থনীতিব গঠনগত কিছুটা ভিন্নতব কাবণে এই ঔপনিবেশিক উদ্যোগ সমান মাত্রায গতি পাযনি। কিন্তু এবই পবিণামে ঊনবিংশ শতাব্দীব শেষ পাদ থেকে বিংশ শতাব্দীব প্রাবম্ভিক বছবগুলিব মধ্যেই বঙ্গদেশেব কৃষিব্যবস্থা বপ্তানিমুখী ঔপনিবেশিক অর্থনীতিব অঙ্গ হযে যায়। বাজস্ব-নির্ধাবণ ও বাজস্ব-সংগ্রহ টেনান্সি অ্যাক্ট চালু হওযাব পববর্তী সমযে এতই জটিল হযে পডে যে কৃষিজমি ও কৃষক সমাজেব উপব জমিদাব-তালুকদাব শ্রেণীব পক্ষে জমি ও বাযতেব উপবে নিযন্ত্রণ অটুট বাখা ক্রমশ দুবূহ হযে ওঠে। এবই পাশাপাশি বিশেষ করে পূর্ব-বঙ্গেব মাঝাবি ও ছোটো বাযতবা খাদ্যশস্যেব বদলে বিশ্ববাজাবেব চাহিদা অনুযাযী পাটচাষে আগ্রহী হযে ওঠায বপ্তানিমুখী কৃষি-অর্থনীতি আবো প্রাধান্য পেতে থাকে। ক্রমশ পালটে যেতে থাকা এই কৃষি-অর্থনীতিব অভ্যন্তবে তৈবি হয নতুন একটি আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী—ব্যবসাযী-মহাজন নযতো ভূস্বামী-মহাজন—যাবা বপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্যেব বাজাবি অর্থনীতিতে ক্রমশ গুরুত্ব পেতে থাকে। জমিদাবশ্রেণীব একাংশ অবশ্য এই পবিবর্তিত পবিস্থিতিতে নিজস্ব আর্থিক স্বার্থেই ঠাঁই কবে নেয—ভূস্বামী-মহাজন অভিধাব মধ্যে তাবই স্বীকৃতি মেলে। কৃষি অর্থনীতিব এই বাজাবিকবণ প্রসঙ্গে সুগত বসু যেমন বলেছেন—"The market and the credit system, which kept the peasant family alive and helped to reproduce

the small peasant economy, became more important than rent as the channels of the drain on the east Bengal peasant"।

বঙ্গভঙ্গ ঘোষণাব এই হল আর্থ-সামাজিক পটভূমি। কিন্তু এই আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাব পুনবাবিষ্কাব আমাদেব বঙ্গভঙ্গেব কাবণ সম্পূর্ণত বুঝতে সাহায্য কবে না। ঔপনিবেশিক স্বার্থে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিব বাজাবিকবণেব কাজ বঙ্গভঙ্গ ঘোষণাব অনেক আগেই যথেষ্ট অগ্রসর হযেছিল। তাই ঔপনিবেশিক বাষ্ট্রেব অর্থনৈতিক স্বার্থ সুবক্ষিত কবতেই বঙ্গভঙ্গেব সিদ্ধান্ত—এমনতব ভাবনা অতিসবলীকবণেব প্রবণতা। কাবণ বঙ্গভঙ্গ ঔপনিবেশিক বাষ্ট্রেব একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ। বাজনৈতিক সচলতা বোখাব বাজনীতি। সম্ভাব্য বাজনৈতিক বিবোধিতাকে ধ্বংস কবার বাজনীতি।

১৮৫৯ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত বাষ্ট্রেব বিভিন্ন ভূমি-সংস্কাব উদ্যোগে জমিদাবশ্রেণী কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়লেও সক্রিয় সংগঠিত বিরোধিতাব কোনো লক্ষণ দেখা যাযনি। ইংবেজি-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীও বাষ্ট্রেব প্রসাদভোগী হওয়াব কাবণে প্রাবম্ভিক পর্বে গোষ্ঠীস্বার্থ সুবক্ষায কোনো সংগঠিত উদ্যোগ নেযনি। আবেদন-নিবেদনেব বাজনীতিও নয, এ হল বাজনীতিহীনতাব পর্ব। আর্থ-সামাজিক স্তবে সৃষ্ট আলোড়ন এই দুই শ্রেণীব মধ্যে স্বার্থসচেতনতা বাড়ালেও তাব বহিঃপ্রকাশ হিসাবে কোনো রাজনৈতিক সচলতার জন্ম দিতে পারেনি। জাতীযতাবাদী চেতনার ধীব ক্রমবিকাশ এই দুটি শ্রেণীব মধ্যেই খণ্ডিত এক রাজনৈতিক সচলতাব সূচনা কবে। খণ্ডিত, কেননা মতাদর্শবিহীন। খাণ্ডিত, কেননা একান্ত গোষ্ঠীস্বার্থকেন্দ্রিক। খণ্ডিত, কেননা এদেশে জাতীয়তাবাদী চেতনাব জন্মইতিহাসে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পবোক্ষ প্রণোদনা ছিল। খণ্ডিত এ কাবণেও যে, ঔপনিবেশিক বাষ্ট্রেব প্রযোজনে ও হস্তক্ষেপে কৃষি-অর্থনীতিতে যে পবিবর্তনেব সূচনা হযেছিল সেখানে এই দুটি শ্রেণীর সংশ্লিষ্ট স্বার্থেব চবিত্র ভিন্ন হওযা সত্ত্বেও উভযেবই বাজনৈতিক প্রতিক্রিযা হযেছিল সমগোত্রেব—সবকাবেব কাছে চিঠিপত্রে ক্ষোভ প্রকাশ এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ভাবতীয প্রতিনিধি-বাড়ানোর দাবির মধ্যেই তা ছিল সীমাবদ্ধ।

অথচ ঔপনিবেশিক বাষ্ট্র এটুকু রাজনৈতিক সক্রিযতাকেও সহ্য কবতে পাবেনি। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ভাবতীয সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বাষ্ট্রযন্ত্রেব মসৃণ চালনা ব্যাহত হবে এই আশঙ্কায ব্রিটিশ সবকাব সমাজ ও অর্থনীতিব সর্বস্তবেই জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীব সুবিধাভোগী অবস্থান বিনষ্ট কবাব উদ্যোগ নেয। বঙ্গভঙ্গেব সিদ্ধান্ত তারই প্রকাশ।

৩

জমিব দখলী-স্বত্ব ও বাজস্ব-প্রদানের নিরিখে বিংশ শতাব্দীর প্রাবম্ভে অবিভক্ত বঙ্গদেশের সব অঞ্চল একই ধবনেব ছিল না। পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ববঙ্গের কৃষি-অধ্যুষিত জেলাগুলিতে জমিদাব ও বিভিন্ন পর্যাযেব কৃষকেব অনুপাত বিভিন্ন ছিল। বঙ্গভঙ্গেব সিদ্ধান্তেব ফলে যে জেলাগুলি বিচ্ছিন্ন হযেছিল, তা প্রায সবটাই পূর্ববঙ্গে। এই অঞ্চলে চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব ফসল জমিদাব শ্রেণী বলতে বোঝাত কিছু অতি-বৃহৎ ভূস্বামী ও অসংখ্য তালুকদার। দখলী-

স্বত্ব ভোগকাবী বলতে বোঝাত বড় ও মাঝাবি কৃযক যাবা আবার অনেক ক্ষেত্রে জমিদার ও নিম্ন-বাযতদের মধ্যে বাজস্ব সংগ্রহে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন কবত। বৃহৎ-ভূস্বামী ও তালুকদাব গোষ্ঠীতে ছিল হিন্দু সংখ্যাধিক্য। ১৯২১-এব জনসংখ্যা প্রতিবেদন অনুযাযী পূর্ববঙ্গে কৃযি-নির্ভব মানুযেব মধ্যে জমিদাব ৪ ৫২%, বাজস্ব-প্রদানকাবী কৃযক ৮৬ ৭৫% এবং কৃযিশ্রমিক ৮ ৭৩%। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই শতকবা হাব কিছুটা অন্যবকম—জমিদাব ৪ ৭২%, বাজস্ব-প্রদানকাবী কৃযক ৭১ ৪৪% এবং কৃযিশ্রমিক ২৩ ৮৪%।

সামাজিক দিক থেকে অবিভক্ত বঙ্গদেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই গ্রামীণ জীবনকে নিযন্ত্রণ কবতেন ধনী কৃযক সম্প্রদায় বা ভদ্রলোক বলে পবিচিত এলিট গোষ্ঠী যার সিংহভাগ ছিলেন উচ্চবর্ণেব হিন্দু এবং কিছু সংখ্যক শিক্ষিত-অভিজাত মুসলমান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এবা ছিলেন কৃযিব শাবীবিক শ্রম থেকে দূবে অবস্থানকাবী। কৃযি-শ্রমেব ভাব বহন কবত এদেব ঘিবে থাকা চাযি সম্প্রদায, যাব মধ্যে ছিলেন নানা স্তবেব বাযত এবং কৃযি শ্রমিকবৃন্দ। এই ভদ্রলোক শ্রেণী জমিদাব ও চাযিব মধ্যবর্তী অবস্থানে বাজস্ব সংগ্রহেব দাযিত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এবং ক্রমশ ঋণ-দানকাবীব ভূমিকাতেও তাদেব দেখা যায। পূর্ববঙ্গেব প্রেক্ষিতে এই চাযি সম্প্রদাযেব একটি বড অংশ ধর্মে মুসলমান এবং নমঃশূদ্র। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেব ক্ষেত্রে সামাজিক বিচাবে এই চাযি সম্প্রদায হলেন মূলত নিম্নবর্ণেব হিন্দু—মাহিষ্য, সদগোপ বা আগুবি। পশ্চিমবঙ্গে কৃযি শ্রমিকদেব মধ্যেও অধিকাংশ ছিলেন অতি নিম্নবর্ণেব হিন্দু—বাগদি, বাউবি বা কিছু আদিবাসী সম্প্রদাযের মানুষ।

বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী বাজনৈতিক প্রবাহ বুঝতে কৃযি-নির্ভব মানুযেব এই সামাজিক বিন্যাস মনে রাখা জরুবি।

৪

কিছুটা ইংবেজি শিক্ষায অনগ্রসবতা এবং কিছুটা ব্রিটিশ সবকাবেব বিভাজন-শাসন (divide and rule) পদ্ধতিব ফলে উচ্চবর্গেব মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীব সূচনায বেশ কিছুকাল জাতীয কংগ্রেসেব মঞ্চ থেকে দূবে সবেছিলেন। ববং এই পর্বে অভিজাত মুসলমান সম্প্রদাযেব মধ্যে দেখা যায এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠীসত্তা নির্মাণেব প্রবণতা, যেটি জাতীযতাবাদী শক্তির সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন পবিকল্পনাব হিন্দুমনস্কতায আবো বেশি প্রশ্রয় পেযে যায। ফলে যা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রধানত উত্তর ভাবতেব উর্দু ভাযী মুসলমান সম্প্রদাযেব আশবাফ গোষ্ঠীব সামাজিক বৈশিষ্ট্য, বিংশ শতাব্দীব প্রাবম্ভে এসে বঙ্গদেশেব মুসলমান তালুকদাব ও ধনী মুসলমান কৃযকেব কাছে তাব অনুকবণই হযে দাঁডায সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি। বিশেয কবে, প্রবলভাবে হিন্দু সামাজিক-সাংস্কৃতিক আবহে অভিজাত মুসলমান সম্প্রদাযেব এহেন উদ্যোগ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যেব অতিবিক্ত কিছু ব্যঞ্জনাকে বহন কবে আনে। এই ধাবাবাহিকতা মেনেই অভিজাত মুসলমান অনেক পবিবাবে বাংলাব পবিবর্তে উর্দু বা পারসিযান ভাযাব কদব বাডে এবং ক্রমশ বাঙালি মুসলমান জনসংখ্যাব একাংশ পারিবারিক ইতিহাসে অভাবতীয উৎস খুঁজে পেতে থাকেন। জনসংখ্যা প্রতিবেদনে

একটি চমকপ্রদ তথ্য খুঁজে পাওযা যায—১৮৭১ সালেব প্রতিবেদনে জানানো হযেছিল কলকাতা বাদ দিযে সমগ্র বঙ্গদেশে বৈদেশিক উৎস চিহ্নিত মুসলমানেব সংখ্যা ২,৬৬,৩৭৮ এবং তাব তিবিশ বছব পবে জনসংখ্যা প্রতিবেদনে জানানো হচ্ছে বৈদেশিক উৎসেব দাবি কবেছেন এমন মুসলমানেব সংখ্যা শুধু নোযাখালি জেলাতেই ৮,৬২,২৯০।

অভিজাত ও ধনী মুসলমান সম্প্রদাযেব মধ্যে গোষ্ঠী-স্বাতন্ত্র্যকে বিশেষভাবে চিহ্নিত কবাব এই প্রবণতা সবকাবেব দৃষ্টি এড়াযনি। ১৯০৪ সালেব ফেব্রুযাবি মাসে ঢাকায এক বক্তৃতায কার্জন বলেন যে প্রস্তাবিত নতুন প্রদেশ " would invest the Mohammedans in Eastern Bengal with a unity which they have not enjoyed since the days of the old Mussulman Viceroys and Kings "। ব্রিটিশ সবকাব হিন্দু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীব বিবোধিতায এই পর্বে নানাভাবে মুসলমান তোষণ চালিযে যেতে থাকে। উদাহবণ অনেক দেওযা যায। নতুন প্রদেশেব প্রশাসনে মুসলমান ও হিন্দুর অনুপাত ২ ১ বাখাব কথা ঘোষণা কবা হয। ঢাকাব নবাব সলিমুল্লাকে দেনাব দায থেকে বাঁচাতে ১৪ লক্ষ টাকা ঋণ দেওযা হয সবকাবি কোষাগাব থেকে কেননা ব্রিটিশ সবকাবেব একথা অজানা ছিল না যে পূর্ববঙ্গেব অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায এবং মুসলমান তালুকদাব-ধনী কৃষক গোষ্ঠীব উপরে নবাব সলিমুল্লার যথেষ্ট প্রভাব আছে।

মুসলমান সম্প্রদাযেব মধ্যে সংখ্যায অতি দুর্বল উদীযমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীব একাংশ (গ্রামীণ ও শহুবে) এবং মুসলমান জমিদাব-তালুকদাব শ্রেণীব অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলনে অবশ্য যোগ দিযেছিল, কিন্তু নিজ সম্প্রদাযেব অভ্যন্তবে তাদেব প্রভাব ছিল খুবই কম। যেসব মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও অভিজাত ব্যক্তি স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিযেছিলেন তাদেব ব্যক্তিগত প্রেক্ষাপটেব দিকে নজব দিলে এই আন্দোলনেব কযেকটি বৈশিষ্টেব সন্ধান পাওযা যায—

নাম	জেলা/পূর্ব-পবিচিতি
১ নবাব আবদুব শোভান চৌধুবী	বোগবা
২ খাজা আতিকুল্লা	ঢাকাব নবাবেব ভাই
৩ চৌধুবী গুলাম আলি মৌলা	ববিশাল/জমিদাব
৪ সৈযদ মোতাহাব হুসেন	ববিশাল/জমিদাব
৫ চৌধুবী আলিমুজ্জামান	ফবিদপুব
৬ আবদুল হালিম গজনভি	টাঙ্গাইল/ছোটো-জমিদাব ও কলকাতায ওকালতি
৭ আবদুব বসুল	ব্যাবিস্টাব
৮. খান বাহাদুর মহাম্মদ ইউসুফ	সভাপতি, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিযেশন
৯ আবুল কাশেম	বর্ধমান জেলাব কংগ্রেস নেতা

(ক) পূর্ববঙ্গেব সেইসব জেলা থেকেই অভিজাত ও ধনাঢ্য মুসলমান সম্প্রদাযেব স্বদেশি আন্দোলনে প্রতিনিধিত্ব এসেছে যে জেলাগুলি বঙ্গভঙ্গেব ফলে পুবোনো অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়নি এবং যে জেলাগুলিতে হিন্দু সংখ্যাগবিষ্ঠতা আছে।

(খ) গজনভি এবং বোগবাব নবাবেব মতো স্বদেশি শিল্পোদ্যোগীদেব বাণিজ্য-স্বার্থ ছিল মূলত কলকাতা-কেন্দ্রিক।

(গ) জাতীযতাবাদী আবদুব বউফ যিনি একটি জাতীয বিশ্ববিদ্যালযেব দাবি তুলেছিলেন, আদতে কুমিল্লাব লোক হলেও পেশাদাব জীবনে কলকাতা-স্থিত আইনজীবী।

(ঘ) মুসলমান সম্প্রদাযেব তবফ থেকে আলাদা উদ্যোগ নিযে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলনেব পক্ষে যে ক'টি সংগঠিত প্রতিবাদ হযেছিল, তা হয কলকাতা-কেন্দ্রিক (যেমন—১৯০৬-এব ১৬ ফেব্রুযাবি অ্যালবার্ট হলেব জমাযেত) নযতো ববিশালেব (বাখবগঞ্জ) মত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা, অশ্বিনীকুমাব দত্তেব জন্ম ও কার্যকলাপেব সঙ্গে নানা স্তবে যাব যোগাযোগ (যেমন—চৌধুবি গুলাম আলি মৌলা ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে বাখিবন্ধন আবেদনেব অন্যতম স্বাক্ষবকাবী, মোতাহাব হুসেন ১৯০৬ সালে ববিশালেব স্বদেশ বান্ধব সমিতিব বাৎসবিক সভাব সভাপতি ছিলেন)। আবেকটি হিন্দু সংখ্যাগবিষ্ঠ জেলা ফবিদপুব, যেখানে এক হাজাবেবও বেশি মুসলমান তালুকদাব, জোতদাব, ব্যবসাযী ও অন্যান্য শ্রেণীব মানুষেব সাক্ষব-সংবলিত বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী একটি স্মাবকলিপি ১৯০৭-এব ফেব্রুযাবিতে জমা দিযেছেন জমিদাব চৌধুবী আলিমুজ্জমান। স্বদেশি জমাযেতেব একজন সুপবিচিত বক্তা ছিলেন দেদাব বক্স, সুবেন্দ্রনাথেব সহযোগী এবং পেশা কলকাতায শিক্ষকতা। সুমিত সবকাবকে উদ্ধৃত কবে আবেকটি তথ্যও উল্লেখ কবতে হয—বিপিনচন্দ্র পালেব সঙ্গে আবো ছ'জন মুসলমান স্বদেশিকর্মী নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও অসম প্রদেশ সবকাবেব দ্বাবা বিদ্রোহাত্মক কথা বলাব অপবাধে প্রথম সাজাপ্রাপ্ত আসামী—" the honour of figuring in the first list of proposed prosecutions for sedition drawn up by the government of Eastern Bengal And Assam"।

স্বদেশি আন্দোলনে মুসলমান সমাজেব নাগবিক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীব একটি অংশ এবং অভিজাত-জমিদাব শ্রেণীব অতি নগণ্য একাংশেব যোগদান মূলগত ভাবেই দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য ছিল কাবণ হিন্দু জমিদাব ও তাদেব প্রতিনিধিদেব দ্বাবা শোষিত বিশাল সংখ্যক মুসলমান কৃষকেব কাছে এদেব গুকত্ব ছিল অতি সামান্য।

ফিবে আসতে হয তাই, তৃতীয চিন্তাকাঠামোটি প্রসঙ্গে। নিম্নবর্গেব চিন্তাকাঠামো। সাধাবণ মুসলমান কৃষকেব চিন্তাকাঠামো এই নিম্নবর্গের কাঠামোবই অঙ্গ। এব অসাধাবণত্ব এইখানেই যে, কী ঔপনিবেশিক বাষ্ট্র, কী-ই বা জাতীযতাবাদী শক্তি, কেউ-ই পাবেনি ভেদ কবতে এই চিন্তাকাঠামোব স্বাতন্ত্র্য-বর্ম। ধর্মীয সংস্কৃতিব এক কঠিন বলয এখানে চিন্তাকাঠামোব প্রাচীব গড়েছে। আর্থ-সামাজিক স্তবেব কোনো আলোডনই স্বাভাবিক প্রবণতায এখানে কোনো সচলতাব জন্ম দিতে পাবেনি। সম্প্রদাযেব আভ্যন্তবীণ শ্রেণীবিভাজনও উপেক্ষিত হযেছে ধর্মীয-সাংস্কৃতিক অচলাযতনেব কাছে। মুসলমান জমিদাবশ্রেণী ও অভিজাত উচ্চকোটি এই সুযোগ ছাড়েনি। ধর্ম এখানে ব্যবহৃত হযেছে বাজনীতিব উপাদান হিসাবে, ব্যবহৃত হযেছে একধাবে ঔপনিবেশিক বাষ্ট্র, অন্যধাবে জাতীযতাবাদী শক্তিব সঙ্গে দব কষাকষি খেলায।

চিন্তাকাঠামোব এই অপবিণতমনস্কতাব জন্যই শ্রেণীশক্তির বিচাবে নগণ্য হযেও ঢাকাব নবাব সলিমুল্লা, মযমনসিংহেব নবাব আলি চৌধুবী এবং কলকাতাব আমীব হুসেন-এব মতো ব্যক্তিবা বাঙালি মুসলমান সমাজেব প্রতিনিধি পবিচিতি পেযেছিলেন এবং তারই জোবে সাধাবণভাবে বাঙালি মুসলমান কৃযক সমাজকে জাতীযতাবাদী চেতনাব শবিক হতে দেননি।

৫

ভাবগত স্তবে তিনটি পৃথক চিন্তাকাঠামোব স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রক্রিযাগত স্তবে তিনটি চিন্তাকাঠামোব দ্বন্দ্ব জাতীযতাবাদী শক্তিব অনুকূলে যাযনি। তাব একটা বড কাবণ ১৯০৫-এব পব থেকেই সাম্প্রদাযিক উত্তেজনা ও সংঘর্ষেব ঘটনা ঘটতেই থাকে। বিশেষ কবে ১৯০৬-০৭ পর্বে সাম্প্রদাযিক হানাহানিব অনেক বিপোর্ট সবকাবি নথিতেই আছে। মুসলমান নিম্নবর্গেব চিন্তাকাঠামোব অপবিণতমনস্কতা এইসব ঘটনাব জন্য অনেকটা দাযী। কাবণ এব ফলে মুসলমান সমাজেব কাযেমি স্বার্থেব পক্ষে সহজ হযেছিল মুসলমান চাযিব সব দুর্দশাব উৎস হিসাবে হিন্দু জমিদার ও তাব প্রতিনিধিদেব তুলে ধবা। একথাও সত্য যে ছোটো বাযত ও নিম্নবাযতদেব আর্থিক বিপন্নতাব কাবণে জমিব বাযতী-স্বত্ব নিযে অনিশ্চযতা, কূপ-খনন বা বৃক্ষবোপণ কবাব জন্যে বাজস্ব বৃদ্ধি, গোহত্যা সংক্রান্ত নিযেধাজ্ঞা প্রভৃতি নানা কাবণকে মুসলমান কাযেমি স্বার্থ সুকৌশলে মুসলমান চাযিব হিন্দু জমিদাব বিবোধিতাব উপাদান হিসাবে ব্যবহাব কবতে পেবেছিল। জমিদাব ও চাযিব মধ্যে আর্থ-সামাজিক এই অসংগতি ধর্মীয মাত্রা পেযে যাওযায় সাম্প্রদাযিক সংঘর্ষেব ঘটনা বাড়তে থাকে। এই একপেশে বক্তব্যেব পাশাপাশি ঢাকাব নবাব সলিমুল্লাব মদতপুষ্ট প্রচাবকবা প্রচাব কবতে থাকে যে নতুন গঠিত হওযা প্রদেশটিতে মুসলমান কৃযকদেব কোনো বাজস্ব দিতে হবে না এবং ব্রিটিশ শাসন শেয হযে ইসলামেব পুনকত্থান আসন্ন যে ইসলামি শাসনেব কর্ণধাব হবেন নবাব সলিমুল্লা। ধর্ম-সম্পৃক্ত অভিনব কিন্তু বিকৃত এক বাজনৈতিক যুক্তিবিন্যাসে সামাজিক পবিমণ্ডলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সাম্প্রদাযিক বৈবিতাব দিকেই অগ্রসব হতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে বঙ্গভঙ্গ -বিবোধী স্বদেশি আন্দোলন এক বিবাট অংশে মুসলমান কৃযকেব কাছে নিছকই হিন্দু জাতীযতাবাদী আগ্রাসন হিসাবে পবিগণিত হয।

স্বদেশি আন্দোলন, ভাবগত ও প্রক্রিযাগত, উভয স্তবেই আবো একটি সামাজিক গোষ্ঠীব কাছ থেকে বিবোধিতাব সম্মুখীন হয। ধর্মে হিন্দু হযেও যাবা হিন্দুসমাজেব বর্ণকাঠামোব বাইবে অন্ত্যজ জীবন যাপন কবতে বাধ্য হত, সেই নমঃশূদ্র গোষ্ঠীব মানুয বর্ণহিন্দু সামাজিক ও বাজনৈতিক কর্তৃত্বেব বিপবীতে দাঁড়িযে স্বদেশি আন্দোলনেব ডাক-কে প্রত্যাখ্যান কবেছিল। এই নমঃশূদ্র গোষ্ঠীব সামাজিক ইতিহাসেই বর্ণহিন্দু বিবোধিতাব পবিচয আছে। ফবিদপুব ও বাখবগঞ্জ জেলা নমঃশূদ্র গোষ্ঠীব শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পবিচিতি লাভ কবেছিল। বিশেয কবে ফবিদপুবেব মতো হিন্দু সংখ্যাগবিষ্ঠ জেলায নমঃশূদ্রবা হিন্দু জনসংখ্যাব অর্ধেকেবও বেশি ছিলেন। ফবিদপুর জেলায স্বদেশি আন্দোলনেব গতিও ছিল অন্য এলাকাব তুলনায জোবদাব। জাতীয কংগ্রেসেব গণসংযোগ কর্মসূচিব অঙ্গ হিসাবে এখানে নমঃশূদ্র গোষ্ঠীব

সমর্থন লাভের জন্য কিছু বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ফরিদপুর জেলা সম্মেলনে বিশেষত মুসলমান ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বদেশির প্রচার ও গঠনমূলক উদ্যোগ আরো বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছিল। অথচ এখানে উল্লেখ্য যে, স্বদেশির কর্মীদের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান এই জেলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ব্যাপক করে তুলেছিল সেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই তারা ১৯০৬ সালের নভেম্বর মাসে রায়তদের জমির অধিকার নথিবদ্ধ করার একটি গ্রামীণ সমীক্ষার সময়ে নমঃশূদ্র রায়তদের জমিতে অধিকারদানের বিরোধিতা করে। এর বিপরীতে নতুন গঠিত হওয়া প্রদেশটি সম্পর্কে (হয়তো কিছুটা সরকারি উৎসাহদানের ফলে) মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের মতোই নমঃশূদ্র গোষ্ঠীরও উৎসাহ ছিল যথেষ্ট যাতে এতদিনের আরোপিত সব সামাজিক প্রতিকূলতার অবসান ঘটে। এখানে লক্ষণীয় যে, কীভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিপীড়িত একটি গোষ্ঠী সামাজিক ও ধর্মীয় ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও অপর একটি নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বধর্মে স্থিত কিন্তু সামাজিক বিন্যাসে নিপীড়নকারী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচরণ করে। ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত একটি নমঃশূদ্র সম্মেলন 'বাণিজ্যের স্বাধীনতা' দাবি করে। কয়েক মাস পরে স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম শক্ত ঘাঁটি বরিশালে মুসলমান ও নমঃশূদ্র গোষ্ঠীর মানুষেরা একজোট হয়ে স্বদেশজাত বস্ত্র ও লবণের তুলনায় বেশি দামে বিদেশি বস্ত্র ও লবণ ক্রয় করা শুরু করে। ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে মডার্ন রিভিয়্যু পত্রিকা জানায় যে কোনো কোনো এলাকায় নমঃশূদ্র গোষ্ঠীর লোকেরা "have gone so far as to cease cultivating the lands of the higher class Hindu landholders as burga-tenants, and in some places the Namosudras have formed a combination not to render any services to he upper classes of the Hindu community"।

এইসব সামাজিক প্রতিবাদের চেহারাকে ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতপুষ্ট বলে এড়িয়ে যাওয়া ইতিহাসের অপব্যাখ্যা। বরং মেনে নেওয়া জরুরি যে এই সমস্ত সামাজিক ঘটনাবলি নিম্নবর্গের চিন্তাকাঠামোর স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ভিন্নতাকেই তুলে ধরে। আর জানিয়ে রাখা যায় যে স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষিতেও নিম্নবর্গের চিন্তাকাঠামোর সঙ্গে অপর দুটি চিন্তাকাঠামোর দ্বন্দ্ব মেটেনি এবং তা কোনোভাবেই গণসংযোগের উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী স্বদেশি আন্দোলনকে মজবুত করতে পারেনি।

৬

বিভিন্ন জেলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের বিকাশ ও গতিপ্রকৃতি এবং এই আন্দোলনে জমিদারশ্রেণীর, বিশেষত হিন্দু জমিদারশ্রেণীর ভূমিকার মূল্যায়নের জন্য জমির দখলী-স্বত্ব এবং রাজস্ব-প্রদানের বিন্যাস জরুরি ভূমিকা নেবে। ঐতিহাসিক পটভূমি, আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ও তজ্জনিত রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আলোচনার শেষে আমরা বলতে পারি যে—প্রথমত, পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতেই স্বদেশি আন্দোলনের প্রসার বেশি হয়েছিল কারণ

অবিভক্ত বঙ্গদেশেব যে যে জেলাগুলিকে অসমেব সঙ্গে জুড়ে নতুন প্রদেশ তৈবি হযেছিল, তার প্রায সবগুলিই ছিল উত্তব ও পূর্ব এলাকায।

দ্বিতীযত, প্রাপ্ত বাজস্বেব উপবে অতিবিক্ত নির্ভবশীল জমিদাবশ্রেণী (অর্থাৎ, যেখানে বাজস্ব প্রদানকাবী কৃষকেব সংখ্যা কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীব মধ্যে বেশি) এই স্বদেশি আন্দোলনে বেশি সক্রিয হযেছিল। এই জমিদাবদেব অধিকাংশই ছিলেন ধর্মে হিন্দু এবং বাজস্ব প্রদানকাবী কৃষকদেব অধিকাংশই মুসলমান।

তৃতীযত, যেসব এলাকায বাযত ও নিম্ন-বাযত শ্রেণীব মানুষ ধর্মে ছিলেন মুসলমান, সেইসব এলাকাতেই সাম্প্রদাযিক সংঘর্ষ বেশি ছডিযেছিল।

চতুর্থত, স্বদেশি আন্দোলন কিছুটা গণভিত্তি অর্জন কবাব পবে সাম্প্রদাযিক সংঘর্ষেব ঘটনা ক্রমশ বাডতে থাকায আইন শৃঙ্খলাব অবনতিব আশঙ্কায এবং অনেকটাই সবকাবি চাপে জমিদাবশ্রেণী ধীবে ধীবে নিষ্ক্রিয হযে পডে। সুমিত সবকাব উল্লেখ কবেছেন যে, ব্রিটিশ ইন্ডিযান অ্যাসোসিযেশনেব Loyalist Manifestoতে স্বাক্ষবকাবী ১০৭ জন জমিদাব, যাদেব মধ্যে মুক্তাগাছাব সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুবী ও ভাগ্যকুলেব সীতানাথ বায-ও ছিলেন, সবকাবেব কাছে আইনশৃঙ্খলা বক্ষাব প্রশ্নে নিজেদেব সমর্থন জ্ঞাপন কবেন "however stringent for the suppression of anarchy"।

পঞ্চমত, কংগ্রেসেব গণসংযোগ উদ্যোগ মুসলমান সম্প্রদাযেব বিশেষ কবে বিচ্ছিন্ন কবে দেওযা জেলাগুলিব মুসলমান কৃষক সম্প্রদাযেব মধ্যে প্রসাব লাভ কবতে ব্যর্থ হয। নমঃশূদ্র সম্প্রদাযও স্বদেশি আন্দোলনেব ডাকে সাডা দেযনি। কৃষি অর্থনীতিব সবচেযে নীচুতলাব মানুষেবা—বর্গাদাব, ভূমিহীন চাষি ও কৃষি শ্রমিক—এই আন্দোলনেব গণ্ডিব বাইবেই থেকে গিযেছিল।

ষষ্ঠত, বাজস্বেব মাধ্যমে উদ্বৃত্ত আদাযেব জমিদাবি পন্থা ১৮৮৫ সাল থেকেই সংকটেব মুখোমুখি হযেছিল। বঙ্গভঙ্গ কার্যকব হওযাব ফলে বিস্তৃত কৃষি ভূখণ্ড নতুন প্রদেশেব সঙ্গে যুক্ত হযে যাওযায ওইসব অঞ্চলেব কৃষিজমিতে স্বার্থযুক্ত হিন্দু জমিদাবদেব সংকট আবো ঘনীভূত হয। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও অধিকাংশ হিন্দু জমিদাব এতদিনকাব সঞ্চিত উদ্বৃত্ত অন্য কোনো ভাবে বিনিযোগেব মাধ্যমে বিকল্প আযেব বাস্তা ভাবেননি। ফলত সামন্ত্রতান্ত্রিক কৃষি অর্থনীতিব বাজাবিকবণেব সবকাবি উদ্যোগ ঘটলেও সেই ধাক্কায দেশীয শিল্প তেমন গডে ওঠেনি।

সপ্তমত, বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী বঙ্গভঙ্গেব ফলে পেশা গ্রহণেব সুযোগ সংকুচিত হওযাব আশঙ্কা থেকেই প্রধানত বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনে জড়িযে পডে। কিন্তু ওপবতলাব হিন্দু ও মুসলমান ভদ্রলোকদেব মধ্যে সামাজিক-বাজনৈতিক ক্ষমতা নিযে বিবোধ আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত কবে।

অষ্টমত, বঙ্গদেশে সাম্প্রদাযিক সংঘর্ষেব প্রমাণ উনিশ শতক থেকেই মেলে। স্বদেশি আন্দোলন চলাকালীন সমযেই (১৯০৬-০৭) মযমনসিংহে এব বীভৎস প্রকাশ ঘটে বিলাতি দ্রব্য বর্জনকে কেন্দ্র কবে। এ বিষযে বিস্তৃত আলোচনা কবেছেন সুবঞ্জন দাশ তাঁব Communal Riots in Bengal (1905-1947) শীর্ষক গবেষণাপত্রে। আবাব সাম্প্রদাযিক

সংঘাতের দুটি স্তর ছিল—একটি উচ্চবর্গীয় (elitist) অন্যটি নিম্নবর্গীয়। জাতীয়তাবাদী স্বদেশি আন্দোলন উচ্চবর্গের সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে কিছুটা মোকাবিলার চেষ্টা করলেও নিম্নবর্গের সাম্প্রদায়িক চেতনাকে কোনোভাবেই অনুধাবন করতে পারেনি। কারণ পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদার, আমলা, মহাজনদের শোষণ এবং অত্যাচার ওই অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার জন্য সিংহভাগ দায়ী ছিল। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি ও মহামারির প্রকোপ। অথচ যে হিন্দু উচ্চবর্ণের মানুষদের আত্মাভিমান সাম্প্রদায়িক দূরত্ব বেড়ে চলায় ইন্ধন জুগিয়েছিল, স্বদেশি আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল তারাই। ফলে নিম্নবর্গের চিন্তাকাঠামোকে স্বদেশি আন্দোলন প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়। আর এই সুযোগে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় ও কায়েমি স্বার্থ কৃষিজীবী নিম্নবর্গের মুসলমানের চিন্তাবিন্যাস ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থে ব্যবহার করতে পারে।

নবমত, বিশ শতকের প্রথম দশকে কংগ্রেস আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে বহুধাবিভক্ত। চরমপন্থী ও নরমপন্থী—এই দুই গোষ্ঠীর কোনোটিরই সুসংহত সাংগঠনিক ক্ষমতা কিংবা যুক্তির বিন্যাস ছিল না। কংগ্রেস তখন শুধু চরমপন্থী-নরমপন্থী নয়, তারই সঙ্গে নানা উপদলে বিভক্ত। তথাপি নব উন্মেষিত জাতীয় চেতনার অগোছালো যেটুকু চেহারা কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মাথা ছাপিয়ে দেখা গিয়েছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কোনো কারণ ছিল না তাকে অবহেলা করার। কংগ্রেসকে সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হিসাবে ততদিনে ব্রিটিশ সরকার গণ্য করতে শুরু করেছে। ফলত কখনও তীব্র উপেক্ষা দিয়ে, কখনও বা কংগ্রেস-বিরোধী সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিসমূহকে আপাত সুবিধা প্রদান করে, ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের মোকাবিলার ব্যবস্থা করেছে।

কংগ্রেস ও সামগ্রিকভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনার বহুধাবিভক্ত রূপ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সাংগঠনিক উপদলীয় কোন্দল বাদ দিলেও, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনে কংগ্রেস নেতৃত্বের তাত্ত্বিক যুক্তি ও রণকৌশল এক ছিল না। সরকারি প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার আগেই 'সঞ্জীবনী' বিদেশি বর্জনের ডাক দিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকরী হওয়ার দিন, ১৬ অক্টোবর ১৯০৫, বন্দেমাতরম ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি সঙ্গীত কণ্ঠে নিয়ে কলকাতার ভদ্র হিন্দুসমাজের অরন্ধন ও রাখিবন্ধন উৎসব পালনে যে প্রতিবাদ মূর্ত হয়েছিল, তা বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নিছকই একটি নৈতিক প্রতিবাদ মাত্র। এর মূল সুর ছিল, গঠনমূলক স্বদেশি—রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' যার বৌদ্ধিক রূপ। আত্মশক্তির উদ্বোধন তার মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন বিলাতি কাপড়ের চেয়ে সস্তায়, অন্তত সমান দামে, দেশি কাপড় জোগাতে না পারলে বয়কট হবে দরিদ্রের উপর অত্যাচার এবং শেষ পর্যন্ত তা সাম্প্রদায়িক কলহ ডেকে আনবে। আবার প্রফুল্লচন্দ্র ও নীলরতন সরকার প্রমুখেরা কিন্তু স্বদেশি বলতে বৃহদাকার ও আধুনিক শিল্পের কথাই ভেবেছিলেন। আবার সুরেন্দ্রনাথ ও গোখলের মতো নরমপন্থী নেতারা বয়কটকে সাময়িক রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে দেখেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, ল্যাঙ্কাশায়ারের অর্থনৈতিক স্বার্থ বিঘ্নিত হলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ভারতে ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ বাড়বে

এবং বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহৃত হবে। আবার তিলক ও অরবিন্দের মতো কংগ্রেসি চরমপন্থীরা বয়কট অস্ত্রকে মনে করতেন স্বরাজলাভের জন্য এক মূল্যবান হাতিয়ার। যদিও এই স্বরাজ ধারণার কোনো সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল না। অরবিন্দর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের তত্ত্ব বয়কট বলতে শুধু বিদেশি কাপড়, চিনি, নুন বা প্রসাধন সামগ্রিকে বর্জন করা বোঝায়নি। তাঁরা চেয়েছিলেন, শাসনতান্ত্রিক সব ক্ষেত্রে—শিক্ষা, বিচার বিভাগ, পৌরসভা বা আইন পরিষদ—বয়কট প্রয়োগ করতে।

দশমত, বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর বিরুদ্ধে কোনো আর্থ-সামাজিক বিকল্প তুলে ধরার মতো রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তাই প্রশাসনিক স্তরেই এর মোকাবিলা করে।

৭

তিনটি চিন্তাকাঠামোর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বাস্তবতার যে চেহারা ফুটে উঠেছিল, সেই প্রেক্ষিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তার ভিত্তিগত দুর্বলতার কারণেই স্বদেশি আন্দোলনকে প্রকৃত জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে চালিত করতে পারেনি। সেখানে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থ নির্ভর জমিদারশ্রেণীর রাজনৈতিক সক্রিয়তা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল সুরকেই ব্যাহত করে।

তথ্যসূত্র

১. Sumit Sarkar—Swadeshi Movement in Bengal
২ Sugata Bose—Agrarian Bengal
৩ B B Mishra—The Indian Middle-class

স্বদেশি আন্দোলন ও অনুশীলন সমিতি

অমিতাভ চন্দ্র

১

মুখবন্ধ

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভাবতে বিংশ শতাব্দীব একেবাবে গোড়াব দিকে তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন সাম্রাজ্য বিস্তাবকামীদেব একজন যথার্থ প্রতিনিধি হিসাবে বঙ্গভঙ্গেব যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকব কবেছিলেন, তাব বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রামেব মধ্য দিযেই ভাবতে জাতীযতাবাদেব ইতিহাসে এক নতুন পর্বেব সূচনা হযেছিল। ভাবতেব স্বাধীনতা সংগ্রামেব ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গেব বিরুদ্ধে এই আন্দোলন স্বদেশি আন্দোলন হিসাবেই বিখ্যাত ও চিবস্মবণীয হযে আছে।

বাংলা প্রেসিডেন্সিব আযতন নিযে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গেব দুশ্চিন্তাব অন্ত ছিল না। আব এই দুশ্চিন্তা থেকেই ঔপনিবেশিক শাসকেবা মাঝে মাঝেই এই আযতন কাটছাঁট কবাব বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করতেন, যদিও সর্বদা সেইসব প্রস্তাব বাস্তবে কার্যকব কবা হয নি। ১৮৬০-এব দশকেই বাংলা প্রেসিডেন্সিব আকাব কমানোব বিক্ষিপ্ত কিছু প্রস্তাব এসেছিল। ১৮৭৪ সালে আসাম ও শ্রীহট্ট (সিলেট)-কে বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে বিচ্ছিন্ন করাব এক প্রস্তাব এসেছিল। ১৮৯৬-৯৭ সালে আসামেব মুখ্য কমিশনাব উইলিযাম ওযার্ড প্রস্তাব কবেছিলেন, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও মযমনসিংহকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত কবা হোক্। ১৯০৩ সালেব ২৮ মার্চ এক নোটে বাংলাব সেই সমযকাব নতুন ছোটোলাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজাব ওযার্ড-এব পূর্বোল্লিখিত প্রস্তাবটি আবাব উত্থাপন কবেছিলেন। ১৯০৩ সালেব ১ জুন ভাবতেব আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত একটি মিনিটে দেখা যায যে, ভাবতেব তৎকালীন বড়লাট লর্ড জর্জ ন্যাথানিযেল কার্জন সেটি মেনে নিযেছিলেন। জনসাধাবণেব বোধার্থে প্রস্তাবটিব উপযুক্ত কাটছাঁট ও সম্পাদনা করা হয। ১৯০৩ সালেব ৩ ডিসেম্বব তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব রিজলিব একটি চিঠিতে বঙ্গ-বিভাজনেব এই প্রস্তাবটিকে সর্বপ্রথম ঘোষণা কবা হযেছিল।

১৯০৫ সালেব ১৯ জুলাই বঙ্গ-বিভাজনেব এই প্রস্তাবটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা কবা হযেছিল। ৩ ডিসেম্বব ১৯০৩ এবং ১৯ জুলাই ১৯০৫-এব আনুষ্ঠানিক ঘোষণাব মধ্যবর্তী সমযে লর্ড-কার্জন, ফ্রেজাব ও রিজলি বঙ্গ-বিভাজনেব পবিকল্পনাকে রূপান্তবিত কবলেন পুবোদস্তুব এক ব্যবচ্ছেদে। এই ব্যবচ্ছেদেব পবিণতিতে আসাম ছাড়াও চট্টগ্রাম, ঢাকা ও বাজশাহী বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুবা ও মালদহ-ও নতুন সৃষ্ট প্রদেশ 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম'-এব অন্তর্ভুক্ত হল। ১৯ জুলাই ১৯০৫ বঙ্গ-বিভাজনেব মাধ্যমে দুইটি প্রদেশ সৃষ্টিব আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটি কবেছিলেন তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন। কার্জন প্রস্তাবিত ও ঘোষিত এই বঙ্গ -বিভাজনে দেখা গেল যে, নতুন সৃষ্ট প্রদেশ 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম'-এব জনসংখ্যা দাঁড়াল ৩১ মিলিযন, এবং অপব প্রদেশ অবশিষ্ট বাংলাব জনসংখ্যা দাঁড়াল ৫৪ মিলিযন, আব এই ৫৪

মিলিযনেব মধ্যে ১৮ মিলিযন ছিলেন বাঙালি, আব বাকি ৩৬ মিলিযন ছিলেন বিহাবি ও উৎকলবাসী বা ওডিযা। প্রস্তাবিত ও ঘোষিত এই বঙ্গ-বিভাজনেব আনুষ্ঠানিক কাবণ হিসাবে ঔপনিবেশিক শাসকবর্গেব তবফে প্রশাসনিক সুবিধাব বিষযটিব ওপবই জোব দেওযা হযেছিল। কিন্তু এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ও বিভাজনেব আসল উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু-মুসলমানেব মধ্যে ইচ্ছাকৃত বিবোধ সৃষ্টি ও তাকে উস্কানিব মাধ্যমে চিবাচবিত ঔপনিবেশিক 'বিভেদ ও শাসন' ('Divide and Rule') নীতিব বাস্তবাযন এবং বাংলাব বুকে ক্রমবিকশিত জাতীযতাবাদেব জোযাব প্রশমন। অর্থাৎ প্রশাসনিক নয, বঙ্গ-বিভাগেব প্রকৃত উদ্দেশ্যই ছিল বাজনৈতিক।

১৯০৫ সালেব জুলাই মাস পর্যন্ত প্রথাগত 'নবমপন্থী' পদ্ধতিবই ঐকান্তিক প্রযোগেব মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ পবিকল্পনাটিব বিবোধিতা কবা হযেছিল। পত্র-পত্রিকায প্রচাব, প্রচুব পবিমাণে সভা-সমিতি ও দবখাস্ত, বড় বড সম্মিলন ইত্যাদি প্রথাগত 'নবমপন্থী' পদ্ধতিব অবধাবিত সীমাবদ্ধতা ও সুস্পষ্ট ব্যর্থতা নিযে গেল বঙ্গ-বিভাজনেব বিবোধিতাব নতুন নতুন রূপেব ও পথের সন্ধানে। এই সন্ধানেব মাধ্যমেই এল বঙ্গভঙ্গেব বিবোধিতাব এক অমোঘ অস্ত্র ব্রিটিশ দ্রব্য ও শিক্ষা বযকট। ১৯০৫ সালেব ১৩ জুলাই কৃষ্ণকুমাব মিত্র সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সঞ্জীবনী'-তে প্রথম বযকট-এব বিষযটি প্রস্তাবিত হল। ১৯০৫ সালেব ৭ আগস্ট কলকাতাব টাউন হলে বঙ্গভঙ্গেব বিরুদ্ধে এক বিশাল জনসভা হযেছিল। টাউন হলেব এই জনসভাতেই বঙ্গভঙ্গেব বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণেব মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব সূত্রপাত ঘটানো হযেছিল। এই জনসভাতেই প্রতিনিধি ও বক্তাবা সমগ্র প্রদেশেই বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনটিকে প্রসাবিত কবাব অঙ্গীকাব কবেছিলেন। ৭ আগস্ট ১৯০৫ টাউন হলেব এই বঙ্গভঙ্গ বিবোধী জনসভাতেই সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায সহ প্রতিষ্ঠিত নেতৃবর্গ যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্বেব পব বযকট-এব প্রস্তাবটিকে গ্রহণ কবেছিলেন। বযকট ছাডাও বাখিবন্ধন ও অবন্ধনেব জন্য ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব ও বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদীব কল্পনাসমৃদ্ধ আবেদনও বাংলাব জনমানসে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আবেগ ও উন্মাদনা সৃষ্টিতে সহাযক হযে বিশেষ সাফল্য অর্জন কবেছিল।

১৯০৫ সালেব ১৬ অক্টোবব বিপুল ও ব্যাপক প্রতিবাদ উপেক্ষা কবেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ বঙ্গভঙ্গেব সিদ্ধান্ত কার্যকব কবল। বঙ্গভঙ্গ বাস্তবাযনেব এই দিনটিকে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব নেতৃবর্গ সাবা বাংলা জুডেই জাতীয শোক দিবস হিসাবে পালনেব আবেদন বাখলেন। সাবা কলকাতা জুডে হবতাল পালিত হল—১৬ অক্টোবব ১৯০৫। সেই দিন সাবা বাংলা জুডেই উদ্‌যাপিত হল অবন্ধন। ওই দিনটিতে ভ্রাতৃত্বেব প্রতীক হিসাবে বিনিময কবা হল বিভিন্ন বর্ণেব বাখি, আব শোক ও বিষাদেব চিহ্ন হিসাবে কোথাও উনুনে আগুন দেওযা হল না, পালিত হল অবন্ধন। অপবদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গও ২২ অক্টোবব ১৯০৫-এ প্রকাশিত কার্লাইল সার্কুলাব ইত্যাদি মাবফত আন্দোলন ও অবস্থানবত ছাত্রদেব ওপব ঝাঁপিযে পডল, শুরু হল চণ্ড নীতিব ও দমন নীতিব ব্যাপব ও নির্বিচাব প্রযোগ। যুবকদের বক্তে স্নাত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তাবেব সেনানিদেব নিযে আস

হল বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী এই গণ-অন্দোলন দমনেব উদ্দেশ্যে। জাতীযতাবাদী-প্রভাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে অনুদান, বৃত্তি ও অনুমোদন প্রত্যাহাবেব ভীতি প্রদর্শন কবল সাম্রাজ্যবাদী শাসকবৃন্দ। এব প্রতিক্রিযাতেই দেখা দিল সবকাবি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বযকটেব আন্দোলন ও জাতীয শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংগঠন। ১৯০৬ সালেব ১৫ অগস্ট স্থাপিত হল জাতীয শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন (National Council of Education) বা জাতীয শিক্ষা পবিযদ। অববিন্দ ঘোষকে অধ্যক্ষ কবে কলকাতায শুরু হল জাতীয কলেজ। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন বা স্বদেশি আন্দোলন বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণেব মাধ্যমে ব্যাপক আকাব ধাবণ কবল।

২

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন বা স্বদেশি আন্দোলনেব বিভিন্ন প্রবণতা

১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৮ সালেব মধ্যে সাধাবণভাবে বাংলাব বাজনৈতিক জীবনে, এবং নির্দিষ্টভাবে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন বা স্বদেশি আন্দোলনেব মধ্যে, চাবটি প্রধান ধাবা বা প্রবণতা দেখা যায। এই চাবটি ধাবা বা প্রবণতাব মধ্যে প্রথমটি ছিল 'নবমপন্থী' ধাবা বা প্রবণতা, যাব প্রধানতম প্রতিনিধি ও নেতা ছিলেন সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায। দ্বিতীয ধাবা বা প্রবণতাটি ছিল 'চরমপন্থী' ধাবা বা প্রবণতা, যাব নেতৃত্বে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অববিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায প্রমুখ 'চবমপন্থী' জাতীযতাবাদী নেতৃবৃন্দ। তৃতীয ধাবা বা প্রবণতাটি ছিল বৈপ্লবিক জাতীযতাবাদী ধাবা বা প্রবণতা। এই ধাবাটিব বা প্রবণতাটিব প্রতিনিধিত্বে ও নেতৃত্বে ছিল বিভিন্ন বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি, যাব মধ্যে প্রধানতমটি ছিল অনুশীলন সমিতি। আব চতুর্থ ধাবা বা প্রবণতাটিকে বলা যেতে পাবে 'গঠনমূলক স্বদেশী' ধাবা বা প্রবণতা। স্বদেশি শিল্প স্থাপন ও বিকাশ, জাতীয শিক্ষা বিস্তাব, এবং গ্রামোন্নযন ও সংগঠনেব মাধ্যমে আত্মসহাযতাব মধ্য দিযে এই ধাবা বা প্রবণতাটিব প্রতিফলন ঘটেছিল। এই চতুর্থ ধাবাটিকে 'আত্মশক্তি' বিকাশেব ধাবা হিসাবেও অভিহিত কবা যেতে পাবে। এই ধাবা বা প্রবণতাটিব প্রকাশ ঘটেছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বায বা নীলবতন সবকাবেব ব্যবসাযিক উদ্যোগে, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যাযেব পত্রিকা 'ডন' ও ডন সোসাইটিতে, যা জাতীয শিক্ষা বিস্তাবেব আন্দোলনে অঙ্কুবেব ভূমিকা নিযেছিল, এবং সর্বোপবি ববীন্দ্রনাথ ঠাকুবেব ক্ষেত্রে। নিঃসন্দেহে লেখা যেতে পাবে যে, এই 'আত্মশক্তি'-ব ধাবা বা প্রবণতাটিব প্রধানতম প্রবক্তাই ছিলেন ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব। তাঁব ১৯০৪ সালেব প্রখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' ভাষণে, এবং চিবাযত হিন্দু 'সমাজ' বা জনসম্প্রদাযেব পুনবভ্যুত্থানেব মধ্য দিযে গ্রামে গ্রামে গঠনমূলক কাজকর্মেব একটি নক্শা ববীন্দ্রনাথ ইতোমধ্যেই ছকে ফেলেছিলেন। ববীন্দ্রনাথ দ্বাবা অভিহিত 'আত্মশক্তি' ও তাব বিকাশেব এই ধাবা বা প্রবণতাটি, তাব ধীব ও অনাডম্বব চবিত্রেব কাবণে, বাংলাব তৎকালীন উত্তেজিত শিক্ষিত যুবকদেব মানসলোকে তেমন কোনও সাড়া জাগাতে পাবে নি। তাঁবা অনেক বেশি মাত্রাতেই আকৃষ্ট হচ্ছিলেন 'চবমপন্থী' বাজনৈতিক ধাবা বা প্রবণতাটিব দিকে, বা আবও সুনির্দিষ্টভাবে বললে, তাঁবা প্রধানতই আকৃষ্ট হচ্ছিলেন বৈপ্লবিক জাতীযতাবাদী ধাবা বা

প্রবণতাটিব দিকে। এই বৈপ্লবিক জাতীযতাবাদী ধাবা বা প্রবণতাটিব প্রধানতম প্রতিনিধিই ছিল অনুশীলন সমিতি। 'স্বদেশি আন্দোলন ও অনুশীলন সমিতি' নামক বর্তমান নিবন্ধটিতে বঙ্গ ভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন বা স্বদেশি আন্দোলনেব ক্ষেত্রে অনুশীলন সমিতিব ভূমিকাটিই বিশেষভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হযেছে। অনুশীলন সমিতি ব্যতীতও অন্যান্য বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিব নাম ও ভূমিকাও বর্তমান নিবন্ধেব বিষযবস্তুব অন্তর্ভুক্ত হযেছে।

৩
অনুশীলন সমিতিব জন্ম

অনুশীলন সমিতিব জন্ম বা প্রতিষ্ঠা আলোচনা কবতে গেলে আমাদেব আলোচনাটিকে আবও কিছুটা পিছনে নিযে যেতে হবে, অর্থাৎ আমাদেব আলোচনাটিকে শুরু কবতে হবে ঊনবিংশ শতাব্দীব শেষ পর্ব থেকে। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীব ষাটেব দশক থেকেই মূলত কলকাতায এবং অবিভক্ত বাংলাব অন্যান্য স্থানেও বিভিন্ন সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। এই ষাটেব দশকেব শেষভাগ থেকেই কলকাতায এক বার্ষিক উৎসব হিসাবে প্রতি বছবই অনুষ্ঠিত হতে থাকে 'হিন্দু মেলা'। এই 'হিন্দু মেলা'-ব প্রধানতম উদ্দেশ্যই ছিল স্বদেশিব প্রচাব ও জযগান, অর্থাৎ স্বদেশি দ্রব্য ও পণ্য উৎপাদন ও তাব ব্যবহাব, স্বদেশি ভাষাব ব্যাপক ব্যবহাব ও প্রসাব, এবং তাব সঙ্গেই শবীবচর্চা ও শৃঙ্খলা সৃষ্টি ও বক্ষাব মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ তৈবিব প্রযাস। স্বদেশি ও জাতীযতাবাদেব প্রচাব ও প্রসাবই ছিল এই বার্ষিক অনুষ্ঠান 'হিন্দু মেলা'-ব প্রধানতম উদ্দেশ্য। এই 'হিন্দু মেলা' আন্দোলনেব প্রধান দুই স্থপতি ও উদ্যোক্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র ও বাজনাবাযণ বসু। এই 'হিন্দু মেলা'-ব সময থেকেই নবগোপাল মিত্র জাতীয বিদ্যালয, ন্যাশনাল সার্কাস, ন্যাশনাল শিল্প, ন্যাশনাল পেপাব, জাতীয মেলা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকাব ন্যাশনাল বা জাতীয বিষযেব সূত্রপাত কবেন। যাব ফলে নবগোপাল মিত্রেব নামই হযে গিযেছিল 'ন্যাশনাল নবগোপাল'। এই কাজে নবগোপাল মিত্রেব সহযোগী ছিলেন কলকাতাব উচ্চবর্ণীয ও উচ্চবর্গীয শিক্ষিত ভদ্রলোকবৃন্দ। নবগোপাল মিত্র ও বাজনাবাযণ বসু স্থাপিত 'হিন্দু মেলা' নামটি থেকেই পবিষ্কাব যে, এটি ছিল সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদেবই উদ্যোগ, এবং এই উদ্যোগে মুসলমানবা ছিলেন না। 'হিন্দু মেলা' নাম হওযায খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই উদ্যোগে মুসমানদেব আকৃষ্ট হওযাব কথাও নয। ঊনবিংশ শতাব্দীব নব্বইযেব দশকে 'আর্যদর্শন' পত্রিকায এমনকি যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণও মন্তব্য কবেছিলেন, মেলাব নাম 'হিন্দু মেলা' না হযে 'ভাবত মেলা' হলেই ভালো হত।

ঊনবিংশ শতাব্দীব শেষ ভাগে কলকাতাব বিভিন্ন স্থানে কযেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিব উদ্যোগে বিভিন্ন 'আখড়া' গড়ে উঠেছিল। এই সকল 'আখড়া'য প্রধানত ডন, বৈঠক, মুগুব, কুস্তি প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাযাম শিক্ষা দেওযা হত। লাঠি খেলা, ছোবা খেলা, নানা প্রকাবেব শবীব চর্চা প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষা চলত এই 'আখড়া'গুলিতে। উত্তব কলকাতাব শঙ্কব ঘোষ লেনে নবগোপাল মিত্র একটি 'আখড়া' তৈবি কবেছিলেন, যেখানে যুবকেবা শবীবচর্চা কবতেন, অনুশীলন কবতেন লাঠি খেলা, ছোবা খেলা প্রভৃতি। শবীবচর্চা ও শক্তিচর্চাব অন্যতম অঙ্গ

হিসাবে বাঙালির কয়েকটি সার্কাস পার্টিও গড়ে উঠেছিল। এই সার্কাসগুলিতে বাঙালিরা দেশবিদেশে নানারকম ক্রীড়াকৌশল দেখিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছিলেন। শরীরচর্চার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে কলকাতা শহরের বিভিন্ন পাড়ায় জিম্‌ন্যাস্টিকের দল গড়ে উঠেছিল। গৌরহরি মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ বসাক প্রমুখ এই সকল বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গেই শরীরচর্চার অন্যতম উল্লেখযোগ্য সংস্থা হিসাবে রাধিকামোহন রায়ের 'ফ্রেণ্ড্‌স্ ইউনাইটেড ক্লাব' ('Friends United Club')-এর নামটিও আমাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। তারকনাথ দাস ও যতীন্দ্রনাথ শেঠ এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকেই কলকাতায় শরীরচর্চার জন্য 'আখড়া' প্রতিষ্ঠার পাশাপাশিই গুপ্ত সমিতির গড়ে ওঠাও শুরু হয়েছিল। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বাংলার নবজাগরণের যুগে সমগ্র দেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রধান ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি। বাংলার সর্বপ্রথম গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই ঠাকুরবাড়িতেই, যার উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান উদ্যোগে গঠিত এই গুপ্ত সমিতির নাম ছিল 'সঞ্জীবনী সভা'। সমিতির সভ্যদের গোপন ভাষায় এর নাম ছিল 'হান্‌চু পামু হাফ'। এই গোপন সমিতিটির প্রধান পরামর্শদাতা ও সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। বালক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই গোপন সমিতিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গোপন সমিতিটির ও তার ক্রিয়াকলাপের কথা লিখেছেন।

এই সকল 'আখড়া', শরীরচর্চার কেন্দ্র, গোপন সমিতি প্রভৃতি পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় প্রধানতম বিপ্লবী দল 'অনুশীলন সমিতি' গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করে রেখেছিল। এই 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠায় যাঁরা প্রধান উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই সতীশচন্দ্র বসুর কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সতীশচন্দ্র বসু কলকাতার প্রখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জেনারেল অ্যাসেম্বলি'জ্ ইন্‌স্টিটিউশন (পরবর্তী কালে স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে প্রসিদ্ধ)-এর ছাত্র ছিলেন। ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে তিনি একটি ব্যায়ামাগার খুলেছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকার শক্তিক্রীড়া শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছিলেন। গৌরহরি মুখোপাধ্যায়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজে সেই সময় ওই রকম ব্যায়ামচর্চার ব্যবস্থা হয়েছিল। সতীশচন্দ্র বসু গৌরহরি মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ ব্যায়াম-শিষ্য ছিলেন। এই ব্যায়ামাগারটি পরবর্তীকালে 'অনুশীলন সমিতি'র অন্যতম এক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

'অনুশীলন সমিতি' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যাঁরা প্রধান উদ্যোগ ও ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। পেশায় ব্যারিস্টার হলেও প্রমথনাথ মিত্র ছিলেন বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন, এবং স্বদেশের স্বাধীনতা লাভই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। প্রমথনাথ মিত্র, সতীশচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের প্রয়াসেই প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবী দল 'অনুশীলন সমিতি' গড়ে উঠেছিল।

১৯০২ সালের 'দোল পূর্ণিমা'র দিন, বাংলা—১০ চৈত্র ১৩০৮ সন, ইংরাজি—২৪

মার্চ ১৯০২, সোমবাব, কলকাতায প্রথম 'অনুশীলন সমিতি' স্থাপিত হয়েছিল। হেদুযাব নিকটবর্তী ২১, মদন মিত্র লেন (পববর্তীকালে এই বাড়িটিবই ঠিকানা হয়েছিল ২৪, মদন মিত্র লেন)-এ 'অনুশীলন সমিতি'-ব প্রধান ব্যাযামক্ষেত্রটি স্থাপিত হয়েছিল, এবং তাবই কাছে একটি ছোটো বাড়িতে এই সমিতিব প্রধান কার্যালয প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পববর্তী কালে ১৯০৫ সালে 'অনুশীলন সমিতি'ব এই প্রধান কার্যালযটি অক্সফোর্ড মিশন-এব উল্টোদিকে, ৪৯, কর্নওযালিস্ স্ট্রিট (স্বাধীনতা পববর্তী সমযে এই বাস্তাটিব নামকবণ কবা হয—বিধান সরণি) -এ স্থানান্তবিত হয়েছিল। সংক্ষেপে 'অনুশীলন সমিতি'-ব এই প্রধান কার্যালযটি 'উনপঞ্চাশ' বা 'ফর্টি-নাইন' হিসাবেই অভিহিত হত। এই সমিতিব সদস্যদেব প্রধান কার্যালযে মিলিত হওযাব এটিই ছিল সহজ সঙ্কেত।

২৪ মার্চ ১৯০২ 'অনুশীলন সমিতি' গঠিত হওযাব সমযই এই সমিতিব একটি সংবিধানও প্রণযন কবা হয়েছিল। সেই সংবিধান অনুযাযী 'অনুশীলন সমিতি'ব কার্যাদি পবিচালনাব জন্য একটি গভর্নিং কাউন্সিল বা কমিটি গঠন কবা হয়েছিল। 'অনুশীলন সমিতি' তথা তাব গভর্নিং কাউন্সিল বা কমিটি-ব প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন ব্যাবিস্টাব প্রমথনাথ মিত্র, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু, সহ-সভাপতি ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন সুবেন্দ্রনাথ ঠাকুব। পববর্তীকালে ১৯০৩-০৪ সালে কলকাতায আসবাব পব অববিন্দ ঘোষকে 'অনুশীলন সমিতি'ব দ্বিতীয সহ-সভাপতি কবা হয়েছিল।

জাতীয জীবনেব এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে 'অনুশীলন সমিতি'ব উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও 'সাহিত্য-সম্রাট' হিসাবে সুবিদিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযেব অনুশীলন তত্ত্বে শাবীবিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সমন্বিত আদর্শ মানব গঠনের যে নির্দেশ আছে, সেটিই হল 'অনুশীলন সমিতি'ব ভিত্তি।

'অনুশীলন সমিতি'ব প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক প্রমথনাথ মিত্র 'অনুশীলন সমিতি'ব আর্থিক দাযদাযিত্ব গ্রহণ কবেছিলেন। তাঁব সঙ্গে এই বিষযে চিত্তবঞ্জন দাশ, সুবেন্দ্রনাথ হালদাব, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায, বজত বায, এইচ ডি বসু প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যাবিস্টাবগণ পূর্ণ সহযোগিতা কবেছিলেন। এমনকি হাইকোর্টেব তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যবহাবজীবী বাসবিহাবী ঘোষ এবং বিচাবপতি সাবদাচবণ মিত্রও এই বিষযে প্রমথনাথ মিত্রকে যথেষ্ট সাহায্য কবেছিলেন।

প্রথম বিপ্লবী দল 'অনুশীলন সমিতি'ব প্রতিষ্ঠা ভাবতেব স্বাধীনতা সংগ্রামেব ইতিহাসে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

৪

বৈপ্লবিক সংগঠন হিসাবে অনুশীলন সমিতিব বিকাশ ও ক্রিযাকলাপ

১৯০২ সালেব ২৪ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হওযাব পব থেকেই নানা ঘাত-প্রতিঘাতেব মধ্য দিয়ে অনুশীলন সমিতিব বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৯০৩ সালেব গোড়াব দিকে ববোদা থেকে অববিন্দ ঘোষেব মাধ্যমে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায নামে এক বিপ্লবী যুবক অনুশীলন সমিতিতে যোগ

দেন। উত্তর কলকাতার ১০৮, আপার সার্কুলার রোডে অনুশীলন সমিতির অন্যতম কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ওই কেন্দ্রে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুশীলন সমিতিতে নবাগত যুবকদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে শিক্ষা ও দীক্ষা দেওয়া শুরু-করেছিলেন। ১৯০৩ সালের জুন-জুলাই মাস নাগাদ অরবিন্দ ঘোষের ভাই বারীন্দ্রনাথ ঘোষ বরোদা থেকে কলকাতায় এসে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। অনুশীলন সমিতির কর্মকাণ্ডের মধ্যে সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল বৈপ্লবিক প্রস্তুতির।

কিন্তু বারীন্দ্রনাথ ঘোষ অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেওয়ার সময় থেকেই সমিতির মধ্যে শুরু হল নেতৃত্বের সংঘাত। যতীন্দ্রনাথের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও সামরিক বাহিনীসুলভ প্রখর শৃঙ্খলাপরায়ণতা রোম্যান্টিক মনের 'খেয়ালী ভাবুক', শৃঙ্খলাহীন বারীন্দ্রনাথের একেবারেই পছন্দসই ছিল না। বারীন্দ্রনাথের প্রবল অহমিকাও যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল যতীন্দ্র-বারীন্দ্র দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। এই বিরোধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল, তার নিষ্পত্তি ঘটাতে স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষকে ১৯০৪ সালে বরোদা থেকে কলকাতায় ছুটে আসতে হয়েছিল। কিন্তু অরবিন্দও যতীন্দ্র-বারীন্দ্র দ্বন্দ্ব মেটাতে ব্যর্থ হয়ে ও কোনও নিষ্পত্তি করতে না পেরে যতীন্দ্রনাথকে অনুশীলন সমিতি থেকে বহিষ্কার করলেন। সেটা ছিল ১৯০৪ সালের কথা। প্রবল ভ্রাতৃস্নেহই অরবিন্দকে যতীন্দ্রনাথের প্রতি এই অন্যায়-অবিচারের পথে নিয়ে গেছিল এবং এ ক্ষেত্রে অরবিন্দের আচরণ ও সিদ্ধান্ত ছিল চরম পক্ষপাতপুষ্ট ও একদেশদর্শী। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র কানুনগো, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ সেই যুগের সকল খ্যাতনামা বিপ্লবীই এই বিষয়ে একমত ছিলেন যে, যতীন্দ্রনাথের প্রতি চরম অবিচার করা হয়েছিল। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রমথনাথ মিত্র সমিতি থেকে যতীন্দ্রনাথের বহিষ্কারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক সতীশচন্দ্র বসুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যতীন্দ্রনাথকে আশ্রয় দিতে ও বারীন্দ্রনাথের পক্ষ অবলম্বন না করতে। শুধু তাই নয়, অতীব ক্রুদ্ধ প্রমথনাথ বারীন্দ্রনাথ ও তাঁর গোষ্ঠীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করেছিলেন।

অনুশীলন সমিতি থেকে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহিষ্কারের ফলে সমিতির বিকাশ ও বৈপ্লবিক প্রয়াস প্রথমেই এক জোর ধাক্কা খেল। তার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রাথমিক পর্বেই অনুশীলন সমিতি একজন অত্যন্ত দক্ষ বিপ্লবী নেতা ও সংগঠককে হারাল।

এ কথা ঠিকই যে, অনুশীলন সমিতির এই বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের একেবারে প্রাথমিক পর্বে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পার্ক সার্কাসের কড়েয়া অঞ্চলে এক সাহেবের হাত থেকে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনও অ্যাকশন ঘটাতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর বিপ্লবী নেতৃত্বসুলভ গুণাবলি ও অবদান নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না। অনুশীলন সমিতিতে তিনি যে শুধু শরীরচর্চা ও শক্তিচর্চার ওপর জোর দিয়েছিলেন, তা নয়, তাঁর আখড়ায় বা কেন্দ্রে নিয়মিত আলোচনাসভার ব্যবস্থা করে তিনি বিপ্লবী যুবকদের দেশ-বিদেশের বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কাহিনি জানবার এবং ভারতীয় অর্থনীতি-সংক্রান্ত এক ধারণা জন্মাবার সুযোগও

কবে দিযেছিলেন। বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডেব এক ব্যাপক পবিকল্পনা তাঁর মাথায ছিল। অনুশীলন সমিতি থেকে তাঁব বহিষ্কাবেব ফলে সমিতি তাঁব বৈপ্লবিক পবিকল্পনাসমৃদ্ধ এই নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হল।

অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওযাব পব প্রথম দুই-আড়াই বছবেব ঘটনাবলি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ কবলে আমবা দেখতে পাই যে, বিপ্লবী উদ্যোগেব সূত্রপাত ঘটলেও এবং বিপ্লবী প্রযাস শুরু হলেও প্রকৃতপক্ষে কাজ তেমন কিছুই এগোয নি। অবশ্য সলতে পাকানোব কাজটা নিঃসন্দেহেই শুরু হযে গিযেছিল। বঙ্গভঙ্গেব সাম্রাজ্যবাদী সিদ্ধান্ত ও তাব বিরুদ্ধে প্রবল জনমত ও প্রতিক্রিযা এবং দেশ-বিদেশেব আনুষঙ্গিক ঘটনাবলি যুবমানসে সঞ্চাব কবেছিল প্রবল উত্তেজনা-উন্মাদনা। তাব ফলেই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডেব পালে লাগল নতুন কবে বাতাস। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী গণজাগবণ ও স্বদেশি আন্দোলন এবং অনুশীলন সমিতিব বৈপ্লবিক ক্রিযাকলাপ একে অপবেব অঙ্গীভূত হযে গেল, অনুশীলন সমিতিব বিপ্লবী কর্মকাণ্ড অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িযে গেল উদ্ধত ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ কৃত বঙ্গভঙ্গেব সক্রিয বিবোধিতা ও স্বদেশি আন্দোলনেব সঙ্গে। পববর্তী কযেক বছবব্যাপী অনুশীলন সমিতিব বৈপ্লবিক প্রযাস ও ক্রিযাকলাপ সম্পর্কিত আলোচনা বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলন-সংক্রান্ত আলোচনাবই অন্তর্ভুক্ত। স্বদেশি আন্দোলনেব সাফল্য ও অনুশীলন সমিতিব বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডেব সাফল্য এবং স্বদেশী আন্দোলনেব সীমাবদ্ধতা-ব্যর্থতা ও অনুশীলন সমিতিব বিপ্লবী ক্রিযাকলাপেব সীমাবদ্ধতা-ব্যর্থতা, একে অপবেরই প্রতিরূপ।

৫
স্বদেশি আন্দোলন ও অনুশীলন সমিতি

ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রেব প্রত্যাশা ছিল, বঙ্গভঙ্গেব সিদ্ধান্তেব বিরুদ্ধে যাবতীয প্রতিবাদ কিছু দিনেব মধ্যেই স্তব্ধ হযে যাবে, আব এই প্রতিবাদ সভা-সমিতি, আবেদন-নিবেদনেব গতানুগতিক পথেব বাইবে যাবে না। কিন্তু আমলাতন্ত্রেব দুর্ভাগ্যবশত তাদেব সেই প্রত্যাশা পূর্ণ হযনি। ১৯০৫ সালেব জুলাই মাস পর্যন্ত প্রথাগত 'নবমপন্থী' পদ্ধতিতে, অর্থাৎ পত্র-পত্রিকায প্রচাব, সভা-সমিতি, আবেদন-নিবেদন-দবখাস্তেব মাধ্যমে, বঙ্গভঙ্গেব বিবোধিতা কবা হলেও এই ধবনেব ক্রিযাকৌশলেব সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ ব্যর্থতাব থেকেই শুরু হযেছিল বঙ্গভঙ্গেব প্রশাসনিক সিদ্ধান্তেব বিবোধিতাব নতুন পথেব সন্ধান। আব সেই সন্ধানই নিযে গিযেছিল বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনকে এক নতুন পথে, আন্দোলনেব নতুন পদ্ধতি হিসাবে এসেছিল ব্রিটিশ দ্রব্য বযকট। ১৯০৫ সালেব জুলাই মাস থেকেই বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তার প্রথাগত বাঁধা বাস্তা ছেড়ে বেবিযে এল, আব বিভিন্ন ধবনেব নতুন নতুন জঙ্গি কৌশল উদ্ভাবনেব মাধ্যমে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষকেই এই আন্দোলনেব পবিধিব মধ্যে টেনে আনল। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন জাতীয জনজীবনে সঞ্চাব কবল এক অভূতপূর্ব সংগ্রামী উন্মাদনা।

একইসঙ্গে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলিও এই উন্মাদনা-উদ্দীপনা সঞ্চাবে এক বড

ভূমিকা গ্রহণ কবেছিল। বুযব যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তিব পবাজয, ১৯০৪-০৫ সালে বাশিযাব বিরুদ্ধে জাপানেব জয, অর্থাৎ ইউবোপেব বিরুদ্ধে এশিযার জয, চীনে মার্কিন দ্রব্য বযকট, বাশিযায স্বৈরতন্ত্রেব বিরুদ্ধে গণ-বিপ্লব—এই সমস্ত কিছুই ভাবতেব জাতীযতাবাদী নেতৃত্বেব মনে ভবসা ও গর্বেব সৃষ্টি কবেছিল। এশিযাব একটি ছোটো দেশ জাপানেব হাতে বাশিযাব পবাজয প্রতীত হতে থাকে পাশ্চাত্য শক্তিব বিরুদ্ধে প্রাচ্যেব বিজয হিসাবে। জাপানেব সাহায্যার্থে বিভিন্ন অনুষ্ঠানেব আযোজন কবা হযেছিল। এই বকম পবিস্থিতিতেই এসেছিল বঙ্গভঙ্গেব ঘোষণা। বঙ্গভঙ্গেব এই ঘটনাকে সমগ্র জাতিব অবমাননা হিসাবেই গণ্য কবা হযেছিল। বঙ্গভঙ্গেব মাধ্যমে জাতীয অপমানেব প্রতিবাদেব সঙ্গে বাশিযাব বিরুদ্ধে জাপানেব জযলাভেব মধ্য দিযে আত্মবিশ্বাস অর্জন নবোদিত বিপ্লবী আন্দোলনেব মধ্যেও নতুন কবে প্রাণেব সঞ্চাব কবেছিল, নতুন কবে উৎসাহ অর্জন কবে আবও বেশি সক্রিয হযে উঠেছিল অনুশীলন সমিতি।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী গণ বিক্ষোভ অনুশীলন সমিতিকে এই অতি প্রযোজনীয সক্রিযতা দেওযায তৎকালীন বাংলাব বিভিন্ন জেলায এবং এমনকি বাংলাব বাইবেও অনুশীলন সমিতিব কর্মকাণ্ড প্রসাবিত হযেছিল, গড়ে উঠেছিল অনুশীলন সমিতিব শাখা। কলকাতাব পাশাপাশিই ঢাকা, ফবিদপুব, জলপাইগুড়ি, ববিশাল, মযমনসিংহ, চট্টগ্রাম, বাজশাহি, দিনাজপুব, কুমিল্লা, বংপুব, ফবিদপুব, কটক প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে অনুশীলন সমিতিব শাখা প্রতিষ্ঠিত হযেছিল। এব থেকেই বোঝা যায যে, সেই সময জনমানসে অনুশীলন সমিতিব প্রভাব কীবকম তীব্র ছিল। ঢাকা অনুশীলন সমিতিব কর্ণধাব ছিলেন স্বনামধন্য পুলিনবিহাবী দাস, অনুশীলন সমিতিব পাশাপাশিই ঢাকার মুক্তি সংঘ, ফবিদপুবেব ব্রতী সমিতি, মযমনসিংহেব সাধনা সমিতি ও সুহৃদ্ সমিতি, এবং স্বদেশী মণ্ডলী, সন্তান সম্প্রদায, বন্দেমাতবম্ সম্প্রদায প্রভৃতি একাধিক গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। এই গুপ্ত সমিতিগুলি কঠোব শপথ গ্রহণ কবে দেশব্রতে নেমেছিল।

সুতবাং ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলন সূচনা হওযাব সময থেকেই একদিকে যেমন অনুশীলন সমিতি ক্রমশ শক্তিশালী হযে উঠতে থাকে, তেমনই পাশাপাশি বাংলাব অঞ্চলে অঞ্চলে বিভিন্ন ধবনেব সমিতিও গড়ে উঠতে থাকে। এই সমিতিগুলিব মধ্যে বিশেযভাবে উল্লেখযোগ্য কযেকটি ছিল মযমনসিংহেব শক্তি সমিতি ও সাধনা সমিতি, ফবিদপুবেব ব্রতী সমিতি (১৯০৬), ববিশালেব স্বদেশবান্ধব সমিতি (১৯০৫), চন্দননগবেব গোন্দলপাড়ায বান্ধব সম্মিলনী, চব্বিশ পবগনাব চিংড়িপোতায স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আড়বেলিযাব একটি সমিতি, ঢাকাব মুক্তি সংঘ (১৯০৫), ঢাকা অনুশীলন সমিতি (১৯০৫), মাদাবিপুব সমিতি (১৯০৬), বংপুবেব একটি সমিতি প্রভৃতি।

মযমনসিংহেব সুহৃদ্ সমিতি, মেদিনীপুবেব সমিতি, কলকাতায অনুশীলন সমিতি, আত্মোন্নতি সমিতি, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযেব আখড়া, বালিগঞ্জ সবলা দেবীব আখড়া ইত্যাদি আগেই গড়ে উঠেছিল। ১৯০৪ সালেই উত্তব কলকাতাব বামবাগান অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস্ ক্লাব। এই স্বদেশি আন্দোলনেব যুগেই কলকাতাব বিভিন্ন অঞ্চলে আবও বেশ কযেকটি সমিতিব পত্তন হযেছিল।

১৯০৩ সালেই অতীন্দ্রনাথ বসু স্থাপন করেছিলেন মহেশালয় নামে একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯০৫ সালে অতীন্দ্রনাথ বসু ভারত ভাণ্ডার নামে আরও একটি সংগঠন গঠন করেছিলেন।

অন্যান্য সংগঠনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আহিরীটোলায় ললিতমোহন ঘোষালের শক্তি সমিতি, মধ্য কলকাতায় ইন্দ্রনাথ নন্দীর ছাত্র ভাণ্ডার, ভবানীপুরে কবি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের স্বদেশসেবক সমিতি, ব্রতী সমিতির কলকাতা শাখা, দরজিপাড়া, পটল-ডাঙা, খিদিরপুর, সালকিয়া অঞ্চলে সমিতির বিভিন্ন শাখা, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি, নারকেলডাঙা অঞ্চলের ষষ্ঠীতলায় সাধনা সমিতি, কালীঘাটের সন্তান সম্প্রদায় প্রভৃতি।

এখানে যে সমিতিগুলির নাম উল্লেখ করা হল, সেগুলি ছিল আসলে বিভিন্ন ধরনের। এই সমিতিগুলির চরিত্র বা কাজের ধারা কোনওমতেই একই ধরনের ছিল না। এই সমিতিগুলির মধ্যে কোনও-কোনওটি ছিল প্রধানত সমাজসেবা ও শরীরচর্চার কেন্দ্র, কোনও-কোনওটির কাজ ছিল কেবল স্বদেশি ভাবধারা প্রচার, আবার কোনও-কোনওটির মধ্যে নিহিত ছিল গুপ্ত বিপ্লবী রাজনীতির বীজ, যা প্রকাশের অপেক্ষায় প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

১৯০৬ সালের একটি গোপন সরকারি রিপোর্টে এইসব বিভিন্ন ধরনের সমিতির নাম ও উল্লেখ পাওয়া যায়। ওই রিপোর্টে উল্লিখিত সমিতিগুলির কয়েকটির নাম এখানে দেওয়া হল বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়, স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন, ডন সোসাইটি, জাতীয় ধন ভাণ্ডার, সঙ্গীত সমাজ, ব্রতী সমিতি, অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি, বেঙ্গল স্টোর, স্টুডেন্টস্ নিউ অ্যাসোসিয়েশন, ছাত্র ভাণ্ডার, ভারত অনুশীলন সমিতি, সরলা দেবীর আখড়া (ফেন্সিং ক্লাব—'Fencing Club') প্রভৃতি। উক্ত রিপোর্টে বিভিন্ন সমিতির সম্পর্কে হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, অনুশীলন সমিতির 'গোপন উদ্দেশ্য' আছে। ছাত্র ভাণ্ডার নামে দোকান হলেও তার উদ্দেশ্যও ওই একই ধরনের, আর বেঙ্গল স্টোরের উদ্দেশ্যও সম্ভবত সন্দেহজনক। ওই রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছিল, ভারত অনুশীলন সমিতি (অনুশীলন সমিতি একেবারে গোড়ার দিক এই নামেই পরিচিত ছিল), ছাত্র ভাণ্ডার এবং বেঙ্গল স্টোরের ওপর বিশেষ 'কড়া নজর' রাখার প্রয়োজন আছে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতে, এবং বিশেষ করে বাংলায়, রাজনৈতিক সচেতনতার উদ্ভব, বিকাশ ও প্রসারের কাজে সংবাদপত্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বিপ্লবী শক্তি জাতীয় চেতনাকে বিপ্লবী চেতনায় পরিণত করার কাজে সংবাদপত্রকেই এক প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিল। তৎকালীন বাংলা দেশে বাংলায় সংবাদপত্র এবং পত্র-পত্রিকার প্রকাশ বৈপ্লবিক চেতনাকে ইংরাজি শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাইরে নিয়ে এসে আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল।

বাংলায় সংবাদপত্র এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে স্বাধীনতার দাবি প্রতিষ্ঠা এবং বৈপ্লবিক সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রসারের কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত সান্ধ্য বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র—'সন্ধ্যা'। 'সন্ধ্যা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর। জঙ্গি জাতীয়তাবাদী ও বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচারের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক

শাসন বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনকে স্বল্পশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করার কাজে 'সন্ধ্যা' এক অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

'সন্ধ্যা' পত্রিকার প্রবল জনপ্রিয়তায় উৎসাহিত হয়ে অনুশীলন সমিতির তিন বিপ্লবী তরুণ বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রকাশ্যে বিপ্লবী চিন্তাধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সেই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হল ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে এই বিপ্লবী তরুণদের প্রয়াসে ২৭, কানাই ধর লেন থেকে প্রকাশিত হল বাংলা সাপ্তাহিক 'যুগান্তর'। পরবর্তীকালে 'যুগান্তর' পত্রিকার অফিস ২৭, কানাই ধর লেন থেকে ৪১, চম্পাতলা (চাঁপাতলা) ফার্স্ট লেনে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে শুরু হয়ে ১৯০৮ সালে 'যুগান্তর' সাপ্তাহিকীর প্রচার সংখ্যা কুড়ি হাজারে গিয়ে পৌঁছেছিল। 'যুগান্তর' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব বিপ্লবীই ছিলেন অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য।

অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রধান শাখা হিসাবে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রমথনাথ মিত্রের উপস্থিতিতে গঠিত হয়েছিল ঢাকা অনুশীলন সমিতি। ঢাকা অনুশীলন সমিতির পরিচালক নির্বাচিত হয়েছিলেন সুদক্ষ সংগঠক পুলিনবিহারী দাস। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ই প্রায় তিয়াত্তর জন যোগ দিয়েছিলেন এই সমিতিতে। ছয় মাস পরে কলকাতায় এসে প্রমথনাথ মিত্রের কাছে অনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন পুলিনবিহারী দাস।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে দমন করে সমূলে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার একটি কুখ্যাত ফতোয়া জারি করেছিল। এই কুখ্যাত ফতোয়াটির নাম ছিল কার্লাইল সার্কুলার। এই কার্লাইল সার্কুলারে বলা হয়েছিল যে, ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতি করলে বা এমনকি 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিলে অথবা গাইলেই তাদের স্কুল-কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এই সার্কুলারে এমনও বলা হয়েছিল যে, শিক্ষকেরা যদি পরোক্ষভাবেও ছাত্রছাত্রীদের সমর্থন করেন, তবে তাঁদের বরখাস্ত করা হবে, এবং অভিভাবকরা যদি তাঁদের সন্তানদের ফেরাতে না পারেন, তবে তাঁদেরও চাকরি যাবে। কার্লাইল সার্কুলার নামক এই কালা সার্কুলারটির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক প্রশাসন এই মর্মেই দেশবাসীকে ভয় দেখাতে শুরু করল। কলকাতার বিদ্রোহী ছাত্রসমাজ কার্লাইল সার্কুলারের বয়ান ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালের ৪ নভেম্বর কলেজ স্কোয়ারে পাঁচ হাজার ছাত্র সভা করেছিলেন। এই সভা থেকেই তৈরি হয়েছিল অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি। এই অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির প্রধান দুই ছাত্র নেতা ছিলেন শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু এবং রমাকান্ত রায়। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ছিলেন অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি আদ্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ এক সংগঠন ছিল। এই সোসাইটি হিন্দু পুনরুত্থানবাদ বা হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল, এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজে প্রয়াসী হয়েছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান পছন্দ করে নি, কারণ এই অনুষ্ঠানের ফলে মুসলমানদের মনে আঘাত লাগতে পারে। এই বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি তার সমসাময়িক

অন্যান্য সমিতি-সংগঠনের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। বাংলায় সেই যুগে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের ক্ষেত্রে অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির ভূমিকা ও অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯০৬ সাল থেকেই অনুশীলন সমিতির মধ্যে আবার শুরু হল নেতৃত্বের সংঘাত। এবারে সংঘাত দেখা দিল প্রবীণে-নবীনে। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক প্রমথনাথ মিত্রের কর্মপদ্ধতি বিপ্লবী তরুণদের আকৃষ্ট করতে ক্রমশই ব্যর্থ হচ্ছিল। বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, উল্লাসকর দত্ত, দেবব্রত বসু, অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং অপরাপর বিপ্লবী তরুণদের বেশ বড় একটি অংশই প্রমথনাথ মিত্রের 'নীরব শরীরচর্চার নীতি'-তে সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে পথ বদল করে সরাসরি সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে ঢুকতে চাইলেন। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অবিনাশ ভট্টাচার্যের মিলিত উদ্যোগে বিপ্লবী চিন্তাধারা প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হল 'যুগান্তর' পত্রিকা। 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশের পেছনে ছিল অরবিন্দ ঘোষের পরামর্শ এবং ভগিনী নিবেদিতার উৎসাহ। এই পত্রিকার নাম ধরেই অনুশীলন সমিতির সশস্ত্র বিপ্লবকামী এই তরুণ অংশটি বাংলায় 'যুগান্তর' বিপ্লবী দল নামে পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। সুতরাং এই বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই যে, বাংলায় বিপ্লবী রাজনীতিতে বোমা-পিস্তল-বন্দুকের প্রবর্তন করেছিলেন বারীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং তাঁর সহযোগী বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। অর্থাৎ বাংলায় ১৯০৬ সাল থেকেই 'যুগান্তর' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সম্মিলিত অনুশীলন সমিতির এই তরুণ বিপ্লবীদের উদ্যোগেই অগ্নিনালিকার রাজনীতির সূত্রপাত, যে রাজনীতি দুর্মর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজশক্তির শিরদাঁড়ায় কাঁপন ধরিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল। এই সময় থেকেই বারীন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বাধীন এই তরুণ বিপ্লবীবৃন্দ প্রমথনাথ মিত্রের নেতৃত্বাধীন অনুশীলন সমিতির মূল অংশটি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীনভাবে সশস্ত্র বিপ্লবী কাজকর্ম চালাতে শুরু করেছিলেন। শুরু হল বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী রাজনীতির এক নতুন অধ্যায়, বাংলায় শুরু হল 'বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ'।

বরিশালের পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে বারীন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বাধীন তরুণ বিপ্লবীরা তাঁদের প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবী আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছিলেন পূর্ব বাংলার ও আসামের তৎকালীন গভর্নর, অত্যাচারী ছোটোলাট ব্যামফিল্ড ফুলার (Bamptylde Fuller)-কে। সেই আক্রমণ ব্যর্থ হলে বিপ্লবীরা ফুলারকে হত্যার জন্য একাধিকবার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। ফুলারের যাবতীয় অত্যাচার-নির্যাতনকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার যে দুর্ধর্ষ স্পর্ধা সেই সময়কার বিপ্লবীরা দেখিয়েছিলেন, তা অমর হয়ে আছে কবিতার এই দুটি লাইনে

'ফুলার মোদের আর কি দেখাও ভয়
দেহ তোমার অধীন বটে মন তো তোমার নয়'॥

ফুলারের পর বিপ্লবীরা আক্রমণের লক্ষ্য করেছিলেন বাংলার তৎকালীন ছোটোলাট লেফ্‌টেন্যান্ট্‌-গভর্নর অ্যান্ড্রু ফ্রেজার (Andrew Fraser)-কে। ১৯০৭ সালের ৬ ডিসেম্বর মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে বারীন্দ্রনাথ ঘোষ ও তাঁর সহযোগী বিপ্লবীবৃন্দ ডিনামাইট দিয়ে ছোটোলাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের ট্রেনটি উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই প্রয়াসটিও ব্যর্থ হওয়ার পরও বিপ্লবীরা ফ্রেজারকে হত্যার জন্য আরও কয়েকবার চেষ্টা চালিয়েছিলেন, যদিও সেই চেষ্টা কোনওবারেই সফল হয় নি।

১৯০৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিপ্লবীরা ঢাকার পূর্বতন ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেন (Allen)-কে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাতে তিনি সামান্য আহত হয়েছিলেন। কুষ্টিয়ার পাদরি হিকেন বথাম (Hicken Bothan)-এর ওপরও বিপ্লবীরা গুলি চালিয়েছিলেন। ১৯০৮ সালের ১১ এপ্রিল বিপ্লবীদের উদ্যোগে চন্দননগরের স্বৈরাচারী মেয়র তাদ্দিভেলের বাড়িতে বোমা ফেলা হয়েছিল। এইভাবেই সশস্ত্র বিপ্লবীদের উদ্যোগে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বাংলার বাইরেও দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঔপনিবেশিক এই রাজশক্তির প্রতিনিধিদের ওপর এবং এই রাজশক্তির পদলেহী দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের ওপর আক্রমণ চলতে থাকে। এই বৈপ্লবিক আক্রমণ ও নিধন প্রয়াসে আতঙ্কিত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজশক্তি নির্বিচার দমনপীড়ন, গ্রেফ্‌তার ও নির্বাসনের পথ গ্রহণ করল, কিন্তু তাতে বিপ্লবী আন্দোলনকে দমানো গেল না।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড (Kingsford) ছিলেন চরম স্বৈরাচারী। বাংলার অগ্নিনালিকার রাজনীতি অবলম্বনকারী বিপ্লবীদের বিনাশ করার উদ্দেশ্যে তিনি নানাবিধ অত্যাচারের পথ গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনের পথের কাঁটা কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য বিপ্লবীরা অঙ্গীকার-বদ্ধ হয়েছিলেন। বিপদ বুঝে কিংসফোর্ড মজঃফরপুরে বদলি নিয়ে চলে যাওয়ায় বিপ্লবীরা সেখানেই কিংসফোর্ডকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। পরিকল্পনামাফিক দুই তরুণ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল কিংসফোর্ডের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়। কিংসফোর্ডের গাড়ির পরিবর্তে ভুল ফিটন গাড়ির ওপর বোমা ছোঁড়া হওয়ায় স্থানীয় আইনজীবী কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা, দুই নিরপরাধ ইউরোপিয়ান, মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি মারা যান। পুলিশ ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো বিপ্লবী আন্দোলনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্ষুদিরাম বসুকে পুলিশ গ্রেফ্‌তার করতে সমর্থ হয়। কিন্তু প্রফুল্ল চাকী পুলিশের গ্রেফ্‌তারি এড়িয়ে আত্মহত্যা করেন। বিচারকের রায়ে ১৯০৮ সালের ১১ অগস্ট তরুণ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়েছিল। শহিদ ক্ষুদিরাম সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতীকে পরিণত হলেন।

কিংসফোর্ডের ওপর আক্রমণের পরিকল্পনার সূত্র ধরেই ওই বোমা নিক্ষেপের দু-দিন পরেই পুলিশ মানিকতলা অঞ্চলের ৩২, মুরারিপুকুর রোডের বাগানবাড়িতে ব্যাপক তল্লাসি চালিয়েছিল। ওই বাগানবাড়িটিই ছিল এই বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা, যেখানে বোমা বানানোর কারখানা তৈরি করা হয়েছিল। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের অপেশাদারত্ব ও অসাবধানতার কারণে ওই গোপন আস্তানা থেকে পুলিশ অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো, অবিনাশ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ৪৭ জন বিপ্লবীকে গ্রেফ্‌তার করতে এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিল।

এই গ্রেফ্‌তারির পরই পুলিশ বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে শুরু করেছিল আলিপুর বোমার মামলা'। এই 'আলিপুর বোমার মামলা'-র সূত্র ধরেই কলকাতা ও মেদিনীপুর থেকে আরও বেশ কয়েকজন বিপ্লবীকে গ্রেফ্‌তার করা হয়েছিল। 'আলিপুর বোমার মামলা' প্রায় এক বছর ধরে চলেছিল। এই মামলায় বিপ্লবীদের হয়ে সওয়াল

কবেছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী চিত্তবঞ্জন দাশ। মামলা চলাকালীনই নবেন গোঁসাই বিশ্বাসঘাতকতা কবে বাজসাক্ষী হযে যাওযায অকুতোভয দুই বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু জেলেব মধ্যেই নবেন গোঁসাইকে গুলি কবে হত্যা কবেছিলেন। দিনটি ছিল ২৮ অগস্ট ১৯০৮। বিচাবে কানাইলাল দত্তেব ফাঁসি হযেছিল ১০ নভেম্বব ১৯০৮ এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুব ফাঁসি হযেছিল ২১ নভেম্বব ১৯০৮।

চিত্তবঞ্জন দাশেব সুবিখ্যাত সওযালে 'আলিপুব বোমাব মামলা'-ব মূল আসামি অববিন্দ ঘোষ বেকসুব খালাস পেলেও ওই মামলায অভিযুক্ত অন্যান্য বিপ্লবীদেব প্রায সকলেবই দ্বীপান্তব বা দীর্ঘমেযাদি কাবাদণ্ড হযেছিল।

এবপবই বাংলাব বিপ্লবী আন্দোলনেব প্রধান কেন্দ্র হযে উঠেছিল পূর্ব বাংলাব ঢাকা। পুলিনবিহাবী দাসেব নেতৃত্বাধীন ঢাকা অনুশীলন সমিতিই ছিল এই সমযকাব বিপ্লবী কাজকর্মেব পুবোভাগে। বিচ্ছিন্নভাবে মেদিনীপুবে ও চন্দননগবে বিপ্লবী কাজকর্ম চললেও পুলিন দাসেব নেতৃত্বাধীন ঢাকা অনুশীলন সমিতিই ছিল এই সমযকাব প্রধানতম বিপ্লবী শক্তি। অত্যন্ত দক্ষ ও দৃঢভাবে সংগঠিত ঢাকা অনুশীলন সমিতিব সর্বপ্রথম ও প্রধান উদ্যোগ ছিল বডা ডাকাতি—২ জুন ১৯০৮। পববর্তী উল্লেখযোগ্য স্বদেশি ডাকাতি হল ফবিদপুব জেলাব নাবিযাতে—৩০ অক্টোবব ১৯০৮। এই ভাবেই এই সমযকাব বিপ্লবী কাজকর্মেব ধাবক ও বাহক ছিল ঢাকা অনুশীলন সমিতি।

১৯০৮ সালেব ১৬ ডিসেম্বব পুলিনবিহাবী দাস সহ নয জন প্রথম সাবিব নেতৃস্থানীয বিপ্লবীকে গ্রেফ্তাব কবে নির্বাসিত কবা হযেছিল। 'আলিপুব বোমাব মামলা'-য অভিযুক্ত দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদেব দীর্ঘমেযাদি কাবাদণ্ড ও দ্বীপান্তব দণ্ড দেওযাব পাশাপাশিই ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সবকাব ১৯০৯ সালেব জানুযাবি মাসে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তব দলকে নিষিদ্ধ কবে আবও বেশি মাত্রায দমন-নিপীডনেব পথে অগ্রসব হল। নিষিদ্ধ হল ঢাকা অনুশীলন সমিতি, ববিশালেব স্বদেশবান্ধব সমিতি, ফবিদপুবেব ব্রতী সমিতি, এবং মযমনসিংহেব সুহৃদ্ সমিতি ও সাধনা সমিতি। বাংলাব বিপ্লবী আন্দোলনেব সম্পূর্ণ কণ্ঠবোধ কবা অবশ্য ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ বাজশক্তিব পক্ষে সম্ভবপব হয নি। সমস্ত দমন-নিপীডনকে অগ্রাহ্য কবেই গোপনে বৈপ্লবিক কাজকর্ম চলতেই থাকে। তাতে সঞ্চাব হয নতুন ও অদম্য প্রাণশক্তিব, কোনও অস্ত্রেই যাকে দমন কবা সম্ভব হয না।

ঢাকা অনুশীলন সমিতিব প্রাণপুরুষ ও প্রধান নেতা পুলিনবিহাবী দাসেব গ্রেফ্তাবি ও নির্বাসনেব পব নবেন সেন, প্রতুল গঙ্গোপাধ্যায, মাখনলাল সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, নগেন দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীবা অনুশীলন সমিতিব নেতৃত্বভাব গ্রহণ কবেছিলেন। এব পবই চন্দননগবেব মতিলাল বায ও বাবাণসীব শচীন্দ্রনাথ সান্যালেব সঙ্গে অনুশীলন সমিতিব বিপ্লবী নেতৃবৃন্দেব যোগাযোগ গডে উঠেছিল। ১৯১১ সালেব ফেব্রুযাবি মাসে দুর্ধর্ষ বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায ('বাঘা যতীন' নামেই প্রসিদ্ধ) 'হাওডা ষডযন্ত্র মামলা' থেকে মুক্তি পাওযাব পব বাংলাব সব বিপ্লবী দলকে এক জাযগায এনে সম্মিলিত কবে বিপ্লবী আন্দোলনে নতুন কবে প্রাণসঞ্চাবেব কাজে প্রযাসী হলেন। তাঁব আহ্বানে সাডা দিযে নবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

(পববর্তীকালে মানবেন্দ্রনাথ বায়) যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায, অতুল ঘোষ, হবিকুমাব চক্রবর্তী, সুবেন্দ্রমোহন ঘোষ, যোগেন দে সরকাব, সতীশ চক্রবর্তী, নবেন ঘোষ, মনোবঞ্জন গুপ্ত, বিজয বায, পূর্ণ দাস এবং আবও বহু বিপ্লবী তরুণ ঔপনিবেশিক বাজশক্তিব অবসান ঘটিযে মাতৃভূমিব শৃঙ্খলমোচনেব শপথ নিযে সংঘবদ্ধ হলেন। বাংলাব বিপ্লবী আন্দোলন নতুন কবে প্রাণশক্তি অর্জন কবে নতুন কবে আঘাত হানাব জন্য প্রস্তুত হল।

আতঙ্কিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ বদ কবাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবল। ১৯১১ সালেব ১১ ডিসেম্বব ব্রিটেনেব তৎকালীন বাজা পঞ্চম জর্জ (King George, the Fifth) বঙ্গভঙ্গেব সিদ্ধান্ত বাতিল কবাব কথা ঘোষণা করলেন। বদ হযে গেল বঙ্গভঙ্গ, 'আনসেট্‌ল্‌ড্' ('Unsettled') হল 'সেট্‌ল্‌ড্ ফ্যাক্ট্' ('settled fact')। বঙ্গভঙ্গ বদ হওযা সত্ত্বেও নতুন বাংলা অবশ্য তাব পুবোনো আকাব আব সম্পূর্ণ ফিবে পেল না। বিহাব, ওড়িশা ও আসাম— এই বাংলা থেকে বাদ পড়ল। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও তদানীন্তন পূর্ববঙ্গকে নিযে গড়ে উঠেছিল নতুন বাংলা। কলকাতাব বাজনৈতিক গুরুত্ব নষ্ট কবাব উদ্দেশ্যে ভাবতবর্ষেব রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তবিত হল দিল্লিতে। এইভাবেই পবিসমাপ্তি ঘটল ভাবতবর্ষেব ইতিহাসেব এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাযেব।

নতুন কবে শুরু হল বাংলাব বিপ্লবী আন্দোলন। তা প্রবেশ করল পববর্তী পর্যাযে। সেই পর্যাযেব বিপ্লবী আন্দোলনেব ও অনুশীলন সমিতিব ভূমিকাব পর্যালোচনা বর্তমান নিবন্ধেব পবিধিভুক্ত নয়।

৬

স্বদেশি আন্দোলনেব সমযকাব কযেকটি সমিতি ও সংস্থাব নাম ও তালিকা

১। আত্মোন্নতি সমিতি (১৮৯৭), ওযেলিংটন স্কোযাব, কলকাতা, ২। সুহৃদ্ সম্মিলনী (১৯০১), মযমনসিংহ, ৩। ফ্রেন্ডস্ ইউনাইটেড ক্লাব (১৯০২), কলকাতা, ৪। অনুশীলন সমিতি (১৯০২), কলকাতা, ৫। ডন সোসাইটি (১৯০২), কলকাতা, ৬। বান্ধব সম্মিলনী (১৯০২), গোন্দলপাড়া, চন্দননগব, ৭। স্বাস্থ্যকেন্দ্র (১৯০৪), চিংড়িপোতা, ২৪ পবগনা, ৮। ছাত্র ভাণ্ডাব (১৯০৪), কলকাতা, ৯। ঢাকা অনুশীলন সমিতি (১৯০৫), ঢাকা, ১০। মুক্তি সংঘ (১৯০৫), ঢাকা, ১১। স্বদেশবান্ধব সমিতি (১৯০৫), ববিশাল, ১২। স্বদেশসেবক সমিতি (১৯০৭), কলকাতা, ১৩। শক্তি সমিতি (১৯০৭), বাণাঘাট, নদিযা, ১৪। যুবক সমিতি (১৯০৮), কলকাতা, এবং ১৫। ব্রতী সমিতি (১৯০৮), ফবিদপুব।

৭

মূল্যাযন

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন বা স্বদেশি আন্দোলনেব মধ্যে যে চাবটি প্রধান ধাবা বা প্রবণতা ছিল, তাব মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাবা বা প্রবণতাটি ছিল বৈপ্লবিক জাতীযতাবাদী ধাবা

বা প্রবণতা। এই ধারাটিব বা প্রবণতাটিব প্রতিনিধিত্বে ও নেতৃত্বে ছিল বিভিন্ন বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি, যাব মধ্যে প্রধানতমটিই ছিল অনুশীলন সমিতি। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলনেব সাফল্য এবং ব্যর্থতা-সীমাবদ্ধতা এবং বিপ্লবী অনুশীলন সমিতিব সাফল্য এবং ব্যর্থতা-সীমাবদ্ধতা একে অপবেব পবিপূবক, একে অপবেব প্রতিফলন ঘটায।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলন যে দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, লক্ষ্যবস্তুব প্রতি নিষ্ঠা ও বীবত্বেব পবিচয বেখেছিল, তা যেমন অতুলনীয ও সশ্রদ্ধ উল্লেখেব যোগ্য, তেমনই অনুশীলন সমিতিব তথা সেই যুগের বিপ্লবী আন্দোলনেব দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং মৃত্যুঞ্জযী বীবত্ব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষবে উল্লিখিত, অসামান্য বা অসাধাবণ অভিধায অভিহিত হওযাব অধিকাবী, এই বিষযগুলি সমস্ত প্রশ্ন বা সংশযেব অনেক, অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

স্বদেশি আন্দোলন ছিল প্রধানত হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীব আন্দোলন—এই বাস্তবতাটিকে অস্বীকাব কবাব কোনও উপায নেই। হিন্দু উচ্চবিত্ত ও হিন্দু মধ্যবিত্তকে নিযেই গড়ে উঠেছিল এই হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী বা সম্প্রদায, হিন্দু নিম্নবিত্ত অর্থাৎ দবিদ্র হিন্দু, বা হিন্দু নিম্নশ্রেণী এই ভদ্রলোক সম্প্রদাযেব পবিধিভুক্ত ছিল না। বঙ্গভঙ্গ বাঙালি হিন্দুব প্রাণে যতটা দাগা দিযেছিল, বাঙালি মুসলমানেব বোধে আদৌ তা তেমন কবে বাজে নি। ফলে স্বদেশি আন্দোলন প্রধানত হিন্দুদেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল, ব্যাপক মুসলমান সম্প্রদায থেকে গেলেন এই আন্দোলনেব পরিধিব বাইবে। মুসলমানের প্রতি হিন্দুব উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, মুসলমানেব প্রতি হিন্দুব অবজ্ঞা স্বদেশি আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদাযেব অংশগ্রহণেব ক্ষেত্রে এক বিবাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কবেছিল।

সাধাবণভাবে মুসলমান সম্প্রদায স্বদেশি আন্দোলনে যোগ না দিলেও ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। ব্যাবিস্টাব আবদুল বসুল, মৌলবী লিযাকৎ হোসেন, মৌলবী আবুল কাশেম, সিরাজগঞ্জেব মৌলবী ইসমাইল সিবাজি, আবদুল হালিম গজনভি, বগুড়াব জমিদাব আবদুল শোভান চৌধুবি, ঢাকা নবাব পবিবাবেব খাজা আতিকুল্লাহ্, আবদুল গফুব সিদ্দিকি, দীন মহম্মদ, দেদার বক্স, জালালুদ্দিন হাশেমি, মৌলানা আক্রম খাঁ প্রমুখ মুসলিম নেতৃবর্গ বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ কবলেও তাঁবা ছিলেন নেহাতই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। সাধাবণভাবে বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী স্বদেশি আন্দোলন মুসলমান সম্প্রদাযকে আকর্ষণ কবতে ব্যর্থ হযেছিল, বা আকর্ষণ কবাব সেবকম চেষ্টাও চালায নি। কাবণটি অসামান্য বিশ্লেষণ কবেছিলেন ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আব তাব সমালোচনাতেও সোচ্চাব হযে উঠেছিল তাঁব লেখনী। বিষযটিব গভীরে প্রবেশ কবে সমস্যাটিব স্বরূপ উপলব্ধি কবেছিলেন ববীন্দ্রনাথ। অমোঘভাবেই তাই সত্য বিশ্ববিবেক ববীন্দ্রনাথ ঠাকুবেব বিশ্লেষণ—বঙ্গভঙ্গ বাঙ্গালি মুসলমানেব বোধে তেমন কবে বাজে নি, কাবণ 'তাহাদেব সঙ্গে আমবা কোনোদিন হৃদযকে এক হইতে দিই নাই'।

তৎকালীন বিপ্লবী আন্দোলন এবং তাব ধাবক ও বাহক অনুশীলন সমিতি সম্পর্কে এই কথাটিই প্রযোজ্য। প্রধানত হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীব তরুণেবাই যোগ দিযেছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনে, অনুশীলন সমিতিতে। এই আন্দোলন তাব প্রাথমিক পর্যাযে হিন্দু নিম্নশ্রেণীকেও আকর্ষণ কবে নি, মুসলমান সম্প্রদাযকেও আকর্ষণ কবে নি। হিন্দু ধর্মীয চেতনায আচ্ছন্ন,

হিন্দু শ্রেষ্ঠত্ববাদে বিশ্বাসী, হিন্দু ধর্মীয় প্রতীক-অনুষঙ্গ ব্যবহারকারী, হিন্দু ধর্মীয় আঙ্গিকেই বিপ্লবের বাণী প্রচারকারী, ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতিকে সমার্থক হিসাবে প্রতিষ্ঠাকারী প্রাথমিক পর্যায়ের সেই বিপ্লবী আন্দোলন এই সকল কারণেই নিতান্তই হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর আন্দোলন হয়েই থেকেছিল, সেই গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে নি, সেই নির্দিষ্ট পরিধির বাইরে যেতে পারে নি। বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান অনৈক্যের শিকড় মাটির অনেক গভীরে প্রবেশ করেছিল, যার বিষময় ফল আজও আমরা প্রতি দিনই মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করি। গণ্ডি অতিক্রম করে, খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে, যদি হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীর প্রকৃত ঐক্যবদ্ধ, মিলিত আন্দোলন হয়ে উঠতে পারত বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন। প্রথম যুগের সেই বিপ্লবী আন্দোলন, যার পুরোভাগে ছিল অনুশীলন সমিতি, তবে ইতিহাসের ধারা প্রবাহিত হত ভিন্ন এক খাতে, লেখা সম্ভব হত অন্য সম্পূর্ণ অন্য এক ইতিহাস।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থাবলি

১ Buddhadeva Bhattacharyya (ed), *Freedom Struggle and Anushilan Samiti Volume 1*, Anushilan Samiti Calcutta, March, 1979

২ Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908*, People's Publishing House, New Delhi, February, 1994, (First Published November, 1973)

৩ Sumit Sarkar, *Modern India 1885-1947*, Macmillan India Limited Madras, 1986, (First Published 1983)

৪ সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭*, (মূল থেকে বঙ্গানুবাদ, অনুবাদ সম্পাদনা রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য), কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৫, (প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩)।

৫ Amarendra Nath Roy *Bengal's Turbulent Years 1905–1940* Anushilan Granthana, Calcutta, December, 1989

৬ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *নির্বাসিতের আত্মকথা*, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা, মে, ১৯৮৩, (একাদশ সংস্করণ)।

৭ হেমচন্দ্র কানুনগো, *বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম চিরায়ত সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৮৪, কার্তিক, ১৩৯১ বাংলা সন (বা স)।

৮ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম, (অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস—প্রথম খণ্ড)*, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম নবভারত সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৮৩।

৯ জীবনতারা হালদার, *অনুশীলন সমিতির ইতিহাস*, প্রকাশক শৈলেন্দু মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ (প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী), ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭, ফাল্গুন, ১৩৮৩ বাংলা সন (বা স)।

১০ জীবনতারা হালদার, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুশীলন সমিতির ভূমিকা*, প্রকাশক, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৮৯, বৈশাখ, ১৩৯৬ বাংলা সন (বা স)।

১১ চিন্মোহন সেহানবীশ, *রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভাবতীয বিপ্লবী*, মনীষা, কলকাতা, জুন, ১৯৭৩, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০ বাংলা সন (বা স)।

১২ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায, *অগ্নিযুগেব বাংলায বিপ্লবীমানস*, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুযাবি, ১৯৯৩।

১৩ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায, *নথিপত্রে স্বদেশী আন্দোলন*, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, জুন, ২০০৪।

১৪ *বজ্রশিখায বাংলা বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনেব শতবর্ষে সংকলন*, গণশক্তি, কলকাতা, বইমেলা, ২০০৫।

১৫ সুস্নাত দাশ (সম্পাদিত), *শতবর্ষে ফিবে দেখা বঙ্গভঙ্গ*, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয শিক্ষক সমিতি, কলকাতা, সহযোগিতায পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, বইমেলা, ২০০৫।

১৬ সঞ্জীবকুমাব বসু (সম্পাদিত), *সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বঙ্গভঙ্গ ও ভাবতেব স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশেষ সংখ্যা*, বর্ষ ৪০, সংখ্যা ৩-৪, কার্তিক-চৈত্র, ১৪১১ বাংলা সন (বা স), অক্টোবব-ডিসেম্বব, ২০০৪, এবং জানুযাবি-মার্চ, ২০০৫, কলকাতা।

বঙ্গভঙ্গ-স্বদেশি আন্দোলন : ভারতীয় প্রেক্ষিত

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক ঝড়ের দশক। বঙ্গভঙ্গ-স্বদেশি-বয়কট আন্দোলন বাংলার সমাজ-রাজনীতিতে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। এরই সঙ্গে আরও অনেক শাখা আন্দোলন ছিল যেগুলি মূল আন্দোলনগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এবং ওই সময়ের সমস্ত আন্দোলনের যোগফল আমাদের একটি স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "এই স্বদেশী আন্দোলনে আমরা সকলেই আজ ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছি। এখন সকলের মনেই বড় বড় আশার সঞ্চার হইয়াছে।" (ডন, মার্চ, ১৯০৬)। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের ঝোড়ো আন্দোলনের অভিঘাতে দেখা দিয়েছিল যে জাতীয় জাগরণ তা আপাতদৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালিকেন্দ্রিক মনে হলেও তার সর্বভারতীয় চরিত্র ছিল। বিষয়টি মোটেই বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভাবে ও ভাবনায় সংকীর্ণতা ছিল না। সারা ভারতবর্ষের মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলায় উদ্ভূত আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে। শুধু সমর্থন জানানোটাই যে তাদের উদ্দেশ্য ছিল তা নয়। বাংলায় সংঘটিত আন্দোলনের আঁচ বৃহত্তর অর্থে ভারতীয় রাজ-অর্থনৈতিক অবস্থাকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল সন্দেহ নেই। বঙ্গভঙ্গ তো শুধুমাত্র বাংলার বিষয় নয়, গোটা ভারতের। অস্তিত্বের লড়াই কেবলমাত্র বাঙালির নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষও এই সংকটকে উপলব্ধি করেছেন। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করতে গিয়েই সৃষ্টি হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বয়কট আন্দোলন, আর গোটা আন্দোলন রূপ পেল স্বদেশি আন্দোলন হিসেবে। স্বদেশি আন্দোলনের ইতিবাচক দিকটি ছিল বয়কট আন্দোলন। সরকারের একরোখা মনোভাবের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ যখনই ঘোষিত হল তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে বরিশালের *হিতৈষী* এবং কলকাতার *সঞ্জীবনী* বয়কট আন্দোলনকে স্বাগত জানায়। বাংলায় অরণ্যবহ্নির মতো বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের গণমাধ্যমগুলি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ওঠে। বাংলার সর্বত্র মিটিং-মিছিল অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সেই সঙ্গে এমন প্রচারও হয় যে, বিদেশি চিনি পরিশোধনে রক্ত ও হাড় এবং গোমাংস সংরক্ষণে লবণ ব্যবহৃত হয়। সেই লবণ ও চিনি বাজারে আসে এদেশের মানুষের জাত মারার জন্য। অনেকটা এনফিল্ড রাইফেল কাহিনির মতোই বিষয়টি। যাইহোক, লবণ-চিনির সঙ্গে সঙ্গে বিলিতি কাপড়, সিগারেট ও অন্যান্য জিনিস শুধু বয়কট করেই ক্ষান্ত হল না এদেশের মানুষ, রাস্তায় রাস্তায় শুরু হল বহ্নুৎসব।

সমাজের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীর মানুষ এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। আন্দোলন গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে। সমাজ-সংস্কৃতির চাহিদাগুলিও এর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। সামাজিক স্তর বিন্যাসের আড়ালগুলিকে ভেঙে স্বদেশের প্রয়োজনে বিভিন্ন স্তরের মানুষ একত্রিত হতে চেষ্টা করেছে। এ কথা তো

সকলেরই জানা যে, দেশীয় মানুযেব ঐক্যকে ভাঙাব নিরন্তব চেষ্টা চালিযে গেছে ব্রিটিশ সবকাব। এই ঐক্য ভাঙতে তাবা ধর্ম-রাজ-অর্থনৈতিক অস্ত্র ব্যবহাব কবেছে। শেষ অস্ত্র ছিল সাম্প্রদাযিক বিভেদ সৃষ্টিব প্রচেষ্টা। বঙ্গভঙ্গেব উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবকাব পক্ষ থেকে যে প্রশাসনিক সুবিধাব কথা বলা হযেছিল তাব প্রকৃত রূপ স্পষ্ট হযে ওঠে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ *ইন্ডিযা উইনস্ ফ্রিডম*-এ লিখেছিলেন, ' In 1905 Lord Curzon decided to partition the province in the belief that this weaken the Hindus and create a permanent division between the Hindus and the Muslims of Bengal ফলে প্রশাসনিক প্রযোজনে বাংলাকে ভাগ কবা নয, মূল লক্ষ্য ছিল, সাম্প্রদাযিকতাব বীজ বপন করে গোটা দেশকে পঙ্গু কবা। কিন্তু কার্জনের এই উদ্দেশ্যেব বিবোধিতা কবে কৃষ্ণকুমাব মিত্র লিখেছিলেন, "বিলাতী বর্জ্জন প্রস্তাব গ্রহণ কবিলে ইংবেজ জাতিব চৈতন্য হইবে এবং লর্ড কার্জ্জনেব দম্ভ চূর্ণ হইবে ।" ফলে জমিদাববা তাঁদেব প্রতিনিধিদেব এই মর্মে পাঠিযেছিলেন যতে তাঁদেব বাযতবা বিদেশি বস্ত্র ব্যবহাব না কবে। জমিদাবদেব সংগঠন চেষ্টা চালিযে গেছে যাতে মাবোযাডি বস্ত্র-ব্যবসাযীবা বিদেশি বস্ত্রের ব্যবসা না কবে। সামাজিক ও ধর্মীয বীতিও বযকট আন্দোলনেব সহাযক হযেছিল। নবদ্বীপ ও শান্তিপুবেব ব্রাহ্মণ পুবোহিতরা বয়কটেব পক্ষে ছিলেন। তাঁবা বললেন, বিদেশি বস্ত্র এবং বিদেশি উপাচারে পুজো হবে না। যাঁবা এই আন্দোলনের বিপবীতে ছিলেন তাঁদের সামাজিক বযকট কবা হযেছিল। বযকট আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য কর্মী ছিলেন স্কুল-কলেজেব ছাত্রবা। বিভিন্ন সমিতি যে পিকেটিং বা আন্দোলনগুলি পবিচালনা কবতেন সেগুলি সাধাবণত ছাত্র ও যুব সম্প্রদায দ্বাবা সংঘটিত হত।

ইংলন্ডেব কলে তৈরি কাপড বযকট কবাব ফলে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পুজোব সময তাব বিক্রি অনেক কমে যায। মাড়োযাবি বস্ত্র-ব্যবসাযীবা ম্যানচেস্টাব চেম্বাব অব কমার্সকে আবেদন করে যাতে তাবা তাদেব দেশীয সবকাবেব উপব চাপ সৃষ্টি কবে বঙ্গভঙ্গ বদ কবাব জন্য। কিন্তু তাতে কোনো সাফল্য আসেনি। ১৯০৬-০৭ খ্রিস্টাব্দেব 'ল্যান্ড বেভেনিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিপোর্ট অব দ্য লোযাব প্রভিন্স' থেকে জানা যায ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দেব সেপ্টেম্বর থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দেব সেপ্টেম্বর মাসেব মধ্যে ঢাকা, যশোহব, নদিযা, মালদহ, বর্ধমান, হাজাবিবাগ ও আবা জেলায কাপড বিক্রি ৭৫,০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকায নেমে আসে। পাশাপাশি দেশি কাপডেব চাহিদা বেডেছিল। তাঁতিদেব গড় আয বৃদ্ধি পেযেছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দেব ইন্ডাস্ট্রিযাল কনফাবেন্সেব প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, আমেদাবাদ এবং বোম্বাইতে ২২টি কাপড়েব কল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এবং প্রতিষ্ঠিত হযেছিল ১৫টি ব্যাংক যাব মূলধন ছিল প্রায চার কোটি টাকা, আব সওযা কোটি টাকা মূলধন নিযে স্থাপিত হযেছিল পাঁচটি নৌবাহ সংস্থা। মিলেব কাপডেব থেকে হস্তচালিত তাঁতেব কাপড়েব চাহিদা বেডেছিল। তাঁত ছিল বংশানুক্রমিক ব্যবসা। গ্রামীণ সমাজে বিশেষ কবে দবিদ্রদেব মধ্যে কোবা তাঁতেব কাপডেব চাহিদা ছিল। বাজনৈতিক আন্দোলন বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে ম্যানচেস্টাবেব কাপড়েব বদলে দেশি কাপডেব চাহিদা দ্রুত বাড়তে থাকে। সে সময

গ্রামে চবকা বিতবণ কবা হযেছে। বাংলার বযন শিল্পকে আবাব ফিবিযে আনাব চেষ্টা কবা হযেছিল। পূর্ববঙ্গে তাঁতঘবেব সংখ্যা বেড়েছিল, ফলে উৎপাদন বেডেছিল। কমেছিল বিদেশ থেকে আমদানি। শুধু কি বস্ত্র! লবণেব আমদানিও কমেছিল বছবে ছয হাজাব টন। এছাড়া প্রসাধনী ও অন্যান্য জিনিসপত্রেব আমদানি কমে কখনো কখনো তা প্রায তলানিতে ঠেকেছিল। বযকট আন্দোলনেব একটি বাজনৈতিক দিক তো ছিলই, সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সবকাব অর্থনৈতিক চাপেবও মুখোমুখি হযেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ কবা যেতে পাবে, স্বদেশি আন্দোলন শুধুমাত্র বযকট আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। আন্দোলনেব ব্যাপ্তি ঘটেছিল গঠনমূলক কিছু প্রতিষ্ঠানেব সংস্থাপনাব মধ্য দিযে। শিল্প কলকাবখানাব প্রতিষ্ঠা, আধুনিক, বিশেষ করে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু কবাব ভিতব দিযে স্বদেশেব গঠনমূলক দিকটিব প্রতি নেতৃবৃন্দেব বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিব পবিচয মেলে।

ক্রমশই স্বদেশি আন্দোলন বাংলা ছাডিযে বহির্বাংলাব সমর্থন লাভ কবেছিল। বযকট আন্দোলনও সেখানে সমর্থিত হয। তবু বাজনৈতিক টানাপোডেন ছিল। কংগ্রেসেব মধ্যে এই আন্দোলন সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তো ছিলই। কংগ্রেসেব ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দেব অধিবেশনে বযকট সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারিত হযেছিল—"a vindictive desire to injure another " নবমপন্থী নেতা মদনমোহন মালব্য বযকটেব বিবোধিতা কবেন, বিশেষ কবে লালা লাজপৎ বাই বা অন্যান্য বাঙালি নেতাদেব চবমপন্থী মনোভাব ও সিদ্ধান্তের তিনি বিবোধিতা কবেছিলেন। মতাদর্শ ও কর্মপদ্ধতিগত বিবোধ ক্রমশ বাড়তে থাকায ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস নবম ও চবমপন্থীতে ভাগ হযে যায়। অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, "মর্লে মিন্টো সংস্কাব এ দেশে নরমপন্থীদেব বাজনৈতিক অস্তিত্ব ভীষণভাবে দুর্বল কবে দেয, অথচ চবমপন্থী উগ্রতা ও সন্ত্রাসবাদেব বিরুদ্ধে সরকাবেব সঙ্গে সহযোগিতায তাঁদেব আন্তবিকতা ও আগ্রহেব অভাব ছিল না।" *(ভাবতেব মুক্তি সংগ্রামে চবমপন্থী পর্ব)*। কিন্তু কেমব্রিজেব ঐতিহাসিক সি. এইচ ফিলিপ যথার্থই মন্তব্য কবলেন, "মডাবেটবা উন্মুখ ছিলেন সবকাবের সেবাব জন্য কিন্তু কার্যত তাঁদেবই খেদিযে দেওযা হযেছিল।" (উদ্ধৃতি, পূর্বোক্ত সূত্র)। অমলেশ ত্রিপাঠীব কথা আবাব স্মবণ কবি " বণহুংকাবেব মধ্যে চবমপন্থী আন্দোলন শুরু হলেও তাব অবসান হযেছিল ব্যর্থতাব গুমবানিতে।" (পূর্বোক্ত সূত্র)। এই যে নবম-চবমপন্থী কর্মাদর্শগত বিবোধ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাব ভিত্তি হিসেবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব ভূমিকা ছিলই। কাবণ এই আন্দোলনকে ঘিবেই বহুমুখী স্বদেশ-চিন্তা প্রসাবিত হযেছিল, এবং এই আন্দোলনকে কেন্দ্র কবেই ক্রমশ বৈপ্লবিক পবিস্থিতি দৃঢ় হযেছে। ধর্মীয সহাযতাও ছিল। এ আব দেশাই-এব মতে "The Bengal school of militant nationalism led by Pal and Aurobindo Ghosh was influenced by the neo-Vedantic movement of Swami Vivekananda " কিন্তু বিবেকানন্দ-অরবিন্দেব ধর্ম-ভাবনা অনেকেই ভুল বুঝেছেন। ধর্মেব সঙ্গে বাজনীতিব সম্পর্ক নির্ণয কবতে গিযে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদাযিক প্রশ্নই বড়ো হযে দেখা দিযেছে। চবমপন্থায বিশ্বাসীদেব মধ্যে একটা ধর্ম-ভাবনা ছিলই কিন্তু তাকে এক কথায সাম্প্রদাযিক বলে উডিযে দেওযা যায না। বিষয়টি আবও খতিয়ে দেখা দবকাব।

ভারতীয জাতীয কংগ্রেস, তা নবমপন্থীই হোক্ বা চবমপন্থীই হোক্, বঙ্গভঙ্গ-স্বদেশি-বযকট আন্দোলনেব সঙ্গে যে যুক্ত ছিল তা বলাই বাহুল্য। এই দুটি পক্ষ যেহেতু সর্বভাবতীয সংগঠন কংগ্রেসেব অন্তর্ভুক্ত তাই গোটা দেশেই এদেব ভাবনামন্ত্র ও কর্মসূচি বিভিন্ন স্তবে প্রতিফলিত হযেছে, এবং তা সর্বভাবতীয রূপ পেযেছে। অবশ্য কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীব মতে চবমপন্থীদেব সর্বভাবতীয কোনো অস্তিত্ব ছিল না, তাদেব মতাদর্শ গডে উঠেছিল বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র কবে। কিন্তু এই তত্ত্ব বাববাব অসত্য বলে প্রমাণিত হযেছে। কাবণ, বিভিন্ন অঞ্চলেব নেতৃবৃন্দব জাতীযতাবাদী কর্মধাবা সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে প্রকৃত অর্থে ভাবতীয হযে উঠেছে। বঙ্গভঙ্গেব বিষযটিও সেই অর্থে বাংলাব সীমানা পেবিযে অন্য বাজ্যেব মানুষেব মনে নাডা দিযেছে, বিষযটি সর্বভাবতীয সমস্যাব স্বীকৃতি পেযেছে। অবশ্যই সর্বভাবতীয বাজনৈতিক দল কংগ্রেস সমস্যা মোকাবিলায তৎপব হযে উঠেছে। সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস যেমন, তেমনি কংগ্রেসেব অভ্যন্তবেব উপদলগুলিও বিশেষ ভূমিকা পালন কবেছিল।

ভাইসবয কার্জন, বাংলাব গভর্নব অ্যানড্রু ফ্রেজাব এবং স্ববাষ্ট্র সচিব বিজলে বঙ্গভঙ্গ কাণ্ডটি ঘটিযেছিলেন। বিবোধিতা কবেছিলেন আসামেব প্রাক্তন লেফ্‌টেনান্ট গভর্নব হেনবি কটন। কিন্তু ধোপে টেঁকেনি। কার্জনবা দৃঢ-প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে-কোনো মূল্যে বাংলা ভাগ কবা। কিন্তু বাংলাব সর্বস্তবে কার্জনেব কীর্তিব বিবোধিতা তখন তুঙ্গে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বেনাবসে কংগ্রেস প্রতিনিধিদেব সামনে গোখলে ভাবতেব পবিস্থিতি পর্যালোচনা কবতে গিযে বললেন, "The worst factors of the present system of bureaucratic rule—its utter contempt for public opinion its arrogant pretensions to superior wisdom, its reckless disregard of the most cherished feelings of the people the mockery of an appeal of its sense of justice its cool preference of service interests to those of the governed " ব্রিটিশ সবকাবেব সঙ্গে কোনোবকম সহযোগিতা কববেন না বলেও তিনি সিদ্ধান্তে আসেন। পছন্দ না কবলেও তিনি বযকট মেনে নিযেছিলেন। গোখলে মনে কবতেন, বযকট বঙ্গভঙ্গেব বিরুদ্ধে একটি সামযিক অস্ত্র। তবু তাঁদেব উপনিবেশিক স্বাযত্তশাসনে আস্থা ছিল। কিন্তু চবমপন্থীদেব তা ছিল না। তাঁবা পূর্ণ স্বাধীনতাই চেযেছিলেন। নবম ও চবমপন্থীদেব মধ্যে ফাটল যে বৃদ্ধি পাচ্ছিল তা ভাইসবযেব সচিব ডানলপ স্মিথকে প্রতিদিনে লেখা দ্বাবভাঙাব মহাবাজেব বিপোর্ট, যা তাঁব ডাযেবিতে প্রতিফলিত, থেকে জানতে পাবা যায। আব চবমপন্থী বৈপ্লবিক আদর্শ শুধু বাংলা নয সাবা ভাবতবর্যে ছডিযে পডেছে। কিন্তু বাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভেব লক্ষ্যে জাতীযতাবাদী আন্দোলনেব মধ্য দিযে এমন একটি ভাবতীয সমাজ বিপ্লবীবা গডতে চেযেছিলেন যাব মূলে ছিল ধর্মীয জাতীযতাবাদ। তিলক তাঁব নব্য জাতীযতাবাদেব সুবকে বেঁধেছিলেন ভাবতেব ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে মনে বেখে। এখানে তিলকেব ধর্ম কিন্তু ঐশী ধর্ম নয। বীবত্বেব পদতলে আত্মবলিদানই বডো হযে দেখা দিযেছে। শিবাজী এবং গণপতি উৎসবে দেখি বীবত্বেব সাধনাব প্রকাশ। 'গীতা' চর্চাব মধ্য দিযে কোনো ঐশী

সাধনা নয, মহাভাবতে প্রতিফলিত ভাবতীয দর্শন দ্বাবা নিজেদেব চালিত কবতে চেষ্টা কবেছেন। এই দর্শনেব প্রতিফলন ঘটাতে চেযেছেন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে। তিলকেব এই বাজনৈতিক দর্শন বাংলাব বিপ্লবী বাজনৈতিক দর্শন দ্বাবা হযতো কিছুটা প্রভাবিত হযেছে। বিপিনচন্দ্র পাল, অববিন্দ ঘোয প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যে স্বামী বিবেকানন্দেব নব্য বৈদান্তিক আন্দোলন দ্বাবা প্রভাবিত হযেছিলেন তাও তো ভাবতীয দর্শন। আব বাঙালি বিপ্লবীবা যে অবশ্যপাঠ্য হিসেবে 'গীতা' নির্বাচন কবেছিলেন তাকে হিন্দু পুনরুত্থান ঘটানোব উপায হিসেবে চিহ্নিত কবা ঠিক হবে না। বঙ্কিমচন্দ্রেব 'আনন্দমঠ' তাঁদেব অনুপ্রাণিত কবেছে, সেখানে স্বদেশ মাতৃসম, সেই মাকেই বন্দনা কবেছে। এখানেও কিন্তু কোনো হিন্দুত্বেব প্রকাশ নয। কৃষ্ণচবিত্র বচনাব মধ্য দিযেও প্রকাশিত হযেছে ভাবতীয দর্শনেব রূপ মহিমা। মুসলমান সম্প্রদায এই সমযেব বিপ্লবী জাতীযতাবাদ থেকে নিজেদেব কিছুটা তফাতে বেখেছিল তাব কাবণ হিসেবে অনেকে মনে কবেন, "Indian Naionalism was openly based by is leaders on the Hindu ideology By this act they cut off the Moslem masses from the national movement and opened the way to the Government's astute counter-move with the formaion of the Moslem League in 1906" (এ আব দেশাই, *সোস্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অব ইন্ডিযান ন্যাশনালইজম*)। ব্রিটিশ সবকাব নিজেদেব স্বার্থে সাম্প্রদাযিক বিভেদ সৃষ্টি কবেছিল হিন্দু-মুসলমানেব মধ্যে, মদত জুগিযেছিল মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায। আব বঙ্গভঙ্গেব অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদাযিক বিভেদ সৃষ্টি কবে ব্রিটিশ সবকাবেব পক্ষে প্রশাসনিক সযোগ-সুবিধা বাডিযে তোলা, এবং এই সুবিধা পাওযাব জন্য সবকাবি তবফ লীগকে কিছু প্রলোভনও দেখিযেছে। ফলে মুসলমান সম্প্রদায বঙ্গভঙ্গ বিবোধিতায তেমন অংশগ্রহণ কবেনি। ধর্মীয কাবণে তাবা দূবে থেকেছে। এটি পূর্ব বাংলাব মুসলমানদেব মধ্যে দেখা গেছে বেশি। হিন্দু-জমিদাবদেব মুসলমান প্রজাবা কখনো কখনো বিদ্রোহী হযে উঠেছে। মুসলমান কর্মচাবীদেব বিক্ষোভ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কাবণ, The Muslims were greatly perturbed at the short shrift to their patron Fuller" (পূর্বোক্ত সূত্র)। এবং গোটা দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচাবেব উদ্দেশে যখন মোল্লাবা স্বনিযুক্ত তখন ব্রিটিশ সবকাব তাদেব পাশে এসে দাঁডিযেছে। নেভিনসন তাঁব *দি নিউ স্পিবিট ইন ইন্ডিযা*-তে লিখেছেন যে, তিন মাসেব জন্য কোর্ট চোখ বুজে ছিল। হিন্দু মালিকদেব অগ্রাহ্য কবা, হিন্দু দোকান লুঠ কবা, হিন্দু নাবীব ইজ্জত বেহাল কবাব মধ্যে সবকাব কোনো অপবাধ দেখেনি। তাদেব শাস্তিও দেযনি। মর্লে-মিন্টোও তাদেব তোযণ এবং পবিপোযণ কবেছেন। মুসলমান সম্প্রদাযেব মধ্যে একসময ইংবেজদেব বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল যে, তাবা এদেশে এসে তাদেব গৌবব, তাদেব সম্পদ, তাদেব সর্বস্ব লুঠ কবে এদেশেব শাসকে পবিণত হযেছে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ-স্বদেশি-বযকটেব যুগে ব্রিটিশদেবই প্রবোচনায তাদেব সুব পাল্টে গেল "The Hindus have robbed us of wealth, honour and the glory of Islam The spread the Swadeshi net to take our lives O Mohamedan, give

not your wealth into the house of Hindus " ১৯০৬-০৭ সাল থেকে শুরু হযে যায হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা।

কিন্তু একদল মুসলমান ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দেব বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনে সক্রিয ভূমিকা গ্রহণ কবেছিলেন। "সুবেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমাব দত্তেব সঙ্গে আন্তবিকভাবেই হাত মিলিযেছিলেন মহম্মদ ইউসুফ, লিযাকৎ হোসেন, আবদুল বসুল ও আবদুল হালিম গজনভিব মতো মুসলমান নেতাবা।" এবা বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগ দিযেছেন, সভাপতিত্ব কবে অনুষ্ঠান পবিচালনা কবেছেন, এমনকি তাঁবা সরকাবি দমন-পীডন নীতিবও তীব্র সমালোচনা কবেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অববিন্দেব সঙ্গে যোগাযোগ বেখে চলতেন এবং বিপ্লবীদেব সাহায্য কবতে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ। তিনি এক সময়ে বিপ্লবী দলে যোগও দিযেছিলেন এবং বৈপ্লবিক কাজকর্মে সাহায্য কবেছেন। কম সংখ্যক মুসলমান ওই সমযেব বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডেব সঙ্গে যুক্ত ছিল। বাজনৈতিক সচেতনতা ও বৈপ্লবিক কর্মধাবাব সূত্রপাত মুসলমান সমাজে বিশেষ কবে পবিলক্ষিত হয ১৯১২ খ্রিস্টাব্দেব পব থেকে।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে যে নব্য জাতীযতাবাদেব সূত্রপাত সেখানে বিপিনচন্দ্র পাল, অবিবন্দ ঘোষ, বাবীন্দ্র ঘোষ প্রমুখেব সঙ্গে সমান তালে বালগঙ্গাধব তিলক, লালা লাজপৎ বাইবা ছিলেন এবং হাজাব হাজাব যুবক স্ববাজেব জন্য লড়াই কবেছেন ওই সমস্ত নেতৃবৃন্দের দ্বাবা অনুপ্রাণিত হযে। বাংলা ছাড়াও মহাবাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং অন্যান্য প্রদেশেব মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে সাধাবণ নিম্নবিত্ত, কখনো কখনো নিম্নবর্গীয মানুষেব মধ্যে ছডিযে পডেছিল। গোটা ভাবতেব সমস্ত শ্রেণীব মানুষ অন্তত এইটি বুঝতে শিখেছিল যে, "Swaraj could not be achieved without suffering ' তিলক অনুপ্রাণিত হযেছিলেন আগবকব-চিপলাঙ্কাবেব চিন্তনেব দ্বারা। তাঁব *মাবাঠা* ও *কেশবী* পত্রিকা দুটি নব্য জাতীযতাবাদ প্রচাবেব শক্তিশালী মুখপত্র ছিল। শিবাজী উৎসব বা গণপতি উৎসবেব মধ্য দিযে তিনি মহাবাষ্ট্রেব মানুষকে জাতীয চেতনায উদ্বুদ্ধ কবতে চেযেছিলেন। আব জাতীযতাবাদী আন্দোলনে মহাবাষ্ট্রেব অন্যতম নেতা তিলকেব সঙ্গে বাংলাব নেতৃবৃন্দেব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলই। তিলক বঙ্গভঙ্গেব বিবোধী ছিলেন, সমর্থন কবেছেন স্বদেশি-বযকট আন্দোলন। তিনি তাঁব পত্রিকা দুটিব মাধ্যমে স্বদেশি আদর্শকে মহাবাষ্ট্রে জনপ্রিয কবে তুলেছিলেন। তিনি বিশ্বাস কবতেন, স্বদেশি স্ববাজেব পথে নিযে যাবে। কেশবীতে তিলক লিখেছিলেন, "Our nation is like a tree of which the original trunk was Swarajya and branches were Swadeshi and boycott " তিনি ব্রিটিশ সবকাবেব বিরুদ্ধে বযকট ও নিষ্ক্রিয প্রতিবোধকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহাব কবতে চেযেছিলেন। মজঃফবপুবে ক্ষুদিবাম ও তাঁব সহযোগীব বোমা বিস্ফোবণে নিয়ে তিলক যে সমস্ত প্রবন্ধাবলি লিখেছিলেন তা সবকাবেব দৃষ্টিতে ছিল বাজদ্রোহমূলক। এ জন্য তাঁকে মান্দালযে নির্বাসিত কবা হয। তিলকেব পাশাপাশি মহাবাষ্ট্রে আবও অনেক নেতৃবৃন্দ বা বাজনৈতিক কর্মীব নাম কবা যায যাঁবা বিপ্লবী জাতীযতাবাদী আন্দোলনেব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এদেব

মধ্যে বিনায়ক দামোদর সাভাবকার অন্যতম। তিনি 'অভিনব ভাবত' নামে একটি গুপ্ত সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। তা ছাড়া মহাবাষ্ট্রেব বিভিন্ন অঞ্চলে আবও অনেক গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। এই গুপ্ত সমিতিগুলিব কাজেব সঙ্গে বাংলাব গুপ্ত সমিতিগুলিব কাজেব মিল লক্ষণীয।

সাহাবানপুবেব জে এম চ্যাটার্জীব নেতৃত্বে একটি গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সমিতিব মূল অফিস রুবকিতে স্থানান্তবিত হয এবং সেখানকাব ইঞ্জিনিযাবিং কলেজ থেকে প্রধানত কর্মী সংগ্রহ কবা হত। বমেশচন্দ্র মজুমদাব লিখেছেন, "The Parition of Bengal and the *Swadeshi* movement gave a great impetus to their activities, and they kept a close contact with Bengal revolutionaries through Srish Chandra Ghosh, Chandra Kanta and others." বিপ্লবীবা হবদযালেব নেতৃত্বে কাজ কবতেন, এবং বৈপ্লবিক কর্মধাবা গোটা পাঞ্জাবে ক্রমশ ছডিযে পড়ে। লালা লাজপত বাই কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন, কিন্তু তিনি গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ কবতেন। অজিত সিংহ এবং অম্বাপ্রসাদ বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডেব সঙ্গে যুক্ত হযে পড়েন। বিপ্লবীদেব সঙ্গে আর্যসমাজের গোপন যোগাযোগ ছিল বলে সবকাবি কর্মচাবীবা অভিযোগ কবেছিল। অবশ্য 'আর্যসমাজ' তা অস্বীকাব কবে। লালা লাজপত বাই এবং অজিত সিংহ নির্বাসিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁবা মুক্তি পাওযাব কিছুদিন পবে আবাব পাঞ্জাবে আগুন জ্বলে উঠল। বাংলার বিপ্লবীদেব সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ স্পষ্ট হযে উঠল। "A Copy of the bomb manual used by the group of Barin Ghosh of Calcutta was found in the possession of Bhai Paramanand."

বিহাবেব দেওঘব, দুমকা, পাটনা, উত্তবপ্রদেশেব বেনাবস-এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলেব বিপ্লবীদেব সঙ্গে বাংলাব অনুশীলন সমিতিব নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তা ছাড়া অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনও গভীবভাবে তাদেব অনুপ্রাণিত কবে। পাবনাব যতীন হুই, অবিনাশ বায, ববিশালেব নবেন্দ্রমোহন ঘোয চৌধুবী, কলকাতাব বিপিনবিহাবী গাঙ্গুলি, ফণি চক্রবর্তী, অতুল ঘোয, যাদুগোপাল মুখার্জী প্রমুখ বিপ্লবীদেব সঙ্গে প্রভুদযালদেব সম্পর্ক ছিল। অবশ্য প্রভু মাড়ওযাবি হওযায দল তাকে পুবোপুবি বিশ্বাস কবত না। এই প্রভুদযালই বিপিনবিহাবীব সঙ্গে বৈদ্যনাথেব পবিচয কবিযে দিযেছিলেন। পববর্তীকালে বৈদ্যনাথ বাংলাব বিপ্লবীদেব সঙ্গে সম্পর্ক বক্ষা কবে চলতেন। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, বঙ্কিম মিত্র, অখিল দাশগুপ্ত, শ্যামকান্ত ব্যানার্জী প্রমুখ কর্মীবৃন্দেব কাজকর্মেব সঙ্গে বাংলাব নিযমিত যোগাযোগ ছিল।

বঙ্গভঙ্গব প্রভাব বাজস্থানেও পড়েছিল। বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলনেব অনুকবণে বিপ্লবী আন্দোলন সংঘটিত হযেছিল। বিপ্লবীদেব মধ্যে ভবত কেশবী সিংহ, রাও গোপাল সিংহ, অর্জুনলাল শেঠী প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। এঁবা অববিন্দ, তিলক, শ্যামজি কৃষ্ণবর্মাব সংস্পর্শে এসে বিপ্লববাদী কাজকর্মে অনুপ্রাণিত হন। বমেশচন্দ্র মজুমদাব লিখেছেন, "Rao Gopal Singh visited Calcutta and came into contact with the Bengal revolutionaries. Arjun Lal was intimately associated with notable revolu-

tionaries like Amir Chand, Avadh Bihari, and Bal Mukund, and one Bishnu Dutt was the connecting link between them" সমসাময়িক বাংলার বৈপ্লবিক আদর্শ দ্বারা চালিত হলেও সর্বভারতীয় বিপ্লববাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতে তাঁরা প্রয়াসী ছিলেন।

বাংলার বিপ্লবীরাও অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবীদের বিপ্লব মন্ত্রে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে নিয়মিত যে যোগাযোগ রাখত তা আমরা দেখেছি। মাদ্রাজের যুব সম্প্রদায়কে বৈপ্লবিক কর্মধারায় সঙ্গে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে বিপিনচন্দ্র পাল ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে মাদ্রাজে বক্তৃতা দেন। তখনও সেখানে পাকাপোক্তভাবে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠেনি। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড সেখানে চলছিল। বিপিন পালের বক্তৃতা শুনে চিদাম্বরম পিল্লাই খোলাখুলিভাবে স্বাধীনতার কথা বললে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে তিন্নেভেলি এবং টিউটিকরিন-এ পুলিশ-জনতার সংঘর্ষ বাধে। এই স্থানের অধিবাসীদের বলা হল "to boycott everything foreign and assuring them that in three months they would obtain *Swaraj*" স্বরাজ লাভের আরেকটি উপায় হিসেবে বিপিন পাল "openly advocated the manufacture of bombs" নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী জনসাধারণের মধ্যে সভাসমিতি এবং লেখনীর মাধমে বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচার করতেন। আরও একজন ছিলেন ভি ভি এস আয়ার, যিনি সাভারকারের অনুগামী ছিলেন। আয়ার রিভলভার চালনায় দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন এবং তিনি "preached the necessity of violence and assassination to free the country"

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সারা বাংলায় স্বদেশি-বয়কট আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। এই আন্দোলন ক্রমশ সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে পরিণত হয় এবং বাংলার সীমানা অতিক্রম করে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তা ছড়িয়ে পড়ে, এবং ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড রচিত হয়েছিল। আবার তাদের কাছ থেকে বাংলাও পেয়েছে সমর্থন ও সাহায্য। ফলে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ব্রিটিশ বিরোধী ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন : স্বদেশি গান

বন্যা মিত্র

বাংলা গানের বহুমুখী স্রোতের একটি বিশিষ্ট ধারা দেশাত্মবোধক গান বা স্বদেশি গান। এই ধারার উৎসমুখ খুঁজতে গেলে আমাদের পৌঁছতে হয় উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষ অধ্যায়ে। এই সময়ে একটি গানের সন্ধান পাওয়া যায়, যাকে দেশাত্মবোধক গানের আদি-রচনা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। রচয়িতা রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯), বাংলায় টপ্পাঙ্গের প্রণয়-গীতি রচনার পথিকৃৎ পুরুষ। তাঁরই গান—

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা॥
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥

ভক্তি এবং প্রেমের প্রবহমান ধারার মধ্যে গানের এই বাণী বাংলা গানের শ্রোতাকে সচকিত করে বৈকি। 'স্বদেশ' শব্দটিকে এরপর পাওয়া যায় রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) ব্রহ্মসংগীতে। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম হোতা এই দ্যুতিময় মানুষটি তাঁর গানে লিখলেন—'স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি/তোমারি রচনা-মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি'। ব্রহ্মসংগীত যদিও নিরাকার ব্রহ্মোপসনা, তবু নিজভূমি এবং পরবাসের যে বিপ্রতীপ চেতনা, অত্যন্ত ক্ষীণভাবে হলেও এ গানে তা উপস্থিত। কিন্তু প্রক্ষিপ্তভাবে এরকম দু'একটি গানে স্বদেশ চেতনার আভাস ছাড়া উনিশ শতকের প্রথম পর্বের বাংলা গানে দেশাত্মবোধের কোনও ধারাবাহিক বা লক্ষণীয় উপস্থিতি নেই। তবে এই শতকের মধ্যপর্ব থেকে নবজাগরণের প্রভাবেই সম্ভবত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধের যে উন্মেষ হয়েছিল, তার অনিবার্য প্রতিফলন ঘটেছে সমকালীন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে।

ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের কাব্য-কবিতা-নাটকে ধ্বনিত হল মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার প্রশস্তি। আর গানে ধারাবাহিক স্বদেশ চেতনার সূত্রপাত হল ১৮৬৮-তে জাতীয় মেলা বা হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে। ১৮৬৭ সালের প্রথমবারের মেলার কার্যবিবরণী, যেটি দ্বিতীয় বছরে মুদ্রিত আকারে প্রচারিত হল, তাতে মেলার উদ্দেশ্যসাধনের উপায় ছয়টি মণ্ডলীতে বিভক্ত করা হয়েছিল। পঞ্চম মণ্ডলীতে ছিল—'প্রতি মেলায় স্বদেশীয় সঙ্গীত-নিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহ বর্ধন করা যাইবে।' অক্ষয়কুমার মজুমদার, কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, ব্রজনাথ ঘোষ প্রমুখ এই মণ্ডলীতে ছিলেন। ১৮৬৭-তে মেলার প্রথম বছরে কোনও গান রচিত হয়েছিল কিনা বা মেলায় কোনও গান পরিবেশিত হয়েছিল কিনা সেই সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় বছরে যে-উদ্বোধনী সংগীত গাওয়া হয়েছিল, তা মেলা উপলক্ষ্যেই রচনা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান'—সাত

স্তবকেব এই দীর্ঘ গানটিকে বলা যেতে পাবে প্রথম বাংলা দেশাত্মবোধক গান বা প্রথম জাতীয সংগীত। এই গানেব সুবকাব সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে একটি মতে, আদি ব্রাহ্মসমাজেব গাযক এবং ঠাকুববাডিব সংগীতশিক্ষক বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন এই গানেব প্রথম সুবকাব ও গাযক। পবে গ্রেট ন্যাশনাল থিযেটাবেব কর্তৃপক্ষ আবেকটি নতুন সুব সংযোজন কবেন, সেই সুবই বর্তমানে প্রচলিত। হিন্দুমেলা উপলক্ষ্যেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব একবাব বচনা কবলেন—'মলিন মুখচন্দ্রমা ভাবত তোমাবি'। এই গানে ভাবতেব দৈন্য, ম্লান ক্রন্দসী মূর্তি, এমন এক বিযাদেব আবহ তৈবি কবেছিল যা দেশাত্মবোধক গানে আগে কখনও শোনা যাযনি। এ যেন এক নতুন বীতির গান। সেই সমযেব অনেক নাট্যকাব তাঁদেব বচিত নাটকেব গানে এই ভাবকে ব্যবহাব কবেছিলেন। উনিশ শতকেব শেষ পর্বে ববীন্দ্রনাথ বচিত 'কেন চেযে আছ গো মা' কিংবা 'আমায বোলো না গাহিতে বোলো না' ইত্যাদি গানেব অন্তর্লীন বিষণ্ণতা যেন দ্বিজেন্দ্রনাথেব গানেব বিযাদকে ছুঁযে থাকে। ববীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলাব শেযদিকে কোনও কোনও অধিবেশনে স্ববচিত গান পবিবেশন কবেন। কিন্তু মেলাব বিববণীতে নির্দিষ্টভাবে সেই গানগুলিব উল্লেখ নেই। তবে 'তোমাবি তবে মা সঁপিনু এ দেহ', 'অযি বিযাদিনী বীণা', 'ভাবতবে, তোব কলঙ্কিত পবমাণুবাশি', 'ঢাকো বে মুখচন্দ্রমা' ইত্যাদি গানে বযেছে পরাধীনতার গ্লানিব কথা। তাই কখনও কখনও মনে হয, উদ্দীপনা নয, বিযণ্ণতাব আবহেই আবর্তিত হয়েছে এই সমযেব অধিকাংশ দেশাত্মবোধক গান। তবে ব্যতিক্রমও ছিল। যেমন, 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন'। কিংবা ১৮৮৬-তে কলকাতা কংগ্রেসেব দ্বিতীয অধিবেশনে গাওযা হল যে গান—'আমবা মিলেছি আজ মাযেব ডাকে', জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুবেব 'চল্ বে চল্ সবে ভাবত সন্তান' ইত্যাদি। বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যাযেব 'স্বাধীনতা হীনতায কে বাঁচিতে চায হে' (১৮৫৮—পদ্মিনী উপাখ্যান) গানটি একসময় জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিল। উনিশ শতকেব দ্বিতীযার্ধে বিভিন্ন গীতিকাবের বচনায সমৃদ্ধ হযেছে দেশাত্মবোধক বাংলা গানের ধাবা, তবে এই পর্বেব সবচেযে উল্লেখযোগ্য গানটি নিঃসন্দেহে বঙ্কিমচন্দ্রেব 'বন্দে মাতবম্'—যে গান একদিন মুক্তিকামী ভাবতবাসীব বীজমন্ত্র হযে উঠেছিল।

একটা বিযয লক্ষণীয, উনিশ শতকীয জাতীযতাবাদীবা 'হিন্দু' এবং 'আর্য' শব্দ দুটিব মধ্যে যে গৌববময অতীতচাবণা কবতেন এবং তার সঙ্গে বর্তমান হীনদশাব তুলনা কবে যেভাবে মুহ্যমান হতেন—সেই ঘোব যেন ক্রমশ কাটতে লাগল। উনিশ শতকেব শেষ দিকে জাতিচিন্তা যত নিষ্ক্রিযতা কাটিযে জাগবণ ও উত্থানেব পথে অগ্রসব হল, ততই বাঙালি বুদ্ধিজীবীর চিন্তাব কেন্দ্রভূমিতে এল বঙ্গদেশ। জাতীযতাবোধেব উন্মেযেব সঙ্গে পবাধীনতাব যন্ত্রণাব অনুভব অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। তাই শাসক সম্প্রদায়কে ঘিবে নানা সমালোচনা এঁদেব মনে জাগত, কিন্তু ব্রিটিশ শাসকেব বিকল্প যেন এঁবা কল্পনা কবতে পাবতেন না। তাই প্রতিবাদে মুখব হওযাব পবিবর্তে এঁবা বাজানুগ্রহ প্রার্থনা কবতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বাযেব 'আর্য্যগাথা'-ব (১৮৮২) একটি গানে ইংবেজনবিশ হিন্দু উচ্চবিত্ত সম্প্রদাযেব জাতীযতাব চবিত্রটি স্পষ্ট হযে ওঠে—

ব্রিটেন দেখিযা আর্যে—পড়ে আছে পদতলে
কোবো না কোবো না ঘৃণা অধীন কাঙাল বলে।
আজ দুখী এ ভাবত, বিদেশিব পদানত,
সহিছে সহিবে আবো পদাঘাত শত শত,
ছিল একদিন ভবে
ভাবত স্বাধীন যবে
মেদিনী কাঁপাযে আর্য বীবদর্পে চলে যেত।

ধীবে ধীবে স্বাজাত্যবোধেব চেতনা নানান অভিঘাতেব দহনে বর্ণময হযে উঠল। কেবল বিদেশি শাসনেব কবল থেকে মুক্তি নয—বিদেশি শোযণেব কাবণে স্বদেশেব দৈন্যদশা থেকে মুক্তি, স্বদেশীয ভাযাব মর্যাদা, দেশীয শিল্প বাণিজ্যেব বিকাশ, সাম্প্রদাযিক অসংহতিব অবসান ইত্যাদি বিষযেও ক্রমশ সচেতন হযে উঠল দেশবাসী। ফলে নিজেদের ভাবতীয তথা হিন্দু আর্য জাতি মনে কবে যাবা একসময স্মৃতির সবণিতে বিচবণ কবতেন, তাঁবাই যেন এসে দাঁড়ালেন সক্রিয বর্তমানে। চোখ বাখলেন ভবিষ্যতেব দিকে। চোখে তাঁদেব স্বাধীন দেশেব স্বপ্ন। 'সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ কবালে/দ্বিসপ্তকোটিভূজৈর্ধৃত খবকববালে'—যে জাতিব কল্পনা কবেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, সে হল বাঙালি জাতি। শতাব্দী শেযে ববীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ তরুণ প্রজন্মেব স্বদেশচেতনাব অভিমুখ হযে উঠল বঙ্গদেশ বঙ্গজননী। জাতীয কংগ্রেস গঠনের মাধ্যমে ভাবতীয জাতীযতাবোধ যেমন একটা দৃঢ় সাংগঠনিক চবিত্র পেল, তেমনি তাব সহাবস্থানে বইল বঙ্গীয জাতীযতাবোধ। নানান ভাঙাগড়াব মধ্য দিযে একটা জাতিকে ক্রমশ প্রত্যযী কবে তুলতে তুলতে পবিণতিব পথে এগোয একটা দেশেব স্বাধীনতা সংগ্রাম। কাজেই তাব বিশেয একটি পর্ব, কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয। ঘটনাপ্রবাহের কিছু তবঙ্গ। তাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে ১৯০৫-১৯১১ব সমযসীমায সীমাযিত কবা যায না। আগ্নেযগিরিব যে-অগ্ন্যুৎপাত ১৯০৫-এ চতুষ্পার্শ্বকে সচকিত কবেছিল, তাব ঘুম ভাঙছিল অনেক আগে থেকেই।

নিছক প্রশাসনিক প্রযোজনেব বঙ্গভঙ্গেব প্রথম প্রস্তাব ১৮৯৬-তে এলেও ১৯০৫-এর মধ্যে শাসক শ্রেণীর বাজনৈতিক উদ্দেশ্য দেশবাসীব কাছে ক্রমশ প্রকট হযে পড়ে। ১৯০৪-এব ফেব্রুযাবি মাসে লর্ড কার্জনেব পূর্ববঙ্গ ভ্রমণেব সময চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা মযমনসিংহকে আসামের অন্তর্ভুক্ত কবাব প্রসঙ্গ উত্থাপন এবং ওই বছবই ফেব্রুযাবি ও ডিসেম্বব মাসে স্ববাষ্ট্রসচিব বিজলেব দুটি নোটে বাংলাকে ভাগ কবে বাজনৈতিকভাবে দুর্বল কবাব অভিসন্ধি স্পষ্ট হয। হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদাযিক মনোভাবকেও এব দ্বারা উৎসাহিত কবা হয। এইদিকে ইঙ্গিত কবেই ববীন্দ্রনাথ তাঁব 'সদুপায' প্রবন্ধে লেখেন—

'পার্টিশনে আমাদেব প্রধান আশঙ্কাব কাবণ কী। সেকথা আমবা নিজেবা অনেকবাব আলোচনা কবিযাছি, এমন কি, আমাদেব মনে এই ধাবণা আছে যে, সেইদিকে লক্ষ্য বাখিযাই কর্তৃপক্ষ বাংলাকে পূর্ব ও অ-পূর্ব এই দুই ভাগে বিভক্ত কবিযা বঙ্গকে ব্যঙ্গ ও বিকলাঙ্গ কবিযাছেন।

বাংলাদেশের পূর্বভাগে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ধর্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশি, সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাহাদের মধ্যে নিহিত হইয়া আছে। যদি বাংলাকে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমান প্রধান এই দুই অংশে একবার ভাগ করা যায় তবে ক্রমে ক্রমে হিন্দু-মুসলমানের সকল বন্ধনই শিথিল করিয়া দেওয়া সহজ হয়।'

বঙ্গভঙ্গের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ আবেদন-নিবেদন এবং আইনগত প্রতিবাদের পথ ছেড়ে সভা সমাবেশ প্রতিবাদী আন্দোলন ইত্যাদিতে শামিল হন। জনমত সংগঠনের জন্য জেলায় জেলায় সমিতি স্থাপিত হয়, স্বেচ্ছাসেবী দল গড়ে ওঠে।

রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে চরমপন্থীদের প্রবেশও বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করেই। বয়কটের ব্যাপারে তাঁদের প্রবল সমর্থন এবং স্বায়ত্তশাসনের চেনা গণ্ডি পেরিয়ে স্বরাজের বৃহত্তর রাজনৈতিক ভাবনার পথে যাত্রাও এই পর্বে সূচিত হল। 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' ছেড়ে একটি চরমপন্থী ধারা যে বিপ্লববাদের জন্ম দিল, সেই বিপ্লবের এগিয়ে চলার পথ এতদিনের চেনা পথের থেকে একেবারেই ভিন্ন, নতুন। চরম স্বার্থত্যাগ ও মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েও এই পথিকরা মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন রইলেন তাঁদের সশস্ত্র পথ চলায়।

'The Swadeshi Movement in Bengal 1903–1908' গ্রন্থে অধ্যাপক সুমিত সরকার চার ধরনের স্বদেশির উল্লেখ করেছেন : নরমপন্থী স্বদেশি, গঠনমূলক স্বদেশি, সক্রিয় বয়কট ও রাজনৈতিক ভাবনায় চালিত স্বদেশি এবং সন্ত্রাসবাদী স্বদেশি। এরা আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র হলেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল না।

নরমপন্থী প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে পাঁচটি পুস্তিকায়, তার সবগুলিই লেখা হয়েছিল ইংরেজিতে এবং ১৯০৫-এর অক্টোবরের পরেও তার মধ্যে স্বদেশি ও বয়কটের উল্লেখ ছিল না। প্রতিবাদ ছিল মূলত আইনগত ও যুক্তিভিত্তিক। এর নেতৃত্বে ছিলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গঠনমূলক স্বদেশির প্রধান প্রবক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লক্ষ্য ছিল দেশবাসীর মধ্যে আত্মশক্তির উদ্বোধন, বিচ্ছিন্নতাবোধের অবসান। তিনি বয়কটের প্রত্যক্ষ সমর্থক ছিলেন না। গ্রামীণ জীবনের উন্নতির মধ্যেই দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির বীজ নিহিত—একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। অনেকে মনে করেন, ১৯০৬-এর পর রবীন্দ্রনাথের মন থেকে হিন্দু স্বদেশি প্রভাব একেবারেই মুছে যায় এবং এর কারণ সম্ভবত ১৯০৬-৭ সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। 'গোরা' এবং 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের এই পরিবর্তিত মানসের স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। চরমপন্থী ভাবনায় প্রথম থেকেই দুটি ধারার সংমিশ্রণ হয়েছে—একটি রাজনৈতিক, অন্যটি অ-রাজনৈতিক। প্রথম ধারার বাহক বরিশালের 'স্বদেশ-বান্ধব'। ১৭৫টি গ্রামে এর শাখা বিস্তৃত ছিল। এঁদের নেতা ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। আর দ্বিতীয় ধারার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল ঢাকার অনুশীলন সমিতি, যার নেতৃত্বে ছিলেন পুলিন দাস। এখানে গোপনে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ চলত। চতুর্থ এবং সর্বশেষ ধারার নেতৃত্বে ছিলেন বারীন ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁদের চরমপন্থী বৈপ্লবিক ভাবনায় সক্রিয় হয়ে ওঠে কলকাতার অনুশীলন সমিতি। এর পেছনে প্রধান শক্তি ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ।

এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের গান। সুতরাং পাঠকের মনে হতেই পারে এত বিষয়ান্তরের অবতারণা কেন? আসলে, কোনও আন্দোলনের প্রেক্ষিত থেকে যখন গান-কবিতা-নাটক-ছবি তৈরি হয়, তখন তাকে উপলব্ধি করার জন্য সেই সময়টাকে জানা বড় জরুরি হয়ে পড়ে। কারণ, এইসব সৃজনের অধিকাংশই হয়ে ওঠে সময়ের দর্পণ। স্বদেশি আন্দোলনের প্রধানতম ঐতিহাসিক সুমিত সরকার লিখছেন The Swadeshi Movement's greatest claim to immortality lies perhaps in the realm of patriotic poetry and songs' পূর্ববাংলার একটি পুলিশ রিপোর্টে পাওয়া যায়— A new method of appealing to the people is reported from the Tipperah district where a band of young men is going about singing patriotic songs which are said to be far more effective than speeches শুধু ত্রিপুরায় নয়, বাংলার অনেক জায়গায়ই তখন এই দৃশ্য দেখা যেত। কারণ, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে যত সহজে গান পৌঁছয়, তেমন বোধহয় আর কিছুই নয়। আর সেই গান যদি হয় দেশজ সুরে, তবে সে কী অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে, তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর্বে রবীন্দ্রনাথ রচিত স্বদেশি গান।

১ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ সিমলা থেকে ঘোষিত হল, ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হবে। এই ঘোষণা আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চার করল। ৩ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে চারটেয় কলেজ স্কোয়ারে বিশাল সংখ্যক ছাত্র সমবেত হয়ে শপথ গ্রহণ করে তারা পাদুকা ও চাদর বর্জন করে তিনদিন জাতীয় শোক পালন করবে। এরপরে তারা বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর বাড়ির দিকে যাত্রা করে। ৪ সেপ্টেম্বর 'বেঙ্গলী'-র বিবরণে লেখা হয়—'more than four thousand persons including college and school students, bare-footed and holding flags in hand came in procession singing a national song composed by Babu Rabindra Nath Tagore proceeding from the College Square ' এর আগেই রবীন্দ্রনাথ রচিত স্বদেশি গান 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' কলকাতাবাসীকে উত্তাল করেছে। সত্যেন রায় লিখছেন 'বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ৭ই আগস্ট (১৯০৫ খৃঃ) কলিকাতার টাউন হলে যে সভা হয়েছিল, সেই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ নূতন সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' বাউল সুরে গীত হয়েছিল।'

সিটি বুক সোসাইটির যোগীন্দ্রনাথ সরকার 'বন্দে মাতরম্' নামে দেশাত্মবোধক কবিতা ও গানের একটি সংকলন প্রকাশের আয়োজন করছিলেন। ৩ সেপ্টেম্বর 'বেঙ্গলী'-তে এটি বিজ্ঞাপিত হয়—

' "বন্দে মাতরম্"/ইহাতে বঙ্কিমবাবুর "বন্দে মাতরম্", হেমবাবুর "বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে", সত্যেন্দ্রবাবুর "মিলে সবে ভারত-সন্তান", রবীন্দ্রবাবুর "অয়ি ভুবন মনোমোহিনী" প্রভৃতি ১২/১৩টী উৎকৃষ্ট সঙ্গীত, গোবিন্দবাবুর "নির্ম্মল-সলিলে" এবং এইরূপ আরও ৩০/৩৫টী উদ্দীপনাপূর্ণ জাতীয় কবিতা এবং সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট স্বদেশী কাগজে সুন্দরভাবে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।'

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে ৮৪ পৃষ্ঠার 'বন্দে মাতরম্' গ্রন্থটি প্রকাশিত

হয ১৩ সেপ্টেম্বর। মাত্র ছ'দিন পবে ১৯ সেপ্টেম্বব বর্ধিতাকাবে গ্রন্থটিব দ্বিতীয সংস্কবণ প্রকাশিত হয।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব অন্যতম চাবণ কবিব ভূমিকা নিলেন ববীন্দ্রনাথ। যদিও কলকাতায তাঁব সশবীব উপস্থিতি তখন ছিল না। তিনি গিবিডিতে বসে 'খেযা' কাব্যগ্রন্থেব কবিতা লিখছেন আব কবিতাব পাণ্ডুলিপিব খাতা উলটে নিযে লিখে চলেছেন একেব পব এক গান। মাসখানেকেব মধ্যে বচিত হল ২২।২৩টি গান। এই গানগুলি হল—(১) ও আমাব দেশেব মাটি (২) মা কি তুই পবেব দ্বাবে পাঠাবি তোব ঘবেব ছেলে (৩) এবাব তোব মবা গাঙে বান এসেছে (৪) যে তোমায ছাড়ে ছাড়ুক (৫) যদি তোব ডাক শুনে কেউ না আসে (৬) যে তোবে পাগল বলে (৭) তোব আপনজনে ছাড়বে তোবে (৮) সার্থক জনম আমাব (৯) আমি ভয কবব না ভয কবব না (১০) ওবে তোবা নেই বা কথা বললি (১১) ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আব মাটি (১২) বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি (১৩) নিশিদিন ভবসা বাখিস হবেই হবে (১৪) [ও] জোনাকি কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ (১৫) আমবা পথে পথে যাব সাবে সাবে (১৬) আজি বাংলাদেশেব হৃদয হতে কখন আপনি (১৭) আপনি অবশ হলি (১৮) যদি তোব ভাবনা থাকে ফিবে যা না (১৯) আমাদেব যাত্রা হল শুরু (২০) বিধিব বাঁধন কাটবে তুমি (২১) ওদেব বাঁধন যতই শক্ত হবে (২২) আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে (২৩) ওবে ভাই মিথ্যা ভেব না।

গানগুলি শেখাব জন্য তরুণ সম্প্রদাযেব মধ্যে কী আগ্রহ দেখা দিযেছিল, তাব আভাস পাওযা যায ২০ সেপ্টেম্বব ১৯০৫ অমৃতবাজাব পত্রিকায প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে—

'Dawn Society Music Class—A temporary Music class to teach a number of the newest national songs composed by Babu Rabindra Nath Tagore will be opened immediately under the auspices of the Dawn Society.'

এই সংগীতাবলি বচনাব মধ্যবর্তী পর্বে ববীন্দ্রনাথ একবাব কলকাতায আসেন। ২৭ সেপ্টেম্বব বিকেল ৬ টায অক্রুব দত্ত লেনে ববীন্দ্রনাথেব সভাপতিত্বে সাবিত্রী লাইব্রেবি স্বধর্ম সাধন সমিতিব একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান কবা হয। বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী, সুবেশচন্দ্র সমাজপতি, বিহাবীলাল সবকাব, শ্রীশচন্দ্র সর্বাধিকাবী, নিখিলনাথ বায, অমৃতলাল বসু, মনোবঞ্জন গুহ ঠাকুবতা, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, সুবেন্দ্রনাথ প্রমুখ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। সভায তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয। ২৮ সেপ্টেম্ববেব 'বেঙ্গলী'-তে এই অধিবেশনেব বিপোর্ট প্রকাশিত হয—

'The Chairman then delivered a short speech at the end of which he suggested that if Partition of Bengal were carried out on the 16th October next the people of entire Bengal Eastern & Western, should celebrate the day as an occassion of their union. That might be observed as an anniversary and Rakhi Bondhon, by exchange of yellow thread between the people of Eastern and Western Bengal on that day might be observed. A national song terminated the meeting at 9-20 pm.'

বাখিবন্ধনেব প্রস্তাব সম্ভবত এই সভাতেই প্রথম ঘোষিত হল। ববীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে

তাঁর বিখ্যাত 'রাখীসঙ্গীত'—'বাংলার মাটি বাংলার জল' রচনা করলেন। বঙ্গভঙ্গের দিন কলকাতায় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল ও অরন্ধন পালিত হল। ড রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন—'৩০শে আশ্বিন প্রভাতে রবীন্দ্রনাথকে পুরোভাগে রাখিয়া বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আপামর জনসাধারণ এক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া গঙ্গাতীরে সমবেত হইল। গঙ্গাস্নান করিয়া পরস্পরের হস্তে রাখি বন্ধন করিল।'

কুন্তলীন প্রস্তুতকারক হেমেন্দ্রমোহন বসু ধর্মতলা স্ট্রিটের মার্বেল হাউসে ১৯০৬-এর ৫ ফেব্রুয়ারি 'The Talking Machine Hall' নামে ফোনোগ্রাফ ও রেকর্ড বিক্রয়ের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান খুলে তাঁর ব্যবসায়ের বিস্তৃতি ঘটান। এর ক'দিন পর ১৬ ফেব্রুয়ারি 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষণা করেন—

' we have much pleasure in informing the public that highly respectable gentlemen like Babu Rabindra Nath Tagore Babu Dwijendra Lal Roy & Babu Satya Bhusan Gupta have very kindly allowed us to record their voices and this is a priviledge which has not been conferred upon any one else '

৬ মার্চ একই পত্রিকায় আবার পাতা-জোড়া বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়—

H Bose's Records/Songs composed and sung by Babu Rabindra Nath Tagore

১। সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে ৫। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

২। ও আমার দেশের মাটী ৬। বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি

৩। নিশিদিন ভরসা রাখিস ৭। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক

৪। এবার তোর মরা গাঙে ৮। যদি তোর ভাবনা থাকে

and many others

—একই বিজ্ঞাপনে পাঁচটি National Songs Composed by Pundit Kaliprosanna Kabyabisarad ও আটটি Songs Composed and sung by Mr D L Roy [প্রধানত হাসির গান ও 'ধাও ধাও বাণিজ্য ক্ষেত্রে' মুদ্রিত হয়।]

সিদ্ধার্থ ঘোষ 'যন্ত্ররসিক এইচ বোস' প্রবন্ধে ১৯০৬-এর মার্চ মাসে প্রকাশিত 'এইচ বোস রেকর্ডস'-এর ক্যাটালগের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে রবীন্দ্রনাথের গাওয়া আরও ছ'টি গানের সন্ধান দিয়েছেন—

১। আমরা পথে পথে যাব ২। বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি

৩। যে তোরে পাগল বলে ৪। আপনি অবশ হলি

৫। তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে ৬। ঘরে মুখ মলিন দেখে

বিজ্ঞাপিত গানগুলি রেকর্ড করা হয়েছিল ফোনোগ্রাফে মোমের সিলিন্ডারের ওপর, ফলে সবই নষ্ট হয়ে গেছে। পরে হেমেন্দ্রমোহন ফ্রান্সের প্যাথে কোম্পানির সহায়তায় গানগুলি ডিস্ক রেকর্ডে পরিবর্তিত করার আয়োজন করেন। ১৯০৮-এর ১৫ মার্চ 'বেঙ্গলী'-তে অন্যান্য অনেক রেকর্ডের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও একটি রেকর্ড বিজ্ঞাপিত হয়—

3511 350—বন্দে মাতবম্
3511 366—অযি ভুবনমোহিনী

বিজ্ঞাপন প্রকাশেব সমযও বেকর্ডগুলি দেশে এসে পৌঁছযনি। কিন্তু যখন শেষ পর্যন্ত বেকর্ড বাজাবে এল, তখন দেখা গেল একপিঠে 'বন্দে মাতবম্' গান ও অন্যপিঠে 'সোনাব তবী' কবিতাব আবৃত্তি বযেছে।

ববীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, বজনীকান্তব পাশাপাশি যাঁদেব গান এই সময মানুযেব মুখে মুখে ফিরেছে, তাঁবা হলেন—অমৃতলাল বসু, প্রমথনাথ চৌধুবী, বিজযচন্দ্র মজুমদাব, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ, অশ্বিনীকুমাব দত্ত, সবলা দেবী, কামিনীকুমাব ভট্টাচার্য, মনোমোহন চক্রবর্তী এবং অবশ্যই মুকুন্দ দাস।

মুকুন্দদাস ঢাকা জেলাব বিক্রমপুব পবগনাব বানবী গ্রামেব ছেলে। ছেলেবেলায তাঁকে সবাই ডাকত 'যজ্ঞা' বলে, নাম ছিল যজ্ঞেশ্বব দে। স্বদেশি আন্দোলনে ববিশালেব অবিসংবাদী নেতা অশ্বিনীকুমাব দত্তেব সান্নিধ্যে আসেন যজ্ঞেশ্বব তরুণ বযসে। অশ্বিনীকুমাব তাঁকে বলেন, 'যজ্ঞা, তোব এই কণ্ঠ আব প্রাণ নিযে তুই হবি নতুন যুগেব চাবণ। যাদেব আজও ঘুম ভাঙেনি, তুই জাগিযে দিবি তাদেব।' অশ্বিনীকুমাবেব স্বপ্নপূবণ হতে বেশি সময লাগেনি। কিছুদিনেব মধ্যেই বাংলার মানুষ দেখল গৈবিকবেশী এক জ্বলন্ত শিখা গ্রাম থেকে গ্রামান্তবে স্বদেশি যাত্রাব আসব মাতিযে বেড়াচ্ছে। কখনও মা-বোনেদেব উদ্দেশে তিনি গাইছেন 'ছেড়ে দাও কাচেব চুডি বঙ্গনাবী/কভু হাতে আব পবো না', কখনও বা বিদেশি ভোগপণ্যেব মোহে আচ্ছন্ন মানুযদেব ধিক্কাব দিযে বলছেন—

'বাবু বুঝবে কি আব ম'লে।
কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে, একদম দফা সাবলে॥
খেতে ভাত সোনাব থালে
নাউ সেটিস্‌ফাইড্ স্টীলেব থালে,
তোদেব মত মূর্খ কি আব দ্বিতীযটি মেলে।'

মুকুন্দদাস নাটক লিখেছেন 'মাতৃপূজা'। এই নাটক দেখে তাঁব এক বন্ধু বলেছিলেন, 'আপনি ববিশাল শহবে এসে গান করুন, তাবপবে কলকাতা যান।' শুনে মুকুন্দদাস বললেন— 'একটু সবুব কব, এদিক ওদিক থিকা একটু টিল কইব্যা ববিশালেব ধুলা মাথায মাখুম, তাবপব একদম শিযালদা স্টেশনে নাইম্যা কইলকাতা ধইব্যা এমুন একটা ঝাঁকি দিমু যে সেই ঝাঁকিতে সাবা বাংলা কাঁপাইযা দিব।'

মুকুন্দদাস স্বদেশি যাত্রায কলকাতাবাসীকে কাঁপিযেছিলেন কিনা, সে তথ্য জানা নেই, কিন্তু ব্রিটিশ সবকাব তাঁব 'মাতৃপূজা' নাটকটি বাজেযাপ্ত কবেছিল এবং বাজদ্রোহেব অপবাধে তাঁকে আড়াই বচবেব সশ্রম কাবাদণ্ডে দণ্ডিত কবা হযেছিল।

'বন্দে মাতবম্' শব্দযুগল যেন তখন এক সম্মোহন ছড়াচ্ছিল। অসংখ্য বচযিতাব গানে উঠে এল এই শব্দবন্ধ নানাভাবে। বজনীকান্ত লিখলেন 'বন্দেমাবতম্ ত শুধু মাযেব বন্দনাই/এতে

তো ভাই সিডিশনেব গন্ধ নাই'। চাবণকবি মুকুন্দদাস গাইলেন, 'বন্দে মাতবম মন্ত্র কানে/বর্ম এঁটে দেহে মনে/বোধিতে কি পাববে বণে/তুমি কত শক্তিময' কিংবা 'বন্দেমাতবম্ বলে/নাচো বে সকলে, কৃপাণ লইযা হাতে'। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ লিখলেন 'মাগো যায যেন জীবন চ'লে/শুধু জগৎ মাঝে তোমাব কাজে/বন্দেমাতবম্ বলে'। তাঁব বচিত আবও একটি গানে শোনা গেল 'আজ ববিশাল পুণ্যে বিশাল হলো লাঠিব ঘায/ঐ যে মাযেব জয় গেযে যায (বন্দে মাতবম্ বলে), এই শেষ গানটি বচনাব একটি বিশেষ প্রেক্ষিত আছে। ব্রিটিশ দমননীতি যত উগ্র হল, সাবা বাংলাব্যাপী আন্দোলনেব মেজাজও ততই তীব্র হযে ঠল। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসামেব লে গভর্নব ব্যামফিল্ড ফুলাবেব অত্যাচাব ক্রমশ মাত্রাহীন হযে উঠছিল। তাঁব উৎপীড়নেব বীভৎসতা এবং নিষেধাজ্ঞা স্বদেশিদেব কণ্ঠ থেকে 'বন্দে মাতবম' ধ্বনি কেড়ে নিতে পাবেনি। বজনীকান্ত গান বাঁধলেন 'ফুলাব কল্লে হুকুমজাবি/মা বলে যে ডাকবে বে তাব শাস্তি হবে ভাবী'। গানে গানে আসব মাতালেন মুকুন্দদাস 'ফুলাব আব কি দেখাও ভয/দেহ তোমাব অধীন বটে, মন তো তোমাব নয।' ১৯০৬ সালেব পযলা বৈশাখ ববিশালে আযোজিত প্রাদেশিক সম্মেলনেব অধিবেশনে যে প্রশাসনিক নৃশংসতা চলে, তাবই প্রেক্ষিতে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ বচনা করেন উল্লিখিত গানগুলি। অধিবেশনেব প্রথম দিন কিশোব চিত্তবঞ্জন গুহঠাকুলতা 'বন্দে মাতবম্' ধ্বনি দেওযাব অপবাধে পুলিশেব হাতে নারকীয লাঞ্ছনা ভোগ কবে। মাবতে মাবতে তাকে বক্তাক্ত অবস্থায পাশেব পুকুবে ফেলে দেওযা হয। যতবাব তাকে আঘাত কবা হযেছে, জ্ঞান থাকা পর্যন্ত ততবাবই সে 'বন্দে মাতবম্' উচ্চাবণ কবেছে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব অধিকাংশ গান যখন দেশজ সুবেব আঙ্গিকে বাঁধা হযেছে, এমনকী ববীন্দ্রনাথও যখন বহু মানুষেব আবেগকে যুক্ত কবাব সচেতনভাবে সেই পথে হেঁটেছেন, তখন অনন্য এক বচনাশৈলীতে ব্যতিক্রমী থেকেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল বায। তাঁব বচিত 'ধন ধান্য পুষ্প ভবা' ভাবত আমাব ভাবত আমাব' 'বঙ্গ আমাব জননী আমাব' 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' ইত্যাদি গানে এমন এক ওজস্বিতা এবং প্রাণমযতা আছে, যা সেদিন উদ্বেল কবেছিল বহু মানুষকে, আজও কবে।

বহু অজ্ঞাত বচযিতাব গানেও এইসময সমৃদ্ধ হযেছে বাংলা গানেব দেশাত্মবোধেব ধাবাটি। অস্তিত্বেব বিপন্নতায কেউ কেউ হযতো নিজেকে অপ্রকাশ বেখেছেন, কিন্তু আন্দোলনেব শবিক হযেছেন সৃজনসত্তায।

বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী আন্দোলন সমাজেব শিক্ষিত উচ্চবর্গকে যতটা আন্দোলিত কবেছিল, নিম্নবর্গেব শ্রমজীবী মানুষকে ততটা কবেনি বলেই মনে হয। আন্দোলনে শামিল যে-মেযেবা, তাঁবাও মূলত সমাজেব উচ্চবিত্ত আলোকিত পবিবাবেব সদস্যা। 'বঙ্গভঙ্গে কৃষকেব গান' লিখেছিলেন গিবীন্দ্রমোহিনী দাসী। বজনীকান্ত সেন এক তাঁতি-দম্পতিকে সম্বোধন কবে একটি গান লিখেছেন। তিনি বলছেন, তোমবা কাপড় বোনো, তাতে তোমাদেব জীবিকা এবং দেশেব সেবা দুই-ই হবে। কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত তাঁব কাব্যগ্রন্থ 'আমাদেব দেশ' উৎসর্গ কবেছিলেন দেশেব তাঁতি ও চাষি সম্প্রদাযকে। প্রমথনাথ বাযচৌধুবীব কাব্যগ্রন্থ 'দেশভক্তি'-তে কযেকটি

আখ্যান-কবিতায সমাজেব নানাস্তবেব মানুষ কীভাবে স্বদেশি চেতনায উদ্বুদ্ধ হযে বিদেশি দ্রব্য বর্জন করছে তাব ছবি এঁকেছেন। অফিসযাত্রী বাবুকে গাড়োযান বলে, মুখেব বিলিতি চুরুট ফেলে দিলে তবেই সে তাকে গাড়িতে তুলবে। জুতো পালিশওযালা বিলিতি বুট পালিশ কবতে আপত্তি জানায। গৃহবধূ অনাযাসে মূল্যবান বিলিতি জিনিস পুড়িযে ফেলে। অফিসেব সাহেব কেবানিকে দিশি পোশাকে অফিসে আসতে নিষেধ কবায সে চাকবিতে ইস্তফা দেয এবং সেইজন্য তাঁব স্ত্রী স্বামীব গববে গববিনী হযে ওঠেন—এমন অনেক টুকবো ছবি আমবা পাই। তবু সমাজেব নিচুতলায কিংবা গ্রামীণ জীবনে এই আন্দোলন কতটা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, সে সম্পর্কে একটা প্রশ্ন থেকেই যায।

গণসংযোগেব উদ্যোগ নেওযা হযনি এমন নয। কিন্তু প্রযোজনেব তুলনায হযতো তা অপ্রতুল ছিল। নিজে নৌকো বেযে কযেকজন দোহাব সঙ্গী নিযে গ্রাম-গ্রামান্তবে মুকুন্দদাসেব ঘুবে বেড়ানোব কথা সকলেবই জানা। অশ্বিনীকুমাব দত্ত আন্দোলনকে কৃষকমুখী কবে তোলাব আত্যন্তিক চেষ্টা কবেছিলেন। তাঁব প্রেবণায লোকগাযক মফিজুদ্দীন বযাতি জাবিগানেব সুবে স্বদেশি গান বেঁধেছেন। ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতি প্রকাশিত 'স্বদেশী পল্লীসঙ্গীত' বইটিতে লোক-আঙ্গিকভিত্তিক বেশ কযেকটি স্বদেশি গানেব সন্ধান পাওযা যায। পাবনাব মুনসেফ জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযেব ডাযাবি থেকে জানা যাব, সেখানে বৈরাগী ও বৈষ্ণবীবা ধর্মীয গানেব পাশাপাশি স্বদেশি গানও গাইতেন। কথকতাব আসবেও ঢুকে পড়ে স্বদেশ। বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত পীতাম্ববচন্দ্রেব 'স্বদেশ হিতৈষী ভাদু সংগীত' গ্রন্থেও লোক-সুবে আধাবিত স্বদেশি গান পাওযা যায। এতদ্‌সত্ত্বেও মনে হয, বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র কবে জাগ্রত স্বদেশ চেতনা, তা যেন সমাজেব আলোকিত সীমায় সীমাযিত, সর্বত্রগামী নয। তবে এই আন্দোলনেব সবচেয়ে বড অবদান হল, বাঙালিব মনে স্বাধীনতাব বাসনা জাগানো। স্বদেশি আন্দোলনেব উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ বদ। ১৯১১-ব ১২ ডিসেম্বব সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। কিন্তু থামল না স্বাধীনতা সংগ্রাম—১৯০৫-এব অঙ্কুবিত বীজ তখন সতেজ বৃক্ষ।

সহাযক গ্রন্থ

১ The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908/Sumit Sarkar
২ ভাবতেব মুক্তিসংগ্রামে চবমপন্থী পর্ব/অমলেশ ত্রিপাঠী
৩ ববিজীবনী, (পঞ্চম খণ্ড)/প্রশান্তকুমাব পাল
৪ উনিশ শ পাঁচ/নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায
৫ মুক্তিব গান (প্রথম খণ্ড)/সংকলন ও সম্পাদনা সুভাষ চৌধুবী
৭ বজ্রশিখায বাংলা/বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলনেব শতবর্ষে সংকলন প্রকাশনা গণশক্তি

১৯১১ : প্যাঁচের রকমফের

সেমন্তী ঘোষ

১৯১১ সাল, কলকাতা। টালমাটাল সময। খুব তাডাতাড়ি পাল্টে যাচ্ছে অনেক কিছু। পাল্টাচ্ছে ভালোব দিকে, পাল্টাচ্ছে মন্দেব দিকেও। সব মিলিযে কী ভাবে, কেমন ভাবে যে সমযটাকে ব্যাখ্যা করা উচিত, বুঝতে পাবছিলেন না তাঁবা, যাঁবা ওই সমযটাব মধ্য দিয়ে বাঁচছিলেন। আশ্চর্য নয, এমন হওযাটাই স্বাভাবিক। ঘটনাবহুল সমযেব মধ্য দিযে বাঁচতে বাঁচতে অনেক সমযেই সমসাময়িকদেব পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হয না যে সমযটা সব মিলিযে কেমন ছিল। অনেক পরে, পেছন ফিবে সমযটাকে দেখে কেউ হযতো সে বিচাব কবতে পাবেন, একবকম ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দাঁড় কবিযে বুঝতে পাবেন, কী ছিল সেই সমযকালের মূল চবিত্র।

তাই ১৯১১ সালে যখন এত দিনেব আন্দোলন-বিক্ষোভেব দাবি মেনে নিযে ব্রিটিশ বাজ দু'ভাগে বিভক্ত বঙ্গপ্রদেশকে আবাব এক কবে মিলিযে দিল, নবজাত প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও আসামেব নাম তাদেব সরকারি নথিপত্র থেকে উঠিযে দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ ভাবতেব রাজধানী সবিয়ে নিল কলকাতা থেকে দূর পশ্চিমেব দিল্লিতে, সে দিনেব বাজনীতি-সচেতন বাঙালি ভদ্রলোক বোধহয় ঠিকঠাক বুঝতে পাবেননি ইতিহাসে শেষ পর্যন্ত কেমন চেহাবা নিযে প্রতিভাত হবে সেই সমযটা। স্বদেশি আন্দোলনেব অস্তিত্ব যদিও ততদিনে আব নেই, তবু কলকাতাবাসী ভোলেনি সেই আন্দোলনেব তীব্র আবেগময দিনগুলোব কথা, রাস্তার আন্দোলন শেষ হওযার পবেও সে শহব দেখেছে বিক্ষোভের অন্য রূপ, যাব নাম বিপ্লবী সন্ত্রাস। বাংলাকে আবার এক হতে দেখাব তৃপ্তি ও সন্তোষ তাই ভবিযে দিযেছিল কলকাতাব সমাজকে। 'বেঙ্গলি' পত্রিকাব সম্পাদকীয় সহজ ভাষায প্রকাশ কবেছিল সেই সন্তোষ "The most memorable triumph of constitutional agitation within the lifetime of this generation" (১৯১১) বস্তুত, হযতো অতটাই আনন্দেব ছিল না সমযটা কলকাতা থেকে বাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত হওযাব ফলে বাংলা যে ব্রিটিশ বাজেব সুযোবাণীব আসন থেকে নেমে এসে জাযগা নিল আমদববাবে, সে ঘটনাব প্রকৃত তাৎপর্য আসলে তখনও পুবোপুবি অনুভব কবা যাযনি। তাব মানে অবশ্যই এই নয যে কাবওব চোখেই ধবা পড়েনি বাংলাব বাজনৈতিক অস্তিত্ব ও গুরুত্বেব এই বৃহত্তব সংকট। পুনর্গঠিত বাংলা প্রদেশেব প্রথম গভর্নব লর্ড কাবমাইকেলেব মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট যে কেউ কেউ এ বিষযটা নিযে যথেষ্ট ভাবছিলেন তখনও · "As a witty Indian told his fellow Bengalis, 'You have been crying for the moon, and they have given back to you, they have at the same time taken away the sun" কিন্তু এ কেবলই টুকবোটাকবা বিচ্ছিন্ন অন্তর্দৃষ্টি। ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে, হাবানোব কষ্টেব চেযে পাওযাব আনন্দই অনেক বেশি মাত্রায বিবাজ কবছিল ১৯১১ সালেব শেষদিকে, এই কলকাতা শহবে।

সে অনুভূতিই যদি সত্যি হত, তা হলে বলতে হত, ব্রিটিশ বাজেব পক্ষে ১৯১১ ছিল একটা পবাজযেব মুহূর্ত, পশ্চাদপসবণেব মুহূর্ত। জাতীযতাবাদী প্রতিবাদ— সে স্বদেশি-বযকট আন্দোলনই হোক, এখানে ওখানে ফুঁসে-ওঠা সন্ত্রাসেব আগুনই হোক, আব, সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায-চালিত 'বেঙ্গলি' পত্রিকাব ভাষায 'constitutional agitation'ই হোক, সেই প্রতিবাদেব সামনে এসে থমকে দাঁড়িযে গিযেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেব অশ্বমেধেব ঘোড়া, এমনটাই তবে ধবে নিতে হয।

তবে এই 'ধবে নেওযাটা' মোটেই সঙ্গত কিংবা যুক্তিনিষ্ঠ হবে না। বঙ্গভঙ্গ বদ নিযে যে খুব বেশি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ হযেছে, তা নয, কিন্তু ভেতব থেকে সে যুগটাকে দেখাব চেষ্টা কবলে স্পষ্টই বোঝা যায যে, ১৯১১ সালকে ইংবেজ শাসনেব দুর্বল মুহূর্ত বলে দেখাব আকর্ষণ যতই হোক, জাতীযতাবাদী ইতিহাস যতই সাফল্যেব আনন্দে ভাইসবয লর্ড হার্ডিঞ্জ ও সেক্রেটাবি অব স্টেট লর্ড ক্রু-এব বঙ্গভঙ্গ বদেব ঘোষণাকে বিজযবরণমালা দিযে ভূষিত করুক, এই ঘোষণাব পিছনেও ছিল সাম্রাজ্যদেবই আব এক মোক্ষম চতুব প্যাঁচ। বাস্তবিক, ব্রিটিশ পক্ষ থেকেও কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বদকে বাঙালি জাতীযতাবাদেব জয হিসেবে দেখাতে চাওযা হযেছিল, বিপ্লব ও আন্দোলনেব কাছে 'বাজে'ব সমর্পণ হিসেবে দেখাতে চাওযা হযেছিল। এই ভানটা দবকাব হযেছিল কেন? সাম্রাজ্যবাদেব নিজস্ব খেলাটাকে ভালোভাবে খেলাব জন্য। সেই খেলাব প্রযোজনেই ১৯০৫ সালেব বঙ্গভঙ্গ যেমন ছিল উপনিবেশী শাসনকে শক্তপোক্ত কবতে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' স্ট্র্যাটেজির প্যাঁচ, ১৯১১ সালেব বঙ্গভঙ্গ বদও আসলে ঠিক সেই 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'-এবই আব এক প্যাঁচ, একই উদ্দেশ্যে, আলাদা পথে।

কথাটা বুঝতে গেলে আমাদেব কেবল বঙ্গভঙ্গ বদ ও বাজধানী স্থানান্তবেব 'দেওযা-নেওযা ফিবিযে দেওযা'ব বিষযটা বুঝলেই চলবে না, তাকাতে হবে আবও এক বড প্রেক্ষাপটেব দিকে, যে প্রেক্ষাপটে বিনিসুতোব মালায গাঁথা হচ্ছিল একেব পব এক ঘটনা—মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, মর্লে-মিন্টো সংস্কাবেব মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনেব সূচনা, সন্ত্রাসেব কঠোব হাতেব মোকাবিলা, বঙ্গভঙ্গ বদেব ঘোষণা, সেই নতুন পুনর্গঠিত বঙ্গে মুসলিম সংখ্যাগবিষ্ঠতা নিশ্চিত কবা, বাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লি সবানো, ঢাকাকে তুষ্ট কবতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয প্রতিষ্ঠাব শপথ, এইসব কিছুই। ঘটনামালাব মূল সূত্রটা সেই হিন্দু মুসলমান সম্পর্কেব মধ্যে আসলে বিংশ শতকেব প্রথম দশকেব মধ্যেই সূর্যালোকেব মতো স্পষ্ট হযে উঠেছিল ভাবতীয সমাজজীবনে পাবস্পবিক বিবোধিতায গা ভাসিযে দেওযা দুই সম্প্রদায-সংস্কৃতিব অস্তিত্ব। সেই দুই সম্প্রদাযকে দুই হাতে নিযে যে কালেব মন্দিবা বাজাতে প্রবৃত্ত হযেছিল ব্রিটিশ বাজ— বঙ্গভঙ্গেব সূত্রও সেখানে নিহিত, বঙ্গভঙ্গ বদেব সূত্রটাও সেখানেই।

২

প্রথমেই বুঝে নেওযা যাক, সাধাবণত কোন কোন যুক্তি দিযে বঙ্গভঙ্গ বদেব ঘোষণাব ব্যাখ্যা

দেওয়া হয় এবং সেই যুক্তিগুলির ওজন কতখানি। বস্তুত, এই ব্যাখ্যাগুলির কোনওটিই শেষ পর্যন্ত মানা যায় না, বিভিন্ন কারণে সব মিলিয়ে তারা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। স্বদেশি-বয়কট আন্দোলন তত দিনে প্রায় সর্বতোভাবে থিতিয়ে এসেছে, ফলে আন্দোলনের প্রথমাংশে বয়কটের অভিঘাতে ব্রিটিশ বাণিজ্য স্বার্থের যেটুকু ক্ষতিসাধন হচ্ছিল, ১৯০৮ সালের পর আর তার সেই প্রাসঙ্গিকতা দেখা যাচ্ছিল না। মনে রাখতে হবে যে, বয়কটের প্রাথমিক অভিঘাত কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো ছিল না। সুমিত সরকার দেখিয়েছেন, কালেক্টর অব কাস্টমস-এর হিসেবে ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ আমদানি-শুল্ক তালিকায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। সুতিবস্ত্র আমদানি কমেছিল ২২ শতাংশ, সুতোর আমদানি কমেছিল ৪৪ শতাংশ, নুনে ১১ শতাংশ, সিগারেটে ৫৫ শতাংশ আর জুতোর ক্ষেত্রে ৬৮ শতাংশ। বণিকের মানদণ্ড নিশ্চয়ই টলমল করে উঠেছিল সেই সময়ে, কিন্তু একেবারেই সংক্ষিপ্ত এক সময়ে। ক্রমে উৎসাহে ভাটা পড়ল, খানিকটা যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে, খানিকটা বয়কটের পাশাপাশি স্বদেশি শিল্পোদ্যমের নিজস্ব দুর্বলতার কারণে বছর দু-একের মধ্যেই ব্রিটিশ বাণিজ্য আবার আগের নিশ্চিন্ততায় ফিরে গেল। ১৯০৫-১১ সালের মধ্যে বিভক্ত বঙ্গ অবশ্যই ব্রিটিশ রাজের অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকূল প্রমাণিত হয়নি, ১৯১০-১১ সালেও বোঝা যাচ্ছিল যে দুটি আলাদা প্রদেশ শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চালনার খরচ বাড়াচ্ছে বই কমাচ্ছে না। কিন্তু এই শেষের দিকটাতে ব্রিটিশ রাজকোষে ক্ষতির কারণ আর যাই হোক, বয়কট আন্দোলন নয়।

আর কেবল আর্থিক ক্ষতিই তো নয়। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ ইতিমধ্যেই যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছে, তাতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল যে, যে 'প্রশাসনিক দক্ষতা' বাড়ানোর যুক্তিতে বাংলা বিভাগ করা হয়েছিল, সেই যুক্তিটিই ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বস্তুত দুই বাংলাতেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা ১৯০৫-এর পর অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়ে। পশ্চিম প্রদেশে ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ-আন্দোলনের মোকাবিলা করতে গিয়ে প্রদেশের বাকি শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আর পূর্ববঙ্গ ও আসামে গভীর সমস্যা তৈরি হয় প্রায় যোগাযোগবিহীন প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনভিজ্ঞ নতুন জনবল দিয়ে প্রশাসনিক কাজ চালাতে গিয়ে। বঙ্গবিভাগের আগে যে বাংলার পূর্বাংশের প্রশাসন কিছু ভালো ছিল তা নয়, কিন্তু অন্তত এ নিয়ে সংশয় নেই যে বিভাজনের পরে পরিস্থিতির কোনও উত্তরণ সম্ভব হয়নি। লর্ড হার্ডিঞ্জের কাউন্সিলের সদস্য ফ্লিটউড উইলসন ১৯১১ সালের মে মাসে পূর্ববঙ্গ পরিদর্শনে এসে রিপোর্ট করেন যে, সেখানকার পরিস্থিতি একেবারেই 'a positive scandal' 'hardly any goverment exists in the province' কিন্তু প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়ানো গেল না বলেই বঙ্গবিভাগের ছয় বছর পরে বঙ্গবিভাগ রদ করে দেওয়া হল, এই যুক্তিটি স্বীকার করার সমস্যা একটাই। তা হল, ১৯০৫ সালে যখন লর্ড কার্জন বঙ্গপ্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন, তখন 'administrative effieciency'র অজুহাত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে তো 'অজুহাত'ই মাত্র। যে উদ্দেশ্যটা প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না, সেই উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হল না বলে একটা এত বড় পদক্ষেপ উল্টে দেওয়া হল, এমনকী জাতীয়তাবাদের কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে

'নতিস্বীকাব' কবিযে সে পদক্ষেপ উল্টে দেওযা হল, এই যুক্তি-পাবম্পর্য কি খুব গ্রহণযোগ্য? নতুন প্রদেশেব প্রশাসনিক দুর্বলতা ব্রিটিশ সবকাবকে বিবক্ত কবে তুলছিল ঠিকই, কিন্তু সে বিবক্তিব ফলেই বঙ্গভঙ্গ বদেব মতো এত বড একটি ঘটনাকে ব্যাখ্যা কবা যায না। প্রশাসনিক দুর্বলতাব বিযযটি সম্পর্কে এটুকু মাত্রই বলা যায— যখন অন্যতব প্রচ্ছন্ন কাবণে বঙ্গবিভাগ উঠিযে নেওযাব কথা বলা হল, সেই পদক্ষেপেব পক্ষে যুক্তি খাডা কবতে 'বাজে'ব তেমন কোনও অসুবিধে হযনি।

ব্রিটিশ পক্ষ থেকে অনেক সময একটি যুক্তিব আভাস উঠে এসেছে, অনেক সময তা এক ধবেনেব মান্যতাও পেযেছে। যুক্তিটি প্রথম দিযেছিলেন সম্রাট পঞ্চম জর্জ, সেই ১৯১১ সালেই। তিনি বলেছিলেন যে, সে সমযে তাঁব ভাবত পবিদর্শনে আসাব উপলক্ষ্যকে স্মবণীয কবে বাখতে ভাবতকে তাঁব তবফ থেকে একটি ব্যক্তিগত 'উপহাব' (boon) এই বঙ্গভঙ্গ বদেব সিদ্ধান্ত। কেন হঠাৎ এ হেন উপহাব দিতে ইচ্ছে হল তাঁব, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ১৯০৫-৬ সালে যখন 'প্রিন্স অব ওযেলস' হিসেবে তিনি ভাবতভ্রমণে এসেছিলেন, তখন দেখে গিযেছিলেন কী ভীষণ প্রতাপ ছিল স্বদেশি আন্দোলনেব, দেখেছিলেন কী ভাবে একটা গোটা সমাজ ব্যথিত হযে পডেছিল বঙ্গ-বিভাগেব সিদ্ধান্তে। ফলত তিনি নিজে সম্রাট হযে এ 'অন্যাযে'ব প্রতিকাব করতে চাইলেন, দিল্লি দববাবে শোনা গেল বঙ্গবিভাগ রদেব ঘোষণা। ভাইসবয হার্ডিঞ্জ এবং সেক্রেটাবি অব স্টেট ক্রু নাকি ভেবেচিন্তে মেনেই নেন এই উপহাবেব যুক্তিটি, কেননা আব হোক না কেন, অন্যান্য সম্ভাব্য উপহাবেব চেযে যে এই উপহাব কম ব্যযসাপেক্ষ (এমনকী খবচ-বাঁচানো), সে সত্য উপলব্ধি কবতে তাঁদেব দেবি হযনি।

সন্দেহ নেই, এ যুক্তি প্রথম থেকেই কুযুক্তি। হীবেন চক্রবর্তী তাঁব *Political Unrest in Bengal* বইতে ব্যাখ্যা কবেছেন কেন এটি কুযুক্তি। একে তো পঞ্চম জর্জ যেহেতু কেবল সাংবিধানিক মতেই সম্রাট ছিলেন, মোটেও প্রথম চার্লস ইত্যাদি পূর্বসূবিদেব মতো প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন না, এমনকী নিজেব ভাইসবয নিজে নির্বাচন কবাবও যথেষ্ট স্বাধীনতা তাঁব ছিল না, সুতবাং এত বড় একটা সিদ্ধান্ত তিনি নিজ দাযিত্বে নিযে ফেলবেন এবং অন্যান্য ক্ষমতা-স্তবগুলিকে প্রভাবিত কবে ফেলবেন, এতটা বিশ্বাসযোগ্য নয। তাব ওপব হার্ডিঞ্জ পেপাবস থেকে স্পষ্টত মনে হয, সম্রাট নিশ্চযই এ বিযযে খানিকটা উৎসাহী হযেছিলেন, কিন্তু হার্ডিঞ্জ ও ক্রু মাবফত বিযযটি সমর্থিত হওযাব আগে এ বিষয়ে নাক গলানোব কোনও অভিপ্রাযই তাঁব ছিল না। আসল কথা, যদি বা ধবে নেওযা হয় যে বেচাবি সম্রাট একটা উপযুক্ত উপহাবেব সন্ধানে ছিলেন তাঁব বহুলপ্রচারিত ভাবত পবিদর্শন উপলক্ষ্যে, হঠাৎ বঙ্গবিভাগ বদ ঘটনাটিকেই কেন বেছে নেওযা হল, সে প্রশ্নেব সন্তোষজনক উত্তর কিন্তু তাতেও মেলে না। নিশ্চযই অন্য কোনও কাবণে এ ভাবনা সবকাবি মহলেব আনাচে কানাচে ঘোবাফেবা কবছিল, সম্রাটেব আগমনকালে কেবল ভাবনাটিব যথাযথ সমযোপযোগী ব্যবহার কবা গিযেছিল, এটুকুই বোঝা যায।

তবে কি বাংলাব ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে আতঙ্কিত হযেই এই সিদ্ধান্ত?

রাজনৈতিক 'unrest' যে বিদেশি প্রশাসক মহলকে বেশ খানিকটা উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সেই সময়ের হোম সেক্রেটারির অন্যতম সচিব জেনকিন্স যে বলেছিলেন, 'until we get rid of the partition ulcer, we shall have no peace', সে কথার প্রতিধ্বনি আমরা দেখতে পাই আরও বহু সরকারি নথিপত্রে। ১৯১১ সালেও লর্ড মিন্টো এ নিয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন, এমনকী বিপদের ভয়ে সম্রাটকে ভারত পরিভ্রমণে যথাসাধ্য বাধাও দিয়েছেন। শাখানদী-উপনদী-অধ্যুষিত পুব বাংলায় ছিল সন্ত্রাসবাদী বাঙালি যুবসমাজের নিশ্চিন্ত আশ্রয়, ম্লেচ্ছ পুলিশের ক্ষমতা কোথায় সেইসব অঞ্চল থেকে তাদের খুঁজে বার করার। পশ্চিমে ফরাসি চন্দননগরের আশপাশেও সন্ত্রাসবাদের যথেষ্ট প্রতাপ সেই সময়ে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যদিও সন্ত্রাসবাদই হয়তো স্বদেশি বাংলার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক উত্তরাধিকার, কিন্তু সেই সন্ত্রাসের ঘোষিত লক্ষ্য ততদিনে তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেই। ব্রিটিশ শাসকরা কি সত্যিই আশা করার অবস্থায় ছিলেন যে বঙ্গভঙ্গ রদ করে বাংলার রক্তপন্থী যুবসমাজকে শান্ত করা যাবে? বিদেশি শাসনের ঔদ্ধত্য নিয়ে তাদের যে বিক্ষোভ, তার কিছুটা প্রশমন হবে? সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিষয়ে ব্রিটিশ প্রশাসন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চেয়েছিল প্রত্যক্ষ মোকাবিলার পথে চলতে, খুঁজে পেতে তাদের নিঃশেষ করতে। সুতরাং হীরেন চক্রবর্তী যদিও মনে করেছেন হার্ডিঞ্জের মাথায় বঙ্গভঙ্গ রদের পরিকল্পনায় উদয় হয়েছিল 'unrest'-এর মোকাবিলা করবার জন্য, সন্ত্রাসের বন্যা থামানোর জন্য, তাঁর যুক্তি মেনে নেওয়া কঠিন। বঙ্গভঙ্গ রদের মতো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল এক-পা পিছিয়ে এসে, নিজেদের 'আপসকামী' হিসেবে দেখানোর আত্যন্তিক ইচ্ছেয়, সন্ত্রাসবাদীদের পাল্লায় পড়ে তেমন পদক্ষেপ নেওয়ার মতো ততখানি নাস্তানাবুদ হয়েছিল কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ? কিংবা, উল্টোদিকে, বঙ্গভঙ্গ রদের মতো পদক্ষেপ দিয়ে কি সত্যিই সেই সন্ত্রাসের মোকাবিলার আশা বাস্তবসম্মত ছিল? এত বড় ভুল হিসেব করবেন পাকা রাজনীতিক লর্ড হার্ডিঞ্জ, ভাবা কঠিন। বঙ্গভঙ্গ রদের প্রয়োজন হয়েছিল নিশ্চয়ই অন্য কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, সন্ত্রাসবাদীদের শান্ত করা এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল না।

শান্ত করে হাতে রাখতে আসলে চাওয়া হয়েছিল যাঁদের, তাঁরা সন্ত্রাসবাদী নন, চরমপন্থী নন, তাঁরা আসলে শাসকমহলের বহুদিনের পাত্রমিত্র-অমাত্য—নরমপন্থী বলে তাঁদের পরিচয়। বিংশ শতকের গোটা প্রথম দশকটা জুড়ে, এমনকী বঙ্গবিভাগের সময়েও যাঁরা পইপই করে বলে আসছিলেন, 'defiance' নয়, 'defence'ই হল একমাত্র পথ। ঔপনিবেশিক শাসনের এই পর্যায়ে ক্রমশ আরও বেশি করে বোঝা যাচ্ছিল, কিছুটা ছেড়ে কিছুটা পিছিয়ে, দেশীয় মহলকে খানিকটা তুষ্ট করে, কিছুটা প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনের সুযোগ দিয়ে, অর্থাৎ এক ধরনের সহযোগিতা বা collaboration-এর মাধ্যমে এ বার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে নতুন একটা চেহারা দিতে হবে। যারা সেই সহযোগিতার বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যকে আঘাত হানবে, তাদের জন্য তো প্রত্যাঘাত রইলই। একদিকে representation, অন্যদিকে repression, এই হয়ে উঠছিল নতুন ফরমুলা। প্রশ্ন উঠতেই

পারে, কিন্তু নরমপন্থীরা যদি প্রথমাবধিই এতটা মিত্রভাবাপন্ন, এতটা বশংবদ, তাঁদের আবার আলাদা করে এতখানি খাতির করার দরকার হয়েছিল কেন? দরকার হয়েছিল দুটো কারণে। এক, তাঁদের মাধ্যমে বাঙালি হিন্দু সমাজের মধ্যে ইংরেজ শাসন বিষয়ে এক ধরনের সমর্থন, সহযোগিতা তৈরি করতে। দুই, তার কিছু আগে থেকে ঘটতে থাকা অন্যান্য নানা ঘটনার অভিঘাতে এঁদের তরফে জমে-ওঠা বিক্ষোভ দূর করতে। ইতিমধ্যে এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছে ব্রিটিশ রাজ, যার থেকে অভিযোগের ভিড় জমছিল তাঁদের মনে, ভাবা হচ্ছিল বাঙালি মুসলমানদের প্রতি স্পষ্টত পক্ষপাতিত্ব করছে ব্রিটিশ। হার্ডিঞ্জের তরফ থেকে প্রয়োজন ছিল সেই বিক্ষোভকে প্রশমিত করার। নরমপন্থী নেতৃত্বের মধ্যেও তখন বিপুল বিক্ষোভ এই মুসলমান-স্বার্থমুখী শাসনপ্রণালী নিয়ে, বঙ্গবিভাগ যার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ অবশ্যই, কিন্তু একমাত্র উদাহরণ নয়। ইংরেজ সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু মুসলমান দুই শিবিরকে যথাসাধ্য আলাদা করে রাখা এবং দুই হাতে দুই শিবিরকে প্রসাদ বিতরণ করে তুষ্ট রাখা। এই পর্ব থেকেই শুরু Divide and Rule নামক দর-কষাকষির খেলার, বঙ্গভঙ্গ খেলার, বঙ্গভঙ্গ রদ যার প্রত্যক্ষ ফল। অর্থাৎ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বাঁধভাঙা আবেগের কাছে হার মেনে নয়, সন্ত্রাসের উপদ্রবকে ঠান্ডা করতেও নয়, শাসনের নতুন ফরমুলা মেনে চলতে প্রয়োজন হয়েছিল নরমপন্থীদের হাতে রাখার (লর্ড মিন্টোর ভাষায় 'Rally the Moderates'), আর তার থেকেই প্রয়োজন হয়েছিল দুই বাংলাকে এক করে একটা 'সদিচ্ছা' (goodwill) দেখানোর। প্রয়োজন হয়েছিল ব্রিটিশ সম্রাটের রাজকীয় 'উপহার'টির।

৩

তাকানো যাক একবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির অন্দরমহলে। ঠিক কী ভাবা হচ্ছিল তখন ভারতশাসনের নতুন পদ্ধতি ও প্রকরণ নিয়ে? ভারত সরকার তথা বাংলার প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী পক্ষের আদানপ্রদানের একটা জটিল ছবি তৈরি হয়ে উঠছিল এ সময়ে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের দিনগুলোর পর আবার এই বিংশ শতকের গোড়ার দিকে, ১৯০৬-৭ সাল নাগাদ, কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চল নিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিল বিদেশি সরকার। স্বদেশি-বয়কট আন্দোলন পর্ব তখনও চলছে। সন্ত্রাসী আক্রমণ এখানে ওখানে। নৈরাজ্যের ভয়ে শাসকমহল দিশেহারা হয়ে পড়ছিলেন স্পষ্টতই। ভাইসরয় লর্ড মিন্টো মনে করছিলেন, 'government by the strong hand' ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিছু 'concession', কিছু 'suppression', এই হবে সেই strong hand'-এর ধরন।

আর এক দিকে চলছিল অন্য তোড়জোড়। সে তোড়জোড় শাসন সংস্কার প্রবর্তনার। ১৮৯২ সালের শেষ শাসনসংস্কারের পর যে আবার সময় এসেছে নতুন সংস্কারের কথা ভাবার, তা নিয়ে চাপ যথেষ্টই ছিল ভারতীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে। গোপালকৃষ্ণ গোখলের মতো প্রভাবশালী নেতারা মনে করছিলেন যে, জাতীয়তাবাদের পক্ষে সংস্কারের পথে এগোনোই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, তাঁদের উদ্দীপনায় সংস্কার নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা শুরুও হল।

চাপ আসছিল আর এক দিক থেকেও, নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের দিক থেকে। ইতিমধ্যেই ১৯০৬ সালে মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে খুশি করার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন দিকের চাপের মধ্যে শাসনসংস্কার বিষয়ক আলোচনার অগ্রণী হয়ে দাঁড়ালেন সেক্রেটারি অব স্টেট মর্লে। খুব সহজ হয়নি এই আলোচনা, কেননা মর্লের সচিবমহল এবং ভাইসরয়-চালিত উপরমহল থেকে আসছিল বিপুল প্রতিবাদ—মূলত দুই কারণে। এক, ভারতের মতো বিপজ্জনক উপনিবেশে সংস্কার প্রণয়নের দরকারই যে কী, বুঝতে পারছিলেন না তাঁরা। দুই, যা-ই সংস্কার হোক না কেন, তার মধ্যে যে রাখতে হবে সরকারের 'strong hand'-এর ছাপ, সে বিষয়েও সংশয়ের জায়গা রাখতে রাজি ছিলেন না লর্ড মিন্টো। ফলে ১৯০৯ সালে নতুন সংস্কার ঘোষিত হল, কিন্তু তা এল অত্যন্ত সীমিত ও খণ্ডিত আকারে। কেননা, মিন্টো স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন মূল সূত্রটি 'The Government of India must remain autocratic, the sovereignty must be vest in British hands and cannot be delegated to any kind of representative assembly' যেটুকু যা প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেওয়া হল, সেগুলি খুবই সীমিত ক্ষেত্রে। রাজস্ব, ঋণ, সমর, দেশীয় রাজ্য, বৈদেশিক নীতি—প্রায় সব কয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল দেশীয় প্রতিনিধিদের আলোচনা-বহির্ভূত। এমনিতেও সরকারি নীতি বা ব্যয়খাতের আলোচনাতেও সমালোচনার ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত করে দেওয়া হল। বাংলা প্রদেশে যদিও বেসরকারি মনোনীত সদস্যরা সরকারি মনোনীত সদস্যদের চেয়ে সংখ্যায় খানিক বেশি ছিলেন, সেই 'বেশি' একেবারেই নামমাত্র, কেননা বেসরকারিদের মধ্যেও আবার কয়েক জন ছিলেন ইউরোপীয়। সুতরাং উড়বার পাখা তৈরি করে সে পাখা বেশ ভালোমতোই ক্লিপ দিয়ে আটকে দিতে ভুল হয়নি মর্লে এবং মিন্টোর।

তবে নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের কাছে সবচেয়ে বড় আঘাত হয়ে এল হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের জন্য 'separate electorate' বা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে নির্বাচন প্রবর্তন। এই ভাবনা বেশ অনেক দিন ধরেই ভাসছিল হাওয়ায়। মুসলিম লীগ তো তার জন্মমুহূর্ত থেকেই দাবি জানিয়ে আসছে। তবে ভেতরের হাওয়া আঁচ করে লর্ড মিন্টো মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠারও অনেক আগেই ১৯০৬ সালের অক্টোবরে সিমলায় এক মুসলিম প্রতিনিধি দলের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিলেন যে স্বতন্ত্র বা সাম্প্রদায়িক ভোটদানের বন্দোবস্ত করা হবে, যাতে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় তাদের সংখ্যার অনুপাতের চেয়ে বেশি পরিমাণ আসন পেতে পারে। কী ভাবে, কেন এই দাবি মুসলমান সমাজে তৈরি হয়ে উঠছিল, তা নিয়ে আমরা কিছু পরে আলোচনা করব। এখন কেবল এইটুকুই বলা যাক যে, যে সংখ্যালঘু বনাম সংখ্যাগুরু রাজনীতি পরবর্তী শতাব্দীর ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করবে, এই ১৯০৬-৭ সালেই তার গোড়াপত্তন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কণ্ঠনিঃসৃত এই আগাম নিরাপত্তার দাবি ব্রিটিশ শাসকের ভারি মনঃপূত হল সাম্রাজ্যবাদের নিজস্ব যুক্তিতেই। শুরু হল দর কষাকষির খেলা, যে খেলায় একদিন দেশ ভেঙে দু-তিন টুকরো হয়ে যাবে। মোট কথা, মর্লের মিশ্র নির্বাচকমণ্ডলীর প্রস্তাব খারিজ করে মিন্টোর কথামতো পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীই প্রবর্তিত হল। কেবল তাই নয়, মুসলমানদের

অনুপাতেব বেশি গুরুত্ব 'weightage' দিতে গিযে সদস্য মনোনযনেব মাপকাঠিগুলিও হিন্দুদেব তুলনায অনেক লঘু কবে দেওযা হল।

১৯০৫ সালেব পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন থেকে শুরু কবে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায বিশেষ উৎসাহদান এবং তাব পব মর্লে-মিন্টো সংস্কাবে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীব স্বীকৃতি পব পব বেশ কতগুলি ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজেব প্রতি ব্রিটিশ বাজেব এই বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশিত হযে পড়াব পব বেশ একটা বিক্ষোভ তৈবি হযে উঠল হিন্দু জাতীযতাবাদী মহলে। হর্তাকর্তাদেব দাক্ষিণ্যে যত তাড়াতাড়ি মুসলিম লীগ আব সব গোষ্ঠীকে ছাড়িযে মুসলমান সমাজেব একমাত্র মুখপাত্র হযে উঠল, সেও বিশেষভাবে লক্ষ কবাব মতো। এই বিক্ষোভ কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যাচ্ছিল তথাকথিত নবমপন্থীদেব মধ্যেও। যে 'মডাবেট'দেব 'লয্যালিস্ট'-এ পবিণত কবা ছিল ব্রিটিশদেব অন্যতম লক্ষ্য, তাঁবা ক্রমশই 'লয্যালিজম'-এব পথ বিষযে সংশযগ্রস্ত হযে পড়তে লাগলেন। গোখলে বিরক্তি গোপন না কবে বলেছিলেন 'মুসলিম প্রতিনিধিত্ব শুধু অন্যায্য হযনি, ভযাবহ ভাবে অন্যায্য হযেছে।'

প্রশ্ন হল, মুসলিম লীগেব দাবিকে এই পবিমাণ গুরুত্ব দিতে শুরু কবা হল কেন? কেন, তা বুঝতে মনে বাখতে হবে পিছনেব প্রেক্ষিতটিকেও। একে তো ঠিক কোন ধবনেব 'নবমপন্থী' গোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেওযা হবে, সে বিষযে মর্লে ও মিন্টোব অভিমত ছিল আলাদা। মর্লে পছন্দ কবতেন গোখলেব মতো কংগ্রেসি মডাবেটদেব, আব মিন্টোব মতে, কংগ্রেস যে জাতীয়তাবাদকে প্রতীকাযিত কবে, তাব থেকে দূবে থাকাই বাঞ্ছনীয, ফলে মুসলিম লীগ জাতীয সংগঠনকে কাছে টেনে নেওযাই ববং মন্দেব ভালো।

যে ইতিহাসেব ধাবায গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব, গোষ্ঠী-স্বার্থ ও পাবস্পবিক দবাদবিব নিবিখেই এক একটি যুগের ঘটনাবলি ব্যাখ্যা কবা হয, সেই ইতিহাস নিশ্চযই মিন্টোব এই বাজনৈতিক চালেব মাধ্যমেই মুসলিম লীগেব উত্থান ও ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ব্যাখ্যা কববে। আমাদেব কিন্তু পাশাপাশি এ কথাও মনে বাখতে হবে যে ১৯০৫ সালেব বঙ্গভঙ্গেব পব থেকেই মুসলমান সমাজেব মধ্যে তৈবি হযে উঠছিল শাসন-ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বেব দাবি। তৈবি হযে উঠছিল এই বোধ যে, নিজেব স্বার্থ বক্ষিত হওযাটাই সবচেযে বড কথা নয, নিজেকে নিজের সেই স্বার্থ তুলে ধববাব অধিকাব দিতে হবে, সেটাই আত্মমর্যাদাপূর্ণ প্রতিনিধিত্বেব মূল কথা। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীব কাছ থেকে এমন দাবি অনেক দেশে অনেক সমযেই শোনা গেছে, এমনকী বিংশ শতকেব প্রথমেও শোনা গেছে, সুতবাং প্রথাগত ইতিহাসেব অভ্যেসমতো স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীব এই দাবিকে প্রথমেই প্রবল সমালোচনা বা আক্রমণ না কবে ববং এই দাবিব পেছনেব মানসিকতা ও পবিস্থিতিব কিছুটা আলোচনা জরুবি।

৪

ভাবতেব বিংশ শতকেব ইতিহাসেব গতিপ্রকৃতি বহুলাংশে নির্ধাবণ কবে দিযেছিল 'সংখ্যাগুরু

বনাম সংখ্যালঘু' রাজনীতি। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ নামক প্রতিষ্ঠানটির সূচনা কিন্তু সেই রাজনীতিরই একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্ন। বস্তুত, লীগের প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে যত কথাবার্তা হয়েছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তরে, তার থেকে অভ্রান্তভাবে একটিই প্রশ্ন উঠে আসে—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে সম্প্রদায়-অঞ্চল-ধর্ম-ভাষা-নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের প্রতিনিধিত্বের দাবি জানায়, তা আদৌ কতদূর সঙ্গত বা সম্ভব। ভারতের বিভিন্ন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কোনও বৈপরীত্য বা বিরোধ থাকে, তবে তা কী ভাবে মিটাবে জাতীয় কংগ্রেস। সর্বভারতীয় স্তরেও যেমন, আঞ্চলিক স্তরেও এই একই সংশয় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল বেশ কিছু দিন ধরে।

স্যার সৈয়দ আহমদের জিজ্ঞাসা ছিল যে, বড় আর ছোটো কেমন করে সমান বা এক অধিকারে রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে মিলিত হবে "in the event of a union between the big and the small, the small is who is bound to be the loser. It is enormously easy for the big to get away with its own terms, to manipulate the small in its own interest, to associate and dissociate with the small at its own convenience."। একেবারে তাঁর জিজ্ঞাসার সুরে সুর মিলিয়ে বাংলার মুসলমান সমাজেও সংশয় উচ্চারিত হতে থাকে। 'নবনূর' পত্রিকায় ১৯০৫ সালে প্রকাশিত লেহাজউদ্দিন আহমদের প্রবন্ধ 'রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান' একই প্রশ্ন তোলেন—কোন জাদুতে মুসলমানদের মতো সংখ্যাবলে ছোটো; শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ হিন্দু স্বার্থের সঙ্গে এক বন্ধনীতে একই হিসেবনিকেশ দিয়ে আলোচিত হয়। আরও এক ধাপ এগিয়ে তিনি এও বলেন যে, যদিও বিদেশি শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়া যে-কোনও স্বাধীনচেতা মানুষেরই কাম্য, কিন্তু স্বশাসন বা 'self-rule'-কে প্রথম প্রাধান্য দিতে হলে এই মুহূর্তে ভারতীয় মুসলমানদের স্বাধীনতার চিন্তা আপাতত স্থগিত রাখাই ভালো। এবং এই স্বশাসন অর্জনের পথে যে যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার এবং যথাযথ পথে নিজেদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারার গুরুত্ব অসীম, তাও লেখক স্মরণ করিয়ে দেন। শেষে হিন্দু ভাইদের কাছে আবেদন প্রথমে আমাদের তোমরা সত্যিকারের মুসলমান হতে দাও, আমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে দাও, তার পর তোমাদের সঙ্গে রাজনীতিক্ষেত্রে হাত মেলাতে আহ্বান কোরো।—

প্রবন্ধটির উল্লেখ করতে হল এই কারণেই যে ১৯০৫-৭ সালের মধ্যে বহু লেখাপত্রে নজরে পড়বেই বাঙালি মুসলমানের উদ্দীপ্ত আবেগ, কখনও আবেদনের ভাষায়, কখনও দাবির ভাষায়। একদিকে যেমন জাতীয়তাবাদের হিন্দুবাদী মূলধারায় তখন সমানেই 'এক ও অভিন্ন জাতি'র ভাবনা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠছে, উল্টোদিকে বার বার সেই 'জাতি'র ধারণায় বড় বড় প্রশ্নচিহ্নে রঞ্জিত করে দিচ্ছে সংখ্যালঘু মন। জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দাঁড়িয়ে পড়া সেই প্রশ্নচিহ্নগুলোর মূল সুরটিকে যদি এক কথায় প্রকাশ করতে হয়, তবে তা হল 'স্বাতন্ত্র্য' ('difference'), জাতীয়তাবাদের বিপরীতে স্বাতন্ত্র্যবোধের অভিব্যক্তি ও আত্মপ্রকাশ। একদিকে 'জাতি' গঠনের প্রয়োজনে সমানেই পারস্পরিক

ভেদাভেদ, স্বার্থবিরুদ্ধতা, ভাষাগত বা সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা কবে 'একীকবণে'ব আহ্বান। অন্যদিকে এই একীকবণেব আহ্বানেব সামনে ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে সম্মান দেওযাব বিপন্ন আবেগ। জাতীযতাবাদেব ইতিহাস পডতে গিযে আমাদেব তাই নজবে পডবেই জাতীযতাবাদেব 'অপব' বা 'other'—এই স্বাতন্ত্র্যবাদকে। অথচ যতই সববে উচ্চাবিত ও ঘোষিত হোক না কেন, মূলধাবাব জাতীযতাবাদ কিন্তু তখন বিপজ্জনক নিশ্চিন্ততায উপেক্ষা কবে গেছে সেইসব প্রশ্নচিহ্ন। ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব ছাড়া আব কোন সমসাময়িক চিন্তাবিদ বা বাজনীতিকেব ভাবনায আমাদেব চোখে পড়ে এই প্রশ্নেব অনুবণন? এ প্রশ্নেব মধ্যে যে এক সঙ্গত আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রকাশেব অধিকাব আছে, কোনও না কোনও ভাবে যে তাকে আলোচনায জাযগা দেওযা অত্যন্ত জরুবি, মূলধাবাব জাতীযতাবাদ তা একেবাবেই বুঝে উঠতে পাবেনি। কিন্তু বুঝেছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসক। সংখ্যালঘুব স্বাধিকাব প্রতিষ্ঠাব এই দাবি তাই তাদেব আলাপ-আলোচনায স্থান কবে নিতে সময নেযনি কোনও।

স্বাধিকাবেব এই দাবির অন্যতম অংশ ছিল শাসনসংস্কাবেব সময পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীব দাবি। বাব বাব মনে কবিযে দেওযা হচ্ছিল যে সংসদীয প্রতিনিধিত্বেব কোনও সামান্য সূচনা হলেও প্রথম থেকেই সংখ্যালঘুব জন্য এই পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীব ব্যবস্থা বাখা উচিত। নযত কেমন কবেই বা হিন্দু-অধ্যুষিত এক একটি অঞ্চলে কোনও মুসলমান প্রার্থী জযেব আশা কবতে পাবেন? পুবনির্বাচনেই হোক আব আইনসভাব নির্বাচনেই হোক, কী ভাবে এক জন নির্বাচিত মুসলমান সদস্য সে ক্ষেত্রে মুসলমান স্বার্থ তুলে ধবতে সমর্থ হবেন? কোন স্বাধিকাবেব সূত্র বলে যে নিজেব স্বার্থ অন্যের দ্বাবা উচ্চাবিত হওযাটাই যথেষ্ট, তাব বেশি কিছু দরকাব নেই? আব তা ছাড়া, বাশিযা কিংবা সাইপ্রাস-এব মুসলমান সম্প্রদায ইতিমধ্যেই পৃথক নির্বাচন লাভ কবে থাকলে ভাবতে তা কেন অপাংক্তেয বিবেচিত হবে? (মিহিব ও সুধাকব, ১৯০৯, বিপোর্ট অন নেটিভ পেপাবস, ৮ নম্বব খণ্ড থেকে সংগৃহীত)—এ সব প্রশ্নেব সামনে নিশ্চযই প্রতিপ্রশ্ন তোলাই যায যে সত্যি কবেই 'মুসলমান স্বার্থ' বলে কিছু হয কি না, কিংবা পৃথক নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনও উপাযে স্বাতন্ত্র্যেব প্রতি মনোযোগ দেওযা সম্ভব কি না। কিন্তু মূল কথা হল, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীব এই দাবি কিছু আকাশ-থেকে-পড়া নতুন কথা নয, গত এক শতকেব ইতিহাসে বহু দেশে বাবে বাবে 'সংবক্ষণে'ব বক্তক্ষযী দাবি তা দেখিযেছে। অথচ এ আমাদেব দেশেব মূলধাবাব জাতীযতাবাদেব অসীম দৈন্য ও ঔদাসীন্য যে এত বড জরুবি প্রশ্নটিকে কখনওই যথেষ্ট সম্মানেব সঙ্গে স্থান দেওযা হযনি, কেবলই উল্টোদিকে ঠেলে সবিযে প্রশ্নটিকে ক্রমশ আবও চবম আকাব নিতে বাধ্য কবেছে।

৫

বাজনীতিব নেপথ্যে যে ভাবধাবাব প্রবাহ বযে চলে, সেই প্রবাহে তখন 'জাতীযতা' বনাম 'স্বাতন্ত্র্যে'ব গভীব সংঘাত। সে দিনকাব ব্রিটিশ বাজেব বাজনৈতিক কলকৌশলেও

'জাতীয়তা'-'স্বাতন্ত্র্যে'র এই সংঘাতের ছাপ পড়ছিল। ১৯০৫-৯ সালের মধ্যে লর্ড কার্জন এবং লর্ড মিন্টোর অনুগ্রহে বারংবার 'স্বাতন্ত্র্যে'র এই রাজনীতি সাম্রাজ্যের দাক্ষিণ্য লাভ করেছিল। অবধারিত ফল হিসাবে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছিলেন মূলধারার জাতীয়তাবাদের নেতারা। তাঁদের কাছে এ কেবল 'হিন্দু বনাম মুসলমান' স্বার্থের সঙ্কীর্ণ বিরোধ ছিল না, তার চেয়ে আরও অনেক বেশি কিছু। যে জাতীয়তাবাদ স্বদেশি স্ফুরণ দেখেছে, বয়কটের বহ্নি দেখেছে, যে জাতীয়তাবাদের আবেগ 'দেশমাতৃকা'র পূজার্চনার মধ্যে নিজেকে প্রকাশিত করেছে, সেই জাতীয়তাবোধের সামনে 'স্বাতন্ত্র্য' বা 'স্বার্থ-বিরুদ্ধতা'র কথা বলা যেন বিধর্মিতার সমান, জাতীয়তা দর্শনের অসম্মান। মর্লে-মিন্টো সংস্কারের রূপরেখা স্পষ্ট হওয়ার পর কেবল গোখলে বা মতিলাল নেহরুর মতো প্রথম সারির নেতারাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েননি, তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল সাধারণ সারির জাতীয়তাবাদেও : "We fail to see how Government could arrive at such a decision that politically Hindus and Muslims interests are opposed to each other " (হিতবাদী, ১৯০৯, রিপোর্ট অন নেটিভ পেপারস, ৮ নম্বর খণ্ড)। 'হিন্দু মহাসভা'র মতো প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার পিছনেও অনেকখানি ভূমিকা ছিল এই তীব্র ক্ষোভের।

শতাব্দীর প্রথম দশক যতই শেষের দিকে আসছিল, ততই ব্রিটিশ সরকার চাপ অনুভব করছিলেন 'জাতীয়তা'র ক্রমবর্ধমান এই ক্ষোভকে কিছুটা প্রশমন করার। প্রশমনের দিকে এগোতে হলে সেই সময়ে সম্ভবত দুটি পথ খোলা ছিল এক, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী প্রথা তুলে দেওয়া, দুই, বঙ্গবিভাগ রদ করা। প্রথম পথটি অবশ্যই কম গ্রহণযোগ্য, এমন একটি সুবিধেজনক শাসনের অস্ত্র ছেড়ে দিতে হলে সাম্রাজ্যের ক্ষতির পরিমাণ হবে অনেক বেশি। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত যে কার্জনের বঙ্গবিভাগ শাসনতান্ত্রিক বা অর্থনৈতিক কোনও দিক দিয়েই ব্রিটিশ রাজকে বিশেষ কোনও সুবিধে এনে দিতে পারেনি, যদিও সে উদ্দেশ্য গোড়া থেকেই ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বাঙালি জাতিকে শায়েস্তা করা এবং বাঙালি মুসলমানদের প্রতি বিশেষ দাক্ষিণ্য দেখানো, এই ছিল সে দিনকার বঙ্গভঙ্গের মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু ততদিনে শাসনসংস্কার প্রবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে হয়ে গেছে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রীতি-অর্জন। বস্তুত, সেই সময়ে 'মুসলমান স্বার্থে'র ধ্বজাধারীরা সরকারের উপর এতটাই প্রসন্ন যে বঙ্গবিভাগ রদ, অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের অস্তিত্ব লুপ্ত করে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের যদি কিছুটা চটাতেও হয়, তাতেও খুব একটা দুশ্চিন্তার কারণ নেই, বুঝতে পারছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা। বাঙালি মুসলমান পত্রপত্রিকাগুলি সরাসরি বোঝাতে চেয়েছে যে, তাদের কাছে এখন আলাদা প্রদেশ রক্ষার চেয়ে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীকে রক্ষা করা অনেক জরুরি। বঙ্গভঙ্গ সরকারিভাবে রদ হওয়ার অন্তত আড়াই বছর আগে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পড়লে বোঝা যায়, 'পার্টিশন অব বেঙ্গল'-এর 'মডিফিকেশন' যে হতে পারে অদূর ভবিষ্যতে, সেই বোধ কতটাই স্পষ্ট ছিল, এবং কতটাই স্পষ্ট ছিল এই যুক্তি যে সব কিছু ছাড়িয়ে সবচেয়ে দরকার সমস্ত রকম নির্বাচিত সভায় মুসলমান

প্রতিনিধিত্বের নিরাপদ অনুপাত রক্ষা করা। সেই অনুপাত রক্ষিত হলেই দেশে সংখ্যাগুরুর একশাসনের ভয় দূর হবে, সংখ্যালঘুর বাকি আর সব কিছু স্বার্থের সুরক্ষা সম্ভব হবে

"A nation had far better become wholly extinct than pass entirely under the control of another The cow-killing question had led to trouble at Titagarh, but considering how Legislative Councils are going to be constituted, probably next year, the predominance of Hindu members will get cow-killing prohibited by law in India Perhaps your Partition of Bengal too may come to be modified next year What we must tell the Government is that we cannot be content unless half of Indian members in all the conucils consists of Muslims" (মিহির ও সুধাকর, ১৯০৯, রিপোর্ট অব নেটিভ পেপারস, ৫ নম্বর খণ্ড থেকে সংগৃহীত)।

এই পরিস্থিতিতে সম্রাট পঞ্চম জর্জের মুখ দিয়ে বাংলা বিভাগ রদের ঘোষণা উচ্চারণ করালেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। পূর্ববঙ্গীয় বাঙালি মুসলমানরা অত্যন্ত দুঃখ পেলেন, কিন্তু সাম্প্রতিক কালের অন্যান্য লাভের খতিয়ান মনে রেখে ততটা ভেঙে পড়লেন না। 'মোসলেম হিতৈষী'র একটি প্রবন্ধের উল্লেখে বোঝা যাবে কেমন বোধ করেছিলেন তাঁরা। "The Partition of Bengal was advantageous to the Mussalmans of Eastern Bengal in all ways This is why we rejoiced at the Partition and prayed to the Government to uphold it However that may be, the present arrangement of placing the two Bengals under one Governor has satisfied the Mussalmans of Bengal But their prayer to the Government is this that the advantages which the Partition gained for the Mussalmans of Eastern Bengal in District Boards, Local Boards and Municipalities, in the public service, in education may be maintained In short, it is the earnest desire of all Mussalmans in Bengal that a system of separate representation like that for election of members to the Legislative Councils may be introduced "।

যেটুকু যা ক্ষতিস্বীকার, তারও ক্লেশ কমাতে ইংরেজ সরকারের তরফে নতুন যুক্তবঙ্গে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করা হল, রাজধানী দিল্লিতে সরিয়ে পুরোনো ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আবার নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়া হল, পূর্ববঙ্গের স্বার্থে ঢাকায় একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হল, আলিগড় কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার যে দাবি অনেক দিন ধরেই ছিল, তাকে স্বীকৃতি দিয়ে সে বিষয়ে তদ্বির শুরু হল।

আর 'বাঙালি হিন্দু'কে শায়েস্তা? বঙ্গবিভাগ রদ করে উদ্দিষ্ট নরমপন্থী গোষ্ঠীকে প্রীত করে, মূলধারার 'জাতীয়তা'র প্রতি দাক্ষিণ্য দেখিয়ে পাল্লা সমান করেও যে কী ভাবে বাঙালি জাতিকে ফাঁদে ফেলা যায়, তার উপায় খুঁজে বার করতে কষ্ট হয়নি লর্ড হার্ডিঞ্জের। বুঝতে অসুবিধে হয় না, কার্জনের থেকে এই দিক দিয়ে তিনি অনেক বেশি ধুরন্ধর। সেই কারণেই বঙ্গ পুনর্গঠনেও ১৯১১-র নতুন প্রদেশকে আগেকার বাংলা প্রদেশ থেকে বেশ কিছুটা আলাদা করে দেওয়া হল, পূর্ববঙ্গ থেকে আসাম, এবং পশ্চিম থেকে বিহার

ও উড়িষ্যাকে বাব কবে নেওযা হল, যাতে বাংলাভাষীদেব একত্র কবেও নবগঠিত যুক্তবঙ্গে মুসলমান সংখ্যাগবিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত করা যায। হার্ডিঞ্জেব সবকাবি নথিই বলছে : "As matters now stand, the Bengalis can never have in either province that influence to which they consider themselves entitled by reason of their numbers, wealth and education" এবং বঙ্গভঙ্গ বদ ঘোষণাব পাশাপাশি কলকাতা থেকে বাজধানী সবল দিল্লিতে। কলকাতাব ইউবোপীয মহল খুব খুশি হযনি, তাদেব ব্যবসা-স্বার্থ অনেকটাই নষ্ট হযেছিল এই সিদ্ধান্তে। আব খুশি হযনি ব্রিটিশ সবকাব যাঁদেব আংশিক সন্তোযেব জন্য চেষ্টা করছিল, সেই নবমপন্থী বাজনীতিকবা। 'দি ইংলিশম্যান' ও 'দি স্টেটসম্যান'-এব পাশাপাশি 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-ও ক্রমে অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুরু কবে।

ইতিহাসে 'যদি. .তবে' ধবনেব যুক্তি বিশেষ গ্রহণযোগ্য নয। কিন্তু ভাবতে ইচ্ছে করে যে, যদি সে দিনে দুই বাংলাকে আবাব মিলিযে দেওযা না হত, তবে কী রকম ভাবে পাল্টে যেত পববর্তী ঘটনাপ্রবাহ। প্রশ্নটা তুলতে ইচ্ছে কবে এই জন্যই যে, সন্দেহাতীত ভাবে বাঙালি মুসলমান স্বার্থ একটা আত্মপ্রকাশেব মঞ্চ খুঁজে পেযেছিল পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশেব মধ্য দিযে। অনেক দিন ধবে এই আত্মপ্রকাশেব খোঁজে ছিলেন তাঁবা। কে জানে, হযতো পৃথক প্রদেশটিতে একটা বড় সমযকাল ধবে প্রশাসনিক স্তরে আরও বেশি ভূমিকা, সামাজিক ক্ষেত্রে আরও বেশি গুরুত্ব, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আবও বেশি মতামত প্রকাশের অধিকাবেব মাধ্যমে সেই আকাঙ্ক্ষা খানিকটা পূর্ণ হতেও পাবত। সে ক্ষেত্রে পরবর্তী যুগেব সর্বভারতীয় মুসলমান রাজনীতিব জটিলতাব সঙ্গে বাঙালি মুসলমান বাস্তব অতটা সহজে জড়িয়ে যেতে পারত কি? বাঙালি মুসলমান মানসলোকে বিক্ষোভেব মাত্রা কম থাকলে 'পাকিস্তান বাজনীতি'ব আকর্ষণটা তাঁদেব কাছে আব একটু কম হত কি?

সে যাই হোক, ১৯১১ সালেব ঘোষণাব যে অন্তর্নিহিত সাম্রাজ্যবাদী বাজনীতি, তা সম্পূর্ণত সফল ছিল, সামযিকভাবে দুই মহলকেই কিছু দিযে কিছু নিয়ে, 'মুসলিম স্বার্থ' এবং 'হিন্দু স্বার্থ' বলে চিহ্নিত দুই মানসিকতাকে যথাসাধ্য প্রীত কবা গিয়েছিল। বিভিন্ন মহল থেকেই তখন হয খুশি, নয প্রসন্নতা, নয অপ্রসন্ন স্বীকৃতির ভাব। আবার একই সঙ্গে এই ধবনেব ওজন সমান বেখে দব কযাকযির খেলাব যেমন মৌলিক নিয়ম, কাউকেই মাত্রাতিবিক্ত প্রসন্ন কবা হযনি, সব মহলেই খানিকটা বিক্ষোভেব আগুনও জিইযে বেখে দেওযা হয়েছিল। এই নিহিত আগুনেই ছিল ঔপনিবেশিক রাজনীতিব মূল অস্ত্র, মূল সাফল্য। দূবদৃষ্টিবহিত বাজনীতির যেমন দস্তব, ঠিক তেমনভাবেই ওই বিক্ষোভেব আসল লক্ষ্য যে উপনিবেশের বাজনীতি, সেই বোধ ক্রমশ পাবস্পবিক দোযারোপেব আবর্তে হাবিযে যেতে থাকল, 'জাতীযতা' ও 'স্বাতন্ত্র্যে'র সংঘাতে হারিযে যেতে থাকল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানেব আশা। ১৯০৫ সালেব বঙ্গভঙ্গেব সিদ্ধান্ত দিযে যতটা না ক্ষতি হযেছিল বাঙালিব জাতিব, ১৯০৫-১১ সালেব অর্ন্তবর্তী সময়েব রাজনীতি, যে বাজনীতিরই একটি অবিচ্ছেদ্য পর্ব বঙ্গভঙ্গ বদ—সেই বাজনীতিব অভিঘাতে তাব থেকে অনেক বড দুঃসমযে প্রবেশ কবল বাঙালিব ইতিহাস, অনেক বড় বিপদেব দ্বাবপ্রান্তে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সাংসদ ও 'নন্দন'-এর সম্পাদক

বিপ্লব দাশগুপ্ত

কবি

ভাস্কর চক্রবর্তী